নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

তৃতীয় খণ্ড।

৩১৫

১৩০৯ ফাল্গুন—১৩১০ মাঘ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম, এ; বি, এল,

ও

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি, এল সম্পাদিত।

কলিকাতা।

ভবানীপুর, ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২।০ আড়াই টাকা।

বর্ষসূচী।

তৃতীয় খণ্ড। ফাল্গুন, ১৩০৭। ১ম সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩০৯ সাল। [১ম সংখ্যা।

"নবপ্রভা"র নব বর্ষ।

আশা ও প্রীতি।

"আদর্শ—প্রীতি ; উপায়—চেষ্টা, অভ্যাস, নিভৃত-চিন্তা ও সাধুসঙ্গ ;
আশা—ভগবদনুগ্রহ ও আত্মার অমরত্ব"

"The Law of Love is the Law of Life"

"নব বৎসরে, কুহু কুহু স্বরে, কে ডাকেরে !"

আবার বসন্ত আসিল—আশার ও প্রীতির সম্ভার লইয়া, পুলকিত বদনে আমাদিগের নিকট আসিল—তাহার কোকিলের কুহু কুহু প্রণয় সঙ্গীত, তাহার কিশলয়-শোভিত তরুশাখা, তাহার চূতমঞ্জরী, তাহার প্রাণারাম মলয়-মারুত। সহস্র স্মৃতি জাগাইয়া, পুরাতন জীবনকে নূতন করিয়া, কঠিন বাস্তব জগতের মধ্যে কোমল স্বাপ্নিক রাজ্যের মধুরিমা বিস্তার করিয়া—হে ঋতুরাজ—তুমি কিসের সুসংবাদ প্রচার করিবার জন্য—আমার নিকট আসিলে। তুমি, শীতের সঙ্কোচ দূর করিয়া, ক্লান্ত জীবনের বিষয় বাসনা, বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বেষ ঈর্ষা, ক্ষুদ্রতা নীচতা, দুশ্চিন্তা দুঃখ, তাবৎ তাড়াইয়া দিয়া, কবিত্বের, সৌন্দর্য্যের, দেবত্বের, প্রীতির, আশার মনোমোহন মেলা খুলিলে। গতবৎসরে যেমন প্রীতি-ভরে দেখা দিয়াছিলে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যেমন সস্নেহে আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলে,—তাহারও পূর্ব্বে, নবযৌবনের অরুণোদয়ে যেমন একটা নূতন শোভার জগৎ আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছিলে, যেমন একটা মধুর কি-জানি-কিরূপ মিলনের আশা দিয়াছিলে,—প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া, হৃদয়ের তন্ত্রীর সহিত

হৃদয়ের তন্ত্রী বাজাইয়া, কেমন একটা মধুর সঙ্গীত শুনাইবার আশা দিয়াছিলে—অদ্য বহুকাল পরেও—তেমনি একটা মধুর স্নেহ, মধুর শোভা, মধুর সঙ্গীতের, মধুর প্রীতির আশ্বাস দিতেছ। আজি যে তেমনি মিলনের দৈববাণী শুনিতেছি। তবে, এক্ষণে একটীতে একটীতে মিলনের পরিবর্ত্তে, একের সহিত বিশ্বের মিলনের আশা দিতেছ। পূর্ব্বেও যে পথ দেখাইয়াছিলে, এক্ষণও সেই পথ—তবে, এক্ষণে সেই পথ আর পূর্ব্বের ন্যায় সংকীর্ণ নহে, প্রীতি-রাজবর্ত্ম দেখিতে পাইতেছি—প্রশস্ত, উদার। এখন বসন্তানিলের সহিত প্রাণ বিশ্বপ্রেমের আকাশে উড়িতে চাহে, স্বার্থপরতা পিঞ্জরটী ভাঙ্গিয়া জীবন-বিহঙ্গ স্বর্গের দিকে ছুটিতে চাহে। মুক্ত হইবার চেষ্টা এত দিন নিষ্ফল হইল, তথাপি এই বাসন্তী দেবী আমার আত্মাকে বলিতেছেন, "হতাশ্বাস হইও না"। কোকিলের কুহুরবে মনে হইতেছে, বিশ্বজগৎকে বিশ্বপতিকে একদিন প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিব; প্রণয়িনী যেমন তাহার প্রাণনাথের হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায়, তেমনি একদিন বিশ্বপতির হৃদয়ে বিলীন হইয়া আনন্দময় হইতে পারিব। কোকিল কূজনে বিরহিণীর প্রাণ যেমন পতির উদ্দেশে উড়ু উড়ু করে, তেমনি কোকিলের এই কুহুরবে বুঝি আজি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথের উদ্দেশে প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতেছে—

মহাকবি গাইয়াছেন—

> পরহুঅ! মহুর পলাবিণিকন্তী
> ণন্দণ বণ-স্বচ্ছন্দ-ভমন্তী
> জই পই পিঅঅম সা মহ দিট্ঠা,
> তা আঅক্খহি মহু পরপুট্ঠ ॥

পরভৃতে মধুরপ্রলাপিনি! কান্তা নন্দনবনে স্বচ্ছন্দং ভ্রমন্তী। যদি ত্বয়া প্রিয়তমা সা মম দৃষ্টা, তদাচক্ষ্ব মহ্যং। অর্থাৎ "হে মিষ্টভাষিণ কোকিল! আমার প্রিয়তমাকে ভ্রমণ করিতে যদি দেখিয়া থাক আমাকে বল।" আমিও বলি, হে কলকণ্ঠ কোকিল! আমার প্রিয়তমকে কোথায় তুমি দেখিয়াছ? নন্দনকাননে, না বৈকুণ্ঠে—আমাকে বল।

হে কোকিল! "ত্বাং কামিনো মদনদূতীমুদাহরন্তি"—কামিজনেরা তোমাকে মদনের দূতী স্বরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু, অদ্য এই পবিত্র বসন্তে, তোমাকে ভগবানের দূত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাই বলি, মাং নয়াশু মৃদুভাষিণি যত্র মে পরমেশ্বরঃ। হে মৃদুভাষিণি যেখানে আমার পরমেশ্বর

আছেন সেখানে আমাকে লইয়া যাও। তিনি কোথায়? এ জীবনে কি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না? বিষয়-বাসনা-তাপে কি যাবজ্জীবন দগ্ধ হইব? তাঁহার প্রেমে এ দগ্ধ প্রাণ কি শীতল হইবে না? ঐ যে কোকিলের ঝঙ্কারের মধ্যে হৃদয়েশ্বরের আহ্বান শুনিতেছি। প্রাণনাথের পুণ্যমন্দিরে কবে যাইতে পারিব? বহুদূরে যে সেই মন্দির। রিপু-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে ক্ষুদ্র জীবনতরী ভাসমান—সাগর পার হইয়া সুদূরস্থিত বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতে পারিবে কি? বসন্তে, আশা দেবী, অরুণ হসিত শৈলশিখর হইতে স্মিতবদনে বলিতেছেন—"অগ্রসর হও, ভয় নাই;" প্রীতি দেবী, কুসুমিত-তরুলতা-শোভিত উপত্যকা হইতে বলিতেছেন, "ভয় নাই, অগ্রসর হও।"

এই যে বৎসর বৎসর বসন্ত পুনরাগত হয়, মৃতপ্রায় প্রকৃতিকে পুনর্জীবিত করে, তাহাতে কেমন একটা আশা হয়—আত্মা ইহলোকে জীবনের ঋতুপর্য্যায় সমাপ্ত করিয়া, পরলোকে অভিনব বসন্তে, স্বর্গীয় কোকিলের ঝঙ্কারে, জাগ্রত হইবে,—অভিনব উৎসাহ, নবীন প্রীতি, নূতন শোভার মধ্যে, আবার নূতন তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইবে। ইহলোকে যে জীবনে ঋতুপর্য্যায় বারম্বার দেখিতে পাই। এই শোক তাপ, এবং অশ্রুবর্ষণ, এই অবসাদ—তাহার পর আবার উৎসাহ, আবার হর্ষ, আবার আশা, আবার প্রীতি; এই জীবনেই কত বার শোকে বা দ্বেষে বা নৈরাশ্যে মরিলাম; কতবার আশায় বা প্রীতিতে বা ভক্তিতে বাঁচিলাম। দুঃখ ও সুখ, দ্বেষ ও প্রীতি, মৃত্যু ও জীবন, শীত ও বসন্ত, মর্ত্ত্যে চক্রবৎ ঘুরিতেছে। কিন্তু সময়ের সহিত একটা পরিবর্দ্ধমান উদ্দেশ্য, একটা পরিবর্দ্ধমান উন্নতি চলিতেছে। এই উন্নতির মূল আশা। আশার ভিতর দুইটা বস্তু আছে; একটী ইচ্ছা, আর একটী বিশ্বাস;—সুখী বা ভাল হইবার ইচ্ছা, সুখী বা ভাল হইতে পারিব এই বিশ্বাস। স্মৃতি ভূতকাল ও বর্ত্তমানকে সংবদ্ধ করে, আশা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুখময় সূত্রে দ্বারা গ্রথিত করে। আশাতে আর একটী দ্রব্য আছে। তাহা কল্পনা।—ভবিষ্যতে যে যে সুখ হইতে পারে, আশা তাহা কল্পনা করে, কল্পনা করিয়া সেই সুখ অনুভব ও উপভোগ করে। তাই কবি বলিয়াছেন—

What future bliss he gives not thee to know,
But gives that hope to be thy blessing now.

স্মৃতি যেমন ভূতকালকে বর্ত্তমানে নিহিত করে, আশা তেমনি ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের ক্রোড়ে আনিয়া দেয়। কিন্তু, স্মৃতি নির্ব্বিচারে সুখ দুঃখ দুইই আন-

য়ন করে; আশা কেবল সুখমাত্র চয়ন করে, দুঃখকে ত্যাগ করে। আশার এমনি মোহিনী শক্তি,—যে বাস্তবিক উপভুক্ত সুখ হইতেও প্রত্যাশিত উপভোগ্য সুখ অধিকতর রমণীয়! ঐ যে শারদীয়া পূজা আসিতেছে, পূজার সময় বাটী যাইব, পিতা মাতার চরণধূলি লইব, পতিপ্রেম সোহাগিনীর প্রেমরঞ্জিত হাস্য দেখিব, প্রাণাধিক পুত্রকে কোলে লইব—কত আশা, কত সুখ! পূজা আসিল, বাটী যাইলাম—পিতামাতা, পত্নী পুত্র, সব দেখিলাম—সুখ বটে। কিন্তু যত সুখ আশা করিয়াছিলাম, যেন তত সুখ পাইলাম না। ঐ যে যুবা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কত আশা করিতেছে—"বি এল দিব, উকীল হইব, টাকা করিব, মস্ত বাড়ী করিব, যুড়ি গাড়ি করিব, আমার বৈঠকখানা প্রতিদিন লোকে গম্ গম্ করিবে, প্রেয়সীকে স্বর্ণ-হীরক-মণ্ডিত করিব"—ইত্যাদি কত আশায় এক্ষণে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছে। কিন্তু যখন সে উকীল হইল, প্রকাণ্ড বাড়ী করিল, ওয়েলার ঘোড়ার জুড়ি হাঁকাইল, পত্নীর দেহ সোণা আর হীরায় ঢাকিয়া দিল—তখন আর তাহার তেমন সুখ হইল না! যোদ্ধা নিভৃত কক্ষে ভাবী সংগ্রামের ধারা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, এক দিন তিনি রণ-বিজয়ী হইয়া দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন অথবা রাজা হইবেন, দেশের সমুদয় লোক তখন তাঁহার নিকট নতশির হইবে, রাজলক্ষ্মী তখন তাঁহার গৃহলক্ষ্মী হইবেন—এইরূপ কত আশা করিতেছেন। জীবনে সবই ঘটিল; কই, আশাতে যত সুখ পাইয়াছিলেন, ঘটনাতে তাহা পাইলেন না। তাই নেপোলিয়নের জীবনে উপরিউক্ত সুখ-সম্পদ-সৌভাগ্য যখন সবই ঘটিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যখন অজ্ঞাত নগণ্য ব্যক্তি ছিলাম, আমার হীন বাসাবাটীর একটী ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বসিয়া, আমার ভাবী কার্য্যপ্রণালীর ধারাপাত করিতাম, এবং ভাবী জীবন আশার তুলিতে অঙ্কিত করিতাম—আমার জীবনের মধ্যে সেই সময় সর্ব্বাপেক্ষা সুখময়। বাস্তবিক উপভুক্ত সুখের অপেক্ষা আশা-কল্পিত উপভোগ্য সুখ অধিকতর মনোহর। যাহা দূরে তাহা চিত্তহারী। তাই আশার কবি বলিয়াছেন—'Tis distance lends enchantment to the view. স্থূলদর্শী ঈশ্বর-দ্রোহী ব্যক্তিগণ ইহাকে "আশার ছলনা" বলিয়া ঈশ্বরকে নিন্দা করেন। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ বলেন, এই আশার মধ্যে মানবজীবনতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই আশা-পুষ্প অমরত্ব বীজের পূর্ব্বসূচনা; মানুষের জীবন বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে, ইহলোকে পরিসমাপ্ত নহে, এই পরমার্থতত্ত্বের মহান্ সঙ্গীত আশা মধুর-

স্বরে দিবানিশি গান করিতেছে। বিশ্ব হৃদয়ে জীবন নাকি অনন্ত, তাই আশাও মানব হৃদয়ে অনন্ত। তাই তত্ত্বজ্ঞ কবি বলিয়াছেন,—

Hope springs eternal in the human breast ;
Man never is, but always to be blest.
The soul uneasy and confined, from home,
Rests and expatiates in a life to come.

আশা অনন্ত উন্নতির মূল। যাহা আছে তাহাতে মানুষ যদি সন্তুষ্ট থাকিত,—তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থায় যাইবে এই আশা যদি না করিত—তাহা হইলে মানুষের উন্নতি হইত না; পশুগণ যেমন উন্নতির চেষ্টা না করিয়া এক অবস্থায় চিরকাল রহিয়াছে, মানুষও তেমন চিরকাল একই অবস্থায় পশুর মত থাকিত। তাহা হইলে মানুষ দ্বিপদ পশু হইত। আশা মনুষ্যত্বের চিহ্ন ও উচ্চ অধিকার। আশা মনের স্বাস্থ্য,—নৈরাশ্য ও ভয় মনের ব্যাধি। আশা হৃদয়কে উৎসাহে বিস্ফারিত করে, দেহে, শিরায়, স্নায়ুতে বল সঞ্চার করে; নৈরাশ্য ও ভয় দেহকে দুর্ব্বল ও অবসন্ন করে। আশার এমনি মহতী শক্তি যে বিনা চিকিৎসায় কত রোগীকে রোগমুক্ত করে; নৈরাশ্য ও ভয় এমনি অনিষ্টজনক যে সুস্থ ব্যক্তিকেও রোগী করে। দুঃখের দ্বিপ্রহরা ঘোরা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে, আশাই মনুষ্য হৃদয়কক্ষের একমাত্র দীপ। আশা পরাজয়ের মধ্যেও জয়, দারিদ্র্যের মধ্যেও ধন, রোগের মধ্যেও স্বাস্থ্য, বিচ্ছেদের মধ্যেও মিলন, মৃত্যুর মধ্যেও জীবন, বন্ধনের মধ্যেও মুক্তি। যাহার আশা নাই সে দগ্ধ কাষ্ঠ, সে জীবন্মৃত, সে জীবিতাবস্থায় শ্মশানে চিতাশায়ী হইয়া আস্তে আস্তে পুড়িতেছে। হে ভগবন্! যতদিন জীবন থাকে, ততদিন যেন আশা থাকে।

সংসারে যে সকল মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সকলেই আশার বরপুত্র। মিলটায়াডিস ও ম্যাটসিনি, গ্যারিবাল্ডি ও গ্যারিসন, কস্‌সিয়স্কো (Kosciusko) ও কশূট (Kossuth), —বুদ্ধদেব ও খৃষ্ট—সকলেই আশার পুত্র! আর প্লেটো, আর মূর—আর রবার্ট ওয়েন, ডে সেন সিমং (Saint Simon), ফুরিয়ে (Fourier) মার্ক্স (Marx) স্পেন্সার—রাস্কিন, টলষ্টয়, জোলা—ইহাঁরা সকলেই আশার সন্তান। প্লেটোর "রিপব্লিক" ও মূরের "ইউটোপিয়া," তাহাদিগের আদর্শ সমাজের আশা। ফুরিয়ে, রস্কিন প্রভৃতি মহাত্মগণের গ্রন্থ ও জীবন অনাহার-দারিদ্র্য-নাশী সমাজতন্ত্র স্থাপনের মহতী আশা, প্রীতিতে অনুপ্রাণিত।

আশা যেমন সুখ ও দুঃখের মধ্যে দুঃখ ত্যাগ করিয়া, সুখই নির্ব্বাচন করিয়া লয়, প্রীতি তেমনি স্বার্থপরসুখ ও পরার্থপর সুখের, নিজের সুখ ও পরের সুখের মধ্যে, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া, পরের সুখ মনোনয়ন ও অনুধাবন করে, এবং অবশেষে পরকে সুখী করিয়া নিজেও সুখী হয়। প্রীতি তর্ক করে না, লাভালাভ গণনা করে না, হিতবাদ বা সুখবাদ বা নীতিবাদ কিছুরই বিচার করে না, সে কেবল ভালবাসে, আর যাহাকে ভালবাসে তাহাকে সুখী করিয়া সুখী হয়। প্রীতি যেমন সম্বর্দ্ধিত হয়, তেমনি সে অধিক লোককে ভালবাসে, তখন সে কেবল পত্নী পুত্র কিম্বা পিতা মাতা ভাই ভগ্নীকে ভালবাসিয়া পরিতৃপ্ত থাকে না, সে পরিবারের বাহিরে যায়—যেখানে দুঃখ দেখে সেখানেই তাহার সান্ত্বনার কোমল কর প্রসারণ করে। সে যখন খুব পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন সে সকলকেই সুখী করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সমুদয় মনুষ্যের ক্রমবিকাশ, সমুদয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এই প্রীতির বিকাশ। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৃদয়, হৃদয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রীতি। সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উঠিয়াছিল। কর্ম্ম দ্বারা অনবরত হৃদয় মন্থন করিয়া প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি অমৃত, ইহাতে অমরত্ব লাভ হয়। বিবর্ত্তবাদ বা পরিণামবাদ মতে যেমন নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমবিকাশসূত্রে উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হয়, তেমনি হৃদয়ের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ও ক্রমবিকাশে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রীতির উৎপত্তি হয়। মানুষ অসভ্য অবস্থায় কেবল নিজের সুখ চাহে, যাহাতে নিজের সুখের বাধা হয়, তাহাতেই ক্রুদ্ধ হয়, তাহাই নাশ করিতে চাহে। যাহাকে নাশ করিলে নিজের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহাকে নির্ব্বিকারচিত্তে নাশ করে। একজন অসভ্যের ক্ষুধা হইল। নিকটে আর কিছু নাই, কেবল তাহার মাংসল স্ত্রী উপস্থিত ছিল। বর্শা দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। তাহার মাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। সেখানে একজন ইংরাজ দাঁড়াইয়া এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া সেই স্ত্রীখাদক অসভ্য ব্যক্তিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, অসভ্য ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে বলিল "উত্তম, মাংস উত্তম"। এখানে, এই বর্ব্বর ব্যক্তির প্রীতির এমনি অভাব, যে সে পত্নী বুঝে না, পুত্র বুঝে না, বুঝে আপনাকে, বুঝে কেবল আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিকৃষ্ট সুখ। কোন কোন পশু-জননী নিজের সন্তান ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উল্লিখিত অসভ্য ব্যক্তি পশু হইতে অধিক দূরে নাই। সমুদয় মনুষ্যজাতি এককালে এই শোচনীয় বর্ব্বর অবস্থায় ছিল। তাহার পর কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে প্রীতির উন্মেষ হইয়াছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যের মধ্যে জননী-হৃদয়ে

প্রথমে এই অপূর্ব্ব প্রীতি-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। অনুসন্ধান করিলে, এই প্রবৃত্তির মূলে এখানেও হয়ত স্বার্থ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, প্রীতিতে জননী মনুষ্যজাতির শিক্ষাগুরু হইলেন। সৎপ্রবৃত্তিই হউক, আর অসৎপ্রবৃত্তিই হউক, বোধ হয় উভয়ই সংক্রামক। প্রথমে জনক সুস্বাদু কোমল শিশুমাংস মাঝে মাঝেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, জননী শিশু সন্তান লুকাইয়া রাখিত। ক্রমে ক্রমে জননীর দৃষ্টান্তে হয়ত জনকের ভক্ষণ স্পৃহা কমিতে লাগিল। আর, জনক দেখিল, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে পারে, অনেক সময় সাহায্য করে, প্রীতিকর কার্য্য করে। তখন পুত্রের প্রতি শনৈঃ শনৈঃ প্রীতি সঞ্চার হইতে লাগিল।

মানুষ যেমন দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে লাগিল, তেমনি বুঝিতে পারিতে লাগিল, নিজের দলের মধ্যে, পরস্পরের উপকার করাতে প্রত্যেকের সুবিধা আছে। আমি যখন বিপদে পড়িলাম, আর এক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিয়া আমাকে উদ্ধার করিল। তেমনি সে যখন বিপদে পড়িল, আমি তাহাকে সাহায্য করিয়া উদ্ধার করিলাম। উভয়ে বুঝিলাম, পরস্পরের উপকারে প্রত্যেকেরই সুবিধা। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের উপকার করিবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছা ক্রমে অভ্যাসগুণে একটী প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইল। * তখন মনুষ্য নিজের সুখ হইবে বলিয়া, অন্যের উপকার করে না, অভ্যাসবশতঃ বা অভ্যাসজাত প্রবৃত্তিবশে অন্যের উপকার করে। তখন, যে সুখ মূলে আত্মমুখী ছিল, তাহা পরমুখী হইল, যাহা "ইগোয়িষ্টিক" ছিল, তাহা "আল্‌ট্রুয়িষ্টিক" হইল। তখন প্রীতির জন্ম হইল। তখন জীব অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, অন্যের সুখে নিজের সুখ। তখন নীতির আবির্ভাব হইল; কর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল মন্দ প্রভেদ জ্ঞান জন্মিল। নীতি আরও উন্নত হইলে প্রীতিতে পরিণত হয়। নীতির বিষয়, অন্যের প্রতি আমার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য।—প্রীতির বিষয়ও তাহাই। তবে নীতিতে আনন্দ থাকিতেও পারে, আনন্দ নাও থাকিতে পারে। যখন নীতি আনন্দের সহিত সম্মিলিত, তখন তাহা প্রীতি। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে আহার দিলে, যদি তাহা তোমার ত্যাগ স্বীকার বোধ হইল, আনন্দ বোধ হইল না, কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া তুমি নীরস হৃদয়ে তাহা করিলে, তাহা নীতি, কিন্তু প্রীতি নহে। তুমি যদি দয়া-বিগলিত, আনন্দ-উচ্ছলিত হৃদয়ে সেই কাজ কর, তাহা হইলে তাহা প্রীতি। নীতি এই প্রীতির অন্তর্গত।

* Mutual Aid as a Factor in Evolution. By Prince Kropotkin.

সভ্য সমাজ যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতেছে তাহার মূল-কারণ পুলিশ বা আদালত নহে। তাহার কারণ নীতি বা প্রীতি। যদি এই নীতি ও প্রীতি সমাজে না থাকিত, লোকে পরস্পরকে একটুও না ভালবাসিয়া কেবল হিংসা করিত, তাহা হইলে আইন আদালতের কাছ দিয়াও কেহ যাইত না, আইন আদালতের সৃষ্টিই হইত না। তবে আইন আদালত কি নীতি বা প্রীতির চিহ্ন? হাঁ, এক পক্ষে। অধিকাংশ লোকের নীতি বা প্রীতির বিরুদ্ধে, ন্যূনাংশ ব্যক্তিগণের অনীতি বা অপ্রীতি যে কার্য্য করিবার সম্ভাবনা, তাহারই নিবারণ করিবার জন্য আইন আদালত। প্রীতি বা নীতি বলে—"পরস্ব অপহরণ করা দূরে থাকুক, যাহার অভাব তাহাকে দান কর।" অপ্রীতি এই কথা বুঝে না, সে সুবিধা পাইলেই, দরিদ্রেরই হউক, ধনীরই হউক, পরস্ব আত্মসাৎ করিবে। তাই প্রীতি বা নীতি, তাহা নিবারণের জন্য, আইন, আদালত, প্রহরী সংস্থাপন করিল। প্রীতি ও নীতি যত উন্নত হইবে যত বিস্তৃত হইবে, ততই শাসনের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে।

আমরা রাজাকে বা গবর্ণমেণ্টকে সমাজের শৃঙ্খলার রক্ষক মনে করি। দুর্বৃত্ত অজ্ঞানব্যক্তিগণ রাজার অভাবে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, সজ্জনের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে; এ কথা সত্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে, ধর্ম্মপ্রচারকগণই, প্রীতিবর্দ্ধকগণই সমাজরক্ষক। তাঁহারা বন্দুক বা তরবারি দ্বারা শত্রু নাশ করেন না। তাঁহারা দ্বেষ হিংসা লোভ প্রভৃতি অসংযত রিপুগণকে নাশ করেন, বিশৃঙ্খলার মূল কারণকে নষ্ট করেন, এবং সমাজে প্রীতি-সাম্রাজ্য শনৈঃ শনৈঃ সংস্থাপিত করেন। ইহলোকে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মুখে, সমাজতন্ত্রবাদীদিগের মুখে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের কথা যে শুনা যায় তাহা এই প্রীতির সাম্রাজ্য। ইহা সংস্থাপিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট, পুলিশ আইন, আদালতের প্রয়োজন থাকে না। হার্ব্বাট স্পেন্সারের ন্যায় গভীর তত্ত্বদর্শীও আশা করেন, মানবজাতি এই অত্যুৎকৃষ্ট অবস্থাতে একদিন উন্নত হইবে।

এই প্রীতিবিস্তারই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, নীতির উৎকর্ষ, মনুষ্যের ক্রমবিকাশের লক্ষ্য। এই প্রীতি-রাজ্য সংস্থাপনের জন্য সমুদায় মানবজাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। জ্ঞানিগণ এক্ষণে বুঝিতেছেন যে এই প্রীতির অভাবে "সভ্যতা" সভ্যতা নহে, চাকচিক্যময় বর্ব্বরতা মাত্র। আমরা প্রথমে ইংরাজি পড়িয়া রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফকে, কামান ও বন্দুককে এবং বৃথা বাহ্য জাঁকজমককে সভ্যতা বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। কিছুদিন পরেই এই ভ্রম গেল। আমি একদিন বঙ্কিম বাবুর

বহুবাজারের বাসায় সন্ধ্যার পর বসিয়া আছি। সেখানে বঙ্কিম বাবু, কবি হেম বাবু, ডাক্তার ৺ বিহারী লাল ভাদুড়ী মহাশয় ছিলেন। কথায় কথায় বঙ্কিম বাবু বলিলেন England is not civilised—ইংলণ্ড সভ্য হয় নাই। আমি সহসা তাঁহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বুঝিলাম। বাঙ্গলার প্রধান ঔপন্যাসিক যাহা তখন বলিয়াছিলেন, বিংশতি বৎসর পরে (১৯০০) ফরাসির প্রধান ঔপন্যাসিক (Zola) New York World নামক পত্রে তাহা লিখিয়াছিলেন।—"Civilized? Not Yet!" অর্থাৎ ইউরোপ এবং মার্কিন এখনও সভ্য হয় নাই। কারণ এখনও তথাকথিত সভ্য জগতে অনেক পরিমাণে প্রীতির অভাব দেখা যাইতেছে। বস্তুত, সভ্যতাই বল, ধর্ম্মই বল, মনুষ্যের চরম উন্নতিই বল, সবই এই ক্ষুদ্র কথা "প্রীতি"র অন্তর্গত।

যে প্রীতি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও উৎকর্ষ, "নবপ্রভা"রও তাহাই উদ্দেশ্য, তাহাই আদর্শ। মানব-প্রীতি বিষয় যাঁহারা চিন্তা করেন, নিজের সামর্থ্যানুসারে এক একটা পন্থা উদ্ভাবন করিবার, এক দিকে অগ্রসর হইবার, চেষ্টা করেন। নবপ্রভাও তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতা অনুসারে একটা পথে চলিতে চাহে। নবপ্রভা এক্ষণে একটা "প্রীতির আশ্রম" স্থাপন করিতে চাহে। কিরূপে এ অধম জন সেই স্বর্গের স্বপ্ন, বর্ণনা করিবে। পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ঋষি-লেখক থাকেন, তিনি আসুন, তিনি এই পবিত্র প্রীতির আশ্রম বর্ণনা করুন, কেমন করিয়া ইহা স্থাপন করিতে হইবে, আমাদিগকে উপদেশ দিন, এবং এই সদনুষ্ঠানে আমাদিগকে সাহায্য করুন। আমি এই "প্রীতির আশ্রম" স্বপ্নে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে বা কার্য্যে পরিণত করিতে অদ্যাপি অসমর্থ। তবে আমার ক্ষুদ্র দরিদ্র শক্তিতে যতদূর পারি তাহা বারান্তরে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে, নবপ্রভার পাঠকগণ! নবপ্রভার তৃতীয় বর্ষারম্ভে, আপনাদিগকে আশা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করি। নবপ্রভার পাঠিকাগণ! আপনাদিগকে আশা ও ভক্তির সহিত অভিবাদন করি। আমরা ও আপনারা সকলেই এক তীর্থের যাত্রী—আবার এক সঙ্গে, নববর্ষে, তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

পুরাণের রচনাকাল।

বৈদিক যুগে যে পুরাণেতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, সে গুলি ঠিক কিরূপ ছিল তাহা হয়ত জানিবার কোন উপায় নাই। নূতন মহাভারতকার স্বপ্রণীত অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে পুরাণ, আখ্যায়িকা, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সমুদায়ই মহাভারতের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। বৈদিক যুগের সাহিত্যে যে সকল আখ্যায়িকা বা আখ্যায়িকার অংশ পাওয়া যায়, মহাভারতের আখ্যাত কথা, কোথাও তাহার অনুরূপ, এবং কোথাও বা তাহা পরিবর্ত্তিত, বা পরিবর্দ্ধিতভাবে দেখিতে পাই। সংক্ষিপ্ত হউক, বিক্ষিপ্ত হউক, বা প্রক্ষিপ্ত হউক, পুরাণ বলিয়া এ কালে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেইগুলি দেশমধ্যে পুরাণ বলিয়া মান্য। এই পুরাণগুলির আখ্যায়িকার সহিত মহাভারতের আখ্যায়িকার অনেক প্রভেদ আছে; কিন্তু পৌরাণিক কথা বলিতে গেলে দেশের লোকে এই পুরাণের কথাই বুঝিয়া থাকে। আলঙ্কারিক যুগের কবিগণ এই পুরাণগুলির আখ্যায়িকাই উপন্যস্ত করিতেন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্মে এইগুলিই অবলম্বিত হইতেছে। প্রাচীনকালে পুরাণের অস্তিত্ব যে ভাবেই থাকুক, এই প্রচলিত পুরাণগুলি যে কোন্ সময়ে রচিত, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

হরিবংশকে যদি পুরাণ বলা না যায়, তাহা হইলে ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে এ কালের প্রচলিত কোন একখানি পুরাণও যে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুবন্ধুর, বাসবদত্তা এবং বাণভট্টের কাদম্বরীতে হরিবংশ এবং বায়ুপুরাণের নাম পাওয়া যায়। সুবন্ধু ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, এবং বাণভট্টের সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণ তৎপরে আরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু ওখানি যে ন্যূনকল্পে ষষ্ঠ শতাব্দীর পুরাণ, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। সম্ভবতঃ কালিদাসের কুমারসম্ভব, বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকার অনুবর্ত্তী। কোন গ্রন্থে নাম উল্লেখ নাই বলিয়া যে পুরাণগুলি ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ নহে, এ যুক্তি অবলম্বন করা বড় নিরাপদ নহে। উইলসন্ সাহেব এবং কতিপয় ইংরাজ পণ্ডিত, প্রায়শঃ ঐ প্রকার যুক্তির বলে পুরাণগুলির রচনাকাল যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই ভ্রমাত্মক মনে হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ঐ দুই-খানি ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা, কারণ উহাতে উৎকলের তীর্থের কথা এবং জগন্নাথ দেবের বিষয় উল্লিখিত আছে। কিন্তু কোন্ প্রমাণের বলে, শ্রীমদ্ভাগবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ হইল, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া পড়িল, তাহা বুদ্ধির অগম্য। বঙ্গদেশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং রাণী ভবানীর সভায় শ্রীমদ্ভাগবত লইয়া যে সকল তর্ক উঠিয়াছিল, তাহার মূলে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব; সে কথা বড় সুবিধাজনক নহে। বোপদেব যে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের পর ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; কথাটা নিতান্ত অসার। পণ্ডিতেরা স্বীকার করিতেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের পূর্ব্বে রচিত। অন্য তর্ক পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাধার আবির্ভাব দেখিয়াও এ কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ; ঐ গ্রন্থের অস্থিমজ্জা রাধা। রাধার সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, কদাপি সর্ব্বলোকভোগ্য গীতগোবিন্দ রচিত হইতে পারিত না। ধারা নগরাধিপতি বাক্‌পতি রাজের একখানি দানপত্র, ইণ্ডিয়ান এণ্টি-কোরির ষষ্ঠভাগে মুদ্রিত আছে, ঐ দানপত্রের তারিখ ১০৩১ সংবৎ অর্থাৎ ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে। ঐ দান পত্রে "তৎ-রাধা বিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্লৎ-বপুঃ পাতু বঃ" দেখিতে পাই। তাহা হইলে রাধা ঠাকুরাণীর বয়স বড় কম নহে। অন্ততঃ পক্ষে ইহার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সৃষ্টি না হইয়া থাকিলে, এরূপভাবে উল্লেখ পাওয়া যাইত না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই যদি রাধার জন্ম, তাহা হইলে ঐ পুরাণ কদাচ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভের পরবর্ত্তী হইতে পারে না।

রাধার জন্ম যখন নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ভাগবতের পরে, তখন কোনপ্রকারে ঐ পুরাণকে ৯ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে এমন কি আভ্যন্তরিক কারণ পাওয়া গিয়াছে জানি না, যাহা দ্বারা ঐ পুরাণ মুসলমান-দিগের আগমনের সময়ের পরবর্ত্তী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বরং আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থ মুসলমানদিগের আগমনের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হইয়াছে। কল্কি অবতার সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সময়ের পুরাণে লিখিত হইয়াছে, যে ঠাকুর ম্লেচ্ছগণের সংহারের জন্য আবির্ভূত হইবেন। তদবলম্বনে গীতগোবিন্দেও দেখিতে পাই, "ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং"। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে ভারতবর্ষীয় রাজাগণ যখন দস্যুর মত পরস্পরের

প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিবেন, তখনই কল্কির আবির্ভাব হইবে।—১ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে :—

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যু প্রায়েষু রাজসু
জনিতা বিষ্ণু যশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।

দ্বাদশ স্কন্ধে এই কথা আরও বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। সেখানে লিখিত হইয়াছে, যে যখন দেশীয় লোক নাস্তিক হইয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র উপবীত দ্বারাই চিহ্নিত হইবে, শূদ্রেরা রাজা হইবে, তখনই কল্কি অবতার হইবেন। যদি মুসলমানদিগের কথা পুরাণকর্ত্তার স্বপ্নেও জানা থাকিত, তাহা হইলে কদাচ সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। ভবিষ্যৎ রাজবংশের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মেকলে যে অষ্ট যবন (শবরগণ) রাজত্ব করিবে, সে কথা আছে। কিন্তু অষ্ট যবনের পরাভবের পর উৎকলে হিন্দু প্রভাব বিস্তারের কথা নাই। কাজেই এই সময়টা বড় জোর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ। শ্রীমদ্ভাগবত যে বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী তাহা নিঃসন্দেহ। বিষ্ণুপুরাণে যখন ঐ অষ্ট যবনের মেকলে রাজত্ব করিবার কথা আছে তখন ঐ গ্রন্থ ৮ম শতাব্দীর বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত। সে হিসাবে শ্রীমদ্ভাগবত সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর পুরাণ। এ গণনায় ইংরাজ-পণ্ডিতগণের এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার ৪০০ বৎসরের প্রভেদ দাঁড়াইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে দেখাইবার জন্য, নারায়ণের ২৪টি অবতারের কথা আছে। হয়ত এটা বুদ্ধের ২৪ জন্মের কথার সহিত প্রতিযোগিতা। লিঙ্গপুরাণে আবার শিবকে কৃষ্ণের উপর আসন দিতে গিয়া, তাঁহার ২৮ অবতার কল্পিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ লিঙ্গপুরাণ দশম শতাব্দীর গ্রন্থ।

চণ্ডী ও দুর্গা যে ভাগবতের পূর্ব্বে পূজিত হইতেছিলেন তাহা ভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য মনে হয়, যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ, সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীর শেষভাগের গ্রন্থ। ৮ম শতাব্দীর প্রথমেও যে চণ্ডী অনার্য্যের দেবী, তাহা ৭ম বং ৮ম শতাব্দীর কবিগণের রচনা হইতেই প্রমাণিত হয়। এ বিষয়ে অন্য প্রবন্ধে বিশেষ কথা লিখিয়াছি। এখানে বলিয়া রাখি যে মহাভারতের যে দুইটি অধ্যায়ে দুর্গাস্তব পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত। যে কেহ মহাভারত পড়িলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মহাভারতের

কুত্রাপি দুর্গার নাম নাই, বা মাহাত্ম্য নাই ; অথচ যাঁহাদের মাহাত্ম্য বিশেষ-ভাবে বর্ণিত, সে সকল দেবতা ছাড়িয়া, সহসা নিতান্ত অপ্রয়োজনে দুর্গা স্তব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে, কালিদাস বর্ণিত রঘুবংশের বিবরণ এবং শকুন্তলা উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরাণে এবং মৎস্য পুরাণে বিক্রমাদিত্য রাজার কথাও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই দুইখানি বিষ্ণুপুরাণের সমসাময়িক, অথবা কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী।

ভবিষ্য পুরাণ, বায়ুপুরাণের মত প্রাচীন বলিয়াই স্বীকৃত ; সেইজন্য এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। দেখা গেল যে প্রধান প্রধান পুরাণগুলির একখানিও ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে। অন্যান্য পুরাণ-গুলি যে মুসলমান রাজত্বকালে রচিত তাহাতে আমার সন্দেহ হয় নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ধর্ম্মপূজা।

(১)

রাঢ়ে।

এ পূজা কাহার ?

এ পর্য্যন্ত হিন্দু দেবদেবীর তালিকায় যত নাম উঠিয়াছে, ধূপ দীপ গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা যাহাদের অর্চ্চনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকলেই সমান শক্তিসম্পন্ন, মর্ত্তবাসিগণের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, মানাপমান ইত্যাদি ঐহিক ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বাধিকারী বা ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাদির হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা তাহা নহে—তাঁহাদিগকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীতে আছেন পাঁচটী—শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, এবং বিষ্ণু। ইহাঁরা সাধক দ্বারা "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞানে পূজিত ও উপাসিত। ইহাঁরা চতুর্ব্বর্গ দানে সমর্থ ; সাধককে ইহকালে অতুল ঐশ্বর্য্যে সুখী ও সম্পন্ন করিতে এবং পরকালে স্বর্গবাসে সুখী করিতে, এমন কি অবস্থা বিশেষে মুক্তি দান পর্য্যন্ত ও ত্রিতাপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। ইহাঁরা হিন্দুর গুরুদত্ত দীক্ষার দেবতা। ঐহিক ঐশ্বর্য্য এবং পারলৌকিক মোক্ষ ইহাঁদিগের অঙ্গুলীর অগ্র

ভাগবর্ত্তী—মনে করিলেই দিতে পারেন। এই পাঁচটী দেবতা ভিন্ন, আর কাহার ঈদৃশী ক্ষমতা নাই। এজন্য দেবতা মধ্যে ইঁহাদিগের আসন সর্ব্বোচ্চে—হিন্দুর যাগযজ্ঞ, বিবাহ, অন্নাশন, পূজা, হোম ও শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে ইহাঁদিগের পূজা করিতে হয়, গণেশাদি পঞ্চদেবতা বলিতে এই পাঁচটী দেবতাকেই বুঝায়। ইহাঁরা ভিন্ন হিন্দুর উপাস্য দেবতা আর নাই—এবং ইহাঁদের উপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকও হিন্দুর মধ্যে আর নাই। হিন্দু এই পাঁচটীর অন্যতম দেবতাকে অভীষ্ট জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। গুরু শিষ্যকে তাহার কুলপ্রথানুসারে তত্তৎ দেবতার মন্ত্র দান করেন। শিষ্য সেই গুরুমন্ত্র পাইয়া সাধনা দ্বারা সার্থক হয়েন।

কিন্তু ধর্ম্মযোগী গৃহী ইষ্টদেবতাকে "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞানে উপাসনা করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চোপাসকেই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পূজা হোম যাগযজ্ঞ দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ে সর্ব্বদা প্রস্তুত, অন্যান্য পন্থা অপেক্ষা গৃহীর পক্ষে ইহাই সুপ্রশস্ত, ও সুগম। কারণ তাহাতে মানব পরকালে স্বর্গবাসে সক্ষম হয়, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞানে সংসারী হিন্দু কর্ম্মযোগেই সমধিক আস্থাবান। দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধের তুল্য ফলপ্রদ—ইহা শুনিয়া বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণবের মন সুস্থির থাকিতে পারে না—মা মহামায়ার শ্রীপাদপদ্মে বিল্বদল গঙ্গোদক দিবার জন্য শরদাগমে লালায়িত হয়। তিনি শারদীয় মহাপূজা উপলক্ষে তিন দিন শূদ্রভদ্র ব্রাহ্মণাদি নানা জাতীয় লোককে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া চিত্তের প্রফুল্লতা লাভ করেন,—পরকালের কথা পরকালে কিন্তু ইহকালে তদ্দ্বারা যে সুখটুকু ভোগে আইসে তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। এই হিসাবেই রাস, দোল, রথযাত্রাদির উৎসবে শক্তিসাধক নিরুৎসাহ নহেন।

তদতিরিক্ত কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি সৌর, কি শৈব, কি গাণপত্য পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া প্রশমনার্থ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সহস্রশীর্ষ পুরুষের উদ্দেশে সচন্দন তুলসীদল অর্পণ করিয়া থাকেন, কালীঘাটে দেবীমাহাত্ম্যপাঠ করাইতেও ক্ষান্ত নহেন, মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি দিবাকরকে অর্ঘদানে তুষ্ট করেন। ইঁহারা প্রথম শ্রেণীর দেবতা, ইঁহাদের সম্বন্ধে পৃথক কথা। আবার সর্পভীতি নিবারণের জন্য বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার মনসা দেবীকে স্মরণ করিতে হয়, অপুত্রকতা দোষের পরিহার জন্য দেবসেনাপতি ষড়াননের আশ্রয় গ্রহণ, পুত্রকন্যাদিগের জ্ঞানের অনুরোধে বাগ্দেবীর করুণা ভিক্ষা, দুসন্ধ্যা দুবেলা উদর পরি-

তোষার্থ ধনদা'র প্রসন্নতা প্রার্থনা না করিলেই চলে না। তাহার উপর পরিজনগণের মধ্যে কাহার বসন্ত হইলে শীতলাদেবীর পূজা, শীতলাষ্টক পাঠ না করিয়া কে ক্ষান্ত থাকিতে পারে—আবার সূতিকাশয্যাশায়ী শিশুর কল্যাণ কামনার্থে গৃহী হইয়া কে ষষ্টি দেবীর অবমাননা করেন? এইরূপে নানা কার্য্যের, নানা অনুষ্ঠানের জন্য হিন্দু অসংখ্য বা তেত্রিশকোটী দেবতাকে মানিয়া চলেন। উপরিউক্ত পঞ্চ দেবতা বাদে সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। কারণ বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। প্রথম শ্রেণীর দেবতাদিগের সহিত ইহ কাল ও পরকালের, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতাগণের সহিত কেবলমাত্র ইহকালের সম্বন্ধ। হিন্দু শাস্ত্রকার কোনমতে দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত নহেন—আকাশে আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক পাল, মর্ত্তে বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার, মহাশক্তির দশমহাবিদ্যা নবদুর্গাদি মূর্ত্তি, কত নাম করিব; তেত্রিশকোটী দেবতা ব্যাধির মধ্যে যাহার মহত্ত্ব এরূপ মহাব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধর্ম্মরাজ, তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রকার দেব দেবীর তালিকা ভুক্ত করেন নাই কিন্তু বঙ্গীয় কবি বিপুল বিস্তৃত গ্রন্থে যাহার মহিমা বর্ণন করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই—যাহার নাম শুনিলে রাঢ়বাসী হিন্দুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, যে গ্রামে ধর্ম্মঠাকুর আছেন, সেই গ্রামবাসীগণ ধর্ম্মের পূজা মহোৎসবে ঐকান্তিকতা সহকারে যোগ দিয়া থাকেন, ধর্ম্মের নামে সহস্রবার দণ্ডবৎ প্রণত হয়েন, শাস্ত্রকারের কথা ধরেন না, অবনত মস্তকে ধর্ম্মরাজের চরণারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করেন—এ দেবতা কে? এ পূজাই বা কাহার—ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে স্বতঃই চিত্ত আকৃষ্ট হয় না কি?

দেবতার ধ্যানমন্ত্রে তাঁহাকে অনেকটা চিনিতে পারা যায়, কেন না, ধ্যান মন্ত্রে তাঁহার আকার অবয়ব, ক্রিয়া, কর্ত্তৃত্ব, মহিমা মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত থাকে। অতএব অন্যান্য বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে আমরা ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান মন্ত্রটী দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করিব। তৎসৌকর্য্যার্থে এ স্থলে ধ্যানমন্ত্রটীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন,—

যস্যান্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণো নাস্তি কায়ো নিনাদঃ।
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য॥
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্ব্বলোকৈকনাথং।
ভক্তজনাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং॥

যাঁহার আদি অন্ত মধ্য নাই, শব্দ নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, মরণ ভয়

নাই, এবং জন্মও নাই। যিনি যোগীন্দ্রগণের ধ্যানগম্য, সর্ব্বজীবে অবস্থিতি করেন, স্বর্গমর্ত্তপাতালাদি বহু লোকের নাথ, ভক্তগণের কামনা পূর্ণকারী, সুরনরগণের বরদাতা, এবম্প্রকার শূন্যমূর্ত্তির চিন্তা কর।

ধ্যানমন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বা শ্বেত পীত নীল লোহিতাদি বর্ণ বিশিষ্ট কোন সাকার মূর্ত্তির ধ্যান নহে—ধ্যানমন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "শূন্যমূর্ত্তি"। অতএব ইহা নিরাকার, পরব্রহ্মের ধ্যান—এরূপ ধ্যান-মন্ত্র হিন্দুর কোন দেবতার নাই। ইহাতে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব আইসে না। "শূন্য যাঁহার মূর্ত্তি, সর্ব্বজীবে যিনি সমান ভাবে অবস্থিতি করেন, এই ধ্যান তাঁহার। তাঁহাকে চক্ষে দেখিবার নহে, শ্রোত্র দ্বারা শুনিবারও নহে, অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের ইনি প্রত্যক্ষ যোগ্যও নহেন। ধ্যান অনুসারে ধর্ম্মরাজ নিরাকার ব্রহ্ম।

এই সংস্কৃত ধ্যান ধর্ম্মপূজার প্রধান অবলম্বন। আমরা ধর্ম্মপূজার প্রধান কেন্দ্র হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাট, দিগড়া, দৌলৎপুর, বেঙ্গাই, শস্তা প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত সংস্কৃত ধ্যানটী ধর্ম্মপূজায় অবশ্য ব্যবহার্য্য, নিত্য পূজার শেষে অন্যান্য দেবতার স্তব পাঠের ন্যায় রমাই পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গলা কবিতাগুলিও অবশ্য পাঠ্য। উহা ধর্ম্মের কাহিনী বলিয়া খ্যাত; যে সকল ধর্ম্ম পণ্ডিত নিরক্ষর, তাহারাই এ সকল কাহিনী পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা করিয়া থাকে, যাহারা তাহাও অভ্যাস করিতে না পারে তাহারা কেবল "ধর্ম্মায় নমঃ" বলিয়া জল পুষ্প দ্বারা পূজা শেষ করে। বস্তুগত্যা উপরিউক্ত সংস্কৃত ধ্যান ব্যতীত ধর্ম্মের পূজা হয় না। এই ধ্যানমন্ত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আধুনিক রচনা নহে। ইহা সঙ্গত ও সম্ভবপরও হইতে পারে না, কারণ বঙ্গীয় ধর্ম্মপুরাণ লেখকেরা ধর্ম্ম ঠাকুরকে শুভ্রকান্তি, শুভ্রবস্ত্রধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইলে ধ্যানমন্ত্রও তদনুযায়ী হইত। পৌত্তলিক পুরোহিত কর্ত্তৃক এরূপ উচ্চ ভাবের এবং উচ্চ আদর্শের ধ্যানমন্ত্র রচনা সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মপূজার প্রথমাবস্থাতেই যে এই ধ্যানমন্ত্র রচিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমান ও সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। হিন্দুর উপাসনাপদ্ধতির মূলে নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, পশ্চাৎ সাধকের ধারণাশক্তির খর্ব্বতাপ্রযুক্ত উপাসনা-কার্য্যের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছিল।

"উপাসনার্থ সাধুনাং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা।"

ধর্ম্মরাজের ধ্যানমন্ত্র দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে ধর্ম্মরাজ ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র, তাহা না হইলে কখন ধ্যানমন্ত্রে তাঁহাকে নিরাকার বলা হইত না। কালক্রমে সাধকের শূন্য মূর্ত্তির অনায়ত্তা প্রযুক্ত তাঁহার রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকিবে।

ধ্যান মন্ত্রে যাহা বুঝা গেল দেখা যাউক তদতিরিক্ত তাঁহার নামের কোন সার্থকতা আছে কি না। ধর্ম্মরাজ যদি দেব দেবীর তালিকায় থাকিতেন তাহা হইলে সহজেই তাঁহার তত্ত্ববোধ সুবিধাজনক হইত, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকার আমাদিগকে অন্ধতমসে ফেলিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশব্দের অর্থ পরিগ্রহার্থ কোষকারগণের সাহায্য সুলভ—তাঁহাদের মধ্যে অমরসিংহই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

> সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
> সমন্তভদ্রো ভগবান্মার জিল্লোক জিজ্জিনঃ॥
> ষড়ভিজ্ঞো, দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
> মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তুযঃ॥
> সা শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
> গৌতমশ্চার্ক বন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥

ধর্ম্মরাজের নামবাচক শব্দ—সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, তথাগত (যেরূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইরূপে যিনি আগত) সমন্ত ভদ্র (সমন্ত=সমস্ত বিষয়ে+ভদ্র= ভাগ্যবন্ত,, (বুদ্ধ) ভগবৎ (ষড়ৈশ্বর্য্যবান) মারজিৎ (মার=কাম+জিৎ=যে জয় করে, বুদ্ধ ও শৈব) লোকজিৎ (লোক=জগৎ+জিৎ=জয় করে যে, বুদ্ধ) জিন (জি=জয় করা+নক, তপঃপ্রভাবে যিনি বিশ্বকে জয় করেন) ষড়ভিজ্ঞ (ছয়টী বিদ্যায় অভিজ্ঞ যিনি, ১। দিব্যচক্ষু শ্রোত্র, ২। পরচিত্তজ্ঞান, ৩। পূর্ব্বজন্মস্মরণ, ৪। আত্মজ্ঞান, ৫। বিয়দ্‌গতি অথাৎ আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি এবং ৬। কায়ব্যূহসিদ্ধি অর্থাৎ দেহের যন্ত্রের সংস্থাপিত জ্ঞান ক্ষমতা এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, বুদ্ধ, দশবল (দশটী বল বিশিষ্ট) অদ্বয়বাদিন্ (অদ্বৈতবাদী) বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, মুনি। তিনিই শাক্যসিংহ, শাক্য মুনি সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি (শুদ্ধোদনের পুত্র) গৌতম, অর্কবন্ধু এবং মায়াদেবীর পুত্র।

ধর্ম্মরাজ বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শুদ্ধোদনের পুত্র, মায়াদেবীর পুত্র

ইত্যাদি পরিচয়ে আমরা বুঝিতেছি যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবই ধর্ম্মরাজ। অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য। বুদ্ধদেব খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবতার হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য খৃষ্টের ৫২ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। মতান্তরে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। যাহাই হউক, যে প্রকারেই হউক চৌদ্দ শত বৎসর ধর্ম্মরাজ বুদ্ধদেব বলিয়া পরিগৃহীত—বড় কমদিনের কথা নহে।

প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন বুদ্ধদেব ঈশ্বরে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, এইজন্য হিন্দু পৌরাণিকেরা তাঁহাকে নাস্তিকাবতার বলিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ যে অমরসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি বুদ্ধদেবের "অদ্বৈতবাদী" অন্যতম আখ্যা মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বলিতে সেকালে যেন বুদ্ধদেবকেই বুঝাইত। আর মনে হয় তাঁহার পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী আর কেহ ছিলেন না। সে যাহাই হউক, বুদ্ধদেবের একেশ্বরবাদিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা অমরসিংহের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহি, তবে একটা সুযুক্তির কথা বলি এই যে—সে মনস্বী মহাপুরুষ ঐহিক সুখসম্পদ, রাজ্য ধন তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রাধ্যায়নে ও তাপত্রয় জনিত জীবের দুঃখ দূরীকরণের উপায় চিন্তায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা সংযত—বিষয় বাসনা পরিশূন্যতা ও পরার্থ চিন্তা হেতু নিষ্কাম যিনি সর্ব্বার্থসিদ্ধনামে পরিচিত তাঁহায় ন্যায় নির্ম্মল ও নিশ্চল মনে যে ইশ্বরের সত্বা উপলব্ধি হয় নাই, ইহা নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত। সত্য বটে তিনি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত তাঁহার অন্য প্রকারে উপাসনার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া ঈশ্বর যে নাই এ কথাও কোথাও কোনপ্রকারে ঘোষণা করিয়া যান নাই। যখন তিনি নির্ব্বাণরূপ পরমপদ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ এবং জন্মজন্মান্তরের সাধনায় যে পরম "বুদ্ধপদ" প্রাপ্তির ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মপদ—নির্ব্বাণলাভ হইলে আর পুনঃ পুনঃ জননী জঠর যাতনা সহ্য করিতে হয় না, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয়ে দগ্ধ হইবার ভয় থাকে না,—তাঁহার তখনকার অবস্থা—গিরি নদীর ন্যায়, শত শত ক্রোশ ভ্রমণে সহস্র সহস্র জনপদ অতিক্রমে তিনি মহাসমুদ্রের অঙ্গীভূত। তখন তিনি দেবগণের দেবতারূপে স্তূয়মান, তখন আর তাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য থাকে না—অগাধ, অনন্ত তখন আর তাঁহার জন্মজরা মরণাদি কোথায়? তাই বুদ্ধকে তাঁহার উপাসকেরা

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন,—আমরা গ্রন্থান্তর হইতে বুদ্ধদেবের অপর একটী ধ্যান মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা দ্বারা কুত্রাপি ধর্ম্মরাজের পূজা হইয়া থাকে কি না বলিতে পারি না।

শান্তং সদা প্রাণীবধাতিভীতং বৃহজ্জটাজূট ধরোত্তমাঙ্গং।
তনুল্লসদ্ গৈরিক গৌরবস্ত্রং যোগীশ্বরং বুদ্ধমহং ভজেয়ং॥

এখন বলি হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুদ্ধদেবকে পরব্রহ্মের অবতার স্বীকার করিয়াও কেন তাঁহাকে ধর্ম্মরাজরূপে পূজা করিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, নানা পুরাণ নানা উপপুরাণ মধ্যে নানা দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিলেও ধর্ম্ম-রাজের পূজার কথা উল্লেখ করেন নাই।

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ শীর্ষস্থানীয়, হিন্দু ধর্ম্ম হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণের একচেটিয়া, তাহাতে ব্রাহ্মণ যাহা করিবেন তাহাই হইবে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের নিকট যেন দেবতার দেবত্বও অকিঞ্চিৎকর তদপ্রতিপাদনার্থ পরব্রহ্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে কৌস্তুভের সঙ্গে ভৃগুমুনির পদচিহ্নকে দেদীপ্যমান করিয়া দেওয়া হই-য়াছে। ভাবিয়া দেখুন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কত চেষ্টা, কত যত্ন, কত অনুষ্ঠান, কত আড়ম্বর—সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে যিনি আঘাত করিতে প্রস্তুত তাঁহাকে ব্রাহ্মণ নিমিষে নষ্ট করিতে পারিলে ছাড়েন না, ছাড়িবেনই বা কেন—এ হেন জাতিত্ব গৌরবকে আহত দেখিয়া কে নিশ্চিন্ততা অবলম্বন করিতে পারে—শুধু গৌরব নহে, তাহার সহিত অন্য স্বার্থেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই এমনও নহে। বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু ঠাকুর যদি জলদ গম্ভীর শব্দে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রতিকূলে কোন ঘোষণা করেন, তাহা হইলে তাহাও ব্রাহ্মণের নিকট আদর পায় না, হয়ত তিনি বলিবেন—উহা বৈকুণ্ঠাগত বিষ্ণুস্বর নহে, না হয় লিখিবেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির কতক অংশে বিষ্ণুর ভীমরতি হইয়াছে, তাই আজি তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, অথবা তিনি দত্তাপহারী—ব্রাহ্মণকে যে সম্মান দিয়াছিলেন, তাহা পুনর্গ্রহণ-প্রয়াসী।

বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, নীচ শূদ্র আচণ্ডালকে পৌরহিত্যাধিকার অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে দুর্বিষহ আঘাত করিয়া গিয়াছেন,—সরল, শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণাবলম্বী যে কোন জাতি পুরোহিত হইবে ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পক্ষে আর কি অধিক মর্ম্মন্তুদ হইতে পারে? ধর্ম্ম-চর্চ্চায় সকলেরই সমানাধিকার—ইহা ব্রাহ্মণের প্রাণে কোন মতেই সহ্য হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে শূদ্র ও অন্ত্যজাধমের পৌরহিত্যে অধিকার জন্মিল সে

ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের সহানুভূতি প্রত্যাশা আকাশকুসুমের ন্যায়। যে ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, আচণ্ডাল শূদ্রের যে ধর্ম্মচর্চ্চায় সমান অধিকার তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে পতিত ধর্ম্ম—আচণ্ডাল শূদ্রে ধর্ম্মপূজার অধিকার পাইয়া একবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, হিন্দুসমাজে কি বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিল, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা ভার হইয়া উঠিল—হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি চঞ্চল হইল—জুগি জোল্গা ডোম আর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিল না—পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে, পুত্রকন্যাদির বিবাহ অন্নাশনাদিতে, দোল দুর্গোৎসবে আপনারাই পৌরহিত্য করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে নবশাকাদি শূদ্রের প্রতিও সন্দেহের সঞ্চার না হইতে পারিবে কেন? যে অত্যল্প কাল মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা ভাবিলে মনে হয় যেন ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্যের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল—ব্রাহ্মণের অসঙ্গত আধিপত্য অনেকেরই পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, যেন তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য ব্রাহ্মণেতর সকলেরই একপ্রাণতা জন্মিয়াছিল। বুদ্ধদেব যেখানেই আপন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন সেইখানেই দলে দলে তাঁহার অনুচর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় অসাধারণ পুষ্টিলাভ করে—সে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের উপযুক্ত কর্ণধার ছিলেন না। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে ব্রাহ্মণগণ যারপরনাই স্বেচ্ছাচারী হইয়া অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েন, নতুবা বৈশাখী সন্ধ্যা সমুত্থিত বাত্যা বিতাড়িত তৃণপুঞ্জের ন্যায় হিন্দুর হিন্দুত্ব উড়িয়া যাইবে কেন—হিন্দুধর্ম্ম সমূলে কম্পিত হইবেই বা কেন—একমাত্র জাতিভেদের প্রতিকূলতা করিয়া বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন—সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে অচিরকাল মধ্যেই তিনি সধর্ম্মীর দল পুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের সহায় হইয়া স্বয়ং তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা না হইলে হয়ত তিনি এতদিন একটা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী দানব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন।

বৌদ্ধরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে অভক্তি করিতেন না—কখন কাহার বৃত্তিচ্ছেদও করেন নাই—প্রত্যুত ভূমিদান দ্বারা তাঁহারা যাহাতে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি দ্বারা নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিতেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপেও তাহাদের অনাস্থা ছিল না, অদ্যাপি বৌদ্ধরাজগণের প্রদত্ত ভূমিদান বিষয়ক যে কয়খানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। গৌড়ের বৌদ্ধরাজ মহীপাল দেব মহাবিষুব সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানরূপ পুণ্যকার্য্যের আনুসঙ্গিক কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে

এবং পালবংশীয় অন্যতম বৌদ্ধ নরপতি মদনপাল স্বীয় মহিষীর ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত শ্রবণের দক্ষিণাস্বরূপ তৎপাঠক বটেশ্বর স্বামী ব্রাহ্মণকেও ভূমিদান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা আরও একটী তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়—প্রাচীন বৌদ্ধগণ অহিন্দু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না—হিন্দুধর্ম্মের পুরাণাদি পাঠে তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, হিন্দুর অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মে অযত্ন ছিল না। অধুনা শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবগণের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও যেমন তাঁহারা হিন্দু বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তৎকালে ভারতীয় বৌদ্ধগণও তদ্রূপে হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত হয়েন নাই। ইহাও আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের কৌশল, স্বার্থহানির শঙ্কায় তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে হাতছাড়া করিতে পারেন নাই। কিন্তু মনে মনে সাধারণ বৌদ্ধ ও ভিক্ষুকগণের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন। বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার না করিলে বৌদ্ধরাজার সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইতে হইত, বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি হিন্দুসম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে হিন্দু সম্প্রদায় একবারে হীনবল হইয়া পড়িত—কালে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইয়া আসিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবার আশা ছিল—নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া তৎকালিক হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকে দলছাড়া হইতে দেন নাই। যতদিন এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল, প্রসার প্রতিপত্তির একটানা স্রোত বহিয়াছিল, তত দিন এইরূপেই ঘটিয়া গিয়াছিল, কিরূপে কোন সময়ে কি ভাবে সেই একটানা স্রোতের ভাটা আরম্ভ হয় তাহা ধর্ম্মপূজার ইতিহাসের সহিত আলোচিত হইবে। ফলতঃ ধর্ম্মরাজরূপেও যদিও এ দেশে অদ্যাপি বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত বুদ্ধোপাসক কেহই নাই। এদেশের ধর্ম্মপণ্ডিতেরা কেহই ধর্ম্মবীজমন্ত্রে দীক্ষিত নহে, ধর্ম্মরাজকে অভীষ্ট দেবতারূপে পরলোকের পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার করে না—তাহাদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, হিন্দুর পূর্ব্ব কথিত পঞ্চোপাসকের অন্যতম। ফল কথা তাহা না হইলেও ধর্ম্মপূজা দ্বারা এখনও যে এ দেশে বুদ্ধপূজা প্রচলিত আছে তাহা সহস্রবার স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মগাজন যে বৌদ্ধোৎসবের রূপান্তর তাহাও অস্বীকার করা যায় না—এদেশে যদিও এখন প্রকৃত বৌদ্ধ নাই কিন্তু বুদ্ধ-পূজা আছে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

রাঢ়ে ধর্ম্মপূজা।

(প্রতিবাদ)

সর্ব্বত্র ধর্ম্মপূজা হয়। (কেবল রাঢ়ে নহে।)

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"।

কেহ ভাবিবেন লেখক ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ প্রস্তাব লিখিতেছেন, তাহা নহে। এখন কতকগুলি লোক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বপ্রকার কথাবার্ত্তায় লেখাপড়ায় ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন তাঁহারা দাম্ভিকতার সহিত কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য লোপ হইবে বলিয়াই তাঁহারা শূদ্রজাতিকে দাসত্বে চির-নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে তাহাদিগের চক্ষুরুন্মীলন হইয়াছে, সুতরাং আর এখন ব্রাহ্মণকে গুরু বলা বিধেয় নহে। এতাদৃশী স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, যেন সত্য সত্য পাশ্চাত্যশিক্ষার বলে ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ ও অধঃকৃত করিয়াছেন। তাহারই প্রমাণ দর্শাইবার জন্য সেদিন "রাঢ়ে ধর্ম্মপূজা" এই শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যের বিলোপ এবং অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফল কথা ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে বিষয়াসক্ত নতুবা তাঁহাদিগের পদাঙ্গুষ্ঠের নিকটও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কে যাইতে সমর্থ তাহা বলিতে পারি না। নিস্পৃহ ব্রাহ্মণের ক্ষমাশীলতায় অদ্যাপি কেহ সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা এখনও কেহ বলিতে সমর্থ নহেন। তথাপি "রাঢ়ে ধর্ম্ম-পূজা"র লেখক কহেন "ধর্ম্মপূজাটী ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মপূজা শূদ্রেরই আরব্ধ, অনুষ্ঠিত, উপক্রান্ত এবং প্রতিষ্ঠিত, শূদ্রযাজী পুরোহিতেরা শেষে শূদ্রের নিকট হইতে ছলে, বলে, কলে, কৌশলে "ধর্ম্মপূজাটী" সংগ্রহ করিয়াছেন। শূদ্রের এ বিষয়ে যে একাধিপত্য আছে তাহার প্রমাণ দর্শাইবার জন্য শূকর বলির উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি হইলে উহাতে কখনই শূকর বলির ব্যবস্থা থাকিত না।

এই কথাটীই লেখকের প্রধান অবলম্বন। সুতরাং সাধারণে মনে করে কথাটী প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য। বাস্তবিকই তাহাই কি ঠিক—তাহা নহে। ধর্ম্মপূজা যে সর্ব্বত্র হয় এবং ব্রাহ্মণেরাই যে তাহার অনুষ্ঠানকর্ত্তা ও সংস্থাপক তাহাই দেখান কর্ত্তব্য। শূকর বলির এক কথাতেই মীমাংসিত হইবে। যথা—মনুষ্য-

মাত্রেই ধর্ম্মবুদ্ধিতে স্বীয় স্বীয় ভোজ্য দ্রব্য ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করেন না। আর্য্যজাতির কথা সুদূরপরাহত, অন্য জাতির কথা বলি। খৃষ্টানগণ মদ্যাদি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া সেবন করেন। মুসলমানেরা কুক্কুটাদির মাংস তাঁহাদিগের কোরাণের বিধি অনুসারে ঈশ্বরে নিবেদন করিয়া থাকেন। অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য ইতর লোকেও ঈশ্বর মানেন এবং খাদ্য বস্তু ঈশ্বরে সমর্পণ না করিলে যে উহা অখাদ্য হয়, এ বোধ অনায়াসসিদ্ধ, কাজে কাজেই "ধর্ম্ম-পূজায়" ছলে, বাগ্দী, ডোম জাতি যে ধর্ম্মপূজায় শূকর বলি না দিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। মদ্য তাহাদিগের একান্ত হৃদ্য ও ক্লান্তি-বিনাশক। শূকর তাহাদিগের নিতান্ত মনোরম খাদ্য বস্তু, তাহারা অসুরবিশেষ, অসুরেরা ভোজন না করিতে পারেন এমন বস্তুই অপ্রসিদ্ধ! কুকীরা কুকুর পিষ্টক খায়, চীনেরা বিড়াল খাইয়া পরমানন্দিত হয়। কোড়া জাতিরা সর্পের মস্তক ছেদন করিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে যাহা উৎসর্গ করে তদ্বিষয়ে কে প্রতিবন্ধকতা করিতে সমর্থ। এবং বাধা দিবারই বা প্রয়োজন কি? প্রতিবন্ধকতা করাই দোষ।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, ফল পুষ্প পত্র মৎস্য মাংসাদি যাহা ভোজনার্থে প্রয়োজন তৎসমস্তই ঈশ্বরে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধং।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতং॥"

অনিবেদিত বস্তু খাইলে বিষ্ঠা ভোজন তুল্য, যথা—

মৎস্যসূক্তে—

অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্যমাংসাদিকঞ্চযৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণোর নিবেদিতং॥
বিষ্ণোরিতি দেবতামাত্রোপলক্ষণং
যথা অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামবাক্যং
যদন্নঃ পুরুষো রাজং স্তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করা যাউক আর গৌরচন্দ্রিকা অথবা ভণিতায় প্রয়োজন আবশ্যক করে না। ধর্ম্মের পূজা সর্ব্বত্র। যথা—

ধর্ম্মরাজ স্বতঃসিদ্ধদেবতাও বটে এবং কখনও যম কখনও শিব কখন নারায়ণ রূপে বর্ণিত ও পূজিত হইয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশে ধর্ম্মের মহিমা এত প্রবল যে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং বৃথা আড়ম্বর না করিয়া কেবল দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে যে, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ধর্ম্মের পূজা হইয়া থাকে। যথা লোকে ধর্ম্মমা, ধর্ম্মবাপ, ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মকন্যা পাতাইয়া থাকে। সে সম্পর্কে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র অনুভব হয় না, উভয়পক্ষে ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় উভয়েই আবদ্ধ। ঔরস পুত্র কন্যার সহিত ধর্ম্মপুত্র বা কন্যার কিঞ্চিতমাত্র ইতর বিশেষ দেখা যায় না। ধর্ম্মপিতা, ধর্ম্মমাতা, ধর্ম্মভ্রাতা এবং ধর্ম্মবন্ধু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবন্ধনে ইহলোক ও পরলোকের সহায়।

ধর্ম্মের পূজার প্রভাবে ইহলোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের প্রাপ্তি এবং পরকালে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হয়। পঞ্চ মহাযজ্ঞের বেদাধ্যাপনকে ঋষি যজ্ঞ কহে, পিতৃযজ্ঞ শব্দে তর্পণ, ও শ্রাদ্ধাদি হোমের নাম দেবযজ্ঞ। প্রাণিগণের আহারদানকে ভূতযজ্ঞ কহা যায়। অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ শব্দে নির্দ্দেশ করে। গৃহস্থ মাত্রকে প্রত্যহ এই পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। এক্ষণে যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যাপন না করাইতে পারেন তিনি অন্ততঃ তিন বেদের তিনটী সূক্ত আবৃত্তি করিয়া থাকেন। পিতৃলোকের তর্পণে যমতর্পণে স্পষ্টই ধর্ম্মের নামে অগ্রে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ইহা দ্বিজাতি ও শূদ্র সকলেই করিয়া থাকেন। যথা—

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায়চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায়চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমিষ্ঠিনে॥
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

এখানে ধর্ম্ম যমরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বলোকে পূজিত।

লোকে কোন প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা সম্পাদনে ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে; স্থল বিশেষে ও কার্য্য বিশেষে ধর্ম্মের উদ্দেশে প্রকৃতপক্ষে ঘটস্থাপন ও যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কোথাও বা তাহার অনুকল্পে কেবল প্রতিজ্ঞা বাক্যে সত্যের দোহায় (অর্থাৎ সারবত্তা) প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত করা হয়। প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তিবর্গ ধর্ম্মবন্ধন হইবে অর্থাৎ সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে পরিচ্যুত না হয়েন এই জন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা পূজার অঙ্গ ও প্রকার ভেদ মাত্র।

ধর্ম্মরাজ লিঙ্গরূপী, ধর্ম্মরাজ নারায়ণ শিলারূপী, ধর্ম্মরাজ অশ্বত্থবৃক্ষরূপী

সুতরাং তাঁহার পূজা চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে স্থানভেদে শিবের গাজনে প্রসিদ্ধ—উত্তর অঞ্চলে শিবলিঙ্গে ধর্ম্মের পূজা ও গাজন (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর গর্জ্জন) হয়।

দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে নারায়ণ শিলায় ও অশ্বত্থবৃক্ষে ধর্ম্মের পূজা ও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

অন্যত্র মৃৎশিলা, দারু ও ঘটাদিতে উপাসকের ইচ্ছা বশতঃ ধর্ম্মরাজ যথাবিধি পূজিত হইয়া থাকেন। এতদ্দেশে চৈত্র সংক্রান্তি অক্ষয় তৃতীয়া অথবা বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্ম্মঘটের ব্রত হইয়া থাকে। তাহাতে যে মন্ত্র আছে তাহা শূদ্রের রচিত নহে সুতরাং ধর্ম্মপূজা শূদ্রের অনুষ্টিত ইহা কদাপি বলা যায় না।

নারদীয় পুরাণে এবং বায়ুপুরাণে শ্বেতবরাহ কল্পে গয়া মাহাত্ম্যে যাহা লিখিত আছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে গয়াশ্রাদ্ধে অগ্রে ধর্ম্মের পূজা করিতে হয়। ধর্ম্মরাজ শালগ্রাম শিলায় অশ্বত্থ বৃক্ষে এবং রুদ্ররূপে অবস্থিত আছেন। প্রমাণ যথা—

ধর্ম্ম ধর্ম্মেশ্বরংনত্বা মহারোধিতরুন্নমেৎ।
চনদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে।
বোধিসত্ত্বা যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ।

সপ্তম অধ্যায় ৩০ শ্লোক।

গয়া শ্রাদ্ধকালেই ধর্ম্মরাজ ও যমরাজ পৃথক্‌রূপে পূজিত হইয়া থাকেন যথা।

ততো যমবলিং দদ্যাৎ মন্ত্রেণানেন সংযতঃ।
যমরাজ ধর্ম্মরাজো নিশ্চলার্থং হি সংযতৌ॥
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৃণাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।

৭অ ৪২ শ্লোক।

এই সকল পৌরাণিক জাজ্বল্যমান প্রমাণ সত্ত্বেও কি শূদ্রবর্ণ কহিবেন, ধর্ম্মপূজা শূদ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত। যদি বলেন বলুন, পাঠকগণ উহার বিচার করিবেন। ব্রাহ্মণের অপ্রাপ্তি স্থলে শূদ্রেরা স্বয়ং পূজা করিয়া থাকে। দুলে, ডোম, মুদ্দাফরস প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির পুরোহিত নাই। সুতরাং তাহারা স্বয়ং পূজা করে। তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদিগের স্বরূপ যোগ্যতা স্বীকৃত হইবে? ঐ সকল নীচ ইতর ও অন্ত্যজ জাতির উদরান্নের সহায় শীতলা দেবী, মনসা দেবী। তাই বলিয়া কি উহাদিগকে ব্রাহ্মণের পথ প্রদর্শক ও উপদেশক বলা যাইবে? কদাচ না। মনসা পৌরাণিক দেবতা

দুলে বাগ্‌দী ডোমের মস্তিষ্ক সম্ভূতা নহে। মহাভারতের আস্তিক পর্ব্ব দেখ। যথা—

আস্তিকস্ত মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকে স্তথা।
জরৎকারু মুনেঃপত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে॥

(বসন্ত) শীতলা, ওলাউঠা প্রভৃতি মহামারী সমুদয় রোগে প্রকৃতির পূজা হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল পূজার প্রকরণ ও পদ্ধতি ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত, শূদ্রের আবিষ্কৃত নহে মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য দেখ। প্রমাণ—

উপসর্গান শেষাংস্তু মহামারী সমুদ্ভবান্।
তথাত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥
যয়া তয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎ পাতাত্তি যোজগৎ।

স্পষ্ট প্রমাণ পাইবে। উপসংহারে দেখাইতে পারি যে যেখানে যেখানে ধর্ম্মপূজা হয় প্রায়ই অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে হইয়া থাকে তথায় সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যাহাদিগের পুরোহিত নাই তাহারা স্বয়ং পূজা নির্ব্বাহ করে। তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের সমকক্ষ মনে করিব।

মহাকালীর পূজার বলিদানে সলোম অস্থি দিবার বিধি আছে। ঐরূপ সরুধির বলিদানের ব্যবস্থা দেখিলে বোধ হইবে কোন দস্যু বা রাক্ষস কর্ত্তৃক বলিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ মহাকালীর বলিদানে নরমাংস, মহিষ মাংস, উষ্ট্র মাংস, মার্জ্জার মাংস, মেষ ও ছাগ মাংস প্রশস্ত। প্রমাণ যথা কর্পূরাদি স্তবে "সলোমাস্থি স্বৈরৎপলনমপি মার্জ্জার মসিতে পরং চৌষ্ট্রং মেষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা। বলিস্তে পূজায়াং মপি—বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাৎ সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভাত"॥ এই প্রমাণ দ্বারা কি বলিব কালিকাপূজার পদ্ধতি হয় যবনের, না হয় চীন পণ্ডিতের অথবা রাক্ষসের লিখিত। কারণ উষ্ট্র মাংস, মার্জ্জার মাংস এবং মহিষের মাংস যথাক্রমে যবন, চীন ও নেপোলীয়দিগের খাদ্য বলিতে হয়। বাস্তবিক কি তাই। তাহা নহে। ইহা আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ আর্য্যজাতির তান্ত্রিকতার ঐ অর্থাপত্তি ঘটে। ঐ ছয়টী বলি যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ছয় রিপুকে গণিতে হইবে। যে উপাসক ষড়্‌রিপুকে বলি দিবে অর্থাৎ জয় করিতে পারিবে তাহার সাধুজনের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি অনায়াসে সাধ্য।

ধর্ম্মের পূজা রাঢ়দেশে শূদ্রে সংস্থাপন করিয়াছেন এ কথার উত্তর দিবার আবশ্যক না থাকিলেও উহা কেবল এক দেশ ব্যাপক বলিয়াই এ কথার উত্তর

দেওয়া নিতান্ত উচিত। ধর্ম্মের পূজা কোন স্থান হইতেই লুপ্ত হয় নাই। কি তান্ত্রিক, কি বৈদিক কি পৌরাণিক সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মের পূজা দেখা যায়। তান্ত্রিক যথা—

ধর্ম্মায়নমঃ জ্ঞানায়নমঃ বৈরাগ্যায়নমঃ। ঐশ্বর্য্যয়েনমঃ ইত্যাদি ক্রমেণ দশোপচারৈঃ, পঞ্চোপচারৈঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং ভাবে কেবলম্ জলেন।

কিন্তু সর্ব্বত্র প্রণবাদিন মোহান্তেন পূজয়েৎ।

ধর্ম্মঘট পূজার মন্ত্রের একদেশ এখানে দেখান গেল। যথা—

এষ ধর্ম্ম ঘটোদন্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সকলামমসন্ত মনোরথাঃ॥
ওঁ পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতুসাশ্বতী।

ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির নাম ধর্ম্মাবতার। তদনুসারে বিচার কর্ত্তাকে ধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞান করিতে হয়। বিচারাসনে আসীন ব্যক্তি স্বজাতি বিজাতি ভেদ রহিত জ্ঞানে মাননীয়। বয়োবৃদ্ধ বা কনিষ্ঠত্বেও বিচারকের ধর্ম্মাবতারত্বের কিঞ্চিৎমাত্র হানি দেখা যায় না। অতএব বলি সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের পূজা অর্থাৎ সম্মান হইয়া থাকে। সুতরাং বলিতেছি—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

প্রবাসী।

চলে ছিনু যবে, জীবন প্রভাতে,
বাহিয়া শীতল পথ;
নবীন পথিক, যেতেছি প্রবাসে,
ছিল কত মনোরথ।
বুকে ছিল বল, পথের লাগিয়া,
সম্বল আছিল সাথে,
হরষে চাহিয়া তোমারে দেখেছি
চলিতে চলিতে পথে।
পাইয়াছি সাড়া যখনই ডেকেছি,
উছলি উঠেছে প্রাণ;
উৎসাহে পথ চলেছি দ্বিগুণ
লভেছি নুতন জ্ঞান।
আজিকে সুদূরে কত বার ডাকি
কোথা তুমি, কোথা তুমি;
শুধু ঘুরে ফিরি, লক্ষ্য হারায়ে,
অজানিত বনভূমি।
আর তো তোমারে পাই না দেখিতে,
সুদূরে মিলাল গেহ,
প্রবাসে আমারে, পাঠায়ে একেলা,
আর কি দেখে না স্নেহ।

আগে কত বার, বিষাদের মাঝে,
তোমারে পেয়েছি কাছে ;
আকুল হৃদয়ে, ডেকেছি যখন,
জেনেছি সান্ত্বনা আছে।
ছিল না যখন, হৃদয়ের ভার,
বিশ্বাস আছিল বুকে,
তখন বারেক, দেখিনিক' চেয়ে,
চলিয়াছি কোন মুখে।
এবে নুয়ে পড়ে, গুরুতর ভারে
বিশ্বাস বিহীন কায়া,
শ্রান্ত পথে আর, ফিরিতে পারি না,
কোথায় শীতল ছায়া।
কত ছিল কাজ, কি হ'ল সাধনা,
কি ফল লভিনু হেথা,

বড় সাধ ছিল আপনা স'পিতে,
ঘুচাতে পরের ব্যথা।
বৃথায় ভ্রমিনু, মিলিল না হায়,
কোথায় সে লক্ষ্য স্থল ;
শুধু দেহ ক্ষয়, পুরিল না আশা,
প্রয়াস হ'ল বিফল।
ছিল কত কাজ, কি হ'ল সাধনা,
কি ফল লভিনু ঘুরে,
যা ছিল সম্বল, হারায়ে ফেলেছি,
কেমনে যাইব ফিরে।
সুদূর প্রবাসে, লক্ষ্য হারায়ে,
ভ্রমিছে তনয় তব,
দেখাইবে পথ নিয়ে যাও সাথে
আসুক জীবন নব।

৺অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।*

আইনে জমিদারদিগের অসুবিধা।

[নবপ্রভার পাঠকগণ অবশ্য অনুভব করিয়াছেন দীন হীন প্রজাপুঞ্জের সহিত নবপ্রভার পরিচালকদিগের গভীর সহানুভূতি, এবং তাহাদিগের অবস্থার উন্নতিকল্পে সহৃদয় ব্যক্তিগণ যাহাতে সচেষ্ট হন তজ্জন্য প্রয়াসী। আমাদিগের বিবেচনায় এমন উপায় আছে যাহাতে জমিদার ও প্রজার উভয়েরই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আইনে জমিদারদিগের যে সকল অসুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করা উচিত এবং তাহার হেতু ও পরিণাম ও প্রতিকার কি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। নঃ প্রঃ সঃ]

বাঙ্গালা দেশে মহানুভব কর্ণোয়ালিসের যত্নে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। ভূমির রাজস্ব চির কালের জন্য স্থিরীকৃত

---

* এই ক্ষুদ্র কবিতাটি চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকের লেখা। তাঁহার জনৈক আত্মীয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"বালকটী দুরারোগ্য ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারি পাঁচ মাস শয্যাগত ছিল এবং সেই অবস্থাতেই অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিল ; তাহার লিখিবার শক্তি ছিল না ; মুখে মুখে বলিত এবং তাহার ভগিনী লিখিয়া লইত। বিগত ১৩০৮ সালে ৯ই ভাদ্র সে তাহার আত্মীয়বর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছে।" মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল। নঃ প্রঃ সঃ

হইল। গবর্ণমেণ্ট কেবল প্রজাবর্গের হিতের জন্য আবশ্যক মত আইন প্রচলিত করিতে পারিবেন এই প্রকার ব্যবস্থা থাকিল। ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত জমিদার-দিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ প্রায় রহিল। জমিদার ইচ্ছামত প্রজাপত্তন, প্রজা উচ্ছেদ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ক্ষমতাই পরিচালনা করিতে পারিতেন। তবে চুক্তি অনুসারে ভূম্যধিকারী এবং প্রজা উভয়েই প্রচলিত আইন অনুসারে বাধ্য ছিলেন। তৎপর ১৮৫৯ সালে ১০ আইন প্রচলিত হইল; জমিদারদিগের ক্ষমতাও হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। রাহুগ্রাস আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলা কৌন্সিলের ১৮৬৯ সালের ৮ আইন, এবং ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের দ্বারা জমিদারদিগের ক্ষমতা শনৈঃ শনৈঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করা হইল। ভবিষ্যতে জমিদারদিগের ক্ষমতার পূর্ণগ্রাস হইবে কি না জানি না।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই প্রকার প্রতীয়মান হয় যে জমিদারগণ ভূমির প্রকৃত নিব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী। কিন্তু এইক্ষণ সে কথা লুপ্ত প্রায়। পূর্ব্বে জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে প্রজার সহিত এই প্রকার চুক্তি করিতে পারিতেন যে ১৩ বৎসরের জন্য প্রজা জমীতে কৃষিকার্য্য করিয়া জমী পরিত্যাগ করিবে অথবা জমিদার ইচ্ছা করিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। কিন্তু এইক্ষণ আর সে বন্দোবস্ত করা চলে না। (ক) এ প্রকার চুক্তি করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে। ভূস্বামী ও প্রজা, সরল চিত্তে সরল বিশ্বাসে, স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছামত চুক্তি করিলেও সকল চুক্তি আইন অনুসারে গ্রাহ্য নহে। দেখুন,—

(১) বাকী করের সুদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজা ইচ্ছামত চুক্তি করিতে পারিতেন। ১৮৮৫ সালের পূর্ব্বের যে সকল চুক্তি আছে তাহা এইক্ষণও আইন অনুসারে বলবৎ আছে। কিন্তু ১৮৮৫ সালের পর শতকরা ১২৲ টাকার অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য করা চলে না। (খ)

(২) দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার কর উভয়পক্ষ স্বাধীন ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিলেও টাকায় দুই আনার অতিরিক্ত ধার্য্য হইতে পারে না। (গ)

(৩) জমিদারের জমী কোন ব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক দখল করিয়া লইয়া কোন কৃষি-প্রজা পত্তন করিলে, জমিদার বেদখলের বাবদ ডিক্রী করিয়া জমী পুনরায়

(ক) Bengal Tenancy Act s. 178 sub-sec. (3)

(খ) Bengal Tenancy Act s. 178 sub-sec. cl. (h)

(গ) Bengal Tenancy Act s. 29

উদ্ধার করিলে, উক্ত কৃষি-প্রজা সরলমনে বেদখলিকারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া থাকিলে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারেন না। (ঘ)

(৪) আংশিক মালেক যদি কৃষি-প্রজা অর্থাৎ রাইয়তের বিরুদ্ধে বাকী করের ডিক্রী পান, তাহা বাকী করের ডিক্রীর তুল্য গণ্য হইবে না; দেন ডিক্রীর তুল্য বিবেচিত হইবে। এবং বাকীর মহাল ক্রোক বিক্রয় হইতে পারে না। অপিচ যদি দেশাচার প্রথা অনুসারে কৃষি প্রজার স্বত্ব বিক্রয়োপযুক্ত না হয় তবে আংশিক মালেকের ডিক্রীতে আদৌ বিক্রয় হইবে না। সুতরাং আংশিক মালেকের বাকী করের ডিক্রীর টাকা আদায় হইবার কোন উপায় নাই। (ঙ)

(৫) কোন কায়েমি মৌরসি জমা বিক্রয় হইলে মালেকের ফি দাখিল করিবার নিয়ম আছে। এবং মালেককে নোটীস্ দিবার বিধান আছে। কিন্তু মালেক যদি প্রকৃতপক্ষে নোটীস্ না পান, এবং সরলমনে পুরাতন প্রজার নামে বাকী করের মোকদ্দমা করেন, এবং বিক্রয়ের বিষয় অবগত না থাকা প্রমাণও করেন তথাপি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। অবগত থাকুন আর না থাকুন নূতন প্রজার নামে নালিশ করিতে হইবে। (চ)

(৬) জমিদার বাকী বকেয়া সহ কোন নূতন জমিদারী ক্রয় করেন তবে পুরাতন বাকী কর অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট প্রাপ্য বাকী কর আদায় করিতে হইলে বাঙ্গালা খাজানা আইনানুযায়ী ডিক্রীর যে সকল সুবিধা তাহা পান না এবম্বিধ ডিক্রী দেন ডিক্রী তুল্য জ্ঞান হইবে। এবং ঐ সকল বাকী কর আদায় করিতে হইলে খাজনা আইনের লিখিত ৪ বৎসরে তামাদির বিধান খাটিবে না; সাধারণ তামাদির ৩ বৎসরের তামাদির নিয়ম খাটিবে।

(৭) আংশিক মালেক একক করবৃদ্ধি কিম্বা উচ্ছেদ কিম্বা জমি পরিমাপ করিবার নালিশ করিতে অনুপযুক্ত। যদি অন্যান্য সরিক প্রজার সহিত এক-যোগে এই প্রকার নালিশ করিবার বাধা জন্মায় তথাপি যে সরিক এই প্রকার নালিশ করিবার ইচ্ছুক তিনি তাহা করিতে পারিবেন না। (ছ)

(ঘ) I. L. R. 20 Cal. 708 (F. B.)

(ঙ) Cal. weekly note 521.

(চ) I. L. R. 19 Cal. 774.

(ছ) Bengal Tenancy Acts 180.

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অনেক অসুবিধা জমিদারদিগের হইয়াছে। উল্লিখিত কয়েকটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও জমিদারগণ আপনাদিগকে একপ্রকার সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বাকী কর আদায়ের এইক্ষণ যে প্রকার বিধি আছে তাহাতে জমিদারদিগের যে বিষম অসুবিধা হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। কোন একটী বাকী করের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহা নিষ্পত্তি হইতে বহু বিলম্ব হয়। এবং নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল ও হাইকোর্টে কোন কোন স্থলে দ্বিতীয় আপীল উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই প্রকারে সামান্য একটী করের মোকদ্দমা করিলে ২।৩ বৎসর চলিয়া যায়। কিন্তু আমরা মনে করি যে এ সম্বন্ধে যদি আইন পরিবর্ত্তন করা যায় তবে প্রজা ভূম্যধিকারী কাহারও অসুবিধা হয় না। ১৮১৯ সালের ৮ কানুনে যে প্রকারে পত্তনি খাজনা আদায় করিবার নিয়ম আছে, এই প্রকার নিয়ম কোন কোন রকম বাকী করের মোকদ্দমায় অনায়াসে করা যাইতে পারে। যে সকল প্রজার সহিত লিখিত চুক্তি আছে এবং যে সকল প্রজার বিরুদ্ধে আদালতের ডিক্রী আছে সেই সকল প্রজার বিরুদ্ধে ১৮১৯ সালের ৮ আইনে বিধান মত করাদায়ের নিয়ম করিলে কাহারও যে কোন প্রকার অসুবিধা হয় এমত বোধ হয় না। * এ সম্বন্ধে কেহ এ প্রকার প্রতিবাদ করিতে পারেন যে এ প্রকার আদায়ের বিধান হইলে অনেক মিথ্যা দাবী উপস্থিত হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন সম্ভব কিম্বা কোনই আশঙ্কা

---

* এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে পত্তনিদারগণ প্রায়ই সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত লোক। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই এক এক জন মোক্তার বা উকীল আছে। তাহারা অষ্টমের দায় হইতে যথাকালে মক্কেলকে মুক্ত করে। গরিব অশিক্ষিত প্রজার এরূপ মোক্তার নাই। তাহার পর পত্তনিদারগণ এক প্রকার জমিদার। তাহাদিগের জমা বৃদ্ধি হয় না, এবং তাহারা খাজনা দিলে জমিদারগণ তাহাদিগের উপর কোন প্রকার প্রভুত্ব করিতে পারেন না। এরূপ স্থলে তাহারা অষ্টমের একটা মাত্র অসুবিধা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারেন। গরিব প্রজার নিরিখ বৃদ্ধি হইতে পারে, জমী জরীপ করিয়া জমা বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং তাহাদিগের উচ্ছেদ হইতে পারে। তাহার উপর যদি সরাসরি বিচার মতে তাহাদের জমী বিক্রয় হইয়া যায়, তাহা হইলে বেচারা সব বড়ই বিপদে পড়ে। ভরসা করি শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধ লেখক এই আপত্তির মীমাংসা করিবেন। জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমানেও অনেক স্থলে পত্তনি বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কিন্তু প্রজাকে পত্তনির সুবিধা দিতে চাহেন না বলিয়াই পত্তনি বন্দোবস্ত করেন না। প্রজা পত্তনির সুবিধা পাইবে না, কেবল সরাসরি নীলামের অসুবিধা ভোগ করিবে এই প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা দোষ ঘটে কি না আইনজ্ঞ প্রবন্ধলেখক বিবেচনা করুন। নঃ প্রঃ সঃ

নাই। ১৮১৯ সালের ৮ কানুন অনুযায়ী যে জমিদারেরা কর আদায় করেন তাহাতে প্রায় কখনই দেখা যায় না যে মিথ্যা দাবী করিয়া কোন জমিদার করাদায়ের প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন প্রকার আশঙ্কা দেখা যায় না। এবং এই সকল আশঙ্কা থাকিলে বরং এই প্রকার কোন বিধান করা চলে যে কোন মিথ্যা দাবী করা প্রমাণ হইলে মালেক দাবীর চতুর্গুণ কিম্বা সম্পত্তির মূল্যের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। এবং খরিদদার খরিদের টাকা ও তাহার সুদ ও শতকরা পাঁচ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইলে নীলাম রহিত করিবার জন্য প্রজা প্রার্থনা করিতে পারিবেক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন।

মায়া।

দশম পরিচ্ছেদ।

Awake! what, ho! Brabantio! thieves! thieves! thieves!
Look to your house, your daughter and your bags,
Thieves! thieves!

Shakspeare.

রাত্রি দুই প্রহর। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। তাহার উপর আকাশে মেঘ হইয়াছে—ঘোর অন্ধকার। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে গৃহস্থগণ সুষুপ্ত। কিন্তু হারাধন, কুমুদিনী ও মায়া এখনও নিদ্রা যায় নাই। আসুন পাঠক পাঠিকে, সেই কৃষককুটীরে গভীর রজনীতে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, আমরা শুনি।

হারাধন বলিল—"বৌমা, দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে দেহপাত কোরো না। আমি কি নিশ্চিন্ত আছি? মহেশ আমার একমাত্র পুত্র, আমার এই বুড়ো বয়সে সেই একমাত্র আশা ভরসা—সে আমার অন্ধের যষ্টি। তার মামলা ভাল কোরে চালিয়ে তাকে খালাস করিবার জন্য; যেমন ক'রে পারি টাকা কর্জ্জ করবোই। আমি প্রত্যহ দুয়ার দুয়ার ঘুরছি। একটা মহাজন আজ বলেছে টাকা কর্জ্জ দেবে। জমী জমা, ঘর বাড়ী, সব বন্ধক দিয়ে তার কাছে টাকা নেব—কা'লই টাকা পাব। তুমি অত অধীর হয়ো না, মা! শ্রীহরি কি আমাদের পানে একবারেই মুখ তুলে তাকাবেন না?

মায়া। বৌ বলছে, তার যা কিছু গয়না আছে, কালকেই তুমি সব বিক্রয় করে, দাদাকে খালাস কোরে আন।

বৌ (কুমুদিনী) অতি মৃদু করুণস্বরে বলিল—“আমার হাতের লোহা গাছটা, আর পরনের সাড়ীখানা বাদে, আমার যা কিছু গয়না সাড়ী আছে—কালই আপনি সব বেচে, যা কিছু টাকা পান উকীল বাবুদের পায় ধ'রে দিয়ে, তাঁকে খালাস কোরে নিয়ে আসুন।

হারাধন। মা! তোমার গয়না কই আর? সুতীর কাপড় যা আছে, তাতে কটা টাকা হ'বে। খুনী মামলা চালন কি অল্প টাকার কাজ?

কুমুদিনী। আমার এত গহনা, এত কাপড়, —তা বেচে কি কতক টাকা হবে না?

হারাধন। মা তুমি কি ভুলে গিয়েছ? নায়েবের অত্যাচার জুলুমে যখনই কোন গরিব প্রজা বিপদে পড়েছে, মহেশ তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য, তার নিজের যা ছিল, ঘরে যা ছিল, অবশেষে তোমার গহনা ও কাপড় সবই বিক্রয় কোরেছে।

কুমুদিনি। আমি জানি আমার স্বামী দেবতা। তাই তিনি নিজের যা ছিল—আমার গহনা কাপড়—সেওত তাঁরই—অন্যকে বাঁচাবার জন্য সব বেচে ফেলেছেন—আমার সম্মতি লওয়া কোন আবশ্যক ছিল না, তবু আমার মত ল'য়ে বিক্রি করেছেন। তাতে আমি দুঃখ করি না—আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যিনি অন্যকে রক্ষা ক'রেছেন, তাঁকে আমরা এখন কেমন ক'রে রক্ষা কর্‌বো?” এই বলিয়া কুমুদিনী আবার কাঁদিতে লাগিল।

মায়ারও চোখের জল পড়িতেছে, তবু মায়া যেন একটু ধীর ও বিজ্ঞভাব ধারণ করিয়া বলিল;—“বৌ কাঁদিস্‌নে”। তাহার পর হারাধনের দিকে ফিরিয়া বলিল—“বাবা, আমি তোমাকে টাকা এনে দিব, তুমি ভেব না।”

হারাধন। কেমন কোরে, মা?

মায়া। তাঁতিবৌ গাঙ্গুলিদের বাড়ী দাসীপনা ক'রে টাকা করেছে—সে আমাকে বলেছে; আমি দাদাকে খালাস ক'রবার জন্য কারো বাড়ী দাসীপনা করব। কা'ল, বাবা, তুমি আমাকে কারো বাড়ী দাসী ক'রে রেখে দিয়ে এস। —কিন্তু, বাবা, রাত্রিতে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পার্‌ব না”—এই বলিয়া মায়া হারাধনের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হারাধনেরও চক্ষু ভিজিয়া গেল।

৫

হারাধন বলিল—"মায়া, বলিস কি? তুই কচি মেয়ে, তুই কি দাসীপনা করতে পারিস? এই বুড়ো বয়সে, —মহেশ জেলে, তার উপরে, তোকে না দেখলে যে আমি ম'রে যাব।

মায়া। না, বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায়ও যাবো না।

কুমুদিনী। আমি ত আর কচি মেয়ে নই। আমি ত দাসীপনা ক'রে উকীল মোক্তারের খরচের জন্য, মামলা খরচের জন্য যে কর্জ্জ হবে, তা শোধ করবো।

হারাধন। হা হরি! হারাধনের বেটার বৌ কি না আজি দাসীপনা করবে? আমি বেঁচে থাকতে তার এই খোয়ার হবে? না, মা! আর— তোমার এই বয়স, এই রূপ তোমাকে পরের বাড়ীতে রাখাও যা আর বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া তা। আর, চাকরী! মহেশ যে বড়ই ঘৃণা করে। সে ত বেটা ছেলে। তবু সে কথায় কথায় বলতো—"আমি মরিতে পারি, কিন্তু কারো চাকুরি করিতে পারি নে।" হায় বিধাতা, তুমি আমার কপালে কি এই লিখেছিলে? ছেলের জেল—ছেলের বৌর দাসীপনা? না, তা হবে না, বৌমা তা কখন হবে না।

সেই আঁধার রজনীতে, সেই নিস্তব্ধ গৃহে, নীরবে তিন জনেরই অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে হারাধন আবার বলিল—"তোরা কাঁদিস না। কাল বাড়ী বাঁধা দিয়ে, গরু ও লাঙ্গল বেচে, ঘটী বাটী যা আছে, সব বেচে, টাকা যোগাড় করবো; করবোই।

মায়া। হ্যাঁ বাবা, দাদা যাতে খ'লাস হয়, তাই কর।

হারাধন। বিদ্রোহী প্রজারা চাঁদা তুলে মোকদ্দমা চালাতে আরম্ভ করেছে। এক সন্ন্যাসী ঠাকুর খবর দিয়েছেন—তোমরা তা জান—এক জন ভাল মোক্তার আর একজন ভাল উকীল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যের টাকার ওপর, বৌমা, তোমারও যেমন ভরসা হয় না, আমারও তেমনি ভরসা হয় না।

কুমুদিনী। ভরসা করি কেমন ক'রে? প্রজারা যে সব বড় গরিব। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেই খেতে পাচ্ছে না। অন্যের জন্য কেমন ক'রে টাকা দেবে।

মায়া। প্রজারা এত গরীব কেন?

হারাধন কন্যার কথা লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর কালকে

আমায় বল্লেন যে তিনি শীঘ্র মহেশকে খালাস কর্‌বার জন্য প্রবোধ বাবুর নিকট যাবেন।”

কুমুদিনী ও মায়া সন্ন্যাসী ঠাকুর কি যাবেন? কবে?

হারাধন। বোধ করি, কা'ল কি পরশু।

মায়া। “আমাদের আর ভয় নাই। সে সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় ভাল। এক দিন দাদার সঙ্গে এসেছিলেন—তুমি দেখনি? আমি দেখিছি। বাবা! আর আমাদের ভয় নাই। দাদা নিশ্চিতই খালাস হবে। আমার ঠিক বোধ হচ্ছে।” বলিতে বলিতে মায়ার বিষণ্ণ মুখকমল যেন আশার কিরণে একটু প্রফুল্ল হইল। এমন সময় দূরে প্রিং প্রিং প্রিং করিয়া কি শব্দ হইল, যেন একতারা বাজিতেছে। সঙ্গে একটা গান শুনা যাইতে লাগিল,—অতি করুণ স্বরে কে গাহিছে,—

শ্যাম সুন্দর নটবর মজায় কুলবালারে,
কুঞ্জ কুটীরে ধীরে ধীরে ল'য়ে যায় গোপীরে।
আয়ান নাহিক ঘরে; রাধার হরণ তরে
পাঠাইল রসরাজ দূতী বিশাখারে—
ওরে—সে বিষি বিষম—ভুজঙ্গীরে॥

হারাধন একজন ভক্ত বৈষ্ণব। প্রথমে এই গান শুনিয়া তাহার মন যেন একটু প্রশান্ত হইল। কুমুদিনী ও মায়া সেই দূরাগত করুণ গীতি শুনিল। হারাধন যখন গানের শব্দগুলি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তখন সে শিহরিয়া উঠিল। কুমুদিনীও চমকিয়া উঠিল।—

হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—“মা কিছু বুঝিয়াছ কি?”

কুমুদিনী—বোধ হচ্ছে, বিপদের উপর আবার বিপদ; আর কিছু বুঝি নাই।

হারাধন। হাঁ। “আয়ান” মানে আমাদের মহেশ। “রাধিকা”—অর্থাৎ তুমি। নটবর, আমাদের নায়েব নটবর। বিশাখা, সেই সর্ব্বনাশী বিসি, যে তোমার কাছে আজ আসিয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া কুমুদিনী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। মায়া কিছুই বুঝিল না—একবার তাহার বাবার দিকে, একবার বৌর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত বুঝিল—“ব্যাপারটা ভাল নহে।”

হারাধন বলিল—“বৌ মা! এখন উপায় কি করি? কা'লই আমরা প্রবোধ

বাবুর জমিদারিতে পালাইয়া যাইব। কাল খুব ভোরে উঠে আমরা পালাব।

কুমুদিনী। আমিও আপনাকে বরাবরই বলছি, তাঁকেও কতবার বলেছি—"প্রবোধ বাবুর জমীতে না পালালে আমাদের ধন মান প্রাণ জাতি কিছুই থাকবে না।" কিন্তু এ অভাগিনীর কথা তিনিও শুন্‌লেন না, আপনিও শুনেন না।

হারাধন। "মহেশকে খালাস কর্‌বার জন্য বাড়ী বাঁধা দিয়ে টাকা কর্জ্জ করবো, তাই এখানে কদিন আছি"—

এমন সময় একটা শীশ দেওয়ার শব্দের মত কেমন একটা অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ হইল। তিন জনেই কাণ পাতিয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দরজায় খুস্‌খুস্ খট্ খট্—খটাস্ শব্দ হইল। তাহার পর ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দ। উঠানে দুপ্‌দাপ্ মানুষের পা'র শব্দ শুনা গেল। হারাধন বলিল—"কেও?" বাহিরে গম্ভীর চাপা স্বরে উত্তর হইল—"চুপরহ"।

হারাধন তখন মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি বলিল—"বৌমা! পালাও, পালাও, খিড়্‌কির দুয়ার দিয়া, কানাচ দিয়া—শীঘ্র পালাও"। কুমুদিনী পিছনের দুয়ার দিয়া পালাইল। মায়া তাহার বাবার গলা জড়াইয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় ঘরের সম্মুখের দুয়ারে কে সজোরে পদাঘাত করিল, দুয়ারের খিল ভাঙ্গিয়া, দুয়ার খুলিয়া গেল। একজন লাঠিয়াল আসিয়া খপ্ করিয়া হারাধনের গলা ধরিল, আর একজন বলিল "বল্ বেটা বুড়ো, "তোর বেটার বৌ কোথা?" হারাধন বলিল,—"বৌমা রান্নাঘরে।" দুইজন লাঠিয়াল সে দিকে ছুটিল সেখানে পাইল না, তাহারা সমুদয় ঘর পাতি পাতি করিয়া খুজিতে লাগিল। একজন বলিল "ভাগ গিয়া"। এ দিকে অন্ধকারে কাণাচ দিয়া পালাইতে গিয়া কুমুদিনী একটা বর্জ্জিত হাঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। তাহাতে একটা শব্দ হইল। কয়েকজন লাঠিয়াল সেইদিকে ছুটিল। কিন্তু সেখানে আম্র বাগান—ঘোর অন্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইল না। কুমুদিনী ক্ষণকাল পরে উঠিয়া সেই অন্ধকারেই আবার ছুটিল। এবার বৃক্ষের শাখায় কপালে দারুণ আঘাত লাগিল কুমুদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা হইল। তখন উপুড় হইয়া শুইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। ভয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, কিন্তু বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। হতভাগিনী কুমুদিনী যেখানে ভূতলে মৃত্তিকাশায়িনী সেই-

দিকে একজন লাঠিয়াল একটা লণ্ঠন লইয়া খুজিতে আসিল—ক্রমে তাহারই দিকে আসিতে লাগিল।

কুমুদিনী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। লাঠিয়াল দেখিল, কুমুদিনীর কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে, কাপড় আলু থালু ও ধূলায় ধূসরিত, চক্ষু অশ্রুবিপ্লুত। কুমুদিনী গলায় বস্ত্র দিয়া হাত যোড় করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমাকে বাপ বলিলাম, দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা কর"।—সেই গৌরকান্তি অশ্রুবিপ্লুত-বিশাল নয়না, ভীতি-বিধূনিত-হৃদয়া, বিপন্না ক্ষীণাঙ্গী কৃতাঞ্জলি লগ্নীকৃতবাসা, বিধুরা কৃষকবধূকে দেখিয়া ঐ লাঠিয়াল স্তম্ভিত হইল। লাঠিয়াল যুবা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক উদারতা তাহার হৃদয়ে অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই।—অসাহায়া অবলার প্রতি অত্যাচার করা লজ্জার বিষয় সে অনুভব করিল।—সে বলিল "মা, তুমি পালাও, আমি তোমাকে ধরিব না"। এমন সময় রহিমবক্স নামক একজন পেয়াদা সেখানে আসিয়া পড়িল, বলিল—"বাহবা—তোম ক্যায়সা নেমকহারাম হ্যায়" এই বলিয়া সে লাফাইয়া কুমুদিনীর হাত ধরিল। কুমুদিনী ঝাট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া আবার পলাইবার চেষ্টা করিল। তখন রহিমবক্স তাহার অঞ্চল ধরিল আর একজন লাঠিয়াল সজোরে কুমুদিনীর হাত ধরিয়া থাকিল রহিমবক্স বস্ত্র দ্বারা কুমুদিনীর মৃণাল-কোমল-ভুজদ্বয় বাঁধিতে লাগিল। তখন কুমুদিনী ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"প্রাণনাথ, তুমি এখন কোথায়—তুমি একবার আসিয়া দেখ, তোমার কুমুদের কি দুর্গতি হইতেছে!" তখন একজন লাঠিয়াল "চুপ" বলিয়া কুমুদিনীর মুখ বাঁধিয়া ফেলিল; আর, একজন তাহার পা বাঁধিল, এবং তোলা তোলা করিয়া একখানি পাল্কিতে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাল্কির দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। বেহারারা পাল্কী তুলিল। লাঠিয়ালগণ পাল্কীর অগ্রে পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ঐ দিকে, হারাধনকে যখন লাঠিয়ালগণ ধরিল, হারাধন বুঝিল, আর আশা নাই। সে ভাবিল "আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, তবে, হে হরি! বৌমাকে রক্ষা কর, তাহার ধর্ম্ম রক্ষা কর।" হারাধন পরম ভক্ত।—সে এই মহাবিপত্তিতে, চক্ষু মুদিয়া মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল। একজন লাঠিয়াল হারাধনকে পীঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। আর একজন লাঠিয়াল হারাধনের পৃষ্ঠে খুব জোরে দুই ঘা লাঠি মারিল। হারাধন যেমন "বাবারে", বলিয়া চীৎকার করিয়াছে,

অমনি একজন পামর তাহার মুখের ভিতর কাপড় পুরিয়া দিল, মুখ বাঁধিল, পা বাঁধিল, গলার সহিত হাঁটু বাঁধিল—বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়া হারাধনকে একটা মাংসপিণ্ডের মত করিয়া ফেলিল। আবার মারিতে লাগিল। তাহার পর বৃদ্ধকে একখানি ডুলির মধ্যে ফেলিল। বাহকগণ ডুলি লইয়া পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে চলিল বীর মহেশ! তুমি এক্ষণ কোথায়। তুমি প্রজাবর্গকে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলে। অদ্য, তোমার বৃদ্ধ সাধু পিতা, তোমার যুবতী পতিব্রতা ভার্য্যা, কোথায় কি অবস্থায় চলিল!

মায়ার কি হইল? যখন হারাধনকে দারুণ আঘাত করিয়া মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া তাহাকে বাঁধিয়া একটা মাংসদলার মত করিয়া ফেলিল, এবং আবার মারিতে লাগিল, তখন মায়া মূর্চ্ছা গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, বালিকার জ্ঞান হইল, তখন ঘর অন্ধকার, বাড়ী নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র বায়ু হুস্ হুস্ হুস্ করিয়া বহিতেছে। খোলা দরজা ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া পড়িতেছে। মায়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল—

"বাবা—বৌ—দাদা—ও বাবা ও বৌ তোমরা কোথায়? আমার যে বড় ভয় করছে—বাবা—বাবা—বাবা:" হায়! সেই নির্জ্জন অন্ধকার বাটীতে সেই ভয়ার্ত্তা শোকার্ত্তা শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে এমন কোন লোক ছিল না। কেহ শুনিতে পাইল না, তাহাকে সান্ত্বনা করিতে বা সাহস দিতে কেহ আসিল না,—শোকে ও ভয়ে মায়া আবার মূর্চ্ছিত হইল।*

বিদ্যায় বিপদ।

(Herbert Spencer's "Facts and Comments". Gugau's "Education and Heredity," Contemporary Series, Nineteenth Century February, 1903.

আত্মশিক্ষায় আত্মোন্নতি;—শিক্ষার নিষ্ফলতা,—পাণ্ডিত্য-বিহীন বিস্মার্ক (Bismarck) ও লিনকন্ (Lincoln), পণ্ডিত গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ (Gladstone); পলিটিক্যাল্ ইকনমির (Political Economy) অনাদর, কবডেন্ ও রিকার্ডো;—শিক্ষা—সঙ্কোচ

---

* এই উপন্যাসে যেমন একটী দুর্ব্বৃত্ত নায়েবের কার্য্যাবলী বর্ণিত হইতেছে পরে একটী সচ্চরিত্র নায়েবের ব্যবহারও বিবৃত হইবে। সুতরাং কাহারও রাগ করিবার কারণ নাই।

বনাম শিক্ষা-বিস্তার ;—শিক্ষাবিস্তারে ইংলণ্ডের শোচনীয় পরিণাম, ইংরেজের নৈতিক অবনতি, কলুষিত রুচি ও মিথ্যাপ্রিয়তা ; পরীক্ষার কুফলে গাইয়োর (Guyuu) মত ;—মনুষ্যত্বের অভাব ; —চৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, প্যারিচরণ, রামতনু ;—বঙ্গদেশের শোচনীয় অবস্থা, থিয়েটার যাত্রা ; সংবাদপত্র ; অধিকারভেদে শিক্ষাভেদ ও শিক্ষাবিস্তারে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মত ; "অমিয় নিমাই চরিত" ও "কৃষ্ণ চরিত্র", উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ; —সন্ন্যাসী-শিক্ষক।

আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতি লইয়া একটা তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, বিলাতের সংবাদ ও মাসিকপত্রে এ বিষয়ের চর্চ্চা চলিতেছে। এখানেও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। বেনসনের স্কুলমাষ্টার (Mr. Benson's School-master), সার্ হেন্‌রি লজের (Sir Henry Lodge) প্রবন্ধ এবং উহাদিগের বাদ-প্রতিবাদ এবং সার্ জন গষ্টের (Sir John Gorst) অভিমত এবং বিলাতের এডুকেশন বিল লইয়া সমালোচনা চলিতেছে। এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার বিষয়ে সভা-সমিতি বক্তৃতার খুব ধুম চলিয়াছিল ; তাহার জের এখনও মিটে নাই —অনেকের বিশ্বাস যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের এত দুর্গতি ; দেশের অধিকাংশ লোক এখনও পর্য্যন্ত নিরক্ষর ; শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের এত অভাব। শিক্ষা সুবিস্তৃত হইলে, দেশের ধন উছলিয়া উঠিবে ; আবার ভারতভূমি স্বর্ণকিরটিনী হইবে ; নীতির বিস্তার হইবে ; লোকের মন ভাল হইবে, লোকে ভালমন্দ বিচার করিতে শিখিবে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোল, নগরে নগরে পুস্তক পড়িবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দাও, বিলাতের ন্যায় স্কুল কলেজের আধিক্য হউক, তাহা হইলেই সুখের, সুমতির, স্বর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।

আমরা বলি, বিলাতের শিক্ষাপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ করিলে, দেশের পক্ষে যে বড় মঙ্গল হইবে তাহা বোধ হয় না। বিলাতের চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ঠিক নহে এবং তাহার সংস্কার প্রয়োজন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নাইন্‌টিন্‌থ সেন্‌টুরি (Nineteenth Century) শিক্ষার অনুপকারিতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা

চুম্বক করিলে এই দাঁড়ায় যে শিক্ষাবিস্তারে নৈতিক আবিলতা বাড়িয়াছে, চিন্তাশীলতা কমিয়াছে। যে বিলাতী-স্কুল-কলেজ লইয়া, র‍্যালে এবং লর্ড কর্জ্জন একেবারে মোহ-মুগ্ধ, সেই বিদ্যালয় সমূহ সম্পর্কে উক্ত মাসিকে যথেষ্ট আক্ষেপোক্তি বর্ত্তমান।

বিলাতের অধিনায়ক বা শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদিগের ভাবী উন্নতি বা গৌরবের জন্য স্কুলকলেজের নিকট বিশেষ ঋণী নহেন। ক্রমওয়েল (Cromwell) চাষার কাজ করিতেন, যোদ্ধা ক্লাইব্ এবং রাজনীতিজ্ঞ হেষ্টিংস কেরাণী ছিলেন, চেম্বর্‌লেন্ বাণিজ্যের জন্য শিক্ষিত হইয়াছিলেন, লর্ড ক্রোমার্ (Lord Cromer—ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব Baring) যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রিন্স বিস্‌মার্ক্ (Prince Bismarck) আইন পরীক্ষায় দুইবার "ফেল্" হন; বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ (Benjamin Franklin) ছাপার কাজ করিতেন; জর্জ্জ ওয়াসিংটন্ (George Washington) জরিপ করিতেন, হার্সেল (Sir William Herschell) গায়ক ছিলেন, ফ্যারাডে (Faraday) পুস্তক বাঁধিতেন, তুলাযন্ত্র আবিষ্কর্ত্তা আর্করাইট্ (Arkright) নাপিত ছিলেন, স্পেন্সার (Herbert Spencer) ইঞ্জীনীয়ার ছিলেন, এডামস্মিথ পাদরী ছিলেন এবং এডিসন্ (Edison) সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। এব্রাহাম লিন্‌কন (Abraham Lincoln) যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড্ (President Garfield) নাবিকের কাজ করিতেন, কার্ণেজী (Andrew Carnegie) ফ্যাক্‌টারিতে সামান্য কাজ করিতেন। স্কট্ Sir Walter Scott) উকীলের মুহুরি ছিলেন, ম্যাক্‌সিম্ (Sir Hiram Maxim) শকট নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং রথচাইল্ড্ ফেরিওয়ালা ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপরোক্ত অসাধারণ ব্যক্তিগণ নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক।

সভ্যজাতির যুদ্ধকৌশল, রণপাণ্ডিত্য, শারীরিক শক্তি অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক নিপুণতার উপরই বেশী নির্ভর করে, এই একটা সিদ্ধান্ত ইউরোপে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই রণপাণ্ডিত্যের সহায়তা করিবার জন্য, ইংলণ্ডে ষ্টাফ্ কলেজের (Staff College) সৃষ্টি। কিন্তু গত বোয়ার সমরে এই ষ্টাফ্ কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ও বিশিষ্ট গৌরবান্বিত ছাত্রেরা, অসভ্য বোয়ারের সঠিক নিশানায় যেরূপ বেঠিক এবং ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত না থাকিতে পারে। লর্ড রবার্টস্ এবং লর্ড কিচ্‌নার প্রভৃতি যাঁহারা

প্রভৃতি যাঁহারা টাক্ কলেজের বড় ধার ধারেন না, তাঁহারাই বোয়ারদিগের অব্যর্থ সন্ধানে তিষ্ঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই প্রকার দেখিয়া শুনিয়া নাইনটিন্থ্ চেনচুরী লেখক বলিতেছেন—"In view of these examples and many more which are less fami liar it is not to be wondered at that thoughtful men begin to question the efficacy of education altogether."

কেহ যেন মনে না করেন যে উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাশিক্ষার নিন্দা করা হইয়াছে। যে বিদ্যা পুস্তকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, যে শিক্ষায় চিন্তা পরিচালিত না হয়, যে শিক্ষা ওজন না করিয়া দেওয়া এবং ওজন না করিয়া লওয়া হয়, কেবলমাত্র তাহারই কথা বলা হইতেছে। বিদ্বান্ ও জ্ঞানী এক কথা নহে। বিদ্যা পরিপাক না হইলে, কেবল পীড়া উৎপাদন করে। তাই গেটে (Gœthe) বলিয়াছেন যে "the greater the knowledge the greater the doubt." পুস্তক-কীটেরা হ্যাজ্লিটের (Hazlitt) বাক্য সপ্রমাণ করিয়া দেয়—"the most learned are the most narrow-minded"—যে পাণ্ডিত্য সত্যের পথ দেখাইতে অক্ষম এবং কার্য্যের পরিসর উন্মুখ না করিয়া, আপনাতেই অসাড় নির্জীবভাবে আবদ্ধ থাকে, সে বিদ্যাশিক্ষা নিতান্তই নিষ্ফল সন্দেহ নাই। আজকাল বিলাতের দুই প্রধান কর্ম্মঠ রাজনীতিজ্ঞ, চেম্বারলেন্ ও লর্ড ক্রোমার (Lord Cromer) বিশেষ পণ্ডিত বলিয়া প্রখ্যাত নহেন। তাঁহারা দিনরাত্র নাক মুখ গুঁজিয়া পুস্তকের মধ্যে পড়িয়া থাকেন না এবং নিজপক্ষ সমর্থনের জন্য পুস্তক বা পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করেন না। গ্লাডষ্টোন্ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অনেক সময় কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটাইত। তিনি সকল সময় প্রত্যেক প্রশ্নের দুই দিক দেখিতে গিয়া, কার্য্যসূত্রের খেই হারাইয়া ফেলিতেন—"Mr. Gladstone's unwieldy store of book knowledge was a millstone round his neck." তাই বেকন বলিয়াছেন—"It is not so important to know what might be said as what ought to be done.". সংসারে যাঁহারা কৃতী বলিয়া প্রতিপন্ন, তাঁহারা প্রায়ই পাণ্ডিত্যবিবর্জ্জিত। "The two greatest statesmen of modern times, Bismarck and Abraham Lincoln might be called uncultured"। ইংরেজ রাজত্বে অমার্জ্জিত অষ্টম হেনরী, এলিজাবেথ এবং ক্রমওয়েল দেশের ,বক্ষ

কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শতাংশের একাংশও প্রথম জেমস্ ("the wisest fool in Christendom") কিম্বা দ্বিতীয় চার্লস্ ("who never said a foolish thing and never did a wise one), করিয়া যাইতে পারেন নাই। যাঁহারা পলিটিক্যাল্ ইকনমির (Political Economy) কূটকচলে প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত, কার্য্যকালে তাঁহারা প্রায়ই বিপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কবডেন্ (Mr. Cobden) দেউলিয়া হইয়া গেলেন এবং Ricardo) দালালী না করিলে অন্নাভাবে মারা যাইতেন ; তাই কেহ কেহ এখনও বলিয়া থাকেন "It is strange how few business men of the first rank have a good word to say of political economy."—অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে, কারনেজীর (Andrew Carnegi) উপদেশ বাক্য যে বিশেষ ফলপ্রদ সে বিষয় সন্দেহ নাই ;—"Start young and broom in hand."

আমাদের দেশের মত বিলাতে শিক্ষা সঙ্কীর্ণ-পরিসর নহে ; কুলি, দরোয়ান, গাড়োয়ান, মুটেমজুর পর্য্যন্ত লেখা পড়া জানে ; গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী ; খুব ভাল পুস্তকও চারি পাঁচ আনায় পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেক গৃহে দুচারিটা কেতাবের আল্‌মারি বা বুকসেল্‌ফও বিদ্যমান।—শিক্ষার এ প্রকার বিস্তারেও জ্ঞান, বিবেচনা, বুদ্ধি, নীতি বাড়িয়া যায় নাই। বিলাতের লোক একটা না একটা দলভুক্ত ; কিন্তু যদি তথাকথিত কোন শিক্ষিত ইংরেজকে জিজ্ঞাসা কর, "ও বাপু, তুমি যে Little Englander বা Imperialist ইহার কারণ বলিতে পার" তাহা হইলে সে কিছুক্ষণ হতাশভাবে তাকাইয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া নিরুত্তর হইবে —বক্তৃতার নিয়ত নিনাদে এবং সংবাদ পত্রাদির জয় ঢাকের গোলমালে, তাহাদের মস্তিষ্কে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে এবং চিন্তাবিহীন অতিরিক্ত অধ্যয়নে বিবেচনাশক্তি এমন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা যে নিজে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের পথ বা কর্ত্তব্য আবিষ্কার করিয়া লইবে তাহার আর যো নাই। বিলাতেও সাধারণ শিক্ষিত লোক (average-man) আমোদের জন্য পড়িয়া থাকে, জ্ঞানলাভের জন্য নহে সুতরাং ইংরেজ সংবাদপত্র খুন, ব্যভিচারে অতিরঞ্জিত এবং মাসিকপত্রগুলি পাপময় আসক্তির কলঙ্কময় চিত্রে লোকের মন দূষিত করিয়া থাকে ; বিলাতী সাধারণ শিক্ষিত সমাজে, ভাল জিনিষের আদর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। থিয়েটারের অবস্থাও শোচনীয় ; একখানি ভাল নাটক অভিনীত হইলে লোকে অধীর হইয়া পড়ে

এবং উচ্চদরের সঙ্গীতও ভালবাসে না ; হাসির গানেরই ভাঁড়ামিরই বেশী আদর ; এই সম্পর্কে নাইটিন্‌থ্‌ সেন্‌চুরীর প্রবন্ধ হ'তে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ;

"The average man reads not for information but for amusement. Divorces, murders &c. are the most popular items Inspite of the universal education of the people, the stage is steadily degenerating. The masses are no longer able to follow a drama, notwithstanding universal education and can only concentrate their minds sufficiently to follow performance of the scraps style, composed of comic songs, ballets and buffoonery.—The brain of the people has evidently not been sharpened but been dulled and softened by too much reading. Whatever the gospel may be, if there is money enough to drum it loudly and continuously into the public the puhlic is sure to adopt it."

ব্রিটিশ রাজ্যে, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে সত্যের প্রতি যে আদর বা অনাদর ছিল, সর্ব্বাধিগম্য শিক্ষার বিস্তারে তাহার তারতম্য হয় নাই। জন্‌সনের (Dr. Johnson) সময়, যে প্রকার মিথ্যা কথা মিথ্যা লেখা প্রচলিত ছিল আজ দেড় শত বৎসরের শিক্ষা-বাহুল্যে তাহা দূর করিতে পারে নাই। স্পেন্‌সার তাহার অমূল্য গ্রন্থে (p. 62 Facts and Comments) বিলাতে অসত্য প্রচারের কথা এইরূপ বলিতেছেন :—

"A centnry and a half seems to have made little difference. Day by day the reports of the South African War have been full of fictions, exaggerations, garblings ; much has been *falsified* much *suppressed.*"

ভারতের শিক্ষাপ্রণালী যে ছাঁচে ঢালা হইয়াছে এবং এখনও পর্য্যন্ত সেই ছাঁচে সুশ্লিষ্ট রাখিবার জন্য যে প্রকার বিপুল চেষ্টা চলিতেছে তাহা একেবারে ইংরেজী, এবং উহা ইংরেজের দেশেও সুফল প্রসব করে নাই ও করিতেছে না। আবার ইংরেজ ও হিন্দুতে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে, যে একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই এবং ফলাফল বিবেচনা না করিয়া দুর্ব্বল বিলাতী অনুকরণে আমাদের জাতিটাকে "বিলাতী বাঁদরে" পরিণত করিতে প্রয়াসী হই, এবং কার্য্যকালে, বুঝিয়া সুঝিয়াও, একটা সমীচীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কথা—"That civilization ought to be carried on its original line of civilization" কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই না।

একটু অনুধাবন করিলেই দৃষ্ট হইবে, বিলাতী শিক্ষা সভ্যতার নকল করিতে গিয়া আমাদের গতিটা, সম্মুখ দিকে না হইয়া ক্রমেই পিছন দিকেই হইতেছে ; এই পঞ্চাশ বৎসরে ইংরেজি স্কুল কলেজের বাহুল্যে, উপাধিধারী এবং পাঠার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা দেশের, নিজের বা পরিবারবর্গের

বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছে না। মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোকের" অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। প্রচলিত শিক্ষার গুণে বিলাস বাসনা বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। যে একপাত্তা ইংরাজী পড়িয়াছে, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা ছাড়া, সে সর্ব্বপ্রকার কায়িক পরিশ্রম ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিতেছে। ভদ্রলোকের আয় গড়পড়তা ২৫।৩০, টাকার উর্দ্ধ হইবে না। এই আয়ের ভিতর ৩.৪টা ছেলে মেয়ে মানুষ করিতে হইবে, মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। এদিকে ইংরেজি শিক্ষার খরচও যথেষ্ট। তার উপর এই উত্তপ্ত প্রদেশে বেলা সাড়ে দশটা হতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত, বিদ্যালয়ে, ছেলেদের, বন্দী কয়েদীর মত আবদ্ধ থাকিতে হয়, এবং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বাৎসরিক ষাণ্মাসিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। শরীর যাক, স্বাস্থ্য যাক, বুদ্ধি যাক, স্কুলের শিক্ষক হতে গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণী পর্য্যন্ত ছেলেকে কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, কেবল "পড়্ পড়্ পড়্;" যেন পরীক্ষাফলের উপরই আমাদের এই ঘোর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই নিয়ত নিনাদিত "পড় পড় পড়" তাড়নে ছেলেরা বাস্তবিকই মাটীতে একেবারে গুঁড়াইয়া পড়িয়া যাইতেছে। দেশের স্বার্থহীনতা, ম্যালেরিয়া প্লেগ-পীড়ার প্রকোপের সহিত রামায়ণ মহা-ভারত বর্জ্জিত ইংরেজী পুস্তকের গুরুভার আরও গুরুতর হইতেছে। যেন একটা অন্ধ বিশ্বাস পুস্তক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জ্ঞান, চিন্তাশীলতা এমাত ফুটি। উঠিবে। যতদিন প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলে উপাধি লাভ-লালসা আমাদের দেশ হইতে নিষ্কাসিত না হইবে ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই এ বিষয় একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"We all know the feeling of intellectual relief after an examination. * * * An examination for most pupils is nothing but permission to forget. A diploma is often permission to become ignorant again" (Guyau's Education and Heredity p. 172).

যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারে প্রবৃত্ত না হইয়া, লর্ড কর্জ্জন এগুলিকে সমূলে বিনাশ করিতেন তাহা হইলেও বড় বেশী অমঙ্গল হইত এমন বোধ হয় না।

দেশের দশজন উপযুক্তরূপ শিক্ষিত হইলে যে উপকার মঙ্গল ও সুখ হয় তাহা হাজার জন অর্দ্ধশিক্ষিতের দ্বারা কখনই হইতে পারে না। একা রামমোহন রায় স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকার প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, একা

বিদ্যাসাগর দেশের যে কল্যাণ বিধান করিয়া গিয়াছেন, একা ভূদেব দেশীয় শিক্ষিত লোকের মতিগতি যে সুপথে চালিত করিয়া গিয়াছেন, একা বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যের যে উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, এক রামতনু বা প্যারিচরণ ছাত্রগণের যে কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দশ হাজার অর্দ্ধ-শিক্ষিতের সম্মিলিত শক্তিতে হইতে পারিত না। আমাদের উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে কতদূর নির্জ্জীব ও অসাড়, তাঁহাদের রীতি নীতি ও এমন নিম্নস্তরে গা ঢালিয়া দিয়াছে যে "পাশব অত্যাচারের" কালিমাময় কাহিনী না থাকিলে সংবাদপত্র বিকায় না; থিয়েটারে গণিকার হাবভাব নাচগান না থাকিলে লোক হয় না। যে সুমধুর সুপবিত্র যাত্রা ধর্ম্মকাহিনী সংযুক্ত হইয়া এক হাজার দেড় হাজার লোককে অতি সামান্য খরচে বা এক রকম বে-খরচায় আমোদ আনন্দ বিতরণ করিত সেই যাত্রার আদর তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এখন বিভ্রমবিলাস বারাঙ্গনাসমাকুল থিয়েটার মুজরা মাফল বাগানপাটি পাইলে, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ, আজকালকার—কেলুয়াভুলুয়া বার্জ্জিত সুমার্জ্জিত সুমধুর তানলয় ঝঙ্কারিত যাত্রা শুনিতে বিশেষ উৎসুক নহেন।

আগে ভাইএ ভাইএ বিবাদের কথা শুনা যাইত; ইংরেজী শিক্ষার মহীয়সী শক্তির গুণে এখন মা ছেলেতে বিবাদ সুরু হইয়াছে। এখন তথা কথিত শিক্ষিত সমাজ তথাকথিত শিক্ষিতা স্ত্রী লইয়া বেহাতী ও ব্যতিব্যস্ত; জননীর স্নেহের উপর নজর করিবার আর অবসর নাই। আর যদি সত্যনিষ্ঠার কথা বল উহা এখন মুমূর্ষু অবস্থায় গঙ্গালাভের প্রতীক্ষা করিতেছে।

দেশ-কাল পাত্র উপেক্ষা করিয়া শিক্ষার অনিয়মিত সম্প্রসারণ ক্ষতিজনক ইহা বহুদর্শন—হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য। চামার, চণ্ডাল, তেলী তামিলা, ধোপা, ছুতোর, কামার, চাষা, সোণারবেনে, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকলেই একই স্কুল কলেজে, এক বিষয় একই রসায়ন বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ শেলী-ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পড়িবে, এই যে একটা চলিত কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—এই চপল সিদ্ধান্তটী দেশের সুখস্বাস্থ্য বিধায়ক নহে বরং সমূহ আশঙ্কাজনক, একটু তলিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। অধিকারভেদে শিক্ষাভেদ ইহা হিন্দুদিগের আপ্ত-বাক্য। যাহাদের নৈতিক বল কম, তাহাদের বুদ্ধির তেজ প্রখর করিয়া দিলে সমাজের পক্ষে অশুভ। ইহা অবিদিত নহে সাধারণ জনগণের চিত্তে দেবভাবের অপেক্ষা পাশব প্রবৃত্তির প্রভাব প্রবলতর। এই

শয়তানের ভাব যাহাতে কম হয়, তাহা না করিয়া যদি কথঞ্চিৎ লেখা পড়াও শেখান যায় (যাহাকে ইংরাজিতে three R's.— reading, writing, arithmetic বলে) তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনেক সময় অনিষ্ট হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সুকুমার ভাববেশী বুদ্ধি কম, ভবিষ্যতের দৃষ্টি ক্ষীণ, সুতরাং নৈতিক বলও কম; সুতরাং আমাদের দেশের স্ত্রীলোককে রামায়ণ মহাভারত না পড়িতে দিয়া সুকুমার ভাবগুলির পরিবর্দ্ধন না করিয়া যদি পূর্ব্বোক্তই Mill গণিত, কিম্বা "অমিয় নিমাই চরিত" না পড়িতে দিয়া "কৃষ্ণচরিত বা গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র পড়ান হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের দয়া দাক্ষিণ্য তিরোহিত হইয়া ক্রমে তৎস্থানে ফাজলুমি, জ্যাঠামি, তাচ্ছল্য, ঔদাস্য, বিলাস আসিয়া অধিকার করিবে; এই সব কথাগুলি হিন্দুর আপ্ত বাক্য হইলেও ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্গে ইংরেজি নজির সমর্থিত না হইলে গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং এস্থলে বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি উদ্ধৃত [illegible]ল—

"Unquestionably, in average human beings the lower emotions are more powerful than the higher. Hence education, adding to the force of all the emotions, increases the relative predominance of the lower, and the restraints which the higher impose are more apt to be broken through. There is a greater liability to social perturbations and disasters— * * * Beyond all doubt, the growth of intellectualization in advance of moralization has done enormous mischief." Vide Herbert Spencer's "*Facts and Comments*" p. 66.

শিক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হইলেই জাতিবিশেষের উন্নতি হাউই বা ফানুসের মতন ঊর্দ্ধগামী হয় না। শিক্ষা সঙ্কীর্ণবৃত্তে ভ্রাম্যমান হইলেও, যদি উহা জন কয়েক মানুষের মতন মানুষ তৈয়ারি করিতে পারে; যদি জন কয়েকেরও, চিন্তা জ্ঞান ভক্তি, একাগ্র এবং ঘনীভূত করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল। গৃহে কতকগুলি অসাড় নিস্তেজ লোক ক্ষীণ নাড়ী লইয়া ধুক্ ধুক্ করিলে, তাহারা যেমন গৃহস্বামীর কোন উপকারেই লাগে না বরং তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে এবং পাড়াপড়শীরও কোন কাজে আইসে না, তেমনি অর্দ্ধ শিক্ষিত, বহুসংখ্যক হইলেও দেশের কোন মঙ্গল বা সুখ বিধান করিতে পারে না। তাই মনসুর গাইও বলিতেছেন—

"There is great importance of the correlation between intensity of life and its expansion towards others," Education and Heredity (contemporary Science Series) p. 181.

• ভাবে ভাবে ঘনীভূত ভক্তিতে ভক্তিতে দ্রবীভূত চৈতন্য হাজার হাজার

পবিত্রের মর্ম্ম স্পর্শ ও উদ্ধার করিলেন ; আর আজ সহস্র ক্ষীণভক্তি বৈষ্ণব ক্ষীণ শক্তি হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন।

বিশিষ্ট প্রতিভাশালী অধ্যাপকের গুণেই অধুনা জার্ম্মানী সভ্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জার্ম্মানীর প্রধান যোদ্ধা ও সেনাপতি মলটকে (Moltke) সামরিক ছাত্রগণকে রণ বিদ্যায় শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপক সক্রেটিস (Socrates) এবং পাইথাগোরাসের (Pythagoras) অধ্যাপনার গুণে প্লেটো (Plato) এবং প্লেটোর শিক্ষা ফলে এরিস্টটল (Aristotle)। ফ্রেড্রিক (Fredrick the Great), নেপোলিয়ন এবং নেলসন্ তাহাদিগের সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে শিক্ষা দিতেন। আবার লিবেগের (Liebeg) শিক্ষাগুণে জার্ম্মানীর রসায়নবিদ্যা, এবং সিমিন্সের (Siemens) পাণ্ডিত্যফলে তাড়িৎবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক জগতে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—

"Men of great ability are raised not by the superficial education of the many but by the intensive culture of the few and Germany's successes in science and industry are traceable to the intensive, not to the extensive education that has been provided by her."

আমাদের দেশের প্রধান অভাব ভাল শিক্ষকের। বিলাত হইতে যাঁহারা কলেজের অধ্যাপক মনোনীত হইয়া এখানে আসেন, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য যৎসামান্য। পাইওনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশ, এখানকার ইংরেজী-অধ্যাপকেরা ইটন, রগবি, হ্যারো (Eton, Rugby and Harrow) স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা দ্বিতীয় শিক্ষক হইতেও নিকৃষ্টতম। আমাদের দেশের যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা প্রায়ই অধ্যাপনে নিযুক্ত নহেন। এমন অবস্থায়, আমাদের শিক্ষার, ফল যে নিতান্ত শোচনীয় হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি।

আমরা চাই স্বার্থত্যাগী হৃদয়বান পণ্ডিত সন্ন্যাসী শিক্ষক সমিতি, যাঁহারা, সাহিত্যের সৌন্দর্য্যময় ব্যাখ্যায় এবং সঙ্গীতময় আবৃত্তিতে, ছাত্রগণের হৃদয় ভগবানের শোভাবৈভবে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন ; যাঁহারা বিজ্ঞানের জীবন্ত উপদেশে, ছাত্রগণের চিন্তা ও জ্ঞান উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইবেন ; যাঁহারা নিজের ত্যাগগৌরবান্বিতশক্তিপূর্ণ চরিত্রমাহাত্ম্যে ছাত্রগণের চিত্ত তেজ শক্তি সত্যনিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের দেশের শুভার্থিগণের আন্তরিক প্রার্থনা যদি এই দিকে চালিত হয়, তাহা হইলে সরস্বতী সুপ্রসন্না হইবেন, নচেৎ নহে।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

মাঘ, ১৩০৯।

১লা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী। 'ষ্টেট্ অব কলম্বিয়া' পত্রের সম্পাদক সাউথ কারোলিনা লেফ্‌টনাণ্ট গভর্ণর কর্ত্তৃক গুলি দ্বারা হত হন।...সস্ত্রীক ডিউক অব কনট চাকধারা পরিদর্শন করেন।

৩রা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী। জর্ম্মণ জাহাজ 'পান্থর' ভিনজুইলার সানকার্লোর দুর্গোপরি ভীষণ গোলাবর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু পরাজিত হয়।

৫ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী। মার্কনি টেলিগ্রাফ দ্বারা ভারত সম্রাট এডবার্ড এবং আমেরিকা-প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টে স্ব স্ব সাম্রাজ্য স্থান হইতে বার্ত্তা প্রেরণ করেন।

৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী। মরক্কোর সুলতানের সহিত ফেজনগরের সন্নিহিত গ্রামবাসীগণের যুদ্ধ হয় কিন্তু বিদ্রোহীগণ পরাজিত হয়।...মিঃ রালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলার নিযুক্ত হন।...জর্ম্মণ জাহাজ 'পান্থর' পুনর্ব্বার সানকার্লোর দুর্গ আক্রমণ করে।

৭ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী। দিল্লীর দরবার হইতে লর্ডকর্জ্জন কলিকাতায় আগমন করেন।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী। ভারত সেনাপতি লর্ড কিচনার কলিকাতায় আগমন করেন।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী। বড়লাট বাহাদুরের আবাসভবন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী লর্ড ওয়েলেসলী কর্ত্তৃক নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় ১৯০৩ সালে উহার শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে "শত বার্ষিকী নাচ" হয়।

১৩ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী। সপ্তম এডয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে কলিকাতায় মহোৎসব হয়।

১৫ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী। কাউণ্ট বলষ্ট্রেম পুনরায় জর্ম্মণ মন্ত্রী মন্ত্রীসভার সভাপতি হইতে নির্ব্বাচিত হন।...সুলতানের সৈন্য মরক্কো সিংহাসনের মিথ্যা দাবীকারীর সৈন্যকে পরাজিত করে। এবং অনেক বন্দী ও হত করে।

১৬ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী। বড় লাট লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক নূতন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হয়।...ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কয়েকটী নূতন বিলের প্রস্তাব হয়।

১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী। ইন্দোরের হোলকার নরপতি রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় শারীরিক অসুস্থতা তাঁহার রাজ্য ত্যাগের কারণ। তাঁহার দত্তক-পুত্র বালাসাহেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী। পারস্যের সাহকে অর্ডার অব দি গার্টার উপাধিতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত করা হয়।...সম্রাট ৭ম এডবার্ডের পীড়ার সংবাদ আসে।

২০শে মাঘ, ৩রা ফেব্রুয়ারী। রুসিয়া ও পারস্য বাণিজ্য সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হয়। ইহাতে পারস্যে আমদানী ও রপ্তানীর শুল্ক সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন বন্দোবস্ত হয়।

২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। ভিন জুইলায় পুনঃ বিদ্রোহ হইবার সূচনা হয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। আমাত গুরার নিকটে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হয় এবং বন্দী হয়।

২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী। মিঃ সিসিল আর্থর স্প্রিংরাইস রুসিয়ায় ইংরাজের দৌতকার্য্যে নিযুক্ত হন।...সম্রাটের পীড়ার আরোগ্য সংবাদ পাওয়া যায়।

২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।...আর্ল পার্সি ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী। বর্দ্ধমান মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী। সাক্‌সনীর ক্রাউন প্রিন্স ব্যভিচার দোষে পত্নীকে ডাইভোর্স করিয়াছেন।

২৮শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী। ভালেনা নগরে অশান্তির আশঙ্কা অনুভূত হয়। বলগেরিয়া ও তুরস্ক সৈন্যে যুদ্ধ হয়।

কলিকাতা ২০নং হাবাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ভবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড। চৈত্র, ১৩০৯। ২য় সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, চৈত্র, ১৩০৯ সাল। [২য় সংখ্যা।

গীতার আবিষ্কার।

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কচ্ছে দিবারাতি
বল্‌ছে মোরা ভণ্ড ভীরু মিথ্যাবাদী জাতি,
হতাশভাবে তপ্তাপোষে পড়লাম গিয়ে শুয়ে
দুইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত দুয়ে,
ভাবছি এটার মুখের মত জবার দেবো কি তা
ঠেকলো হাত এক বইয়ের উপর তুলে দেখি গীতা
ওমা! তুলে দেখি গীতা।

লাফিয়ে উঠলাম তপ্তার উপর মাটামভাবে-সোজা
ছটকে পড়্‌ল মাথাথেকে অপমানের বোঝা,
নিন্দা যদি কর এবার কর্ব্ব কি তা জানি
অমনি চাঁদের চোখের উপর ধর্ব্ব গীতাখানি,
এখন বটে অপমানটা—কচ্ছে সবাই বড়
তবু একবার চন্দ্রবদন গীতাখানি পড়
একবার গীতাখানি পড়।

সকালবেলায় আপিষ গিয়ে গাধার মত খাটি
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দুখানি চাটি,
বাসায় ফিরি—বন্ধুবর্গ জড় হলে' খালি
যাঁদের অন্নে ভরণ পোষণ তাঁদের পাড়ি গালি,

একা যখন—(হায়রে গলায় জোটে নাও দড়ি)
তপ্তাপোষের উপর বোসে কোসে গীতা পড়ি
ওগো কোসে গীতা পড়ি।

দেখি যদি গৌরমূর্ত্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে ওগো বাবা বলে ডাকি,
ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে—যেন বাঘে খেলে—
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে
কোনরূপে বাড়ী পঁউছে ঘরে দিয়ে চাবি
মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি
তখন গীতার কথা ভাবি।

গীতার জোরে সচ্ছে ঘুষি সচ্ছে কান্‌টিটে
গীতার জোরে পেটে না খাই সয়ে যাচ্ছে পীঠে,
করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যা মকদ্দমা,
সয়ে যাবে—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা;
গীতার মত নাইক শাস্ত্র—গীতার পুণ্যে বাঁচি,
বেঁচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় মরে' আছি
বাবা গীতায় মরে আছি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

রাজা বল্লাল সেন।

(প্রথম প্রস্তাব)

সুবিখ্যাত আদিশূর, লক্ষ্মণ সেন এবং বল্লালসেন এই হিন্দু নরপতিত্রয়ের সহিত বঙ্গদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বোধ হয় অন্য কোনও হিন্দু নরপতির সহিত তাহার অর্দ্ধেকও নাই। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানগণ, রাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা দলপতি রায়, রাজা ঘনশ্যাম পাল, রাজা বসন্ত রায় প্রভৃতির নাম বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু আদিশূর, লক্ষ্মণসেন অথবা বল্লালসেনের নাম কখনই ভুলিবার নহে। বঙ্গদেশের ইতিহাস হইতে এই তিনজনের নাম অন্তর্হিত করিলে, বাঙ্গালার ইতিহাসের অর্দ্ধেকটা

উড়িয়া যায়। বঙ্গে শূর বংশ বা সেন বংশের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে আদৌ ব্রাহ্মণ ছিল না, একথা বিবেকবিহীন প্রলাপীর অভিমত বাক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু তাহা হইলেও পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে আদিশূরই সর্ব্ব প্রথমে নূতন ও স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন। আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশে হিন্দু সমাজ ছিল এবং হিন্দুসমাজশিরোমণি ব্রাহ্মণদিগের বসতিও ছিল, কিন্তু নানা কারণে আদিশূর পশ্চিম প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ আনাইয়া এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ও সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বঙ্গের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের ইহাঁরাই পূর্ব্বপুরুষ; বৈদিক অথবা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের আদি নিবাসী। আদিশূরের শাসনকালের পূর্ব্বে বঙ্গে ব্রাহ্মণ-বসতি ছিল না এবং আদিশূরই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালী জাতিকে ব্রাহ্মণের মুখ দেখাইয়াছিলেন, এই ধারণা ভ্রমাত্মিকা; ব্রাহ্মণ ছিল না বলিলেই স্বীকার করিতে হয় আদিশূরের পূর্ব্বে এদেশে হিন্দুসমাজ ছিল না!! কারণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব. বর্ত্তমান প্রবন্ধভুক্ত প্রসঙ্গ সমূহের সহিত আদিশূরের সম্পর্ক খুব কম, এজন্য এই অবান্তর কথার প্রমাণ সহ উল্লেখ করা গেল না। রাজা লক্ষ্মণসেন বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন; রাজা লক্ষ্মণ অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহারই শাসন সময়ে এদেশে যবন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সহজ বিশ্বাসী এবং সরল প্রকৃতিক ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের কথায় বিনা যুদ্ধে পাঠানকে বাঙ্গালা দেশ অর্পণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই কথার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননা করিয়া থাকেন। রাজা বল্লাল সেন, এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রধান কৈন্দ্রিক মূর্ত্তি (Central Figure), সুতরাং বল্লালের প্রকৃতি ও চরিত্র বর্ণনা করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বল্লাল সেন বঙ্গ দেশীয় হিন্দুর জাতিভেদ প্রথার বিশ্লেষণ করিয়া কৌলীন্য ও মৌলিকা প্রথার প্রবর্ত্তন করেন; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের এই কৌলীন্য প্রথা বাঙ্গালার ঘোরতর অবনতির মূলীভূত কারণ। কৌলীন্য প্রথার পক্ষসমর্থনকারীরা যতই ইহার প্রশংসা করুন—ইহার উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য যতই প্রমাণ, তর্ক বা বিতর্ক উত্থাপন করুন—এই প্রথা যে অতীব অনিষ্টকর, ইহা ধ্রুব সত্য। বাঙ্গালায় বহুবিবাহের ইহাই মূল; ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের দরিদ্রতা, অকালে অল্পবয়স্ক বালিকাদিগের বৈধব্য দশা, স্ত্রীজাতির মধ্যে ঘোরতর

ক্লেশ ও অসুবিধা, অসমঞ্জস বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, অসাময়িক বিবাহ, উচ্চ বংশের লোপ, অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যভিচার, গার্হস্থ বিবাদ, প্রভৃতির ইহাই মূলীভূত কারণ।—রাজা বল্লাল সেন আদিশূরের পৌত্র এবং লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন, তিনি এক সময়ে আমাদের দেশের রাজা ছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই রাজার প্রকৃতি, স্বভাব ও চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে; সেই আকাঙ্ক্ষার কিয়ৎ পরিমাণে পরিতৃপ্ত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে আমি যে সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই—(১) বল্লাল সেনের ধর্ম্ম (২) বল্লালের জাতি (৩) তাঁহার বাসস্থান (৪) তাঁহা কর্ত্তৃক কৌলীন্য ও মৌলিক্য প্রথার প্রবর্ত্তনের কারণ (৪) বহুসংখ্যক হিন্দু জাতির প্রতি বল্লালের ব্যবহার এবং (৬) বল্লালের প্রকৃতি, স্বভাব ও নৈতিক চরিত্র। "সত্যং পরং ধীমহি" ইহাই আমাদের অবলম্বন; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। সুতরাং প্রত্যেক সত্যসম্ভূত প্রমাণ অতি সাবধানতার সহিত আমি প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি; যাহা অসত্য বা অপ্রামাণিক তাহার আদৌ আশ্রয় অবলম্বন করি নাই।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অন্ধকারপূর্ণ অনমুসন্ধেয় গর্ভে নিহিত, সুতরাং বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রম স্বীকার না করিলে ঐতিহাসিক সত্যের সহজে আবিষ্কার করা যায় না। বল্লাল সেন নিজে তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়া যান নাই সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকদিগের গ্রন্থ, রচনাবলী, শ্লোকসংগ্রহ (Anthology), জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কিম্বদন্তী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের আবিষ্কৃত অনুশাসন পত্র প্রস্তরফলক প্রভৃতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য। বল্লালের জীবিতকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে যে সকল পণ্ডিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত জীবন-কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই— ১) পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত্র" (২) শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট বিরচিত "বল্লাল চরিতম্" (৩) শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট রচিত বল্লাল চরিতের পরিশিষ্ট (৪) শ্রীমৎ গোপাত ভট্ট রচিত বল্লালকাহিনী (৫) কলিকাতায় চিনেবাজারের নাথবাবুদিগের কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিত, এবং

(৬) শরণ দত্ত রচিত "বল্লাল চরিত্রম্"। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বিভূতি মহাশয় তাঁহার "সুবর্ণ বণিক" নামক পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আসিয়াটিক্ সোসাইটি ও সংস্কৃত কলেজে যে দুইখানি হস্তলিপি গ্রন্থ ছিল তাহা এক্ষণে আর তথায় নাই"। ঢাকা কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক (বেদানুবাদক) পণ্ডিত রমানাথ ঘোষ, সরস্বতী, এম, এ, পূর্ব্ববঙ্গে গোপতি ভট্ট কৃত বল্লাল চরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাবু নিমাইচাঁদ শীল এবং (তাঁহার ভগিনীপতি) সুবিখ্যাত রেভরেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়গণ "বল্লাল চরিত" হইতে অনেক প্রমাণ তাঁহাদিগের "সুবর্ণ বণিক জাতির ইতিবৃত্ত" নামক প্রখ্যাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। শরণ দত্ত বল্লাল সেনের সমসাময়িক ছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ তাঁহার প্রকাশিত "আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত" পুস্তকের ইংরাজি ভূমিকায় লিখিয়াছেন "Saran Datta, the author of the treatise entitled Vallal Charita, was a contemporary of Vallal. That Saran was a contemporary of Vallal Sen appears from the third verse of Jaidev's immortal lyrics, Gita Govinda, in which verse five great poets are mentioned, namely, Jaidev, Umapati, Govardhana, Dhoyi and Saran. We also know Saran from an Anthology by Batu Dass, the son of a general of Laksman Sen, written in 1205 A. C." "শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত সম্বন্ধে শাস্ত্রি মহাশয় লিখিয়াছেন "All these facts show conclusively that the materials used by Ananda Bhatta were contemporary with the Sen dynasty. His book is a historical record of the leading events of Vallal's reign." এতদ্ভিন্ন যদুনন্দন কৃত "মূল চাকুর" এবং "বৈদ্যকুলজী" গ্রন্থদ্বয়েও বল্লাল সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে, সুতরাং আমরা এই কয়েকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বল্লালের বংশ ও চরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেছি।

বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, এতগুলি প্রাচীন ও প্রখ্যাত গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতেও, বল্লালের ধর্ম্ম, বর্ণ এবং জন্মস্থান সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে সন্দিহান। তিনি প্রকৃতরূপে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি হিন্দুজাতির মধ্যে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার আদি নিবাস কোথায় ছিল, ইহা

লইয়া বঙ্গদেশের লেখকসমাজে প্রভূত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার সুস্পষ্ট মীমাংসা হয় নাই। বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, পণ্ডিত গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রণীত এবং ডাক্তার রামদাস সেন কর্ত্তৃক সমালোচিত "লঘুভারত অথবা কল্পীতিহাস" গ্রন্থে উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহুল তর্ক ও প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বল্লাল সেন বৈদ্য ছিলেন; ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেনবংশকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানকালের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বল্লালকে কায়স্থজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বল্লালের প্রকৃত বর্ণ কি তাহা নিরাকরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্ম কি ছিল তাহা জানা আবশ্যক। এই জন্য রাজা বল্লাল সেনের ধর্ম্ম লইয়াই প্রথমে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। কেহ কেহ বলেন, বল্লাল বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন; কেহ কেহ বলিয়াছেন, বল্লাল প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শেষে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তর্কের কথায় সময় নষ্ট না করিয়া, আমরা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, আমরা তৃতীয় মতের পারপোষক; আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, রাজা বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই প্রবন্ধ আদ্যন্ত পাঠ করিলে এ কথার অনেক প্রমাণ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধানাধ্যাপক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ, মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত "শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিত" গ্রন্থের ইংরাজি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—Bhatta pada, a learned Hindoo Ascetic—well known as Bhatta Sinha Giri—was the author of the Vyasa Purna which is reproduced *in extenso* by Ananda Bhatta. It was Bhatta Sinha Giri who converted Vallal to Saivaism. অর্থাৎ ভট্ট সিংহ গিরি নামে জনৈক সদ্বিদ্বান সন্ন্যাসী, রাজা বল্লাল কে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অনেকে বৈষ্ণব বা সৌরমত পরিত্যাগ করিয়া শৈব বা তান্ত্রিক হয়েন, একথা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মত উভয়ই হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত; এস্থলে Conversion শব্দ "মতান্তর" নহে, "ধর্ম্মান্তর" অর্থে ইহাকে বুঝিতে হইবে, কারণ সন্ন্যাসীরা বিশেষতঃ বেদান্তবাদী "গিরি" শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকভাবের অনুসন্ধান জন্য আন্দোলন করেন নাই। বাবু মধুসূদন

সরকার ("নব্যভারত", ২০ খণ্ড, ৮ম সংখ্যায়) লিখিয়াছেন "রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় বল্লাল সেনের সভাসদ মধ্যে দুইটি দল ছিল—হিন্দু ও বৌদ্ধ। শূদ্রদিগকে সম্মানিত করায় এবং জাতিভেদ অমান্য করিয়া অতীব নীচ জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করায়, বল্লালকে বৌদ্ধমতাবলম্বী অথবা বৌদ্ধ মত সমর্থক বলিয়াই বোধ হয়।" রাজা বল্লাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, ঐ সময়ে, এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক, বৌদ্ধ মঠ, বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রভৃতির প্রভূত প্রভুত্ব ও প্রভাব বিকীর্ণ ছিল। "The Pal kings favoured Budhism. It was not persecuted by the Sena dynasty. The Budhism which now assumed Hindoo) Tantric phase became greatly honoured and followed by the people of Bengal."—

Traces of Budhism in Bengal.—(A paper published by Government. 9, 9, 1901).

এতদ্ভিন্ন ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বল্লালের চরিত-কাহিনীকারগণ তাঁহার বাল্যজীবনে এমন কোনও কথাই লেখেন নাই, যাহাতে তাঁহাকে প্রকৃষ্ট হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়। ব্রাহ্মণাধ্যাপকেরা লেখনী ধারণ করিয়াই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক, রাজার স্বধর্ম্মপ্রিয়তা, দেবদ্বিজে ভক্তি, পূজা, উপাসনা, দান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, বল্লাল সম্বন্ধে সে সকল কথা কিছুই নাই, বরং যাহা আছে তাহাতে বল্লালকে অহিন্দু (বৌদ্ধ) বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। পরিণামে তিনি পিতার তিরস্কারে এবং সমাজের ভয়ে বহুল কুক্রিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায়। সে সকল কথা পরে বর্ণনা করিব।

এক্ষণে আমরা রাজা বল্লাল সেনের বর্ণাশ্রম লইয়া বিচার করিতে বাসনা করি। পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে তিনি ক্ষত্রিয় অথবা বৈদ্য অথবা কায়স্থ এই তিন জাতির মধ্যে কোনও একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তিনি কায়স্থ বংশসমুদ্ভূত ছিলেন। আমাদের অভিমত সমর্থনার্থ নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ দিলাম। এই প্রমাণ মালায়, তাঁহাকে প্রথমে ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য অপ্রতিপন্ন করিয়া, পরিণামে কায়স্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

১ম প্রমাণ।—মহাপুরাণ, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি

হিন্দুশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের যে সমস্ত উপাধি আছে, তাহা প্রধানতঃ এই—আহবী সামন্ত, শস্ত্রী, ভূমিপঃ, অস্ত্রী, সমরী, কেশরী, বর্ম্মণঃ, সিংহ, লালা, রক্ষী, কিরিটী নায়ক, অধিনায়ক এবং অগ্রণী। পাঠক মহাশয় দেখিলেন, ইহার মধ্যে "সেন" উপাধি কোথাও নাই। আদিশূর সেন, লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন, ইহাঁরা সকলেই "সেন" উপাধিধারী; সেন কখনও ক্ষত্রিয়ের উপাধি ছিল না এবং এখনও নাই। হিন্দুরা প্রথমেই নাম জিজ্ঞাসা করিয়া মানুষের ধর্ম্ম ঠিক করিয়া লয়—যথা, কৈলাসচন্দ্র (হিন্দুর নাম), মইনুদ্দীন (মুসলমানের নাম), উইলিয়ম পিটর (খৃষ্টানের নাম); তাহার পরে উপাধি দ্বারা জাতির পরিচয় হয়—যথা চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের, বসু কায়স্থের ইত্যাদি। এস্থলে সেন উপাধি দ্বারা রাজা বল্লালের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। আমরা পুরাণে কোনও ক্ষত্রিয় রাজার বংশগত "সেন" উপাধি দেখি নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে আদিশূর সেন, শূরবংশ সমুদ্ভূত। "শূর" শব্দ পুংলিঙ্গ, শূর+অন=শূর। ইহার অর্থ বীর, সাহসী, শালবৃক্ষ, সিংহ, সূর্য্য, চিত্রকবৃক্ষ, মসুর ডাউল, ইত্যাদি। শৌর্য্যশালী বা বীর্য্যবান ব্যক্তি মাত্রেই শূর উপাধিলাভের যোগ্য, সুতরাং শূর কোনও ধর্ম্মগত বা জাতিগত উপাধি নহে। বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধঘোষ নামক মৈথিলী ব্রাহ্মণ "শূর" বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম ছিল—শূর, কিন্তু তাহা নাম মাত্র, উপাধি নহে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাশয়েরা শূরবংশের স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু শূরবংশ বলিয়া এদেশে কোনও রাজবংশ ছিল না, সেন ও শূর একই বংশ, ঐ বংশের আদি বলিয়া এবং প্রভূত শৌর্য্যবীর্য্যশালী বলিয়া রাজা আদিত্য সেন (আদিশূরের আদি নাম) আদিশূর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। শূর বা সেন, ক্ষত্রিয় জাতি ব্যঞ্জক উপাধি নহে, ইহা ক্ষত্রিয়ের সাহস বা বীরত্বব্যঞ্জক উপাধি হইতে পারে কিন্তু এতদ্দ্বারা ক্ষত্রিয় বংশের পরিচয় পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কোনও ক্ষত্রিয় গৃহস্থ শূর উপাধিতে আজিও খ্যাত হয় নাই, সুতরাং বল্লাল সেন শূর বংশোৎপন্ন হইলেও ক্ষত্রিয় নহেন।

তৃতীয় প্রমাণ।—কোনও ক্ষত্রিয় রাজবংশে আদিশূর, লক্ষ্মণ সেন বা বল্লাল সেনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। কোনও ক্ষত্রিয়া কন্যাকে বল্লাল বিবাহ করেন নাই। প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে, কোনও স্বজাতীয় রাজার অনুরোধ রক্ষা করিয়া "ভাষ্যপত্র" প্রেরণের সময় তৎসহ

একাধিক দাসী উপঢৌকন স্বরূপে পাঠাইবার নিয়ম ছিল। প্রাচীন লেখকেরা ভাষ্য পত্রের বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজা আদিশূর যখন কনোজের ক্ষত্রিয় রাজার নিকট হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য অনুরোধ করেন, কান্যকুব্জের রাজা তদুত্তরে যে ভাষ্যপত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে দাসী প্রেরণের কোনও কথা নাই! স্বজাতীয় রাজা হইলে এই অনুরোধ রক্ষার সময়ে, কান্যকুব্জাধিপতি ইহা কখনই বিস্মৃত হইতেন না এবং বল্লাল চরিতের প্রণেতাগণ তাহা উহ্য করিতেন না। রাজা আদিশূর যদি ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা হইলে বহুপুরাকালীয় এই সামাজিক সম্মানে বঞ্চিত হইয়া তিনি কখনই নিরস্ত থাকিতেন না। কিন্তু নিরস্ত থাকা দূরে থাকুক, তিনি কান্যকুব্জাধিপতির নিকটে ভূয়ো ভূয়ো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

৪র্থ প্রমাণ।—রাজা আদিশূর, রাজা লক্ষ্মণ সেন ও রাজা বল্লাল সেন এমন কোনও কর্ম্ম করেন নাই যাহাতে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্মান করা যায়, তাঁহাদের ক্রিয়া সমূহ অ-ক্ষত্রিয় জনোচিত বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। পুরাণাদিতে দেখা যায়, যখন যে রাজা হইয়াছে অমনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। উড়িষ্যায় এখনও খণ্ডায়দ নামক কৃষক জাতির প্রাচীন রাজারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজবংশে ক্ষত্রিয় শোণিতের একবিন্দু বর্ত্তমান না থাকিলেও তাঁহার ধন ও প্রভুত্ব জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য!! বিষ্ণুপুরাণে, মৌর্য্য রাজাগণ শূদ্র হইয়াও ক্ষত্রিয়; নীচ শকবংশোদ্ভূত নরপতিবৃন্দ এবং সৌরাষ্ট্রের অধম অন্ত্যজ জাতিও রাজা হইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু এস্থলে "ক্ষত্রিয়" শব্দ জাতিত্ব বাচক নহে, পদব্যঞ্জক মাত্র। বল্লাল সেন ধর্ম্মতঃ, কর্ম্মতঃ এবং জন্মতঃ অ-ক্ষত্রিয়। আবু রায় ও বাবু রায় নামে বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজাদিগের বঙ্গদেশের আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা ছিল না, শূর বা সেন বংশ ক্ষত্রিয় হইল কিরূপে?

৫ম প্রমাণ।—রাজা বল্লাল সেন বৈদ্য বংশসম্ভূত হইলে, নানা শ্রেণীর হিন্দু জাতিকে সম্মানিত করিয়া, নিজের জাতিকে হীনপদস্থ করিয়া যাইতেন কেন? একটা "সেন" উপাধি থাকিলেই "নিশ্চয়ই বৈদ্য জাতির লোক" এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মিকা। যদি অনুস্বর থাকিলেই সংস্কৃত হয় তাহা হইলেই সেন উপাধি থাকিলেই বৈদ্য হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু "সেন" কি অন্যান্য বহুল জাতির উপাধি নহে? বৈদ্য জাতি সম্বন্ধে রাজা বল্লালের ব্যবহার তাঁহার অবৈদ্যত্বেরই পরিচায়ক।

৬ষ্ঠ প্রমাণ।—বঙ্গদেশ ভিন্ন বৈদ্য বলিয়া কোনও হিন্দুজাতির অস্তিত্ব নাই। যেমন ডাক্তার বলিলে, ইংরাজি মতের সর্ব্ব জাতীয় চিকিৎসকে বুঝায়, বৈদ্য বলিলে ভারতের সর্ব্বত্র তাহাই বুঝাইয়া থাকে। মালাবার উপকূলে অতীব অধম এবং অস্পৃশ্য জাতিরাও বৈদ্যের কার্য্য করে এবং অনেক প্রদেশের ব্রাহ্মণেরাও বৈদ্য বলিয়া প্রখ্যাত। আসামের "রাজ বড়ুয়া" নামে ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই বৈদ্যগিরি করিয়া থাকে। ধনেশ মিশ্র (ব্রাহ্মণের) শিষ্য বোপদেব নামক এক পণ্ডিত, বৈদ্যের কর্ম্ম করিতেন—

"বিদ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিষক্কেশব সূনুনা।"

ইনি ভিষক কেশবের সন্তান। সেন বংশ কোনও বৈদ্যরাজবংশ হইতে উৎপন্ন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই; বঙ্গের বৈদ্য বা বৈদ্যযাজী ব্রাহ্মণেরা যে সকল প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা অতীব দুর্ব্বল।

৭ম প্রমাণ।—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার রামদাস সেন, আচার্য্য কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহু গ্রন্থালোচনা, বহু অনুশাসন পত্রের বিশ্লেষণ এবং বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বল্লাল সেন বৈদ্য ছিলেন না।

৮ম প্রমাণ।—সেন বংশের পূর্ব্বে বা পরে বাঙ্গালার বা ভারতের ইতিহাসে কোনও বৈদ্য জাতীয় রাজার নাম পাই না। বৈদ্যেরা কোনও সময়ে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ নাই। বৈদ্যেরা ক্ষত্রিয় নহে এবং ক্ষত্রিয়েরাও বৈদ্য নহে, বৈদ্যের ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রবিরোধী।

রাজা বল্লাল সেন যে কায়স্থ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রস্তাবে কয়েকটি প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বিজনতা।

(হাসির কবিতা)

গুণ গুণ করি উষার সমীরে
ফিরিছেন কবিবর,
বিজনের ভাব জাগে অন্তরে
বিজনতা মনোহর!

শিরায় শিরায়　　বিজনের ভাব
হয়ে এল ঘনীভূত ;
ফিরিলেন কবি　　নিজ নিকেতনে
ভাবভরে অভিভূত।

বিজন সে গেহ　　সাজান যতনে ;
অনুচর প্রতিদিন—
গুছায় টেবিলে　　দোয়াত, কলম,
খাতা, নিব্, আলপিন্।

পশিলা সে ঘরে　　ভাবভরে কবি
আপনি পড়িল দ্বার :
বন্ধ করিয়া　　গবাক্ষচয়
রচিলা অন্ধকার।

মানসে বাহিরে　　সম বিজনতা
কবিতা মানাবে ভাল :
কর পরশনে　　বাঁধা সৌদামিনী
নীরবে ধরিলা আলো।

হেরিলেন কবি　　চেয়ারে বিছান
সাধের আসনখানি ;
পূর্ণ হৃদয়ে　　লইয়া লেখনী
বসিলা চেয়ার টানি।

কে জানে তখন　　কিসের কাকলী
কোথা হ'তে পশে কাণে ;
আসনে আসীন　　ফিরালেন কবি
আঁখি চারিধার পানে।

'মিয়' 'মিয়' করি　　বাড়িছে সে রব—
কবিবর নিরুপায়।
এত যতনের　　ঘন বিজনতা
বুঝিরে ভাঙিয়া যায়।

টিপিলেন জোরে ডাকের ঘণ্টা—
ঝন্ ঝন্ বাজে খালি—
ত্রস্ত হইয়া ঢোকে অনুচর
আস্তে দুয়ার ঠেলি।

কহিলেন কবি— "চেঁচায় যে মেনী
কোথা—দাও দুর ক'রে,"
খুঁজিয়া তাহারে পেলে না কোথাও
হায়, যত অনুচরে।

থামে না মেনীর চিৎকার তবু
বিজনতা ভেঙে গেল;
হায়রে ভাবের বিজন কবিত্ত—
'তির পিত নাহি ভেল'।

'অকর্ম্মা তোরা' বলি কবিবর
যেমন দাঁড়াল রেগে,—
আসনের নীচে ছিল পোষা মেনী—
অমনি ছুটিল বেগে।

শ্রীরসময় লাহা।

ভৌতিক-তত্ত্ব।

প্রথম প্রস্তাব।

MIRACLE বা অলৌকিক ঘটনা।

ইংরাজি ভাষায় অলৌকিক কার্য্য Miracle নামে অভিহিত হইয়াছে। David Hume ডেভিড হিউম প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে A miracle is a violation of the laws of nature অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা বলিতে প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য বুঝাইয়া থাকে; তাঁহারা ভূত বিশ্বাস করেন না এবং প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়মের বিপর্য্যয়ে যে কখন কোন কার্য্য হইতে পারে একথাও স্বীকার করেন না।

প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া কোন অলৌকিক ঘটনা অবিশ্বাস করিতে গেলে যেন প্রকৃতির নিয়ম তাঁহাদের জানিতে বা শিখিতে কিছুই বাকি নাই, তাঁহারা সমস্তই জানিয়াছেন এবং সমস্তই বুঝিয়াছেন ইহাই অনুমান বা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু এই অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত কাল হইতে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক যে সমস্ত কার্য্য প্রতি নিয়ত সংঘটিত হইতেছে, তাহার কোন একটার বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা যে কত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ জীব তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের বিদ্যার গরিমা, বুদ্ধির গরিমা এবং জ্ঞানের গরিমা ঘুচিয়া যায়; আমাদের মনের অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়—আমরা লেখাপড়া শিখিয়া যতই কেন উন্নতি সাধন করিয়া থাকি না, এখনও অনেক বিষয় যে আমাদের শিখিবার এবং অনেক বিষয় জানিবার আছে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হওয়া অতিশয় অসম্ভব; আকাশমার্গে ঢেলা নিক্ষেপ করিলে ঢেলাটী কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উঠিয়া মাধ্যাকর্ষণ বলে পুনরায় ভূপতিত হয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু যোগবলে হউক বা অন্য কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রভাবে হউক, মানুষ মাটিতে না পড়িয়া অনায়াসে শূন্যগর্ভে বসিয়া থাকিতে পারে একথা প্রাচীন আর্য্যগণের স্বকপোল কল্পিত অলীক কথা বলিয়া যদি কাহারও মনে অবিশ্বাস হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা কলিকাতায় প্রফেসার বোসের সার্কস যাইতে অনুরোধ করি, সেখানে প্রতি রাত্রে একটী স্ত্রীলোককে দুইটী কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দুইখানি হাত আশ্রয় করিয়া শূন্যের উপর দাঁড় করাইয়া রাখা হইতেছে, তারপর একটী কাষ্ঠ দণ্ড অপসারিত করিয়া লইলেও স্ত্রীলোকটী অপর কাষ্ঠদণ্ড আশ্রয় করিয়া তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতেছে, অবশেষে তাহার শরীরখানি একদিকে টানিয়া দেওয়া হইতেছে এবং তাহার দেহ যষ্টি মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে প্রতিহত করিয়া মাটির সহিত সমান্তরালভাবে শূন্যের উপর অবস্থিতি করিতেছে। অগ্নি স্পর্শ করিলে হাত পুড়িয়া যায়, কিন্তু কয়েক বৎসর অতীত হইল, কাশিতে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া মানুষ অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিয়াছে; দীর্ঘকাল অনশনে থাকিলে প্রাণনাশ হয়, কিন্তু কোন একজন মহাযোগীকে ভূগর্ভে প্রোথিত করত তাহার উপর চাস দিয়া ফসল বুনান হইয়াছিল, ফসল সুপক্ক হইলে তাহা কর্ত্তন করিয়া লইয়া দীর্ঘকাল

পরে মৃত্তিকা খনন করতঃ সেই মহাপুরুষকে উত্তোলন করিলে তখনও তাঁহাকে জীবিত থাকিতে দেখার কথা শুনা গিয়াছে।

প্রমাণ স্বরূপ মৃত মহাত্মা রামমোহন রায় প্রকাশিত ১৭৬৮ শকের ৪৪ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে একজন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যথেচ্ছকাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল বেঞ্চুরা নামক একজন ফরাশীশ ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা জন্য তাঁহাকে মৃত্তিকা মধ্যে স্থাপিত করেন, এবং তিনিও কাপ্তেন ওয়েড্ সাহেব তাঁহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্থান কালে দৃষ্টি করেন। তাহার এই সংক্ষেপ বিবরণ যথা; একদা সেই যোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ অনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকা রন্ধ্র এবং মুখ ভিন্ন অন্য অন্য শরীর দ্বার মধুচ্ছিষ্ট অর্থাৎ মোম দ্বারা বন্ধ করিলেন, এবং এক পট্টের গোণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন। তদনন্তর সেই গোণীর মুখ বন্ধন পূর্ব্বক তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম মুদ্রিত করিয়া তাঁহার লোকেরা তাহা সিন্দুক মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বদ্ধ করিলেক, এবং সেই সিন্দুক মৃত্তিকা মধ্যে রক্ষা করিয়া তদুপরি যব বপন করিলেক। তাহার রক্ষণ জন্য সেই স্থানে রক্ষক স্থাপিত হয়। দশ মাস পর্য্যন্ত সেই যোগী মৃত্তিকা মধ্যে মগ্ন ছিলেন, ইতিমধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়চ্ছেদ জন্য দুইবার সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং দুই বারই তাঁহাকে সমানরূপ অচেতন দেখেন। দশমাস পূর্ণ হইলে যখন তাঁহাকে উত্তোলন করা যায়, তখন তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল। তাঁহার সমুদয় শরীর শীতল, কেবল ব্রহ্মরন্ধ্র অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। তদনন্তর প্রথমতঃ তাঁহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিয়া সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং তাঁহাকে উষ্ণ জলে স্নান করাইলে দুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন। যৎকালে তিনি পৃথিবী মধ্যে প্রোথিত থাকেন, তখন তাঁহার নখ কেশ প্রভৃতি বৃদ্ধি হয় না। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিত কালে পরমানন্দে মগ্ন থাকেন।"

W. G. Osborne's Court and Camp of Runjeit Sing p. 124.

প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হওয়া অসম্ভব হইলেও, শূন্য গর্ভে বসিয়া থাকা, অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া যাতায়াত করা, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ অনশনে

মাটির তলায় জীবিত অবস্থায় বাস করা প্রভৃতি যে কয়টী উদাহরণ আমরা দিয়াছি তাহাতে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে; এই জন্যই বলিতেছি আমাদের জানিবার ও শিখিবার এখনও অনেক বিষয় বাকী আছে।

ভগবানের ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে বা কোন অদৃশ্য জ্ঞানময় পুরুষের মধ্যস্থতায় অনেক সময়ই অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। পাঠক যদি কখন তারকেশ্বর বা বৈদ্যনাথ মন্দিরে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই দেখিয়াছেন কত শত শূল, কুষ্ঠ, মহাব্যাধি প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি একমনে একপ্রাণে দেবাদি দেবের অনুগ্রহ প্রার্থনায় সেখানে পড়িয়া আছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতজন মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

বৈদ্যনাথের মন্দিরে কাহারও রোগমুক্ত হওয়ার কথায় অনেকেই হয়ত মনে মনে হাসিবেন এবং আমাদের এই প্রবন্ধটী পাঠ করাও হয়ত এইখানেই বন্ধ করিয়া দিবেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে বা কোন অদৃষ্ট জ্ঞানময় পুরুষের মধ্যস্থতায় যে কেবল আমাদের দেশেই এপ্রকার অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, ইউরোপেও এক সময়ে এপ্রকার কার্য্য হওয়ার কথা শুনা গিয়াছে। আমরা David Hume সাহেবের পুস্তকেই দেখিতে পাই ফ্রান্সে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত Abbi Paris আবি পারিসের একটী পবিত্র সমাধি মন্দির ছিল; সেখানে অন্ধ ব্যক্তি যাইয়া চক্ষু পাইয়াছে, বধির শ্রবণশক্তি লাভ করিয়াছে এবং কঠিন কটিন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ মনে এবং স্বচ্ছন্দ শরীরে ফিরিয়া আসিয়াছে। David Hume সাহেব আপন পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন—

"Many of the miracles were immediatly proved upon the spot before judges of unquestioned integrity attested by witnesses of credit and distinction in a learned age and on the most eminent theatre that is now in the world."

পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত স্থানে এবং শিক্ষিত যুগে উক্ত সমাধি মন্দিরের অনেক অলৌকিক ঘটনা তত্তৎকালে সৎ এবং চরিত্রবান বিচারকের সম্মুখে সম্ভ্রান্ত এবং নিষ্ঠাবান সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে।

হিউম সাহেব আরও বলিয়াছেন এই সমস্ত ঘটনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই সমস্ত

কার্য্য প্রতারণা মুলক বিবেচনা করতঃ মন্দিরটীকে একবালে নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরে এই অলৌকিক ঘটনা সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই।

হিউম সাহেব Miracle অলৌকিক ঘটনার একজন ঘোর বিরুদ্ধবাদী; তিনি নিজ পুস্তকে এত কথা স্বীকার করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—

What have we to oppose to such a cloud of witnesses, but the absolute impossibility or miraculous nature of the events which they relate? And this, surely, in the eyes of all reasonable people will alone be regarded as a sufficient refutation."

অর্থাৎ এই সমস্ত ঘটনা ঘোর অসম্ভব এবং নিতান্ত অলৌকিক ভিন্ন এই সকল সাক্ষী প্রমাণের বিরুদ্ধে আমরা আর কি বলিব? সাক্ষী প্রমাণ থাকিলেও অলৌকিক এবং অসম্ভব বলিয়া তিনি এই সমস্ত ঘটনা অবিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন।

হিউম সাহেব যাহাই বলুন পারিস পার্লিয়ামেণ্টের জজ Mons Montejeron একজন চরিত্রবান এবং স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার পুস্তক পাঠে আমরা জানিতে পারি——

ফ্রান্সে সে সময়ে যত rector ধর্ম্মযাজক এবং clergy ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই সমস্ত ঘটনা সপ্রমাণ করিয়াছেন; Cardinal Novelles একজন সৎচরিত্র সাধু পুরুষ এবং Duc de Chatellon ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ডিউক ও পীয়ার, তাঁহারা উভয়েই উক্ত সমাধি মন্দিরের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে সাক্ষী দিয়াছেন; অবশেষে Mons. Herault একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং তীক্ষ্ণদর্শী বিচারকের উপর এই সকল বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য ভার দেওয়া হইলে, তিনিও দেখিয়া শুনিয়া এবং সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া মন্দিরের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের রাণী এ সকল কোন কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনা পরীক্ষা করিবার জন্য আপন ডাক্তারকে পাঠাইয়া দেন—ডাক্তার যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করেন, তখন একজন ঘোর নাস্তিক, কিন্তু মন্দিরে যাইয়া দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনের বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল এবং নাস্তিক হইতে আস্তিক ভাবে তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল।

Mons. Montegeon লিখিত পুস্তক হইতে একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এই সমাধি মন্দিরের বিষয় শেষ করিব :—Madamoiselle Coirin নামক একটী স্ত্রীলোকের বাম স্তনে একটী ক্ষত হওয়ায় একাদিক্রমে বার বৎসর কাল তাহাকে অতি দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক বড় বড় ডাক্তারে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন কিন্তু কোনই ফল হয় নাই, অবশেষে তাহার স্তনটী বক্ষস্থল হইতে খসিয়া পড়ে। মনুষ্যের চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া এবং যন্ত্রণায় কাতর হইয়া কইরিণ অবশেষে এই সমাধি মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার যে কেবল ক্ষত আরোগ্য হইয়াছিল, তাহা নহে, ভগবানের কৃপায় তাহার স্তনটী পুনর্গঠিত হইয়া পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেই আকার ধারণ করিয়াছিল।

কইরিণের আরোগ্যসংবাদ রাজ্যমধ্যে বিস্তার হইয়া পড়িল; যে সকল ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা একথা শুনিলেন কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কইরিণের পিতা এবং তাহার দুই ভ্রাতা ফ্রান্সের রাজ-সংসারে উচ্চপদে চাকুরি করিতেন, তাঁহারা কইরিণকে পারিশে আনাইলেন এবং রাজবৈদ্যের দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন—রাজবৈদ্য M. Gunlard, M. Souchay, Surgeon to the Prince of Conte, Seguier, Surgeon of the hospital of Nouterre, M. Deshieres, Surgeon to Duches of Berry, M. Hequet. one of the most celebrated Surgeons in France. এই সমস্ত প্রধান প্রধান ডাক্তার এবং অন্যান্য পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক কইরিণকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। বিরুদ্ধবাদীরা এ সম্বন্ধে কি বলিবেন জানি না কিন্তু ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কিছুই দর্শান যাইতে পারে না।

অলৌকিক ঘটনায় তোমার আমার অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক দেশে, এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সক্রেটীস, প্লুটার্ক, সেণ্ট আগষ্টীন প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিতগণের জীবন বা ইতিহাস পাঠ করিলে তাঁহারা যে Miracle বা অলৌকিক ঘটনা সমস্ত বিশ্বাস করিতেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্য মুনি ঋষিগণ যোগযুক্ত অবস্থায় অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া

গিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীস এবং প্রাচীন রোম যখন সভ্যতার ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে সময়ে সেই দেশের লোক অলৌকিক ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। লুথার এবং কল্‌ভিনের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ইহার অনুকুলে সাক্ষী দিয়াছেন। Sir Mathew Hale এবং তাঁহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে সকল দার্শনিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে প্রমাণাদি লইয়া অবশেষে সেই সমস্ত প্রমাণ অখণ্ডনীয় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন।

কোন ঘটনা অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করার পূর্ব্বে আমাদের জ্ঞান কতটুকু এবং বিদ্যা ও বুদ্ধিই বা কতটুকু তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। সহস্রাধিক বৎসর কি তদূর্দ্ধকাল পূর্ব্বে যে সকল বিষয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, তাহা এক্ষণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল তত্ত্ব মনে ধারণাও করিতে পারেন নাই তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। গ্যালিলিও যখন ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত করিবার কথা প্রথম প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া তিনি পাগল হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ফাটকে দেওয়া হইয়াছিল; রেলগাড়ি বা টেলিগ্রাফের কথা যখন প্রথম উঠে তখন অসম্ভব ব্যাপার বিবেচনা করিয়া লোকে কতই না উপহাস করিয়াছিল, আবার এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে mesmerise করিয়া অক্লেশে অস্ত্র চিকিৎসা করিবার কথা উত্থাপিত হইলে স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কি সম্ভব বলিয়া চিকিৎসক মহলে একটা মহা হাঁসির রোল পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু কালে ছোট বড় নানা প্রকার ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে; রেল গাড়িতে চড়িয়া লোকে ছয় মাসের পথ সামান্য দিনে যাতায়াত করিতেছে, তারযোগে লোকে বাড়ী বসিয়া পৃথিবীর সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং রোগীর শরীরের উপর হাত বুলাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করতঃ কঠিন কঠিন অস্ত্রচিকিৎসা অক্লেশে এবং অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে।

এ জগতে সম্ভব কি এবং অসম্ভবই বা কি তাহা আমরা কিছুই বুঝি না। এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, ইহার কার্য্যও অনন্ত এবং যে শক্তি প্রভাবে এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাও অনন্ত; আমরা যে সময় প্রথম জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহার সহিত যে কালে প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। আমাদের জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল; আমরা পূর্ব্বে যাহা জানিতাম না এক্ষণে তাহা জানিয়াছি, এবং এক্ষণে যাহা জানি না বা বুদ্ধিতে

ধারণাও করিতে পারি না, কালে তাহা হয়ত বুঝিব ও জানিব। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকে অবিশ্বাস করিয়াছে, কালে তাহাই সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য বলিতেছি মানুষ দুই চারি হাজার বৎসরে সামান্য যে একটু জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাই চরম বিবেচনা করতঃ প্রকৃতির নিয়ম আর তাহার জানিবার বা শিখিবার কিছুই বাকী নাই ভাবিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিলে তাহা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করা কোন লোকেরই উচিত হয় না।*

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

বসন্তে।

আবার আম্র-মঞ্জরী ভ্রমর-ঝঙ্কার, রুচিরভার বসন্ত আসিল। আবার চারুতর মোহন মাধব সপুষ্পদ্রুমে, সপদ্ম সলিলে, সুগন্ধি পবনে, রম্য দিবসে, সুধা-প্রদোষে উপস্থিত হইল। আবার সুমন্দ স্নিগ্ধ মলয়ানিল বহিল। পিককুল আবার উৎফুল্ল-আনন্দে গাইয়া উঠিল। কত গানে, কত শোভায়, কত সুগন্ধে বসন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে বসন্ত যৌবনে কত স্বপ্নময় আশা, কত অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, কত ভবিষ্যৎ সুখের আভাস লইয়া আসিত, আজ প্রৌঢ়ে তাহা বিষাদময় নিষ্ফলতা শুষ্ক নির্ম্মমতা, কঠোর তাচ্ছিল্য লইয়া উপস্থিত।—পূর্ব্বে যে বসন্তে সকলই আনন্দ-ময়, মঙ্গলময়, সুখময় বোধ হইত, আজ পরিণত বয়সে দেখি—আনন্দের চেয়ে নিরানন্দ বেশী—সুখের চেয়ে দুঃখ অধিক, আশার অপেক্ষা নৈরাশ্য ঘনীভূত। যৌবন-শিহরিত-বসন্তে,—বর্ত্তমানে চঞ্চল উদ্দমে সুপ্রশস্ত আনন্দ, ভবিষ্যতে অসীম আশা ও নির্ভরতা;—আজ প্রবুদ্ধ-সৈত্য-সঙ্কুচিত মধুমাসে বহু-আয়াস-লব্ধ-বাঞ্ছিত বর্ত্তমান অতৃপ্ত, জীবন কঠোর শুষ্ক—আত্মনিবদ্ধ কর্ত্তব্য-গ্রন্থিতে সুশ্লিষ্ট। পূর্ব্বে যে বাসন্তী সুষমা ললনা-লীলাময়ী-ব্রীড়ায়, তরল হাসাময়ীর প্রকম্পনে, আশঙ্কাশূন্য সত্বায় ছড়াইয়া পড়িত, আজি তথাকথিত 'সুখ-বসন্ত' বহু ভারপ্রপীড়িত-পুত্রকন্যাদায়গ্রস্ত নিতান্ত গদ্যময় পরিশিষ্টে পরিসমাপ্ত।

---

* এই প্রবন্ধের লিখিত অধিকাংশ উদাহরণ এবং ইংরাজি quotations সমস্ত ডার্ব্বিন সখা, ডার্ব্বিন সমকক্ষ ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace DCL, LLD FRS) প্রণীত Miracle and Modern Spiritualism নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নিজের নিষ্ফল পরিণাম, নিজের ক্ষুদ্রশক্তি, নিজের অসীম দুর্ব্বলতা, বহুশুভনাশি আপাততঃ রমণীয় পাপচিন্তা এবং স্বার্থক্ষুণ্ণ ভোগসমষ্টির উত্তপ্ত নিশ্বাস আজ বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যাকে আরও যেন বিহ্বলতর করিয়া তুলিতেছে।

* * * * *

গ্রীষ্মের কার্য্যময় উত্তাপ, বর্ষার কৃপাবারিধারা, শরতের সুনির্ম্মল শান্তি, হেমন্তের স্বর্ণময় সমৃদ্ধি, শীতের সঞ্চিত শক্তি একাধারে মিলিত হইয়া পূর্ণাবয়বে, পূর্ণাশক্তিতে, পূর্ণানন্দে বসন্ত উপস্থিত।—মানুষের দুঃখকষ্ট—যতই সুবিস্তৃত হউক না কেন, নৈরাশ্য যতই গভীরতর হউক না কেন, দুঃখের গীতিকবিতা-কাব্য যতই মিষ্ট মধুর লাগুক না কেন, সৌন্দর্য্যের সার্থকতা আছে। তোমার দুরদৃষ্টের ঘটনাসমষ্টি এমন হইতে পারে যে আর মানুষের পানে তাকাইতে ইচ্ছা করে না। যদি তুমি আমি প্রকৃতিস্থ হইতাম, যদি মানুষ এত অধঃপাতে না যাইত, তাহা হইলে প্রকৃতি সুন্দরীর এত প্রয়োজন হইত না। আমাদের মন যদি বসন্তের আকাশের মতন সপ্রশান্ত উদার হইত, যদি আমাদের চিন্তা মলয়ামারুতবৎ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সুখদা হইত, যদি আমাদের কার্য্য বসন্ত-কুসুমের ন্যায় সুগন্ধ বিতরণ করিত, যদি আমাদের কথাবার্ত্তা পিককোকিল-কুজিত কণ্ঠের ন্যায় সহজ সরল অকপট হইত, তাহা হইলে বসন্তের শোভা-ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করিতে পারিতাম।

* * * * *

—আমরা জীবনে, কত সময়ই না একটু মিষ্ট কথার জন্য, সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য, এতটুকু সহানুভূতির জন্য লালায়িত, এবং না পাইলে কতই না ক্ষুণ্ণ হই এবং পুণ্য কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টায়, প্রতি পদবিক্ষেপে, কত বাধাই না পাইয়া থাকি এবং সহানুভূতি-অভাবে কত সময়ই না ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়ি।—যখন এই প্রকার নৈরাশ্য-সংশয়-শঙ্কায় উদ্ভ্রান্ত হই, তখন ঘরের বাহিরে, লোকসমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই—দেখি উপরে গ্রহ-তারকাভূষিত নভোমণ্ডল,—চন্দ্রমা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজের সুধা ধারা জ্যোৎস্না ঢালিতেছে, বাতাস কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া আপনার সুখের হিল্লোলে চলিয়া যাইতেছে; নীচে, পুণ্যশ্লোকা জাহ্নবী, নিজমনে পরোপকার ব্রতে কুলুকুলুনাদে আপনার গন্তব্যপথ ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে; চতুর্দ্দিকে বিহঙ্গকুল প্রতিদান তুচ্ছ করিয়া আপনার মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কার দিতেছে।—কোথা হইতে কে যেন সেই নৈশ আকাশ মথিত করিয়া আমার সংশয় সমাকুল

জীবন কর্ত্তব্য-প্রশ্নের উত্তর দিল ;—"তুমি আমাদিগের মতন হও ; আমরা যেমন সহানুভূতি স্নেহ প্রশংসা অপেক্ষা না করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তুমিও তেমনি নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাও ; অন্যের কার্য্য, অন্যের কর্ত্তব্য, অন্যের কূট মৎলব লইয়া ব্যস্ত থাকিও না ; নিজেকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া, নিজের শক্তি ওজন করিয়া, এদিক্-ওদিক্ না তাকাইয়া, নিজের অভীষ্ট সুসিদ্ধ কর"। সেই দিন, সেই বসন্তের মধুর রজনী বড়ই আশ্বাসের বাণী বলিয়া গেল।

* * * * *

নাতিদূরে গঙ্গা প্রবহমানা। নদীতটে চন্দ্রকিরণ প্রোজ্জ্বল অশ্বত্থ বৃক্ষ। নভোদেশে পূর্ণশশী। এই সকলের উপর বসন্তের শ্রীশোভা সৌন্দর্য্য।—ভগবান্ নিজের বিভূতি বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন—"অহম্ ঋতুনাং কুসুমাকরঃ" আমি ঋতুদিগের মধ্যে পুষ্পিত অভিরাম বসন্ত ; "অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং" আমি সর্ব্ববৃক্ষগণের মধ্যে ছায়াসঙ্কুল নিতান্ত আরামদায়ী—বহুবিধ তৃপ্তিবিধায়ক অশ্বত্থ বৃক্ষ ; "নক্ষত্রাণামহং শশী" নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্রস্বরূপ এবং "স্রোতসামস্মি জাহ্নবী" প্রবাহদিগের মধ্যে জাহ্নবী।—মানুষের মন সততই চঞ্চল, নিজের আত্মনিহিত ভগবদৈশ্বর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ এবং স্বভাবতঃ বাহিরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। মানবেন্দ্রিয় দ্বার বহিরুন্মুখ ; তাই ঈশ্বর সৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্য ভগবান এই সৌন্দর্য্যের সুমোহন সমাবেশ করিয়াছেন। উপরি উক্ত ভগবদ্বাক্য বুঝিয়া চলিলে বাহিরের সৌন্দর্য্য ভিতরকে সুন্দর করিবে এবং ভক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে। তাই, গীতায় দশম অধ্যায়ে আরও পরিষ্কাররূপে বুঝান হইয়াছে যে,

"যদ্‌যদ্বিভূমিতৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥"

অর্থাৎ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশযুত বলিয়া জানিও।—এই প্রকারে ভাবিতে, অনুভব করিতে শিখিলে, যাহার যেটুকু সৌন্দর্য্য-শোভা কান্তি তেজ আছে, তাহাকে ভক্তি সম্মান করিতে শিখিবে ; তখন আমাদের প্রীতি, আনন্দ বৃদ্ধি হইবে এবং দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

* * * * *

নবদ্বীপে আজ দোলপূর্ণিমা।—অখণ্ডমণ্ডল শতধা বিখণ্ডিত হইয়া, নবদ্বীপের রাস্তা—ঘাটে, মাঠে, প্রাঙ্গণে, মন্দিরে, মঠে, টোলে, চতুষ্পাঠীতে,

বৈষ্ণবের আখড়ায়, যুবকের মুখে, সুন্দরীর অঙ্গসৌষ্ঠবে, প্রৌঢ়ের দেহে, স্থবিরের বিকলাঙ্গে, সৌধে, জাহ্নবীজীবনে, শতধা প্রতিফলিত হইতেছে। গঙ্গা-জলাঙ্গীর সম্মিলিত শ্যামল বারিরাশি আলিঙ্গিত তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে। দক্ষিণে হাওয়া স্বনিয়া স্বনিয়া আশ্বাসবাণী বহিয়া যাইতেছে। নদীতটস্থ বায়ু মুখরিত অপপেলব কিশলয় শোভিত তরুরাজি জাহ্নবীকে সাদরে আহ্বান করিতেছে? কোকিল কুহরে কুহরে সঙ্গীত কাঁপাইয়া হৃদয়তন্ত্রীকে প্রীতির, আনন্দের, উল্লাসের ঝঙ্কার দিতেছে, একের হৃদয় অন্য হৃদয়ে মিলাইয়া দিতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে মধুর মৃদঙ্গে মুগ্ধক্ষিপ্ত হরিনামের হরিসঙ্কীর্ত্তন নিকটবর্ত্তী হইল। চক্ষু জলে ভিজিয়া গেল; শরীর বিবশ হইয়া উঠিল। হরিসঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল, আর আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত কথা মনে হইল, ভাবিলাম নবদ্বীপের পূর্ব্ব গৌরব আর তাহার বর্ত্তমান বিলুপ্ত-বিভব। ভাবিলাম, বঙ্গের গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে তো, সে নবদ্বীপ, যদি তাকাইবার কোন স্থান থাকে তো সে নবদ্বীপ। বঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতে, জ্ঞান ও ভক্তির গঙ্গাযমুনা সঙ্গম যদি কোন স্থান থাকে তো সে নবদ্বীপ। এই সরস্বতীর পাদপীঠ নবদ্বীপে জ্ঞানচর্চ্চা তর্কসিদ্ধান্ত-স্মৃতি-ন্যায়ের বিশ্লেষণ, সার্ব্বভৌম-বাসুদেবে, কুশাগ্র বুদ্ধি রঘুমণি জগদীশ গদাধরে এবং কঠোর নীতিনিয়ামক স্মার্ত্তরঘুনন্দনে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গে ও তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয়—অদ্বৈত নিত্যানন্দে প্রীতি প্রেম ও আশার রাজ্য দিক্‌দিগন্তে বিকশিত হইয়াছিল।

* * * * *

পবিত্রচেতা অদ্বৈতাচার্য্যভক্ত প্রমুখের কাতর ব্যগ্র প্রার্থনা-ফলে, শতসহস্র কণ্ঠের গগনভেদী হরিধ্বনির ভিতর, এই মনোহর অভিরাম বসন্তে, এই পূত-দোল পূর্ণিমায়, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। যে আসক্তি, অনুরাগ প্রেম, শ্যাম-শ্রীকৃষ্ণ নবযৌবনসম্পন্না ললিত-ললামময়ী উদ্ভাসিত সুন্দরী প্রকৃতির মধ্য দিয়া অঙ্কুরিত ও সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিজের ভুবনমোহন সুঠাম স্বর্ণকমল গৌররূপে, ততোধিক তাঁহার নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধচরিত্রে এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সর্ব্বসংক্রামক ভুবনবিজয়ী দুর্দ্দামবন্যাসম বিপুল প্রেমে, উদ্বোধিত করিয়া, নরনারীর মন সুধা সিঞ্চিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। হায়, আজ সেই চরিত্র-গরিমা, সেই বজ্রাদপি-কঠোর চরিত্র-নীতি, সেই বিদ্বেষশূন্যতা, সেই অন্যশুভকামনা কোথায়? সেই অপরিসীম অপ্রমেয় প্রেমরাশি, সেই

কুসুমাদপি-মৃদু-কোমল ভালবাসা কোথায়! সেই কৌপিনধারী, সন্ন্যাসী-সর্ব্বত্যাগী-গৌরাঙ্গের ত্যাগ-স্বীকার কোথায়!—

* * * * *

ভগবানের রাজ্যে আশা নাই একথা বলিব না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন আশা ছাড়িব না? শতবার পড়িয়া যাইব শতবার উঠিতে চেষ্টা করিব। প্রাণের সঙ্কল্প, যেখানে প্রত্যাশিত স্নেহের পরিবর্ত্তে অপ্রীতি-তাচ্ছিল্য পাইয়াছি —সেখানে প্রীতি বিলাইব। আমাদের হতভাগ্য দেশে, অভাব বিদ্যার নহে, বুদ্ধির নহে; অভাব প্রীতির। ইহা কম আক্ষেপের কথা নহে যে এই গৌরাঙ্গের দেশে, তাঁহার প্রেমজল ধৌত বঙ্গে, এত রেষারেষি, এত দ্বেষহিংসা, এত ঠেলাঠেলি।—

* * * * *

এই প্রীতির পথ সুপ্রশস্ত করিবার জন্য এই ফুলভরা, আশাভরা বসন্তে "নবপ্রভা"র জন্ম। "নবপ্রভা" যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত তাঁহারা নিতান্ত ক্ষীণমতি, ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণশক্তি। ভক্তগণের পদরেণুর আশায় "নবপ্রভা" এতদিন বাঁচিয়া আছে।—"নবপ্রভা" প্রার্থনা করিতেছে—হে ফুলভরা, আশাভরা বসন্ত, তুমি "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" হও, আর "নবপ্রভা" যেন এই বহুজন হিতের বহুজন সুখের সহায়তা করে।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়।

নব-জীবন।

(গল্প)

১

লজ্জার মাথা খাইয়া এক দিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মপুত্র তীরে দাঁড়াইয়া সুরমার হাত ধরিয়া কম্পিত স্বরে ডাকিলাম "সুরমা"?

আমার বাল্য সহচরী—একান্ত শুভানুধ্যায়িণী—আমার কবিতার একমাত্র admirer সুরমা উত্তর দিল "কি বলছো বিনয়"?

আমি বলিলাম "সুরমা, আজ হইতে আর পাঁচটী বছর আমার জন্য অপেক্ষা করিবে কি? এত দিন যখন বিবাহ কর নাই—আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা কর তাহার পর বিবাহ করিও।"

সুরমা বলিল "বিনয় আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইতে তোমায় অনুরোধ করিতে পারি না। ভেবে দেখ, এক জনকে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া সহ সঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে তোমার প্রণয়চিন্তা হইতে দূর করিয়া দাও। বিবাহ না করিলে কি ভালবাসা যায় না? আমাকে ছোট বোন বলিয়া স্নেহ কর না কেন? আমি তোমারই জন্য চিরকুমারী থাকিব। তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব—প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তোমার হিত কামনা করিব—তোমার সুখে হাসিব, দুঃখে কাঁদিব: সম্পদে বিপদে ছোট বোনটীর মত তোমার সাথে সাথে প্রতি নিয়ত ছায়ার মত থাকিব। যাহাকে বিবাহ করিয়াছ তাহাকে হৃদয়ের সমুদয় প্রেমটুকু অর্পণ করিয়া ফেল। অহরহঃ ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর—পরিণামে সুখ ও শান্তি পাইবে। তখন তোমার সাধের সুরমাকে স্নেহের ছোট বোনটীকে অধিক সুন্দর দেখিতে পাইবে।" সুরমার কথায় আমার মনে যেন কিঞ্চিৎ অশান্তি ভরা শান্তি আসিল—আলোয় আঁধারে মিশিয়া একটু যেন আলোক রশ্মি হৃদয়কন্দরে প্রতিভাত হইল, অতীত অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। একেবারে আঁধারে ডুবিয়াছি—বর্ত্তমান জীবনে একবিন্দু আলোক নাই—সবই ঘোর অন্ধকার। সুরমার কথা শুনিয়া যেন প্রাণের মধ্যে নিমেষের তরে সৌদামিনীর খেলা হইল: অতীত দেখিলাম। উঃ কি মহাভুল করিয়াছি। প্রেমলতা কে—অভাগিনী প্রেমলতাকে আমি ধর্ম্মত বিবাহ করিয়া কি ভীষণ ভুল করিয়াছি। তাহাকে সুখী করিতে পারিলাম না নিজেও সুখী হইতে পারিলাম না। সুরমার চিন্তা আমাকে অকালে মৃত্যুতটে আনিয়া দিতেছে। সুরমা বিদুষী এবং সাতিশয় বুদ্ধিমতী। সুরমা আমাপেক্ষা অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে—আমাপেক্ষা অধিক পাঠ করিয়াছে। আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও বলিলাম:—

"সুরমা তোমার কথা সত্য। কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি কৈ? সত্য বটে, এরূপ অবস্থায় তোমার চিন্তা করা মহাপাপ, কিন্তু আমার বিদ্যা বুদ্ধি যুক্তি তর্ক সবই তোমার চিন্তা আসিয়া পরাস্ত করিয়া ফেলে। আরও আকুল হইয়া যাই। কত দিন তোমাকে ভুলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রেমকে ভালবাসিতে যাই কিন্তু সুরমা—তোমার ছবি আসিয়া মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া আমার ভালবাসাকে দূরে ফেলিয়া দেয়। প্রেমকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া তোমার ছবি মাঝে দাঁড়াইয়া আমাদের দুজনাকে দুদিকে ফেলিয়া দেয়: সুরমা, এরূপ অবস্থায় কি করিতে বল? তোমার ভাবনা আমাকে অকাল বার্দ্ধক্য আনিয়া

দিয়াছে। আশা উদ্যম গতপ্রায়, চিন্তায় চিন্তায় আমি জরাগ্রস্থ হইয়াছি। আজ তোমায় ছাড়িব না—তুমিই বল আমি কি করিব ? আমার অবস্থা যেরূপ সঙ্কটাপন্ন তাহাতে আমার মরণ ভাল।”

সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বেড়াইতে যাইয়া একটী উচ্চ স্থানের উপর আমরা পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। সুরমাকে কাঁদিতে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলাম। আমিও তাহার স্কন্ধদেশে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সুরমা বলিল “তার চেয়ে আমার মরা ভাল। আমি মরিলে সংসার হইতে আমার স্মৃতি চলিয়া যাইবে। তুমি ও প্রেম সুখে থাকিবে।”

আমি বলিলাম, “সুরমা, সংসার হইতে তোমার স্মৃতি চলিয়া যাইতে পারে সত্য কিন্তু আমার মর্ম্ম হইতে তোমায় স্মৃতি যাইবে কেমনে ? আকাশে শত সহস্র তারকা প্রত্যহই উঠিয়া থাকে। কিন্তু আজ যে নীহারিকাকে দেখিলাম কাল তাহাকে চিনিতে পারিব না। তাই বলিয়া কি চাঁদকে কেহ কখন ভুলিতে পারে ? তুমি মরিলে আমার প্রাণ আরও আকুল হইবে—আরও অধীর হইব।”

সুরমা বিষাদ কণ্ঠে বলিল, “তবে কি হবে ?”

উভয়েই নির্ব্বাক ! দেখিতে দেখিতে রাত্রি অধিক হইল। ডিব্রুগড় অভিগামী জাহাজের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমাদের চেতনা হইল। পথিমধ্যে কোন কথাই হইল না। বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

২

উক্ত ঘটনার পর ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুরমা বিলাত হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কলিকাতা মহানগরীতে বেশ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছে। এক্ষণে তাহার মাসিক আয় সহস্র মুদ্রা। আমার বিদ্যার দৌড়ে আমি কোন একটী বে সরকারী আফিসে কুড়ি টাকা বেতনের মুহুরীর কাজ করিতেছি। আমি যে কলিকাতায় থাকি সে তাহা জানিত না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল কিন্তু আমার তথ্য সে জানিতে পায় নাই। সে তখনও কুমারী ছিল। আমিও তাহার স্মৃতি বুকে পুরিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত কাটাইয়া আসিতেছি। শরীর মনের অবস্থা পল্লীগ্রামের বহু পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার মত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বন জঙ্গলে ভরা এবং বক্ষের উপর কত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া পতিব্রতা স্বাধ্বী প্রেমলতা ভাবিয়া ভাবিয়া ভগ্ন অট্টালিকা

পাশে মলিন পর্ণ কুটীরের লুপ্তপ্রায় চিহ্নের মত কোন প্রকারে খাড়া রাখিয়াছে। দিন দিন সে মরণের দ্বার দেশে যাইয়া উপস্থিত প্রায় হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভীষণ ব্যাধি আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। প্রেমের সেই অবস্থা দেখিয়া আমার চেতনা হইল। কিন্তু করিব কি? গরীব কেরাণী আমি। বিশ মুদ্রা মাসিক আয়ে কেমন করিয়া সুচিকিৎসা করাই? তাহার জন্য আকুল হইয়া গেলাম।

ঠিক এই সময়ে কোন খবরের কাগজে পড়িলাম কোন কুমারী দাস গুপ্তা লণ্ডন মহানগরী হইতে এম ডি পাশ করিয়া * * * নং লোয়ার সার্কুলার রোডে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁহার অতি দয়ার শরীর, গরীবদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সংবাদপত্রে ইহা পাঠ করিয়া কুমারী দাস গুপ্তার সন্ধানে চলিলাম। আফিস হইতে সাড়ে ছয়টার সময় ফিরিয়া সেই শত তালি দেওয়া কাপড় পরিয়াই লোয়ার সার্কুলার রোডে চলিলাম। পায়ে জুতা নাই। জুতা কিনিবার সামর্থ্য আমার কোথায়? মাথায় দীর্ঘ কেশ তৈলাভাবে জটা পড়িয়াছে। মনে নিরাশ হইয়া চলিলাম। কি জানি কুমারী দাস গুপ্তার দ্বারপাল আমার এ হেন বেশ দেখিয়া গৃহস্বামিনীর সহিত দেখা করিতে না দেয়। ভগবানের নাম করিয়া জানবাজারের খোলার বাটী হইতে রওনা হইলাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময় কুমারী দাস গুপ্তার বাটীতে পৌঁছিলাম। দ্বারপালের নিকট তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বেচারা যেন একেবারে মাটীর মানুষের মত আমাকে লইয়া বসিবার ঘরে রাখিয়া আসিল। যথা সময়ে একটা আয়া আসিয়া অতি বিনীত ভাবে আমাকে জানাইয়া গেল যে মেম সাহেব খানায় বসিয়াছেন আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আমি গৃহস্বামিনীর বন্দোবস্ত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভগবানের প্রেমের কথা ভাবিতেছি এমন সময়ে কুমারী দাস গুপ্তা ঘরে আসিয়াই আমাকে করমর্দ্দন করিলে। আমি কুমারী দাস গুপ্তার মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া পড়িলাম!

কুমারী দাস গুপ্তা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি হইয়াছে?" আমার মুখের কথা সরিল না। অনেক কষ্টে রুদ্ধশ্বাসে "সুরমা" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলাম। কুমারী দাস গুপ্তা আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া "কে বিনয় নাকি!" বলিয়াই চীৎকার। পরে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ক্রন্দন।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে সুরমা বলিল "চল বিনয়, উপরে চল। প্রেম কোথায়? সে কেমন আছে?"

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম "সুরমা এখন বসিবার সময় নাই। চল একবার প্রেমকে দেখিয়া আসিবে। বোধ হয় সে আর বাঁচিবে না?"

সুরমা আয়াকে ডাকিল, গাড়ী তৈয়ারী করিবার হুকুম দিয়া সেই বেশেই বাহির হইল। গাড়ী আসিলে আমি জানবাজার যাইতে হইবে বলিয়া উভয়ে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বসিয়া সে আমাদের সব কথা শুনিল। আমাদের ইতিবৃত্ত শুনিয়া সে কাঁদিতেছিল। সময়ে বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া সুরমা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। প্রেমলতা অতি কষ্টে দ্বার খুলিয়া দিল। সুরমা তাহাকে কোলে লইয়া বলিল "দিদি—প্রেম—আমি তোমার সুরমা।" তার পর তাহাকে বুকে লইয়া বার বার চুম্বন করিতে লাগিল। এ মিলনের আবেশ প্রায় আধ ঘণ্টা গেল। সুরমা ঘরের ও আসবাবের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। আমাকে ডাকিয়া বলিল "বিনয় আমাকে ভালবাস—আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি?"

আমি "কি সুরমা?" সুরমা বলিল "এ বাড়ী এখনই ছাড়িতে হইবে। বাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া আমার সঙ্গে আমার বাটীতে চল।"

আমি বলিলাম "সুরমা, প্রেমকে লইয়া যাও তাহাকে তোমার হাতে সঁপিয়া দিলাম—আমি এখানে থাকি।"

সুরমা বলিল "বিন্ সেই ব্রহ্মপুত্রতীরের কথা স্মরণ কর। আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রেমও বাসে। দুই বোনে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিব। আমি তোমার ছোট বোন। আমার কথা রাখিবে না নাকি? দিদি প্রেম আমি তোমার ছোট বোনটী। আমার আর কে আছে? তোমরাই দুজনে আমার জীবনেরই সুখ ও শান্তি। যাবে নাকি বোন?"

প্রেম ও আমি সুরমার বিষাদমাখা কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম "চল সুরমা—তোমারই কাছে যাবো।"

প্রেমও বলিল—"সুরমা—দিদি চল্ তোর কাছে যাইয়া—তোর হাতে আমার স্বামীকে সঁপিয়া মরিব।"

সব ঠিক ঠাক। আমরা সুরমার কাছে আসিলাম। তিন মাস পরে প্রেম একটু আরোগ্য হইল।

৩

প্রেম। "দিদি, আমার কথা শোন। তুমি ওঁকে ভালবাস—উনিও তোমাকে প্রাণ মনে ভালবাসেন। এস বোন—আমরা দুই জনে তাঁহার দাসী হইয়া সেবা করি।"

সুরমা। "দিদি, সত্য কথা বলিতে কি তাহাতে কেহই সুখী হইতে পারিব না। বরং আরো অসুখী হইতে হইবে। স্বামীর আংশিক প্রেম স্ত্রীতে সহ্য করিতে পারে না"। উভয়েই চুপ। আর কেহই কোন কথা কহিল না।

* * * * *

ইহার দুই মসে পরে প্রেমের জ্বর হইল। আরও পনর দিন গেল, রাজযক্ষ্মা দেখা দিল। তাহার পর এক মাস পরে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সুরমা ও আমাকে ডাকিয়া প্রেম বলিল, "সুরমা আমি জন্মের মত চলিলাম। স্বামীর যত টুকু ভালবাসা পাইয়াছি তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া চলিলাম। এমন দেবতা স্বামীকে সংসারে একা ফেলিয়া যাইতে প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়। বোন আমার স্বামী—আমার প্রাণের দেবতা তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়া নবজীবন লাভ করি। বল দিদি আমার স্বামীর হইবে কি?" গম্ভীরস্বরে সুরমা বলিল " প্রেম, তোমার কথা রাখিব তোমার স্বামীকে আমি লইলাম। ছোট বোন কাতর ক্লিষ্ট ভাইয়ের সমস্ত ভার লইল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার স্মৃতি চিহ্ন বুকে পূরিয়া তোমার স্বামীর-আমার স্নেহশীল ভাইয়ের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইয়া রহিব। ভাইয়ের পাশে বোন, বোনের পাশে ভাই না থাকিলে সংসারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কোথায় বোন?" আমিও কাঁদিয়া বলিলাম "প্রেম আজ নবজীবন লাভ হইল। তোমার মুখে ভগবানের ছবি দেখিতে পাইতেছি। কামনা ত্যাগ না করিলে প্রেম, পরিশুদ্ধ প্রেম, জাগিতে পারে না ভগবান প্রেমময়। তাঁহাতেই জীবন মন অর্পণ করিয়া সুখে সংসারে রহিব। তোমার প্রেম ও তাঁহার প্রেম বুকে পূরিয়া "জয় প্রেমময়" বলিয়া সংসারে কাজ করিব। যাও যাও স্বর্গে যাও, আমরাও তোমার পশ্চাতে আসিতেছি। তুমি প্রফুল্ল মনে স্বর্গধামে যাও। সুরমা আমার মায়ের পেটের ছোট বোন, সে অবশ্য আমার যত্ন করিবে"। সকলে "জয় প্রেম ময়" বলিলাম।

রাত্রি তিনটার সময় সতী সাধ্বী প্রেমলতা হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেল। মৃতার মাথা সুরমার কোলে, আমি পাশে বসিয়া। সুরমা প্রেমে

আপ্লুত হইয়া ভগবান উদ্দেশে বলিল। "প্রেমময়—আজ নবজীবন লাভ হইল। তুমি প্রেমের আধার। আমরা অন্ধ হইয়া কি না ভুল করিয়া ফেলি। আজ চক্ষু ফুটিল। প্রভো প্রাণে বল দাও—যেন আমরা সহোদর সহোদরা মিলিয়া তোমার রাজ্যে—তোমার প্রেমের রাজ্যে তোমারই প্রেম বিলাইতে পারি।"

৪

তিন বৎসর অতীত। "প্রেমলতা সদন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুরমা মাতা হইয়া কত শত অনাথার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে তাঁহার মুখে সর্ব্বদা প্রেমের মধুর হাসি লাগিয়া আছে। আমিও "প্রেমলতা সদনে" পুরুষ অসহায়দিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। অবশ্য ইহার মূলে সুরমা, প্রেমলতা আর সর্ব্বাদিকারণ প্রেমময় ভগবান।

প্রাণে বড়ই শান্তি। সুরমা বোনের যত্নে আদরে আমার নব জীবন লাভ হইয়াছে। এখন প্রেমময় চরণ বড়ই ভালবাসি। সুরমা ও আমি একত্রে "প্রেমলতা সদনে" বসিয়া সেই প্রেমময়ের পদ প্রাণ ভরিয়া পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু।

সুবন্ধু।

বাসবদত্তা ভিন্ন কবি সুবন্ধুর অন্য কোন রচনা পাওয়া যায় না। বাসবদত্তা, প্রাচীনকালে যে প্রকার খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাতে মনে হয় যে এখানি অলঙ্কৃত গদ্যকাব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রচিত। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কবি বাণভট্ট যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও যেন ঐ অনুমান দৃঢ়তর হয়। বাণভট্টের কাদম্বরী এবং হর্ষচরিত গদ্যে লিখিত; এইজন্যই তিনি হয়ত হর্ষচরিতের মুখবন্ধে সর্ব্বপ্রথমে গদ্য রচনায় খ্যাতিপ্রাপ্ত সুবন্ধুর কাব্যের কথা, এবং তৎপরে কবি হরিশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে হয়ত পদ্যে ভিন্ন কাব্য রচনার প্রথা সমধিক প্রচলিত ছিল না বলিয়া, বাসবদত্তার কথায়, কবি বাণভট্ট লিখিয়াছেন:—

কবীনাম গলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া
শক্তেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্।

ভট্টার হরিশ্চন্দ্র, যে "মনোহারী" এবং "পাদবন্ধোজ্জ্বল" "গদ্যবন্ধ" লিখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। গদ্যে রচিত বলিয়াই হয়ত বাসবদত্তার নূতনত্ব; নহিলে ইহার কথাভাগ অতি সংক্ষিপ্ত। রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু, একদিন একটি "অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া" অশেষ রূপলাবণ্যবতী কুমারীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া বিরহাতুর হইয়া পড়েন। তাহাকে অনুসন্ধান

করিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যখন বিন্ধ্যপ্রদেশে গমন করেন, তখন শুকশারির মুখে "হৃদয়ফলকে চিত্রিত প্রিয়তমার" সন্ধান পাইয়া, মগধদেশে গমন করেন। মগধ-রাজকুমারী বাসবদত্তাও স্বপ্নে রাজকুমারকে দেখিয়া বিরহাতুরা ছিলেন। কন্যার অষ্টাদশ বর্ষ, বিবাহের উপযুক্ত বয়স বিবেচনা করিয়া, মগধরাজ স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজকুমার গোপনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বাসবদত্তাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে বাসবদত্তা বিন্ধ্যপ্রদেশে শিলাময়ী হইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজকুমারের স্পর্শে আবার মানবী হইয়া গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহিতা হয়েন এই গল্পটি কেবল বর্ণনার ছটায় দীর্ঘ হইয়াছে মাত্র। এই বর্ণনায় অনেকস্থলে বেশ কবিত্ব আছে বটে, কিন্তু রচনা "শ্লেষঃ প্রায়" বলিয়া, যত্নপূর্ব্বক ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে হয়।

এখন একবার বাসবদত্তার রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য কবিদিগের সময় নির্ণয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন।

বাণভট্ট যে ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহা তৎপ্রণীত হর্ষচরিত এবং হর্ষবর্দ্ধনের প্রস্তরলিপির তারিখ হইতে সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন ৬০৫ খৃষ্টাব্দে কনোজের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে যখন সুবন্ধু কৃত বাসবদত্তার উল্লেখ এবং প্রশংসা আছে, তখন সুবন্ধু এই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু কত পূর্ব্ববর্ত্তী?

বাসবদত্তার প্রারম্ভভাগে, বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি লোপের কথা উল্লেখ করিয়া, কবির গভীর আক্ষেপোক্তি আছে।

সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কং কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥

ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া লই। বাসবদত্তার প্রতি কথায় বিবিধ অর্থ ধ্বনিত হয় ; কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিয়াছেন। প্রত্যেক কথায় যে শ্লেষ অথবা বিভিন্নভাব নিবিষ্ট হইবে, তাহা তিনি নিজেই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সরস্বতী দত্ত বর প্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধু সুজনৈক বন্ধুঃ
প্রত্যক্ষর শ্লেষময় প্রবন্ধ বিন্যাস বৈদগ্ধ্য নিধি র্নিবন্ধং।

এখন কবির আক্ষেপের কথাটার অর্থবুঝিতে চেষ্টা করি বিক্রমাদিত্য রাজার কীর্ত্তি শেষ হইবার পর, সরোবর শুষ্ক হইলে যেমন তাহার রস শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীতে রসবত্তা বা বীর্য্যবত্তা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন অজ্ঞাত নর রাজারা (অজ্ঞাত অর্থে কন্ প্রত্যয় করিয়া নবকা সাধিত), বিরাজ করিতেছেন এরূপ স্থলে কোন্ ব্যক্তি না আমাদের প্রতি কি ব্যবহার (দুর্ব্যবহার) করিবে? এই গেল সোজাসুজি একটা অর্থ। সা (সেই) শব্দটিকে বিশেষণ না করিয়া, সরোবরের সহিত মিলাইবার জন্য সারস (পক্ষী) বত্তা করা যাইতে পারে, এবং নবকা (বক সমূহ) কঙ্ক (পক্ষী বিশেষ) প্রভৃতি যোগ ঘটান যাইতে পারে। তাহার পর আবার রসবত্তাকে শৃঙ্গারাদি অর্থাৎ

কাব্যগুণবক্তা করিয়া, নবকা বিলসন্তি অর্থে, নূতন হীন কবিগণ বলিয়া অর্থ করা যাইতে পারে। নবকা লইয়া আর একটি এই অর্থ হয় যে পূর্ব্বে নয় জন কবির খ্যাতি ছিল, এখন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের উপর হীনার্থে ক প্রয়োগ করিতে হয়। কং কঃ লইয়াও ঐরূপ অনেক অর্থ আছে। কিন্তু সমগ্র অংশের টীকা করিতে গেলে পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। সুবন্ধুর সময়ের অল্প পূর্ব্বে যে বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শেষ হইয়াছিল, তাহা ঐ শ্লোকের বিলসন্তি ক্রিয়াপদের বর্ত্তমান কাল প্রয়োগ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। "তিনি গেলেন, আর এখন এই দশা হইল," বলিলে বহু পূর্ব্ব সময়ের কথা বলিয়া মনে করা যায় না। এই বিক্রমাদিত্য যে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য, এবং তিনি যে ৫৪০ হইতে ৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা অন্য প্রবন্ধে লিখিয়াছি। হুয়েন সাং ৭ম শতাব্দীতে আসিয়া ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন, তাহা শুনিয়া গিয়াছিলেন। হুয়েন সাং একথাও বলিয়াছেন, যে বিক্রমাদিত্য হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ কবি মনোহৃৎ (তর্কে পরাজিত হইয়াই হউক অথবা বিরক্ত হইয়াই হউক), তাঁহার সভা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং বিক্রমাদিত্যের পর যখন শীলাদিত্য রাজত্ব আরম্ভ করিলেন তখন মনোহৃতের শিষ্য বসুবন্ধু প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং হিন্দু পণ্ডিতেরা পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হইয়া সভা পরিত্যাগ করেন। হুয়েন সাঙ্গের গণনায় শীলাদিত্য ৫৮০ পর্য্যন্ত মালবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানে বলিয়া রাখি, এই শীলাদিত্যের সহিত কনোজের শীলাদিত্যের কোন সংস্রব নাই। কনোজের শীলাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন, প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র এবং রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; এবং ইহার রাজত্ব ৬০৫ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ। এই দুইটি নাম লইয়া মোক্ষমূলর এবং রমেশচন্দ্র দত্ত গোলযোগ করিয়াছেন বলিয়াই একথাটি বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইতেছে।

বাসবদত্তার প্রারম্ভে আত্মকুলদ্বেষী খলদিগের প্রতি যথেষ্ট ভর্ৎসনা করা হইয়াছে; এবং তাহার পরেই আক্ষেপ করিয়া বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের শেষে অপণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়া আদৃত হইতেছেন বলিয়া লিখিত আছে। হুয়েন সাঙ্গের কথার সহিত মিলাইয়া লইলে, নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, যে সুবন্ধু, মালবরাজ শীলাদিত্যের সভা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভের শ্লোকগুলি—"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য" লিখিত হইয়াছিল বলিতে হয়। সুবন্ধুর গ্রন্থে বৌদ্ধদিগের প্রতি যে বিদ্বেষ দেখা যায় তাহাতেও যেন ঐ কথাই সূচিত হয়। শীলাদিত্যের রাজত্ব ৫৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়া থাকিলে, সুবন্ধু যে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মালব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া লইতে হয়। এরূপ অবস্থায় যদি প্রায় ৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাসবদত্তার রচনা কাল নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না।

সুবন্ধু যে উজ্জয়িনী হইতে মগধরাজদিগের আশ্রয়ে গমন করেন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার কাব্যের নায়িকা মগধরাজকুমারী পাটলিপুত্র হইতে

অপহৃতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গুপ্তরাজাদিগের ক্ষমতা লোপের পর, একদিকে নূতন মগধ গুপ্তদিগের রাজত্ব, এবং অন্যদিকে বর্দ্ধন রাজাদিগের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫৭০ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আদিত্যবর্দ্ধন এবং প্রভাকর বর্দ্ধনকে পাই। সম্ভবতঃ ইঁহাদের কাহারও আশ্রয়ে থাকিয়া সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করিয়াছিলেন।

মনোহৃতের শিষ্য বসুবন্ধুর সহিত সুবন্ধুর কোন সম্পর্ক ছিল কি ? পূর্ব্বকালে এক বংশের লোকের মধ্যে, এ প্রকার নামের মিল থাকিত; কবি খলের বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,

"যদয়ং ন কুলদ্বেষী স্বকুলদ্বেষী পুনঃ পিশুনঃ।"

তাঁহার দ্বেষ্টা কি তবে এই বসুবন্ধু? এ কথাটা আমার আন্দাজ মাত্র; কোন প্রমাণ বা ভিত্তি নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

ফাল্গুন, ১৩০৯।

১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী। ব্রিটিশ, জর্ম্মন ও ইতালীর চুক্তিপত্রের মুসাবিদা ওয়াসিংটনে স্বাক্ষরিত হয়।

২রা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ভিন জুইলা অবরোধের নিষেধাজ্ঞা শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক প্রচারিত হয়।...মাসিদোনিয়া বিদ্রোহীর নেতাগণ বন্দী হওয়ায় বিদ্রোহ দমিত হয়।...ব্রিটিশ কর্তৃক কানোর অবরোধ সংবাদ প্রকাশিত হয়।

৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী। পার্লিয়ামেন্টের পুনরধিবেশন অদ্য আরম্ভ হয়।

৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী। জাপানের প্রিন্স কুমাতসু ৫৫ বৎসরে পরলোক গমন করেন।

৭ই ফাল্গুন, ১৯এ ফেব্রুয়ারী। লেপ্টেনান্ট জেনারেল স্যর এন, জি লিটলটন দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।...নিউকাসল-অন-টাইনে Labour Committeeদিগের সমিতির অধিবেশন হয়।

৯ই ফাল্গুন, ২১এ ফেব্রুয়ারী। আমস্টার-ডাম নগরে ৯০.০০০ হাজার কুলি মজুর ধর্ম্মঘট আইনের প্রতিবাদার্থে একত্রিত হয়।

১৫ই ফাল্গুন, ২৭এ ফেব্রুয়ারী। পর্ত্তুগীজ মন্ত্রীসভা ভঙ্গ হয়।...ভিন জুইলার সহিত ফরাসী ও মেক্সিকানদিগের সন্ধিপত্রের মুসাবিদা স্বাক্ষরিত হয়।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮এ ফেব্রুয়ারী। গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারলণ্ডে ভয়ানক ঝড় হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হয়।

২৬এ ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ। নিউ ইয়র্ক নগরে ভয়ানক রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয়। অনেক লোক বিশেষ আহত হয়।...ছোটলাট বোর্দ্দিলন সাহেব কটক পরিদর্শন করেন।

২৭এ ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ। ছোটলাট বোর্দ্দিলন সাহেব পুরী পরিদর্শন করেন।

২৯এ ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত ও ভবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড। বৈশাখ, ১৩১০। ৩য় সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২॥০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩১০ সাল [৩য় সংখ্যা।

মেঘদূত।

ক। পাঠের যুক্তিযুক্ততা।

প্রথম প্রবন্ধে মেঘদূতের কত ভিন্ন পাঠ ও টীকাকারগণের মধ্যে কত পার্থক্য তাহার কিছু উদাহরণ দিয়াছি। ইহার সন্তোষজনক সামঞ্জস্য করা অনেক পরিশ্রমের দরকার ও অনেক কূটতর্কের আবশ্যক। তবে মোটামুটি লেখার জন্য আমি নিম্নলিখিত পন্থা নির্দ্দেশিত করিতেছি, বোধহয় তাহা পাঠকের নিকট অযুক্তিকর বলিয়া বোধ হইবে না।

পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য ধৃত পাঠ আন্দাজ ৮২০ খৃষ্টাব্দের, সুতরাং সর্ব্বপ্রাচীন। বল্লভদেবের টীকা আন্দাজ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে, সুতরাং টীকায় সর্ব্বপ্রাচীন। মল্লিনাথের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিবেচিত, সুতরাং বহুপ্রাচীন না হইলেও গ্রহণীয়। এখন এই তিনটা তুলনা করিয়া মূল বাহির করিলে আসল হইতে নেহাৎ ফারাক হইবে না। যে যে শ্লোক তিনটাতে পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ আসল। যে যে শ্লোক তিনে পার্থক্য তাহার মধ্যে সাধারণতঃ পার্শ্বাভ্যুদয়, কচিৎ বল্লভদেব, কচিৎ মল্লিনাথ গৃহীত হইবে; আলঙ্কারিক বা কাব্যগত সমালোচনার সাহায্যেও বাছিয়া লইতে হইবে।

এই পন্থায় চলিলে দেখা যায় যে পার্শ্বাভ্যুদয় ধৃত সমস্ত ১২০টি শ্লোক মল্লিনাথ ও বল্লভদেবে বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত "অম্ভোবিন্দুগ্রহণ চতুরাং" প্রমুখ শ্লোক মল্লিনাথে আছে বল্লভে নাই, ও "অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখগতং" প্রমুখ শ্লোক বল্লভে আছে, মল্লিনাথে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকটি কাব্যগত সমালোচনায় আসলের

হওয়া অসম্ভব নয় আর প্রথমটি মল্লিনাথ নিজেই একরকম প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন ; সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১২১ শ্লোক আসল ও তদ্ব্যতীত অপর শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, এমন অনুমান অযুক্তিকর নহে। শ্লোকীয় পাঠে কখন কখন অন্য অন্য টীকাকার ধৃত শব্দ কাব্যগত সৌন্দর্য্যের জন্য পছন্দ হইতে পারে, তখন তাহা গৃহীত হওয়া উচিত।

বাঙ্গলার শ্রীযুক্ত জীবানন্দবিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাব্যসংগ্রহ অন্তর্গত মেঘদূত প্রচলিত। তাহাকে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পরখ করিলে দেখা যায় যে মল্লিনাথীয় ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৭১, ৭৩, ৭৭, ৮০ এই সাতটি শ্লোক জীবানন্দীয় মেঘদূতে নাই, অথচ সেগুলি সম্ভবতঃ আসল শ্লোক ; ও জীবানন্দীয় ৯০ শ্লোক উপরোক্ত তিন পাঠে বা অন্য কোন টীকাকারে পাওয়া যায় না, সুতরাং সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত। এ ছাড়া মল্লিনাথের ধৃত প্রক্ষিপ্ত ২২শ শ্লোকও তাহাতে আছে।

খ। কাব্যে ভৌগোলিক বিবরণ।

মেঘের কাল্পনিক গতি বর্ণন সময়ে কবি যথার্থ ভৌগোলিক বিবরণ অনেক স্থানে দিয়াছেন। পূর্ব্বমেঘ তৎকালিক মধ্য ও উত্তর ভারতবর্ষের বিবরণে পরিপূর্ণ। তাহাদিগের যথাযথ চিহ্ন করা (identification) সমালোচকের এক প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। প্রাচীন টীকাকারেরা ও উইলসন সাহেব প্রমুখ আধুনিক সমালোচকেরা এই চিহ্নং কার্য্য কতক কতক চেষ্টা করিয়াছেন। সব জায়গায় যে ঠিক হইয়াছে বোধহয় না। আমার মতে যথার্থ চিহ্নতের জন্য প্রাকৃতিক ভূগোলের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক, কেন না মেঘের গতি পাহাড়, নদী অধিত্যকা প্রভৃতি দ্বারা সোজা, বা বক্র হয়। ভারতবর্ষের সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল উভয় জড়াইয়া কাব্যস্থ মেঘের নিম্নলিখিত গতি অনুভূত হয় :—

১। ওয়েনগঙ্গা নদীর ড্রেনেজ বেসিন্ (Drainage Basin)

২। রেবা বা নর্ম্মদানদীর ড্রেনেজ বেসিন্

৩। দশার্ণ বা পূর্ব্বমালবের অধিত্যকা

৪। অবন্তি বা পশ্চিম মালবের অধিত্যকা

৫। চর্ম্মন্বতী বা চম্বল নদীর ড্রেনেজ বেসিন

৬। কুরুক্ষেত্র বা পাণিপতের সমভূমি

৭। মধ্য হিমালয়গিরি পুঞ্জ

৮। কৈলাস গিরিপুঞ্জ

১। ওয়েন গঙ্গার ড্রেনেজ বেসিন্ (Drainage Basin)

(i) "রামগিরি" (১,১০৭ শ্লোক)।

রামগিরিতে যক্ষ নির্ব্বাসিত হয়, ইহা মেঘের যাত্রার আরম্ভ স্থান। মল্লিনাথের মতে রামগিরি চিত্রকূটাখ্য পর্ব্বত। রামায়ণীয় চিত্রকূটের যথার্থ স্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে, সচরাচর ইহা আধুনিক চিত্রকূট তীর্থের সহিত চিহ্নিত হয়। সে তীর্থ রামগিরি হইবে না, কেননা এই চিত্রকূট নর্ম্মদার অনেক উত্তরে, রামগিরি নর্ম্মদার দক্ষিণে। সারোদ্ধারিণী-মতে রামগিরি দণ্ডকারণ্যে, ইহাও পরিষ্কার নহে।

বেগলার সাহেব ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের সহিত রামগিরিকে চিহ্নৎ করেন (Archæological Survey of India Vol. XIII. pp. 31-35), ও সেই চিহ্নৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্যাখ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন [পৃ, ১৭, ২০]। ইহা যুক্তিসংঙ্গত বোধ হয় না। আম্রকূট পাহাড় ও রেবা নদী রামগিরির উত্তরে থাকা বর্ণিত হইয়াছে [শ্লোক ১৪, ১৬,১৯] ; কিন্তু রামগড় রেবার পূর্ব্ব, ও আসল আম্রকূটের পূর্ব্ব।

উইলসন সাহেব রামগিরিকে রামটেক বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা বোধহয় ঠিক। "টেক" মারাঠা ভাষায় "গিরি" ; উহা নর্ম্মদার দক্ষিণ ; ও উহা রামসীতার মন্দির প্রভৃতি নানা চিহ্নে পরিপূর্ণ (Arch. Surv. Ind. V. VII. pp. 109-115.)। এই ক্ষুদ্র গিরি আধুনিক নাগপুর সহরের ২৮ মাইল উত্তরে, ২৪°-৩৫′ অক্ষাংশ, ৭৯°-৪০′, দ্রাঘিমাংশ, ইহা গোদাবরীর উপনদী ওয়েন-গঙ্গার ড্রেনেজ বেসিনে অবস্থিত। এইখান হইতে মধ্যভারতের অধিত্যকা একরকম আরম্ভ বলিলে হয়।

রামগিরি হইতে নর্ম্মদা পৌঁছিবার পূর্ব্বে মেঘকেঁ যক্ষ বলিতেছে যে তুমি উত্তর মুখ হইয়া যাইয়া দিগ্‌হস্তিগণের স্থূল হস্ত অবলেপ এড়াইয়া "মালকে" আরোহণ করিবে। "কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ" (কিছুকাল পরে) পুনরপি উত্তরাগমনে আম্রকূট শিখরে বিশ্রাম কর।

(ii) "মাল" (১৬ শ্লোক)।

এই শব্দের নানা অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন, যথা "ক্ষেত্রসমূহং", "মালাখ্যং দেশং", "বনভূমিং", "গ্রামান্তরাটবীং" ইত্যাদি। উইলসন্ সাহেব ছত্রিশ গড়স্থ মালদা নামক স্থানের সহিত মালকে চিহ্নিত করিতে চান। কিন্তু সে রামগিরির ঢের পূর্ব্বে, মেঘের উত্তর গতিতে কোন মতেই পড়ে না।

মল্লিনাথ ধৃত উৎপলমালার অর্থই ঠিক বলিয়া আমার বোধ হয়। "মাল মুন্নতভূতলম্"। শাস্ত্রীমহাশয়ও সেই অর্থ নিয়াছেন (২১-২২পৃঃ)। ইংরাজিতে যাহাকে tableland বলে, মাল তাই। রামগিরি হইতে অধিত্যকা উত্তরে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে এইরকম সমতল উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

(iii) "আম্রকূট" (১৭ শ্লোক)।

সংস্কৃত টিকাকারেরা ইহাকে চিহ্নিত করেন নাই। সমাসবিচ্ছেদে ও মতভেদে, মল্লিনাথের মতে "আম্রাশ্চূতাঃ কূটেষু শিখরেষু যস্য সঃ"; সারোদ্ধারিণীর মতে "আম্রাণাং কূটো রাশির্যত্র সঃ"।

উইলসন্ সাহেব আম্রকুটকে নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকণ্যক পাহাড়ের সহিত চিহ্নিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন (ব্যাখ্যা, পৃঃ ২৩)। ইহা যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। অমরকণ্যক নর্ম্মদার পূর্ব্বে, রামগিরি ও মাল হইতে ঢের উত্তর পূর্ব্বে। মেঘের গতি ঠিক উত্তর, সুতরাং অমরকণ্যক যাইবার কথা নয়; দ্বিতীয়তঃ তথায় যাইতে হইলে তাহাকে প্রথমে নর্ম্মদানদী পার হইতে হইবে, তাহা কবির বর্ণনার সহিত মেলে না।

আমার মতে আম্রকূট রামগিরি ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকার কোন উচ্চ শিখরের নাম। সম্ভবতঃ আম্রবৃক্ষের প্রাচুর্য্য হেতু সেই নাম পাইয়াছিল। ওয়েনগঙ্গা উপনদী এই অধিত্যকার জল নিঃসারিত করিয়া দক্ষিণে চলিয়াছে।

১৪ শ্লোক দিগ্‌হস্তি গণের স্থূল অবলেপ এড়াইয়া যাইতে যক্ষ বলিয়াছে। তাহার মানে আছে। রামগিরি হইতে উত্তরে যাইতে হইলে মেঘের দুইদিকে উচ্চ পর্ব্বত মালা পড়ে, ডাইনে মাওলার পাহাড়সমূহ বামে পাচমারি মহাদেও পাহাড় সমূহ। সুতরাং মেঘকে ঠিক উত্তর যাইতে হইবে, অনেকটা ওয়েনগঙ্গার পথ ধরিয়া যাইতে হইবে। এই হেতু আম্রকূট অমরকণ্যক হইতে পারে না।

(২) রেবানদীর ড্রেনেজ বেসিন্ (Drainage Basin)

(i) "রেবা" (১৯ শ্লোক)।

"আম্রকূট" পার হইলে রেবানদী। রেবা নর্ম্মদার অপর নাম। যক্ষ বলিতেছে যে "উপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে" রেবা "বিশীর্ণ" হইয়া পড়িতেছে দেখিবে। বর্ণনাটা পড়িলে জব্বলপুর নিকটস্থ নর্ম্মদার অবস্থা মনে পড়ে। দিক ধরিলেও প্রায় তাই। সুতরাং তত্রস্থ rapidsর সহিত চিহ্নৎ করা যুক্তি সঙ্গত।

শাস্ত্রে রেবার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, এমনকি গঙ্গার সহিত তুল্য পবিত্রকর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

গঙ্গাস্নানেন যৎপুণ্যং তদ্রেবাদর্শনেন চ॥
যথা গঙ্গা তথা রেবা তথা দেবী সরস্বতী।
সমং পুণ্য ফলং প্রোক্তং স্নানাদ্দর্শন চিন্তনৈঃ॥

(ii) দশার্ণর "মার্গ" (২১ শ্লোক)।

প্রথমে নদীর "অনুকচ্ছ" ধরিয়া তৎপরে "দগ্ধারণ্য" গণের পথ দিয়া মেঘ "দশার্ণ" যাইবে। ইহাতে বোধ হয় মেঘ প্রথমে নর্ম্মদার ধার দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে যাইবে; তৎপরে অনুমান আধুনিক হোসঙ্গাবাদের নিকট পুনশ্চ অরণ্যের ভিতর উত্তরাভিমুখ হইয়া দশার্ণ বা পূর্ব্বমালব পঁহুচিবে।

শাস্ত্রী মহাশয় মল্লিনাথের "জম্বারণেষু" পাঠ লইয়াছেন (২৬ পৃঃ), কিন্তু পার্শ্বাভ্যুদয়, বল্লভ, সারোদ্ধারিণী প্রভৃতি অধিকাংশ পাঠে "দগ্ধারণেষু" আছে। ইহাই সম্ভব—কেননা গ্রীষ্মকালে বন সকল পুড়িতে থাকে বর্ষাগমে নির্ব্বাপিত হইলে তাহা হইতে অধিকতর সুরভিজাত হয়। ব্যাকরণ হিসাবেও দোষ পড়ে, কেননা "জম্বা" রাখিলে একটা "চ" কম হয় ও উহার কর্ম্ম অনেক দূরে থাকে। সুতরাং "দগ্ধারণ্যেষু" পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

যাহারা কখন ইটারসী হইতে ইণ্ডিয়ান মিড্‌লাণ্ড রেলওয়ে দ্বারা ভুপাল বা ঝান্সী গিয়াছেন তাঁহারা এই অরণ্য সমূহের বর্ণনা অনেকটা অনুভূত করিতে পারিবেন। মধ্যভারতের অধিত্যকাস্থ এই সব বনরাজীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্রষ্টব্য।

(৩) দশার্ণ বা পূর্ব্বমালবের অধিত্যকা।

(i) "দশার্ণাঃ" (২৪ শ্লোক)।

সংস্কৃত টীকাকারগণ ইহার স্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু বলেন নাই। এখন ইহা পূর্ব্বমালবের সহিত ঠিক চিহ্নৎ হইয়াছে।

দশার্ণ বহুপ্রাচীন দেশ, পাণিনিতে ইহার উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের বার্ত্তিকানুসারে ইহার ধাত্বর্থ দশ+ঋণ-দুর্গ। মহাভারত, হরিবংশ ও বৃহৎ

সংহিতায় অনেক স্থানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ইহা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল সন্দেহ নাই।

(ii) "বিদিশা" (২৫ শ্লোক)।

দশার্ণ দেশের "রাজধানী বিখ্যাত বিদিশা" "বেত্রবতী" নদীর তটে ছিল। সংস্কৃত টীকাকারগণ কিছু চিহ্নিত করেন নাই। উইলসন্ ইহাকে আধুনিক ভিল্‌সা বলেন। নামের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য সত্বেও ইহা আমার ঠিক বোধ হয় না। কেন না আধুনিক ভিল্‌সা বেত্রবতী বা বেতভানদী হইতে ৩। ৪ মাইল দূরে, ও ইহাতে গুপ্ত সম্রাটের বা তৎপ্রাচীনতর কালের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

আমার মতে বিদিশা বেশ্ নগরের সহিত অধিক মেলে। বেশ নগরের একধারে বেতভা নদী প্রবাহিত; ইহা প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহে পরিপূর্ণ (Arch. Surv. Ind., Vol. X.,pp. 36 ff.) ; ও বিদিশা হইতে "বিশা", ও বিশা হইতে "বেশ" অনায়াসে অপভ্রংশ দ্বারা হইতে পারে। বেশ নগরে অনেক প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুবৃহৎ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে বেশনগর অন্ততঃ দেড়মাইল লম্বা ও এক মাইল চৌড়া ছিল।

(iii) "নীচৈঃ" (২৬ শ্লোক)।

বিদিশার নিকটে "নীচৈঃ" নামে "গিরি" ছিল, যাহার "শিলাবেশ্ম" নাগরগণের বিহার স্থান ছিল। এই গিরি এখনও চিহ্নিত হয় নাই। আমার মতে ইহা বেশনগর সন্নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি পাহাড়। এই পাহাড় বেশনগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দুই মাইলের মধ্যে; ইহা বেশি উঁচু নহে, সর্ব্বোচ্চ চূড়া ৩৫০ ফুট উচ্চ মাত্র, ও ইহার মাঝখানটা অনেক নিচু; ইহা গুহায় পরিপূর্ণ, ও অনেক গুহায় তৈয়ারি বারান্দার চিহ্ন পাওয়া যায়; এবং অন্ততঃ গুপ্ত সম্রাটগণের সময় বিশেষ ব্যবহৃত হইত, কেননা কয়েক গুহায় গুপ্ত সম্রাট সমকালীয় শিলালিপি পাওয়া যায় (Arch. Sur. Ind., Vol. X, pp. 46 ff)। এই সব কারণে নীচাখ্য গিরি উদয় গিরি হওয়াই খুব সম্ভব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীমন্মোহন চক্রবর্ত্তী।

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ।

(২)

সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ভারতের অনেক বড় বড় ইংরাজ রাজপুরুষের এরূপ নিষ্ঠুর মত প্রচারিত হইয়াছিল যে বিনা-বিচারে সমগ্র বিদ্রোহীকুল নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য; নির্ব্বিশেষে ৫০। ৬০ হাজার সিপাহি ও তাহাদের সহচর-অনুচরগণকে তোপে উড়াইয়া দেওয়াই তাঁহাদের অভিপ্রায় ও রায় ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় দয়ালু বড়লাট ক্যানিং মহোদয় একাকী উক্ত পরামর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই। একারণ ভারতীয় ইংরাজ মহল বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহাকে "দয়াল ক্যানিং"* নাম প্রদান করেন। প্রাগুক্ত শ্বেতাঙ্গ মহাপ্রভুগণকে লক্ষ্য করিয়া ক্যানিং যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত তাঁহার এক পত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; উহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত। ঐ পত্রের এক স্থানে স্বদেশীয়গণের জঘন্য প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রণোদিত প্রলাপ-বাক্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া লজ্জা প্রকাশ করিতে ক্যানিং ত্রুটি করেন নাই, এবং যাঁহাদের নিকট সদ্ব্যবহার আশা করিতেন তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত এবম্প্রকার দলভুক্ত দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। † পত্রের অপরাংশে এরূপও প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে অবিশ্বাস হেতু রাজকার্য্যে বঞ্চিত রাখিয়া ভারতসাম্রাজ্য শাসন করা ইংলণ্ডাধিপতির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ‡

বড়লাট ডালহুসির সময়ে অযোধ্যাধিপতি ওয়াজেদ্‌আলি-শাহ সিংহাসন-চ্যুত হইয়া কলিকাতায় আনীত হন। অনেকের মতে এই অন্যায় অত্যাচার মহাবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। বিদ্রোহকালে অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজহস্তচ্যুত অরাজক অবস্থায় থাকিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরধিকৃত হয়।

---

* "Clemency Canning."

† There is a rabid and indiscriminate vindictiveness, even amongst many who ought to set a better example, which it is impossible to contemplate without a feeling of shame for one's countrymen."

‡ "It does not occur to those who talk and write most upon the matter that for the Sovereign of England to hold and govern India without employing and to a great extent trusting natives both in civil and military service, is simply impossibie.

সেই সময় ক্যানিং তৎসম্বন্ধীয় ঘোষণা প্রচার করেন। ইহাতে ভারতের পূর্ব্বতন গবর্ণর-জেনেরল এবং তখনকার বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট লর্ড এলেনবরা * অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একখানি তীব্র সমালোচনাপূর্ণ এবং ঘোরতর অসম্মতিব্যঞ্জক গুপ্তপত্র ক্যানিং সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। অযোধ্যা-হরণ ব্যাপার তাঁহার মনে এতই ন্যায়নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে তিনি উক্ত পত্র ভারতে পঁহুছিবার তিন সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর অনুমোদন জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। এলেন্‌বরার ঈদৃশ অন্যায় ব্যবহারে মহারাণী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান সচিব লর্ড ডার্বিকে এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করেন,—এলেন্‌বরার ন্যায় জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে রাজকার্য্যের সাধারণ নিয়ম এবম্প্রকারে লঙ্ঘন করা যার পর নাই শোচনীয় ব্যাপার। পুনশ্চ এলেন্‌বরা ভারতের রাজন্যবর্গকে নিজের নামে আত্মপক্ষসমর্থনার্থ রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় পত্রাদি লিখেন, তাহাতে মহারাণী বিশেষ ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন। † অব্যবহিত কাল পরে লর্ড ডার্বির নিকট ভিক্‌টোরিয়া কর্ত্তৃক আর একখানি পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে প্রকাশ করেন যে লর্ডক্যানিং সাহেবের বক্তব্য না শুনিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করা ভাল হয় নাই। উক্ত পত্রে ইহাও লিপিবদ্ধ ছিল যে অধস্তন কর্ম্মচারিদিগের সহিত তাঁহার এরূপ পত্রাদি আদান প্রদান বিশেষ বিঘ্নজনক, উহাতে তাহারা তাহা-দিগের উপরওয়ালাগণের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে প্রশ্রয় পায়। তার উপর আবার উক্ত নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণের মতের উপর নির্ভর করিয়া

---

* Lord Ellenborough, President of the Board of Control. Secret despatch.

† "It is a great pity that Lord Ellenborough, with his knowledge, experience, energy, and ability should be so entirely unable to submit to general rules of conduct. The Queen has been for some time alarmed at his writing letters of his own to all the most important Indian chiefs and Kings,, explaining his policy. All this renders the position of a Governor-General almost untenable, and that of the Government at Home very hazardous."

কার্য্যকরা সুশাসনের বিপ্লবোৎপাদক ব্যাপার। ‡ বোর্ডের অন্যান্য সভ্যগণ, পার্লামেণ্ট এবং লোক সাধারণ ভিক্‌টোরিয়ার মতেই মত দিলেন, সুতরাং এলেন্‌বরা দোষ স্বীকার করতঃ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ¶

---

‡ "Lord Ellenborough must be taken to have acted hastily in at once condemning Lord Canning without hearing the Governor-General on the other side. It is always dangerous to keep up a private correspondence with inferior officers, allowing them to criticise their superiors, but it is subversive of all good Government to act at once on the opinion given by inferiors."

¶ শুদ্ধ যে এলেন্‌বরাই অযোধ্যা হরণের বিরোধী ছিলেন, এমত নহে। ভারতে ও কয়েক জন ভাল ইংরাজ বহু পূর্ব্ব হইতে অযোধ্যাধিপতিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতে ছিলেন। রাজ্য-লোলুপ কোম্পানির অনেক দিন হইতে অযোধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তখনকার ইণ্ডিয়া-গেজেট নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবিষয়ে অনেক কথা আপন কাগজে প্রকাশ করেন। একদা তিনি লিখিয়াছিলেন :—

Truth must be told. The Government of Oude, administered by a half-civilised native prince, is bad. The government of the British provinces administered by civilised foreigners, is worse. It is to be hoped then we shall hear no more of usurpation as a remedy for the evils that oppress Oude. But is there no other remedy? Assuredly there is. If the Government have but the tact to abstain from personal interference and private patronage, there is now a most excellent opportunity of putting to the test of experiment a rational scheme of legislation, adapted to the circumstances of Oude. &c. &c. &c.

আর একজন ঐতিহাসিক লিখিতেছেন :—

"The truth ought never to be forgotten, which the Governor-General here so eagerly brings forward ;—*That the misery, produced, by those native governments which the company upholds, is misery produced by the Company, and sheds* disgrace upon the British *name.*"

লর্ড এলেন্‌বরার অদৃষ্টই মন্দ। ভারতে থাকিতে সোমনাথের কবাট লইয়া এক বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। কি জানি কোন্ কর্ম্মফলে সময়ে সময়ে ভারতের প্রতি তাঁহার একটু অতিরিক্ত প্রেম প্রকাশ পাইত। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধে জয়ী হইয়া গিজনী হইতে অপহৃত কবাটদ্বয় উদ্ধার করত ভারতে পুনরানয়ন করেন। এই উপলক্ষে মিস্রের নামে হিন্দী ভাষায় এক মহোল্লাসব্যঞ্জক খরিতা দেশীয় রাজগণের নিকট প্রেরিত হয়; এবং বিশেষ সমারোহ সহকারে সোমনাথে কবাট পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের ইংরাজ এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া উঠেন; সুতরাং কবাট আগ্রাদুর্গেই থাকিয়া যায়। অদ্যাপি সেইখানেই রক্ষিত।

বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মাঝা মাঝি রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে শান্তি সংস্থাপিত হইলে কোম্পানির হাত হইতে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষ শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন, এই মর্ম্মে মিত্ররাজন্যবর্গ ও প্রজা সাধারণের জ্ঞাপনার্থ একখানি উপযোগী ঘোষণাপত্রের প্রস্তাব হয় ; এবং তাহার পাণ্ডুলিপি মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয ; তিনি সে সময় ইউরোপীয় মহাদেশের কোন স্থানে বিরাজ করিতেছিলেন। যথোচিত মনোযোগের সহিত পাঠান্তে পাণ্ডুলিপিখানির ভাষা ও ভাব বিষয়ের গাম্ভীর্য্যের অনুযায়ী হয় নাই বলিয়া অমাত্য লর্ড মাম্স্‌বরির দ্বারা ফেরত পাঠাইয়া স্বয়ং লর্ড ডার্বিকে এইরূপ পত্র লিখেন :—ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপিতে অনেক দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক। বিবেচনা করা উচিত যে দশ কোটীর অধিক প্রাচ্য প্রজার শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণান্তর এক জন রমণী তাহাদিগকে সিংহাসন হইতে অভিবাদন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার শাসননীতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক, এবং গৃহবিবাদজনিত ঘোরতর রক্তপাতের পর যে সকল আশ্বাসবাণী ও অঙ্গীকার প্রজাবর্গকে প্রদান করা হইতেছে তাহা ভবিষ্যতে রক্ষা করা হইবে, এরূপ কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ থাকা চাই। এবম্প্রকার প্রয়োজনীয় ও মহৎ ঘোষণাপত্রে যেন দয়া দাক্ষিণ্য মহানুভবতা এবং বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রতি উদার নিরপেক্ষিতার ভাব প্রস্ফুটিত থাকে। ভারতের কৃষ্ণকায় প্রজা শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে সমান স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া কিপ্রকার উচ্চ অধিকার সমূহ ভোগ করিবে, তাহাও যেন বিশদরূপে প্রচারিত হয়।* মহারাণী অবশেষে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এই মহৎ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সুমহৎ কার্য্যের উপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করত যেন ঘোষণাপত্র সমাপ্ত করা হয়।† ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়া এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে তদ্বিষয়ক পত্রখানি প্রধান মন্ত্রীকে ডাকযোগে পাঠাইয়া তাহার

---

* "It should be borne in mind that it is a female sovereign who speaks to more than a hundred millions of eastern people on assuming the direct government over them, and after a bloody civil war giving them pledges which her future reign is to redeem, and explaining the principles of her government. * * Such a document should breathe feelings of generosity, benevolence and religious toleration, and point out the privileges which the Indians will receive in being placed on an equality with the subjects of the British Crown, and the prosperity following in the train of civilisation."

† "The Queen particularly wishes that the Proclamation should terminate by an invocation to Providence for its blessing on a great work for a great and good end."

পরক্ষণেই তার দ্বারা পাণ্ডুলিপিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। পরে তাঁহার উপদেশমত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিয়া তাহাতে এই কথা কয়টী যোগ করিলেন, "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং আমাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গকে বল প্রদান করুন যাহাতে আমাদের এই প্রজাহিতকামনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।" ‡ এই ভাবে স্বয়ং ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঘোষণাপত্র রাজস্বাক্ষর ও মোহরে অঙ্কিত হওত ভারতবর্ষে প্রচারার্থ বড়লাট সকাশে পঁহুছিলে ক্যানিং তাহা দেশের নানা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া রাজপ্রতিনিধির পক্ষ হইতে দুই চারি কথা যোগ করত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এলাহাবাদ নগর হইতে প্রকাশ করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে ভারতের প্রত্যেক রাজধানী ও জেলায় প্রধান রাজপুরুষ কর্ত্তৃক উহা পঠিত ও বিতরিত হয়। বাঙ্গালা ঘোষণাপত্রখানির অবিকল নকল নিম্নে দেওয়া গেল। ভাষা বা বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে যেখানে যেরূপ ভুল ভ্রান্তি আসল কাগজে আছে ঠিক তদ্রূপ রাখা হইল!—

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

আলাহাবাদ, ১৮৫৮ সাল। ১ নভেম্বর, সোমবার।

শ্রীযুক্ত গবরণর জেনরল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্থানে আজ্ঞা পাইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের সকল রাজগণের ও সরদার সকল লোকের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সকল রাজার ও সরদার লোকের ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর এই ঘোষণাপত্র। পরমেশ্বরের অনুগ্রহেতে গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের, এবং ইউরোপ ও আসিয়া ও আফরিকা ও আমেরিকা ও অস্ত্রালাশিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সংযুক্ত রাজ্যের লোকেরদের বসতিস্থানের ও সেই রাজ্যের বশতাপন্ন স্থানের মহারাণী ও ধর্ম্মরক্ষিকা শ্রীশ্রীমতী বিকটরিয়া।

---

‡ "May the God of all Power grant to us, strength to carry out these our wishes for the good of our people.'

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল দেশের কর্তৃত্ব কার্য্যের ভার এতৎকালপর্য্যন্ত আমারদের সপক্ষে কোম্পানি বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন সেই ভার, পার্লিমেণ্ট রাজসভাগত পরমার্থিক ও সাংসারিক লার্ড সাহেব ও কামন সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সকল লোকের নিকটে জানাইতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভাগত মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। ও উক্ত দেশের মধ্যে আমারদের যে সকল প্রজা বাস করে তাহারদিগকে এই আদেশ করি যে, তাহারা সকলেই বিশ্বস্ত হয় ও আমারদের নিকট ও আমারদের উত্তরাধিকারিরদের ও আমারদের পরে যাঁহারা রাজত্ব পাইবেন তাঁহারদের নিকটে সত্যভক্ত হইয়া থাকে ও আমারদের উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য্য আমারদের নামে ও আমারদের সপক্ষ হইয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমরা ইহার পরে সময়ে সময়ে যাঁহারদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করি তাঁহারদের আজ্ঞার বশে থাকে।

আরো আমরা আপনারদের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র পরিজন ও মন্ত্রি শ্রীযুত চারলস জান বৈকৌণ্ট কানিং সাহেবের ভক্তি গুণে ও ক্ষমতাতে ও সদ্বিবেচনাতে বিশেষমতে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাকে, অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুত বৈকৌণ্ট কানিং সাহেবকে, আমারদের উক্ত দেশের মধ্যে ও তদপরে আপনারদের প্রথম প্রতিনিধি ও গবরণর জেনরল করিয়া আমারদের নামে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য্য করিবার ও আমারদের নামে ও সপক্ষে সাধারণ মতে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আমারদের রাজ্যের প্রধান একজন সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা যে ২ আজ্ঞা ও বিধি সময়ে ২ আমারদের হইতে পাইবেন, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে যে সকল লোক যে ২ পদে এই ক্ষণে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বহাল রাখিলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমারদের যে কোন বাসনা ইহার পরে প্রকাশ হয়, ও যে সকল আইন ও কানুন ইহার পরে করা যাইবেক, তাহা বলবৎ মানিয়া তাঁহারা পদস্থ থাকিবেন।

ভারতবর্ষীয় সকল রাজগণকে এই কথা জানাই। কোম্পানি বাহাদুরের

য়া কিম্বা তাঁহারদের দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ রাজগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা গিয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিলাম, ও তাহা অবিকলরূপে মান্য করিব, ও সেই রাজগণও তদনুসারে অবিকল আচার করেন আমাদের এই অপেক্ষা।

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদের যত দেশ অধিকার হইয়াছে তাহার অধিক কিছু দেশ অধিকার করিতে চাহিনা। পরন্তু আমারদের যে দেশ কি স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের উদোগ হইলে আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণ হয় এমত অনুমতিও দিব না। আমরা আপনারদের স্বত্ব ও গৌরব ও সম্ভ্রম যেমন মান্য করি, তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজাগণের স্বত্বাদি মান্য করিব। আরো কোন দেশের মধ্যে শাস্তি ও সুশাসন না হইলে যে উন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে পারে না, তাহা আপনারদের প্রজাগণ প্রাপ্ত হয় আমারদের এই বাসনা যেমন থাকে, তেমনি ঐ রাজগণের পক্ষেও আমারদের সেই বাসনা আছে।

রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ হই, তেমনি আমারদের ভারতবর্ষ দেশস্থ প্রজাদের নিকটেও বদ্ধ আছি। আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্ত-রূপে ও সরল মনে নির্ব্বাহ করিব।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য, এই কথা আমরা দৃঢ়মতে বিশ্বাস করি ও ধর্ম্মেতে যে সান্ত্বনা পাই তাহা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই ধর্ম্মমত আমারদের কোন প্রজারদিগকে গ্রহণ করাইবার কোন ক্ষমতা স্বীকার করি না ও তাহা গ্রহণ করিতে চাহিও না। আমারদের রাজকীয় বাসনা ও ইচ্ছা এই। ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস কি ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া কোন কাহার প্রতি পক্ষপাত না হয় ও কোন কেহ ক্লেশ কি দুঃখ না পায়। কিন্তু আইন অনুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায়মতে ও বিনাপক্ষপাতে রক্ষা পায় এই আমারদের বাসনা। আরো আমারদের অধীনে যাঁহারা কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা পান, তাঁহারদের সকলকে আমরা এই দৃঢ় আজ্ঞা ও আদেশ করি যে, আমারদের প্রজারদের কোন লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাসেতে কি আরাধনাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমারদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইবেক।

আরো আমারদের এই বাসনা। আমারদের প্রজাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্তমতে সুশিক্ষিত হইয়া ও ক্ষমতাপন্ন ও সরল ভাবাপন্ন হইয়া আমারদের

কোন সিরিস্তায় কর্ম্ম করিতে যোগ্য হয়, তাহারা যে কোন বংশের কি ধর্ম্মের লোক হউক তাহারদিগকে সাধ্যপর্য্যন্ত বিনাবাধাতে ও বিনা পক্ষপাতে কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়। *

ভারতবর্ষের লোকেরা পৈতৃক যে ভূসম্পত্তি অধিকার করেন তাহাতে তাঁহারদের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই ভাব মান্তও করি, ও ভূমি সম্পর্কে তাঁহাদের যে সকল স্বত্ব থাকে সেই সকল স্বত্ব আমরা রক্ষা করিতে চাহি, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ দিতে হইবেক। আর আমারদের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করিবার ও সেই আইন আমলে আনিবার কার্য্যেতে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ও ব্যবহার পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্ত মতে মনোযোগ থাকে।

ক্ষমতা পাইবার লোভেতে যে লোকেরা অমূলক জনরব প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় লোকদিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহারদিগকে রাজবিদ্রোহ ব্যাপারে চালাইয়াছে, তাহারদের কর্য্যের দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল উপদ্রব ও যন্ত্রণা হইয়াছে তাহাতে আমারদের অত্যন্ত শোক হয়। সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন করিয়া আমারদের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যের পথে ফিরিয়া যাইতে চাহে, তাহারদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনারদের করুণা প্রকাশ করাই আমারদের বাসনা।

এক প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমারদের ভারতর্ষীয় রাজ্যের মধ্যে আরো শীঘ্র শান্তি হয় এই অভিপ্রায়ে, আমারদের প্রতিনিধি ও গবরনর-জেনরল বাহাদুর কোন ২ নিয়ম প্রকাশ করিয়া যাহারা সম্প্রতিকার গোলযোগে আমারদের কর্তৃত্বের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছে তাহারদের অধিকাংশ লোককে সেই নিয়ম মতে ক্ষমা পাইবার আশা দিয়াছেন, ও মহা অপরাধ প্রযুক্ত যাহারদের

---

* That no native of the said territories, nor any natural-born subject of his Majesty resident therein, shall, by reason of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the said Company." 118 Act of 1833.

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বৃটীশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয়; কিন্তু কোম্পানির আমলে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে যে ঠিক অঙ্গীকার মত কার্য্য হইয়াছিল, তাহাই বা কি প্রকার বলা যায়?

ক্ষমা হইতে পারে না তাহারদের যে দণ্ড হইবে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের প্রতিনিধির ও গবরনর জেনরল বাহাদুরের সেই কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম আরও এই কথা জানাইতেছি ও ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটনীয় প্রজারদিগকে হত্যা করিবার কার্য্যেতে সাক্ষাৎ লিপ্ত হইবার অপরাধ যাহারদের সাব্যস্ত হইয়াছে কি হয় তাহারদের প্রতি ন্যায্য বিচার অনুক্রমে দয়া প্রকাশ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের ভিন্ন ও তাহারদের ছাড়া অন্য সকল অপরাধির প্রতি আমারদের দয়া প্রকাশ হইবেক।

কোন লোকদিগকে হত্যাকারি জানিয়া যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছে, কিম্বা রাজবিদ্রোহ ব্যাপারের সরদার কি প্রবর্ত্তকরূপে যাহারা কর্ম্ম করিয়াছিল তাহারদের প্রাণ রক্ষা হইবেক, এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি কিন্তু যে ভাবগতিকে তাহারদিগের রাজভক্তি ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের দর নিরূপণ হইবেক। ও কুকল্পনার লোকেরা অমূলক যে জনরব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা অজ্ঞানেতে ত্বরায় বিশ্বাস করিয়া যাহারদের অপরাধ হইয়াছে তাহারদের প্রতি অধিকরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ হইবেক।

অন্য যে সকল লোক এইক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেছে, তাহারা আপনারদের ঘরে ও কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কর্ম্মেতে ফিরিয়া গেলে, আমারদের বিপক্ষে ও আমারদের রাজমুকুট ও সম্ভ্রমের বিপক্ষে তাহাদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা বিনা নিয়মে ক্ষমা করিব ও মনে তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করি। যাহারা আগামি জানুআরি মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ নিয়মমতে কার্য্য করে তাহারা সকলেই আমারদের এই অনুগ্রহ ও ক্ষমা পায়, আমারদের এই বাসনা।

পরমেশ্বরের প্রসাদে যখন দেশের মধ্যে শান্তি পুনরায় স্থাপন হয়, তখন ঐ দেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কার্য্যের উৎসাহ দান করা ও সর্ব্বসাধারণের উপকারের ও উন্নতির কার্য্যের সহায়তা করা ও ভারতবর্ষেতে আমারদের যে সকল প্রজা বাস করে তাহারদের মঙ্গলের নিমিত্তে দেশের কর্তৃত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমারদের অত্যন্ত বাসনা। প্রজারদের উন্নতি হইলে আমারদের বল হয়। তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে আমারদের নিরাপদ হয়। তাহারা কৃতজ্ঞ হইলে আমারদের উৎকৃষ্ট পুরস্কার হয়। প্রজারদের মঙ্গলের নিমিত্তে

আমারদের এই সকল বাসনা সফল করিতে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমারদিগকে ও আমাদিগের অধীন যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব কার্য্য করেন তাঁহারদিগকে শক্তি দিউন। *

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের ঘোষণাপত্র।

বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্ট। আলাহাবাদ। ১৮৫৮। ১লা নবেম্বর। ভারতবর্ষের ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বয়ং গ্রহণ করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন অতএব তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই সম্বাদ দিতেছেন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য কেবল শ্রীশ্রীমতীর নামে করা যাইবেক।

যে বংশের কি জাতির যে সকল লোক কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিয়া ইংলণ্ডের মান ও ক্ষমতার পোষকতা করিতে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাবধি কেবল মহারাণীর চাকর হইবেন।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরেল বাহাদুর তাঁহারদিগকে এই আদেশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্রেতে শ্রীশ্রীমতীর অনুগ্রহসূচক যে বাসনা ও ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে তাহা সফল করিবার জন্যে প্রত্যেক জন আপন ২ পদে ও সুযোগমতে ও সর্ব্ব মন ও শক্তির সহিত সাহায্য করুন।

শ্রীশ্রীমতী স্নেহ ও দয়ার বাক্য প্রয়োগে ভারতবর্ষের কোটি ২ প্রজারদিগকে রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রানুসারে ঐ সকল প্রজা ভক্তিভাবে আজ্ঞাবহ হয় এই কার্য্য প্রবল করিতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই ক্ষণে ও সদাসর্ব্বক্ষণে ত্রুটি করিবেন না।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

জি, এফ এডমনষ্টন

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সহিত ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।"

Printed at the Alipore Jail Press.

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

---

* এই শেষাংশটুকু ভিক্টোরিয়া স্বয়ং যোগ করিয়া দেন।

মায়া।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"Magyars" Said Kossuth extending his hand ' there is the road to your peaceful homes and firesides. Yonder is is the path to death; but it is the path to duty which will you take? Every man shall choose for himself. We want none but willing soldiers." The great body of the army replied by shouting with one voice, "Liberty or death."

যখন দুর্ভাগ্য হারাধন ও কুমুদিনীকে নায়েবের লাঠিয়ালগণ নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়ন করিতেছিল, তখন গ্রামের অনতিদূরে, পদ্মানদীতটে শ্মশানকালীর মাঠে, যাহা হইতেছিল তাহাই এখন বর্ণনা করি।

রজনীতে সেই স্থানে পূর্ব্বের মত লোকারণ্য। বিদ্রোহী কৃষকগণ দলে দলে সেখানে আসিয়া সম্মিলিত, কিন্তু পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন তাহারা অধিকতর অসংযত—মহেশ গ্রেপ্তার হওয়াতে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে কেমন একটা উন্মত্ত প্রচণ্ড ভাব প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে চারিটা দল হইয়াছে। ১। কেবল মুসলমান কৃষক—তাহাদিগের নেতা মোকারিম সেখ। ২। আর একটা দলে হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে যাহারা কতকটা ধীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান্ তাহারাই—তাহাদিগের নেতা যদু। ৩। অপর দলের শর্দ্দার ভীম বাগ্‌দী। এই দলের লোক সকলেই লাঠিয়াল, নীচ জাতি। ৪। চতুর্থ দলের নেতা ষড়ানন সর্দ্দার—ইহারা সকলে সড়কিওয়ালা।

সেই প্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ হইলে, অনেকে চীৎকার করিল—"মোকারিম," "মোকারিম"। মোকারিম একজন সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমান কৃষক। প্রতিদিন তাহার গৃহে ৪০। ৫০ জন অতিথির সেবা হইত। বিনা সুদে সে দায়ী কৃষকগণকে কর্জ্জ দিত। গ্রামে বিবাদ হইলে, লোকে তাহাকে শালিশ মানিত এবং সে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইত। যদিও সে মুসলমান, তথাপি সে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি বলিয়া, হিন্দুরা তাহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। মোকারিম যেমন একদিকে দয়ালু, অন্য দিকে তেমনি সাহসী। তাহার দেহ সুঠাম, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, তাহার বদন কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি শোভিত, মোটের উপর মোকারিম সেখকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারিত। যখন "মোকারিম," "মোকারিম," এই শব্দ সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া, প্রান্তরের এক সীমা হইতে অপর

সীমায় প্রতিধ্বনিত হইল, তখন মোকারিম মাঠের মধ্যবর্ত্তী স্তূপে আরোহণ করিল। হাজার হাজার মসাল সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘোরা রজনীর গাঢ় তমিস্রা বিদূরিত করিয়া দিবালোকবৎ আলোক রচনা করিয়াছিল। মোকারিমের সুন্দর মূর্ত্তি উজ্জ্বল আলোকে বেশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মোকারিমের কটিদেশে একখানি অসি ঝুলিতেছিল। মোকারিম, মুসলমান কায়দা অনুসারে, সেই বিরাট কৃষক-মণ্ডলীকে সেলাম করিল। তাহার পর নিজের শ্মশ্রুরাজি একবার হাত দিয়া যেন সরাইল। তাহার পর মর্ম্মভেদী স্বরে বক্তৃতা করিল :—

"ভাই সব, মুসলমান ভাই, হিন্দুভাই—কিছুদিন আগে এইরূপে রাত্রে, আমরা সকলে জমা হইয়াছিলাম, তখন এই উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া কে বক্তৃতা করিয়াছিল? কে তাহার বোলচালের তেজে আমাদের মাতাইয়াছিল? ("মহেশজি" "মহেশজি")।

'আজ সেই মহেশজি কোথায়? ("সে কয়েদ হইয়াছে") সে কয়েদ হইয়াছে, আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি! আমাদের জন্য যে ফকির হইয়াছে—গরিব রায়ত ভাইকে রক্ষা করিবার জন্য যে অকাতরে নিজের টাকা কড়ি দিয়াছে, নিজের জেনানার গহনা কাপড় বেচিয়াছে, যে আমাদের হিতের জন্য জমিদারের হাজার হাজার লাঠীয়ালকে তৃণজ্ঞান করিয়া, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, কতবার বিপদে পড়িয়াছে—যে আমাদের ভালর জন্য আমাদের খয়রিয়াতের জন্য, তার জানটা সঁপিয়ে দিয়াছে,—আজ সেই মহেশ কয়েদ—আর আমরা হাঁসছি খেলছি—কি আপশোষের বিষয়! কি সরমের কথা! তোমরা মহেশের মোকদ্দমায় খরুচ দিতেছ, সত্য। কিন্তু মোকদ্দমায় কি হয় বলা যায় না। যদি মহেশের ফাঁসির হুকুম হয় — তখন? আমরা বেঁচে থাকিতে মহেশ ফাঁসি যাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? (সকলে—"না, না, কখনই না") "না না" বল্‌ছ, যখন ফাঁসির হুকুম হবে তখন কি করিবে? (সকলে, "তখন আমরা মহেশকে ছিনিয়ে নেব") যদি তখনই ছিনিয়ে নেবে স্থির করেছ, তবে এখনই ছিনিয়ে লওনা কেন? মহেশ যেখানে হাজতে আছে, চল, সেখানে চল, আমার সঙ্গে চল। আমরা এত জনলোক—আমরা জেল ভেঙ্গে তাকে বের করে খালাশ করবো। কোম্পানী বাহাদুরের বন্দুক আছে, কামান আছে, তা আমি জানি। কিন্তু বন্দুক কামান আমি বুঝি না। আমি বুঝি আমাদের দোস্ত, আমাদের বন্ধু, আমাদের সর্দ্দার— মহেশ আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারিত, জান দিবার জন্য সকল সময়েই

মস্তায়িদ ছিল, আমরা কি তাহার জন্য জান দিতে পারি না ? (সকলে "পারি পারি, কেন পারিব না" ?) বহুৎ আচ্ছা।"

মুসলমানগণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল "আল্লা, আল্লা, হো" হিন্দুরা গর্জ্জিল "হর, হর।" তখন প্রচণ্ড-ভাব-ঝটিকায় যেন সেই লোকারণ্য মথিত হইল। অনেকে লাফাইতে লাগিল, অনেকে নাচিতে লাগিল, অনেকে বুক চাপড়াইতে লাগিল। একবার "আল্লা আল্লা হো," একবার "হর হর" নির্ঘোষ হইতে লাগিল। মুসলমান ও হিন্দু এক অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। মোকারিম স্তূপ হইতে নামিল। তখন ভীম বাগদী স্তূপের উপর উঠিল। ভীম দেখিতে ভীমের ন্যায়, যেমন দীর্ঘ তেমনই স্থূল, দেহ মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তক দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র, কেশ হ্রস্ব, হস্তে ভীষণ গদা। ভীম বলিল :—

"মোকারিম দাদা যা বলেছে, মুইও তাই বলি। মোর লাঠির আগে সব সিপাহী ভাগ্‌বে। মোর দলে ৪০০০ হজার বাছা বাছা লেঠিয়াল আছে। কুচ্ ডর নাই (তখন সকলে বলিল "বহুৎ আচ্ছা")।

ভীম নামিল। তখন সড়কিওয়ালাদিগের দলপতি ষড়ানন সর্দ্দার, হাতে একগাছি সড়কি লইয়া, স্তূপের উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং বলিল :—

"মোকরিম দাদা, ভীম ভাইয়ের যা মত, আমারও তাই মত। আমার দলের দুহাজার খুব ভাল সড়কিওয়ালা আছে, আমাদের সড়কির সাম্‌নে কে দাঁড়াতে পারে ? যখন সন্ সন্ করে আমাদের সড়কি ছুটবে, তখন তোমরা বড় মজা দেখ্‌বে। তখন সিপাহী ভায়ারা লেজ কুড়িয়ে বন্দুক ফেলে পালাবে। (সকলে, "আর দেরি কেন, চল, চল")।

তখন মোকারিম আবার স্তূপে লাফাইয়া উঠিল এবং বলিল :—

"ভাই সব, তোমরা এক টুক ছবুর কর। যদু এখনই সহর হতে ফিরে এসেছে। তোমাদিগকে কিছু বলিতে চাহে। তোমরা জান যদু মহেশের একজন দোস্ত। যদুকে মহেশ খুব ইযাতিবার করে খুব বিশ্বাস করে"। তখন যদু ঢিবির উপর উঠিয়া বলিতে লাগিল :—

"ভাই সব, গত কল্য আমাদের দলপতির ও গুরু মহেশের সহিত সাক্ষাৎ করেছিলাম। ("কেমন করে" ?) প্রবোধ বাবু আমার হাতে জেলদারগা মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি দেওয়াতে, জেল দারগা মহাশয় আমাকে জেল খানায় ঢুকিতে হুকুম দিলেন। মহেশের সহিত আমার দেখা হইল। ("মহেশ কেমন আছে") মহেশ ভাল আছে। (যদু সে মহেশের

হাতকড়ি দেখিয়াছিল তাহা বলিল না। অনেকে জিজ্ঞাশা করিল, "মহেশ কি বলিল") তোমরা একটুক ধৈর্য্য ধর, আমি সব বলছি। মহেশ প্রথমে বলিল:—

"আমি আমার জীবনের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহি। আমি মা কালীর পায় আমার জীবন, প্রজাদের উদ্ধারের জন্য, সঁপে দিয়েছি। যে মরিতে ভয় পায়, তার দ্বারা কি কখন কাজ হয়? তোমায় একটা কথা বলি, যদু। তুমি চিরদিন বিশ্বাসী বন্ধু। দেখ, একটা বিষয়ে আমি চিন্তিত। আমি এক্ষণ জেলে। নায়েব অতি পাষণ্ড। একবার আমার বৃদ্ধ পিতাঠাকুরের উপর অত্যাচার করিয়াছিল তা জান। আবার করিতে পারে। আর আমার স্ত্রী— নায়েব যেমন অত্যাচারী তেমনি লম্পট। সেই চামারের কিছুই অকার্য্য নাই। সে সব কুকার্য্য করিতে পারে। (অনেকে বলিয়া উঠিল "আমরা নায়েবের মাথা ভাঙ্গিব" যদু বলিল) শুন, মহেশ যা বলিয়াছে।

"মহেশ বলিল, শুন। যদু, আমার যে সন্ন্যাসী বন্ধু আছেন—সেবানন্দ স্বামী— তিনি আর তুমি, আমাদের পাড়ার দুর্গা গোয়ালিনীকে সঙ্গে করিয়া আমার পিতা ও স্ত্রীকে প্রবোধ বাবুর নায়েবের পরিবারের নিকট রাখিয়া আসিবে। যে দুই একদিন তাহাদিগকে সেখানে না লইয়া যাইতে পারিবে, সেই সময় কয়েক জন বিশ্বাসী ভাললোক আমার বাটীর চতুর্দ্দিকে পাহারা রাখিবে। বিলম্বে বিপদ জানিবে। (অনেকে "ঠিক ঠিক"। ভীম বলিল 'গদাধর, তুই ২০ জন ভাল ও বিশ্বাসী লাঠিয়াল নিয়ে এখনি মহেশের বাটীতে যা। সেখানে পাহারা দিস্'। গদাধর 'আচ্ছা' বলিয়া ২০জন লাঠিয়াল লইয়া মহেশের বাটীর দিকে চলিয়া গেল।)

"তাহার পর, মহেশ বলিল শুন যদু, কৃষকেরা আমাকে বড়ই ভাল বাসে, তারা আমার বড় অনুগত। আমাকে গ্রেপ্তার করাতে তাহারা খেপিয়া উঠিতে পারে এবং হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া নিজের ক্ষতি করিতে পারে। দেখিবে, যেন তারা রাগে কৃষক বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যায়। মোকদ্দমা যখন সম্পূর্ণ মিছা, এবং আমার পক্ষে যখন উকিল মোক্তার দিয়া তদ্বির করা হইতেছে, আর প্রবোধ বাবু যখন এই মোকদ্দমার কথা শুনিয়াছেন তখন খুব সম্ভব আমি বেকসুর খালাস হইব'। তার পর মহেশ বলিল—'যদু, তুমি ভাল করিয়া মোকারিম দাদাকে বলিবে যেন রাগে মাতিয়া জেল ভাঙ্গিয়া আমাকে খালাস করিবার চেষ্টা না করে। এরূপ বেয়াইনী কাজ করিলে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে কৃষকদিগের বিবাদ বাধিবে। তাহাতে সকল দিক

নষ্ট হইবে। সরকার বাহাদুর জমীদারদিগের অনুকূল হইলে প্রজাদের আর রক্ষা নাই। সরকার বাহাদুরের সহিত লড়িবার কোন কারণ নাই ; যদি কারণ থাকিত, যদি সরকার বাহাদুরের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গাম করিলে আমাদের কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, আমি জেলে থাকিয়াও বলিতাম, "লড়"—মহেশ বলিল আমাকে যদি সরকার বাহাদুর ফাঁসিও দেয়, তাহলেও তোমরা সরকার বাহাদুরের সহিত লড়িওনা।

"তোমাদিগের মধ্যে সাহেবদিগের সহিত যে লড়িবে সে আপনার গলায় আপনি ছুরি দিবে। আমি খালাস হইলেও আমি ইংরাজদিগের সহিত লড়িব না। তোমরা যদি কোন কারণে ইংরাজদিগের সহিত লড়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের দলে আর থাকিব না। আমাকে যখন কনষ্টেবলরা ধরে, তখন আমি শিঙ্গা বাজাইলে কত চাষার মরদ জুটিত। আমাকে অনায়াসে তাহারা কনষ্টেবলদিগের হাত হইতে ছিনিয়া লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পাছে আমাকে লইয়া একটা অনর্থক হাঙ্গামা হয়, পাছে সেই হাঙ্গামাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়, তাই আমি শিঙ্গা বাজাই নাই, নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করি নাই। তবে যদি আমরা দেখি—সরকার বাহাদুর আমাদের ন্যায্য কথাতে কান দিলেন না, আমাদের মুখের দিকে তাকাইলেন না, জমীদারের সহায় হইলেন, জমীদারের অত্যাচারের সহায়তা করিতে লাগিলেন, তখন মহেশ সাহেবদিগের তোপের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাবে না। আমিও বলি তোমরা সকলে নিশ্চয় জানিও, তখন মোকারিম দাদা ও মহেশ গুরুজী, তোমাদের আগে তরওয়ার হাতে করে, তোপের গুড়ুম গুড়ুম শব্দের মধ্যে, আগুন আগুণ গোলাবৃষ্টির মধ্যে, কামানের উপর লাফিয়ে পড়বে— ("হর হর" "আল্লা আল্লা হো") নিজের প্রাণ দিয়ে সাহেবদিগের বুঝিয়ে দিবে, যে কৃষাণ ভাইদের কষ্ট মিথ্যা নহে। সাহেবদিগের সেই কষ্ট সমজাইয়া দিবার জন্য এক্ষণও চাষাদিগের মধ্যে মোকারিম ও মহেশের মত লোক আছে সেই আমাদিগের বড় ভাগ্য। মহেশ ও মোকরিম দাদা মরিতে ভয় করে না, এ কথা কে না জানে? তবে মহেশজী বলে, মোকারিম গোচ্ছা হয়ে, কাম ভুলনা। মহেশ আমাকে বলিল—যদু—তুমি মোকারিম আর সমুদয় কৃষাণ ভাইকে বলিও যে পূর্ব্বে যখন আমি কয়েদ হইনি, তখন ও যেমন সকলে আমার কথা শুনিতে এখন, আমি জেলে, এখনও যেন তেমনি কথা শুনে" (সকলে "মহেশের কথা শুনিব"।)

তৎপরে একজন দীর্ঘায়ত কৃশ কায়স্থ সেই স্তূপের উপর উঠিল। তাহার মাথায় শিখা, স্কন্ধে উত্তরীয়। সে গ্রামের গুরু মহাশয়। তাহার নাম কালীকৃষ্ণ বসু। নায়েব তাহার একটা লাখরাজ জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিল। তাহাতে সে একদিন কিছু কড়া কড়া কথা বলিয়াছিল। তাই নায়েব হুকুম দিয়া পেয়াদার দ্বারা গলায় গামছা দিয়া তাহাকে কাছারীতে আনিয়া দুই ঘা জুতা মারিয়াছিল। সেই অপমানের শোধ লইবার জন্য কালীকৃষ্ণ বিদ্রোহিদিগের দলে মিশিয়াছিল।

কালীকৃষ্ণ বলিল—"বাপু সব, মহেশ যা বলে তাই করাই ভাল তার আর সন্দেহ নাই। মহেশ এই কথা বলে, জমীদারকে নেয়াও, নায়েবকে শাসন কর। তা হলে লাখরাজ জমী বাজেয়াপ্ত হবে না, খাজনা বাড়িবে না, অত্যাচার হবে না, কিন্তু বাপু, এ পর্য্যন্ত নায়েবকে শাসন করবার কি করেছ? নায়েব খুব বুক চাড়া দিয়ে, গোঁপে তা দিয়ে, রসিক নাগরটীর মত হেঁসে খেলে বেড়াচ্ছে আরা কাছারী গিয়ে ত পূর্ব্বের মত দুম্ দড়াম্ হুকুম হাকাম দিতেছে। তার জন্য আর কুলের বৌরা ঘাটে যাইতে পারেনা, গৃহস্থের আর জাতি ধর্ম্ম থাকে না—জমী জমা ত চুলোয় যাউক—এক্ষণ যে নিত্য ঘরের বৌ নিয়ে টানাটানি (এই শুনিয়া চাষারা বলিতে লাগিল চল শালার মাথা ভাঙ্গি—সুয়ারকাবাচ্ছা,—উসকা শিরলেঙ্গ) আজগে প্রাতে আমাকে একজন বল্‌ছিল দাদা মহাশয়, শুনেছ নাকি আজ রাত্রিতেই নায়েব মহাশয় কার বৌ বার করর্বে, লাঠিয়াল বেহারা সব ঠিক হোয়েছে ("গরদান লেঙ্গে, সব চলো, চলো কাছারি তরফ চল")। হাঁ বাপুসব, যদি কাজ করিতে চাহ, তা হলে চল কাছারি—বেটার চুলের মুটি ধরে মুখে ঘা কতক জুতা লাগালেই বেটা খুব দোরস্ত হইয়া যাইবে।"

এমন সময়ে দূরে শৃঙ্গ নিনাদ শুনা গেল—একটি—দুটী তিনটী—মুহূর্ত্ত মধ্যে হাজার শৃঙ্গ বাজিয়া নৈশগগন ভেদ করিল। সেই মহাজনতা বাত্যাতাড়িত সিন্ধুতরঙ্গের ন্যায় ছুটিল—যে দিক হইতে প্রথমে শৃঙ্গধ্বনি আসিয়াছিল, সেই দিকে সকলে ছুটিল।

কতকদূর যাইতে যাইতে দুই জন কৃষক বেঁটো ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতবেগে আসিয়া খবর দিল—নায়েব হারাধন ও মহেশের স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

ঐ কথা শুনিবামাত্র—সকলে বলিতে লাগিল "মার মার মার মার," আর ছুটিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কিছু কাল পরে কৃষকগণ কাছারী বাটীর নিকট, মার মার শব্দে আসিয়া, কাছারী ঘিরিয়া ফেলিল। কাছারী হইতে শব্দ হইল—"কোন হ্যায়?" বাহির হইতে উত্তর হইল—"শালা, তোমারা বাপ হায়।" কাছারীর একটা জানালা সট করিয়া খুলিয়া দুরুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। একজন মুসলমান চাষার পায় গোটাকতক ছড়্‌রা গুলি লাগিল—সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া "আল্লা আল্লা হো" করিয়া উঠিল। আর সমুদয় মুসলমান ঐরূপ গর্জ্জন করিল।

এদিকে ষড়ানন সর্দ্দার যেমন বন্দুকধারীকে ঘরের ও বাহিরের উজ্জল আলোকে দেখিল, অমনি একটী সড়কি, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িল। বন্দুকধারীর স্কন্ধ সড়কিতে বিদ্ধ করিল। হিন্দুরা "হর হর হর বোম" করিয়া উঠিল। এদিকে যদু হাঁকিল "সব আদমি বন্দুকের নিশানা হইতে সরিয়া দাঁড়াও।" সকলে জানালার মুখ হইতে সড়িয়া দাঁড়াইল। মোকারিম বলিল "ভীম ভাই তুমি দরজা ভাঙ্গ, আর আমি মই দিয়া প্রাচীর টপকাই—আর ষড়ানন ভাই তুমি ঘরে আগুন লাগাও। ষড়ানন সর্দ্দারের লোক জলন্ত মশাল চালের দিকে উঁচু করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। ভীম নিকটবর্ত্তী একটী গৃহস্থের বাটী হইতে একটী বৃহৎ ঢেঁকি আনিয়া তাহার এক পাশে দুই জন আর এক পাসে দুই জন, চার জন দুই পাসে ধরিয়া "হেঁইয়া—নায়েবের মাথা ভাঙ্গি—হেঁইয়া" এইরূপ বলিতে লাগিল, আর সেই ঢেঁকি ভূমির সমন্তরাল ভাবে দরজার গায় সজোরে মারিতে লাগিল। দরজা সেকেলে, শাল কাষ্ঠে বড় বড় লৌহ প্রেক বিদ্ধ—কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ আঘাতে ঝন ঝন করিতে লাগিল। পরে তাহার হাঁসকল ভাঙ্গিব ভাঙ্গিব হইল, তখন ভিতরের অনেক লোক দরজা চাপিয়া ধরিয়া থাকিল। এদিকে ভীমের লোক "হেঁইয়া, হেঁইয়া" বলিয়া দরজার উপর আঘাত করিতে লাগিল—আর দরজা অধিকতর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অন্যদিকে মোকারিম একখানি মই জোগাড় করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনের উপায় করিতে লাগিল। মোকারিমের কটিদেশে তরবারি। মই দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া "আল্লা আল্লা হো" বলিয়া লাফ মারিয়া ভিতরে পড়িল। তাহাকে চারিজন লাঠিয়াল আক্রমণ করিল। কিন্তু মোকারিম অপূর্ব্ব কৌশলে তরবারি সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং দরজা খুলিয়া দিবার

জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হইল। এদিকে ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ ভীষণ আঘাত আর সহ্য করিতে না পারিয়া দরজা ভূতলে পতিত হইল। তখন স্রোতের ন্যায় বিদ্রোহী কৃষক সকল কাছারী বাটীর ভিতর আসিতে লাগিল। সেখানে খুব লড়াই হইল। কিন্তু মোকারিম, ভীম ও ষড়াননের দলের লোকের রণ-কৌশলে শীঘ্রই কৃষকদিগের জয় লাভ হইল। কাছারির পেয়াদারা সটান পালাইল।

আমলারাও কতক কতক পালাইল। কিন্তু পেশকার আর আমিন পালাইতে পারিল না, আর ষড়ানন তাহাদিগের দুইজনকে ক্যাঁক করিয়া ধরিল। মোকারিম ও যদু একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, হারাধন পীঠমোড়া বাঁধা মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার একখানি হাত আর একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতেছে। যদু তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলিল, মুখে জল দিল, বাতাস করিতে লাগিল। হারাধনের সংজ্ঞা হইল, চক্ষু মিলিল, বলিল—বা—বা—য—দু, আমার—সময়—হয়েছে, মুখে—গঙ্গাজল দাও—"আমার জন্য—ভেব—না। বৌ-মার ধর্ম্ম—র-ক্ষা—কর—সেখানে শীগ্‌গির যাও—তোমরা—মায়া—মায়া—হরি—হরি—"। ভক্ত নিরপরাধী হারাধন বিষ্ণুপদে আপনার পবিত্র আত্মা অর্পণ করিল।

এদিকে কাছারী বাটীর ভিতর দুই খানি ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সমালোচনা।

নিয়ু ইণ্ডিয়া (New India)—ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্র নবপর্য্যায়)

বৈশাখের বঙ্গদর্শনে "রাজকুটুম্ব" নামক প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে :—

নিয়ু ইণ্ডিয়া কাগজ খানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশল গুলি দেখি না। সম্পাদক যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাম্ভীর্য্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদ সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেক দূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।"

নিয়ু ইণ্ডিয়া কাগজ খানি আমরাও আহ্লাদ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু তিনি বঙ্গদর্শনের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তিনি বলেন জাতীয় জীবন, বিস্তারে ও জটিলতাতে, এই ৩০ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বর্ত্তমান বঙ্গদর্শন তাহারই উচ্চতম অভিব্যক্তি। জাতীয় জীবন এই ত্রিশ বৎসরে যে রূপেই বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়া থাকুক, আমাদিগের বিশ্বাস কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মজীবনে, কি মনুষ্যত্বে, এই ত্রিশ বৎসরে জাতীয় জীবনের অনেকটা অধোগতি হইয়াছে।—সেই অধোগতি, সেই আসরতা, সেই আত্মস্তুতিমোহ, বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতেছে। সংবাদ পত্রে—কোথায় হরিশ্চন্দ্র বা কৃষ্ণদাস পালের হিন্দু-পেট্রিয়ট, আর কোথায় বর্ত্তমান হিন্দু-পেট্রিয়ট এবং অন্যান্য সংবাদপত্র! ধর্ম্মপ্রচারে—কোথায় যুগপ্রবর্ত্তক কেশব, আর কোথায় তাঁহার শিষ্যগণ! সাহিত্যে—কোথায় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম, আর কোথায় বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ। প্রবাসীতে জনৈক লেখক বঙ্কিম বাবুর "কমলাকান্ত" নাম লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। তাহাতে ব্যঙ্গনিপুণ সুরসিক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার, প্রয়াগে কমলাকান্তের পিণ্ডদান হইতেছে এই মর্ম্মে একটি অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে বোধ করি নকল কমলাকান্ত আর প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। বিজয় বাবু যাহা নকল কমলাকান্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন নকল বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে অনেকে তাহাই মনে করেন। রবীন্দ্র বাবু যখন কেবলমাত্র সাহিত্য সম্বন্ধে লেখেন তাঁহার প্রবন্ধ প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু তিনি যখন জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন, তিনি প্রায়ই, কল্পনার তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, সুযুক্তি ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের তীর হইতে বহুদূরে চলিয়া যান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত "রাজকুটুম্ব" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব—

"আমাদের অক্ষমের দুর্ব্বলতা ইহাদের (ইংরাজদিগের) সক্ষমের দুর্ব্বলতা"। সুতরাং "আমরা মাথা তুলিতে পারি। অর্থাৎ ইংরাজ ও আমাদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু "অক্ষম" ও "সক্ষম" এই দুই শব্দে যে মস্ত পার্থক্য রহিয়া গেল তাহা লেখক ভুলিলেন। সক্ষমের দুর্ব্বলতা অর্থে ক্ষমতাশালী গুণশালীর দুর্ব্বলতা। সুতরাং ইহাতে সক্ষমের গুণ এবং দুর্ব্বলতার দোষ উভয়ই আছে—ঐ রূপে অক্ষমের দুর্ব্বলতাতে, শক্তিহীনের দুর্ব্বলতাতে, অক্ষমের দোষ এবং দুর্ব্বলতার দোষ, অর্থাৎ কেবল মাত্র দোষই আছে। লেখকের কথাতেই হইল, ইংরাজের গুণও আছে দোষও আছে। আমাদের ক্ষমতা

(গুণ) নাই অথচ দোষ আছে। এক "ক্ষমতার" ভিতর অনেক গুণ থাকিল। ইংরাজ পূর্ণ জীব তাহা কেহ বলেন না। ইংরাজের অনেক গুণ আছে, দোষও আছে। এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের গুণ অতিশয় কম, দোষ এবং অভাব অধিক। সুতরাং যতদিন এই অবস্থা থাকে, যতদিন দেহের শক্তি অপেক্ষা মস্তকের উপর (দোষের) বোঝা অধিক, ততদিন "আমরা মাথা তুলিতে পারি" না।

২। "কর্ত্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড় নহে। *** সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্যায় ক্ষমতায় ইহাদের (সাহেবদিগের) সমান হইতে পারি"— এক "সুযোগ পাইলে" ইহার মধ্যে লেখক নিজেই আত্মোক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। ইংরাজ বেশি বড় ; কারণ "সুযোগ" তাহারা নিজেই করিয়া লয়, আমাদিগের মত অন্যের নিকট সুযোগ পাওয়ার জন্য তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে না। "সুযোগ পাইলে" অর্থে ইংরাজের আশ্রয়ে থাকিয়া যদি আমরা সুযোগ পাই ; কারণ ইংরাজের আশ্রয়চ্যুত হইলে রুষিয়ান বা অন্য কোন জাতি আমাদিগের পদদলিত করিবে। "বেশী বড় নহে "—তবে তারা আশ্রয়দাতা, আর আমরা আশ্রিত, এই যা প্রভেদ। বাঙ্গালী ভীরু, রবীন্দ্র বাবু তাহার কৈফিয়ত দিতেছেন। কিন্তু ভীরুতার কারণ যাহাই হউক ভীরুতা ভীরুতা, ভীরুতা আর কিছুই নহে, ঘৃণিত শোচনীয়।

৩। "আমরা একান্নবর্ত্তী তাই পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্ত্তি পাইবার স্থান নাই।" এ কথা অযৌক্তিক। প্রাচীন হিন্দুগণও একান্নবর্ত্তী ছিলেন, তাহাতে তাহাদের সাহস খর্ব্ব হয় নাই। এখন হিন্দুদিগের মধ্যে রজপূত প্রভৃতি যে সকল জাতি লড়াই করে তাহারাও একান্নবর্ত্তী। অধুনা আমাদিগের সমাজে "একান্নবর্ত্তী" হইয়া থাকা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে, তাহাতে সাহস বাড়িতেছে না।

৪। "যদিও ইংরাজ অন্যায়কারীর গায়ে ঘুষি তুলিবার মত স্ফূর্ত্তি কাহারো থাকে, তবে বিচারালয় আছে।" অর্থাৎ অন্যায় বিচারে দেশীয় ব্যক্তির জেল বা গুরুদণ্ড হয় বলিয়া হিন্দু ভীরু হইয়াছে। এ কথাও নিতান্ত ভ্রান্ত। সাহসের লক্ষণই এই যে ইহা মৃত্যু বা জেলকে ভয় করে না। সাহসী জাতির ভিতর, যখন কর্ত্তব্যের ভেরী নিনাদিত হয়, বা অপমানের অঙ্কুশ যখন তাড়না করে, তখন সহস্র সহস্র পুরুষের হৃদয় আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ প্রাণ দিবার জন্য লাফাইয়া উঠে। এক্ষণেও মুসলমানদিগের মধ্যে একটু পদার্থ আছে, তাহারা মৃত্যুভয়ে সদা বিধূনিত নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাহাকে আমরা

"ছোট লোক" বলি তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণও একটু মনুষ্যত্ব আছে। প্লেগের প্রথম উৎপাতে আমাদিগের গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে "যদি তোমাদিগের পরিবারের অঙ্গ পরীক্ষা করিবার জন্য গোরা আইসে তোমরা কি করিবে"? সে উত্তর করিল, "আমরা মূর্খ গরিব লোক, আমরা এক গাছি করিয়া লাঠি লইয়া ঘরে থাকি। গোরা আসিলে, এক মাত্র সম্বল লাঠি। প্রাণ যতক্ষণ থাকিবে লাঠিতে যত দূর হয় তাহাই দেখিব"। আমার মনে হইল—আমরা শিক্ষিত লোকত এই মনুষ্যত্বের কথা বলিতে পারি না। আমরা প্রবন্ধ লিখিতে পারি, বক্তৃতা করিতে পারি, "এসোসিয়েসন" করিতে পারি, কংগ্রেস করিতে পারি, কিন্তু এই বিনীত অশিক্ষিত গোয়ালার ন্যায় নিজের পরিবারের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত নহি। রবীন্দ্র বাবু এই জাতীয় ভীরুতার গভীরতম, ঘৃণ্যতম, অতলস্পর্শ দুর্দ্দশাকে "সহিষ্ণুতা" নাম দিয়া, কিরূপে ধর্ম্মের নাম গ্রহণ করিতে পারেন তাহা বুঝি না।

৫। "আমরা যদি যথার্থ ভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্য নিজেকে হেয় বলিয়া অন্যায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন" রবীন্দ্রবাবু কি অর্থে "সহিষ্ণুতা" ব্যবহার করিয়াছেন জানি না। "সহিষ্ণু"* যদি ক্ষমাশীল অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যেখানে প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা নাই সেখানে "ক্ষমা" হইতে পারে না। যখন বাধ্য ও নিরুপায় হইয়া কষ্ট (বা অপমান) ভোগ (বা সহ্য) করি তাহাকে যদি একান্ত "সহিষ্ণুতা" বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু এইরূপ সহিষ্ণুতার কিছুই প্রশংসা নাই। এবম্বিধ সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মের সহিত কোন সংস্রব নাই। রবীন্দ্র বাবু বঙ্গদর্শনে যে সকল জাতীয় প্রবন্ধাবলী লিখিতেছেন—আমাদিগের বিবেচনায়, তাহার মূল সূত্র ভ্রান্ত, তাহা অনেক স্থানে যুক্তি-বিরুদ্ধ ও স্বজাতিস্তুতিমোহে অভিভূত। তাহার ফল অনিষ্টজনক। তবে রবীন্দ্র বাবুর ভাষার মধুরতা ও কবিত্বে প্রবন্ধ গুলি সুপাঠ্য তাহা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি! তিনি স্বদেশকে ভাল বাসেন। কিন্তু কোন কোন জননী যেমন সন্তানকে এত ভাল বাসেন যে তাহার দোষ দেখিলেও বাহিরে তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে বড়ই কষ্ট অনুভব করেন—স্বীকার করিতে পারেন না,—কেহ তাহার দোষ উল্লেখ করিলে "না না" বলিয়া উদ্বেলিত স্নেহভরে তাহাকে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরেন, সোহাগ করেন এবং

---

* "সহিষ্ণুঃ সহনঃ ক্ষন্তা তিতিক্ষুঃ ক্ষমিতা ক্ষমী"

তাহার দোষকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন,—রবীন্দ্র বাবুরও স্বদেশবৎসল কোমল হৃদয় তেমনি হতভাগ্য স্বজাতির দোষ দেখিয়া দেখে না, দোষের কথা উঠিলে, দোষকে কল্পিত গুণের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া, তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া আদর করে। যে স্নেহাধিক্য হইতে এই দুর্ব্বলতা নিঃসৃত হয় তাহা মধুর ও সহবেদনার্হ। তথাপি এই দুর্ব্বলতা বর্জ্জনীয়, কেননা সন্তান ও স্বজাতির পক্ষে এই স্নেহজাত পক্ষপাতিতা অনিষ্টজনক এবং ভাবী মঙ্গলের অন্তরায়।

নিউ ইণ্ডিয়ার ভাষার কায়দা এবং স্বজাতি-পক্ষ-সমর্থন চিত্তহারী। আমরা বারান্তরে তাহা বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিব।

আরতি।

(সমালোচনা।)

পুস্তক খানি কবিতার গুচ্ছ, ইহার প্রণেতা শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, মূল্য ১৷৷০। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই প্রমথবাবুর অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় সুন্দর।

পুস্তকখানিতে ১২টি কবিতা আছে ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক একটি নাতিদীর্ঘ খণ্ডকাব্য আছে। 'গৌরাঙ্গ' অধুনা বর্দ্ধিতাকারে ভিন্ন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে গ্রন্থকারের "গীতিকা" সমালোচনাকালে বলিয়াছিলাম যে প্রেমবিষয়ক কবিতার বঙ্গভাষায় অত্যধিক ছড়াছড়ি, তাহার উপর এই বিষয়কে বিদেশীয় রঙে চিত্রিত করিবার প্রবৃত্তিটা ক্রমে ক্রমে এত বাড়িয়াছে যে তাহা অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা দেখিয়া প্রীত হইলাম যে কবি তাঁহার কবিতা হইতে প্রেম বেচারিকে দিন কতক অব্যাহতি দিয়াছেন। অন্যান্য কবিরা উক্তরূপ প্রণালী অনুসরণ করিলে বঙ্গভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

পুস্তকখানির প্রথম কবিতা 'আরতি'। কবিতাটির ভাব অতি উচ্চদরের। নমুনা স্বরূপ—

"সেইতরে গান, জ্বালা আছে যার,
পোষা নাহি যায় বুকে ;" (পৃঃ ৩)
লক্ষ্য হয় তার,—সুনীল আকাশ,—
সুকুমার তনুরুচি।

বিশাল বিশ্বেরে ঊর্দ্ধপানে টানে
তার আঁখিধারা মুছি ॥ (পৃঃ ৪)
দেখিতে দেখিতে ছড়ায়ে সে পড়ে
লোক-লোকান্তর ময় ;
সে যে কভু ছিল একেলার গান,
কার সাধ্য চিনে লয় । (পৃঃ ৪)

এইত গান ! যাহাতে নিজের ব্যথা বিশ্বের মঙ্গল ; যাহা প্রকৃতির পদে আপনার উৎসর্গ ;—

কোন নবসত্য, অপূর্ব্ব নির্ঘোষ
জাগিবে ভুবন ভরি ; (পৃঃ ৬)

এই ত গান ! যেখানে কবি অবতীর্ণ দেবতার মত, শরীরী ঝঙ্কারের মত, বেগবতী নদীর মত নামিয়া আসেন ; যেখানে কবি এই সংসারের বিগ্রহ-বিচারের মধ্যে শান্তি আনেন, রোদনের মধ্যে শুভবার্ত্তা আনেন ; যেখানে হৃদয় ফাটিয়া গান বাহির হয় ;—সেই ত গান ! বাইরণ এইরূপ গান গাহিয়াছিলেন, শেলি এইরূপ গান গাহিয়াছিলেন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ এইরূপ গান গাইয়াছিলেন। নহিলে "ফিরিতেছি তার পিছু পিছু, সে ত কভু নাহি চাহি ফিরে"—ইহা গান নহে, ইহা ন্যাকামি, ইহা প্রলাপ, ইহা কবিতাদেবীর লাঞ্ছনা ! প্রেমকে একবারে বর্জ্জন করিতে বলি না। কিন্তু সে গান গাহিতে জানা চাই ! যাহাতে অন্তঃস্থল আলোড়িত হয়, চক্ষে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, সে গান গাহিতে পারো ? তবে শুনিব ! নহিলে ভারতচন্দ্রের অধর সুধা, আর অপাঙ্গ, আর পয়োধর, এ কামের কীর্ত্তন শুনিলে এখন হুঙ্কার আসে ; আবার এদিকে জাতীয় প্রেমকে হ্যাটকোট ধারি, চুরোট সেবী ও 'বাই জোভ'ভাষী দেখিলে গায়ে জ্বর আসে ।

কবি দুঃখ করিয়াছেন :—

"আদি অকৃত্রিম সে সাহস কই
এবে সঙ্গীতের মাঝে ?"

আমরাও সেই দুঃখ করি ।

দ্বিতীয় কবিতাটি "বর্ষমঙ্গল"। ইহা পুরাতনের সহিত বিদায় গ্রহণ ও নূতন কে অভ্যর্থনা। কবির অনুভূতির সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু কবিতাটি অতি নিস্তেজ।

"এস, হে নূতন
স্বর্গভ্রষ্ট আত্মার মতন!"

বড়ই নিস্তেজ

তৃতীয় কবিতার নাম 'দুঃখের সীমানা'। যদিও নামের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ অত্যল্প, তথাপি কবিতাটি উত্তম।

"ভাবিতাম আমাদেরি চাহি
ফুটে ফুল নভে উঠে তারা'; "
"একদিন চেয়ে দেখি, শেষে,
সেই ফুল, সেই তারা হাসে
সবাই জুটেছি খেলাঘরে,
সঙ্গী এক আর নাহি আসে।" (পৃঃ ২০)

এইরূপ যখন কবি বিষাদাচ্ছন্ন :—

তখন কে তুমি স্নেহভরে
ধরায় পাঠায়ে দাও আলো;
অজ্ঞানের কক্ষে কক্ষে পশি
কে তুমি আঁধারে দীপ জ্বালো! (পৃঃ ২১)

তখন কবি বুঝেন যে—

"আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে ঠেকি'
বিপ্লবে বিগ্রহে উঠে, পড়ি,
শৃঙ্খলাই হতেছে সুদৃঢ়
নব নব শুভ সূত্র ধরি।"
"স্থির ইহা,—ক্রমোন্নতি পথে
উঠিতেছ অকূর্ণ জগৎ। (পৃঃ ২৩)
"আমাদের আপনা বলিতে
যে যেখানে আছে বিশ্বময়,
জন্ম জন্ম আছে তারা সাথে,
নূতন আত্মীয় কেহ নয়!"

৪র্থ কবিতা "সিন্ধুর প্রতি" উক্ত। সমুদ্রই পড়ুন। আমার ভাবার্থ নিম্নলিখিত গল্পটিতে বোঝা যাইবে! মদীয় কোন আত্মীয় কবিতা তত বুঝিতেন না ও পড়িতেনও না। তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় হেমবাবুর 'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতাটি পড়িয়াছেন কি?" মদীয় আত্মীয় উত্তর করিলেন 'এ কবিতা কবি লিখিয়াছেন প্রিয়তমার প্রতি, আমি পড়িব কেন? তাহা তাঁহার প্রিয়তমা পড়ুন! আমিও সেইরূপ বলি যে এ কবিতা কবি সমুদ্রের প্রতি লিখিয়াছেন সমুদ্র পড়ুন, এবং পারেন ত বুঝুন। এ কবিতাটিতে অনেক সংস্কৃতকথা আছে

বটে, কিন্তু কবিতা অত্যন্ত কৃত্রিম। ইহাতে স্তবক গুলির প্রারম্ভে "গর্জ্জ গর্জ্জ" "বহ বহ" "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" "ঢাল ঢাল," "শোন শোন" "হান হান" এবং "নমো নমঃ" শব্দগুলি কেমন বিকট ঠেকে। তার পরে সমুদ্রকে "ঢালো ঢালো সুধা ধারা" এ অনুরোধ কিরূপ? সমুদ্রকে কবি যে অসাধ্য সাধন করিতে বলিতেছেন। এ কবিতাটিতে একটা বিষম প্রয়াস ও কষ্ট কল্পনা লক্ষিত হয়! অনেক উপমা আছে, শব্দচাতুরী আছে, কিন্তু ভাবগুলি যেন অনেক পায়ে ধরিয়া সাধিয়া আনিতে হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

"বিপত্নীক ও বিধবা" নামক কবিতাটির মর্ম্ম "পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে অবলা রমণী বলে একই কি সয়রে।" কবি কিন্তু বিধবাকে পুনর্বি-বিবাহ করিতে বলিতেছেন না। তিনি বিধবার পতিপ্রাণতা বর্ণনা করিয়াছেন।

বিপত্নীকের পুনর্বিবাহের প্রণালীটি একান্ত আকস্মিক। যেন তাহার পতন ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে এটি গদ্যে লিখি-লেই ভাল হইত। কবিতাটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

"আভীর দম্পতি" "ভীষ্ম" ও "রাণীর রণযাত্রা" এতিনটি কবিতা অতি উচ্চ অঙ্গের। তাহাদিগের হইতে উদ্ধৃত করা চলে না। কবিতাগুলি আমূল পড়িতে হয়। "রাণীর রণযাত্রা" কবিতাটির তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। "ঝান্সী দিবনা ছাড়ি" এই কথাটি যেন রাণীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়াছে। সমরের প্রারম্ভে রাণীর দৃঢ়তা ও স্বদেশানুরাগ, এবং সৈন্যদিগের দৃপ্ত রাজভক্তি অতি জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে শরীর কণ্টকিত হয়।

গৌরাঙ্গ নামক কবিতাটি এখন স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তাহার স্বতন্ত্র সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তবে একটা কথা বলি যে প্রমথ বাবুর ভাষা এখনও দোষবহুল। তাহা কানে বড়ই বাজে। সংস্কৃত ও গ্রাম্য কথার অসহনীয় মিলন

"রটা কবি রটা
রৌদ্রে নাই মাধবীর ছটা"

ইহা comic songএর উপযোগী, গম্ভীর রচনার নহে। তাহার উপরে "জগময়" "নিরাময়" "অতশত" "একস্তরে" ইত্যাদি শব্দগুলি দেখা যাইতেছে কবির একান্তই প্রিয়। এ শব্দগুলির কলিকাতা অঞ্চলে প্রয়োগ হয় না। আর এক কথা—"অশ্রু কাপিছে নয়নে" "জরি পুরাতন" "মর্ত্ত পদে পদে ভুগে" "সঘন নয়ন জলে" কিরূপ যেমন উত্তম ব্যঞ্জন খাইতে খাইতে হঠাৎ একটা আধটা

কঙ্কর দন্তে বাধিয়া সমস্ত আহারের সুখটাই নষ্ট করে, তাঁহার এইরূপ পদাবলিও সেইরূপ; হঠাৎ আসিয়া হৃদয়ে আঘাত লাগে। তাঁহার ভাষাসংস্কারও একান্ত প্রয়োজনীয়।

পুস্তকখানি উপাদেয়। প্রমথ বাবু তাঁহার পূর্ব্ব প্রণীত পুস্তিকাবলিতে যে ক্ষমতার আভাস দিয়াছিলেন এই পুস্তক খানিতে তাহার বিকাশ হইয়াছে। আমরা তাহাতে যেন হেম বাবুকে ফিরিয়া পাইতেছি। তাঁহার কবিতার উত্তরোত্তর বিকাশ হউক।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

চৈত্র, ১৩০৯।

২রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ। ভারত সুহৃদ মিঃ কেন এর মৃত্যু হয়।

৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ। ন্যাসনালিষ্ট কর্ত্তৃক ইউরাগুয়ায় ভয়ানক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।... ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯০২।৩ সালের আয় ব্যয় বিবরণী পেশ হয়।

৬ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ। শোভাবাজারের বিখ্যাত মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ্চ। বুদাপেস্তায় কেসথের মৃত্যুৎসবোপলক্ষে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ হয়।

৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ। সুলেখক, ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা ডিন ফারারের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। ইনি ১৮৩১ সালে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন।...ইউরাগুয়া বিদ্রোহের শান্তি সংবাদ আসে।

১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ্চ। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় লবণ করের হ্রাস ও ১০০০, হাজার টাকার আয়ের উপর আয়কর নির্দ্ধারণের আদেশ হয়।

১৩ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ্চ। ভারতবর্ষে দিল্লী দরবার সমাপনান্তে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া সস্ত্রীক ডিউক অব কনট লণ্ডনে পৌছেন।... চিল্লিতে ভূমিকম্প হয়।

১৪ই চৈত্র, ২৮শে মার্চ্চ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ১৯০৩।৪ সালের বাঙ্গালার আয় ব্যয় বিবরণী পেশ হয়।

১৫ই চৈত্র, ২৯শে মার্চ্চ। মাসিদোনিয়া দ্বীপে ভীষণ ঝটিকা (সাইক্লোন) হয়। তাহাতে উপকূলবর্ত্তী অনেক নগর বিধ্বস্ত হয়।

১৬ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ্চ। মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় মান্দ্রাজ আয় ব্যয় বিবরণী পেশ হয়।.. ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজ কর্ত্তৃক সকেটো অধিকৃত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

১৯শে চৈত্র, ২রা এপ্রেল। মিত্রভিজার নিকটে ভির্ডচার্ণ নগরে ভয়ানক যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাতে ২০০ লোক হতাহত হয়।...ইংলণ্ডেশ্বর লিসবন নগরে পৌছান এবং তথায় বিশেষ সমাদৃত হন।

২১শে চৈত্র ৪ঠা এপ্রিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।...ডাঃ ওয়েস কাণ্টারবরির ডিন নিযুক্ত হইলেন।

২৫শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল। সপ্তম এডবার্ড জিব্রাল্ট্রারে পৌছান। ... ৪০,০০০ কুলিমজুর রোমে ধর্ম্মঘট করিয়াছে কিন্তু কোনরূপ অশান্তির সূচনা হয় নাই। ..বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়।

২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল। প্রিন্স ইয়ংলুর মৃত্যু হয়।

২৯শে চৈত্র ১২ই এপ্রেল সোমালী প্রদেশ হইতে মোল্লার পলায়ন সংবাদ আসে।...আলজেরিয়ার গভর্ণর জেনারেল ম্বিভরই পদত্যাগ করেন।

তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। ২য় সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২।৹ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

কংগ্রেস ও দরবার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

Madras, June 9.

The Industrial Exhibition to be held in connection with the National Congress in Madras this year is receiving a good deal of influential support. Lord Ampthill, in addition to a donation of Rs. 300 already announced, is lending a collection of wood carvings. The Hon'ble Messrs. Thomson and Forbes, members of the Madras Government, have given donations, and other officials, European and native, are actively showing sympathy with the movement.

(*Telegram—The Statesman, 10-6-03*).

আমি কংগ্রেস ও দরবার সম্বন্ধে নবপ্রভার ২ খণ্ডে ১২শ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া আমার কংগ্রেসভুক্ত বন্ধুগণ এইবার আমার উপর বিরক্ত হন নাই, তাহাতে আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। একখানি কংগ্রেসপোষক সংবাদপত্রের সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত সম্পাদক উক্ত প্রবন্ধকে সমধিক চিন্তাশীল ও সুধীর সমালোচনা (very thoughtful and sober criticism) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে আমি এই মনে করি যে, চিন্তাশীল কংগ্রেস-ব্যক্তিগণ, কেবলমাত্র "ভিক্ষাং দেহি" চীৎকার দ্বারা দেশের যে উন্নতি হইবে

না তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাতে আমার মনে আশা হয় যে, যদিও আমাদিগের মতামত ও যুক্তি আপাততঃ কংগ্রেস পোষক বন্ধুদিগের মতামতের ও কার্য্যের বিরোধী হইতে পারে, তথাপি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বুঝিতেছেন ও বুঝিবেন যে আমরা কংগ্রেস-বিদ্বেষী নহি, আমরা কংগ্রেস-সংস্কার-প্রয়াসী। রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারে, দুই নৌসেনাদল পরস্পরের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিল। পরে উষার উন্মেষে, উভয় পক্ষের জাহাজের মাস্তুলে একই স্বজাতীয় ধ্বজা উড্ডীন দেখিতে পাইল—তখন বুঝিল, তাহারা উভয়েই একই দেশের সৈন্য, একই রাজার অধীন, একই স্বার্থে আবদ্ধ—তখন উভয় দলের সৈন্যগণ, ভ্রান্তিজাতরণে ক্ষান্ত দিয়া, পরস্পরকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিল। আমরা উভয়দলই একই দেশের সৈন্য, একই জাতীয় পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান, একই স্বার্থে দৃঢ়বদ্ধ। যদি কখন আমরা পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করি, তাহা ভ্রমের অন্ধকারে।

আমি নবপ্রভার ১ম খণ্ডের ৫৪৪ পৃঃ "কংগ্রেস (হর্ষ না বিষাদ)" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা অতিশয় দুঃখে। সুতরাং তাহার ভাষা তিক্ত হইয়াছিল। আমার অনেক আত্মীয় ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া আমাকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করিয়া কেহ বা বিরক্ত, কেহ বা আমার জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা আমাকে দুই একটী কঠিন কথাও বলিয়াছিলেন। এমন কি নবপ্রভার অন্যতর সম্পাদক—যিনি বহুকাল হইতে কংগ্রেসের একজন উৎসাহী "ডেলিগেট"—তিনিও আমার প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার আন্তরি · বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা; তজ্জন্য আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যথা লাগিয়াছিল। আমি তাঁহাকে ও আমার অন্যান্য বন্ধুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে আমি বিদ্বেষবশতঃ কিছু লিখি নাই। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা সরল বিশ্বাস ও গভীর দুঃখের সহিত লিখিয়াছি। কংগ্রেসের একজন প্রধান-নেতা সুরেন্দ্রবাবু। তিনি অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাঁহার নানাবিধ গুণে যেমন অনেকে মুগ্ধ, আমিও তেমনি মুগ্ধ, এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা আমি আমার জীবনের একটী সৌভাগ্য বিবেচনা করি। মহাত্মা দাদাভাই নায়রজির রাজনৈতিক প্রচার-কার্য্য আমি বাল্যকাল হইতে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাদিগের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। এতদ্ভিন্ন কংগ্রেসে অনেক ভাল লেখক আছেন। তথাপি আমা-

দিগের দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলি এমন গুরুতর যে, কোনও পন্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, দেশের অবস্থা, শাসকদিগের মনের গতি, আমাদিগের নেতারা এতাবৎকাল যে পথে চলিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা, অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় কার্য্যের বা আন্দোলনের গতি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন কি না, তাহা স্বাধীন ও প্রশান্ত চিত্তে সকলেরই আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। দেশের চারি পাঁচ জনের হস্তে চিন্তার ভার অর্পণ করিলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন হইবে না। যদি আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচনা করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগের নিজের মতামত থাকা আবশ্যক। কেননা, যাঁহাদিগের নিজের মতামত নাই, প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, তাঁহাদিগের কেহ প্রতিনিধি হইতে পারে না আর যাঁহারা নিজে বিচার না করিয়া অন্যের মতে চলিয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদিগের কোনও মতামত নাই সুতরাং বর্ষে বর্ষে বিরাট্ মণ্ডপে সম্মিলিত হইয়া, বাগ্মীর সুললিত পদবিন্যাস-প্রবাহের উচ্ছ্বাসে গা ঢালিয়া দিয়া, করতালি দ্বারা কোন মন্তব্যের অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে, এই সকল বার্ষিক মন্তব্য-প্রকাশে কি ফল হইতেছে বা হইতে পারে, তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই স্থির-আলোচনায় এই প্রশান্ত চিন্তায় আমরা যাহা বুঝিতে পারি, যে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় হয়, তাহা আমাদিগের নেতাগণের নিকট সসম্মানে নিবেদন করা উচিত— যদি আমরা বুঝি যে, বক্তৃতা যতই ভাল হউক না কেন, কেবল তাহাতে ভারতবাসীর মোক্ষলাভ হইবে না—কেবল সম্মিলিত যাত্রাতে কোন জাতির উন্নতি হয় নাই—যদি আমরা অনুভব করি আত্মচেষ্টা স্বাবলম্বনই জাতীয় উন্নতির প্রাণ—তাহা হইলে নেতাগণকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যে, আপনারা যদি বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, কেবল ভিক্ষার পাণ্ডুলিপি রচনা বা স্বাক্ষর করিয়া স্বদেশপ্রেমিকতার কার্য্য সম্পাদিত হইল বিবেচনা করেন—তাহা হইলে আপনাদিগের প্রতিভা, অনুকরণে বা অভিনয়-ক্রিয়ায় চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে যতই সমর্থ হউক না কেন, আপনারা জাতীয় বিকাশের নেতা হইবার যোগ্য নহেন। যে প্রচণ্ড ইংরাজ শক্তি, মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দরবারে, সেদিন তোমাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই শক্তির নিকট তোমাদিগের বাক্যবীর্য্য কার্য্য-দুর্ব্বলাত্মক আবেদন পত্র লইয়া উপেক্ষিত ও উপহসিত ও

ঘৃণিত হইবার জন্য যাইও না। শাসকদিগের চক্ষে আমাদিগের ঘৃণিত জাতীয় জীবনকে অধিকতর ঘৃণিত করিও না। কংগ্রেস, শ্রমের সহিত, অধ্যবসায়ের সহিত, আত্মনির্ভরের সহিত, আত্মত্যাগের সহিত, শূন্যবাক্যনিনাদ পরিত্যাগ করিয়া, একবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করুক, শাসকদিগের দরবার তাহাকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

আত্মনির্ভরের কথা কংগ্রেস এতদিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। গত দুই বৎসর হইতে কংগ্রেস তাহা শুনিতেছেন। আশা হয়, ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, আত্মনির্ভরের উপর দণ্ডায়মান হইবেন। এক্ষণে যেন সেই বিরাটসভার সম্মিলিত হৃদয়, ধীরে ধীরে স্বাবলম্বনের দিকে চালিত হইতেছে—আস্তে আস্তে সেই বিরাটমণ্ডপে নবালোকের আভা ফুটিতেছে, অরুণোদয়ের পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্বগগন আস্তে আস্তে সিন্দুররাগে রঞ্জিত হইয়া ভাস্করের পূর্ণপ্রভার পূর্ব্বসূচনা করে, তেমনি শিল্পকংগ্রেসে যেন পূর্ণ আত্মনির্ভরের আলোক ও পূর্ণপ্রতিভার পূর্ব্বসূচনা যেন দেখিতেছি—এক্ষণ ইহা অস্ফুট, সত্য; কালে যে স্বাবলম্বন মহাবৃক্ষের শাখা প্রশাখা, বিশাল ভারতভূমির উপর একদিন প্রসারিত হইয়া, তাহার তাপিত দেহ ও প্রাণে সুশীতল ছায়া দান করিবে, বুঝি বা তাহার বীজ শিল্পকংগ্রেসে বপন করা হইল। বুঝি বা স্বদেশিগণ যাহা ইংরাজ "কাপুরুষের বৃথা আর্ত্তনাদ" বলিয়া ঘৃণা করে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, নীরবে দৃঢ়চিত্তে স্বকীয় বলবিকাশের চেষ্টার জন্য উদ্যোগী হইলেন—স্বকীয় বলবিকাশে অনশন মৃত্যু হইতে স্বদেশীর প্রাণ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন—বুঝি বা অধঃপতিত জাতীয়জীবনে, পুনরুত্থানের উদ্দেশে, অবশেষে কার্য্যময় নবযুগের প্রবর্ত্তন হইল।

আমি আশা করি এক্ষণকার রাজনৈতিক কংগ্রেস, কৃষি-শিল্প-কংগ্রেসে পরিণত হইবে। এক্ষণে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। তাহার পর কেবল পদক দিয়া প্রদর্শনী ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। তখন পদকের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে আরোহণ করিবেন। তখন বস্ত্র বয়ন করিবার জন্য হস্তচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল আনাইয়া দিবেন। তাহার পর, এই যন্ত্রগুলি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য, শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।

তৎপরে, স্বদেশের উত্তম পণ্যদ্রব্য যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। তখন কংগ্রেস একটা বিপুল মহামেলার কার্য্য

করিবে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত তাহাতে বিক্রয় হইবে। কংগ্রেসে নানাদিগ্‌দেশ হইতে সঙ্গতিসম্পন্ন লোক আগমন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যে দ্রব্য ক্রয় করিবেন, তিনি স্বপ্রদেশে বা স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার প্রদেশের, বা তাহার গ্রামের অনেক লোক তাহা দেখিতে পাইবে। এইরূপে প্রদর্শনী একটী বিরাট বিজ্ঞাপন-যন্ত্রের কার্য্য করিবে। দ্রব্যগুলি ভাল হইলে অনেক স্থানে তাহা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।

প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইবে। বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের দ্বারা কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল তথ্যের সমালোচনা করাইয়া, পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হইবে। এই সমালোচনাতে কার্য্যকুশল উদ্ভাবনা থাকিবে। প্রত্যেক জেলাতে নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের জন্য একটী উপযুক্ত কর্ম্মী প্রদর্শনীভুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইবে। সমুদয় বৎসর তিনি যে যে তথ্য সংগ্রহ করিবেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রদর্শনীর কমিটীর হস্তে দিবেন। কমিটী প্রত্যেক জেলার বিবরণী হইতে সারোদ্ধার করিয়া একটী সাধারণ বিবরণী, প্রদর্শনীর অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য, প্রস্তুত করিবেন। এই সাধারণ বিবরণী প্রদর্শনীতে বিতরিত হইবে। এবং বাগ্মীগণ, সংগৃহীত তথ্যের মর্ম্ম, ভারতবাসিগণের জীবনোপায়, তাহার ব্যবহার-প্রাণ কবিত্ব, মনোমোহিনী চমৎকারিণী উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রচার করিবেন। তখন বাগ্মীগণ বিদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনপ্রণালীর দুর্ব্বলস্থান আক্রমণ না করিয়া, স্বদেশীয়-গণের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, আলস্য, নিশ্চেষ্টতা আক্রমণ করিবেন, স্বদেশীয়-গণের হৃদয়ে স্বাবলম্বনের নূতন অদম্য অমোঘ বল, বাগ্মিতাতাড়িত-প্রবাহে, ঢালিয়া দিবেন।

গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ রাখেন আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই সে সংবাদ রাখি না। প্রত্যেক পরগণা ও গ্রাম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট তন্ন তন্ন করিয়া যে তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, গ্রামের জমিদার এবং তহসিলদারগণও তাহার অধিকাংশই অবগত নহেন। আমি আমার অধীন একজন জমিদারি-পরিদর্শক বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারীকে কয়েকটী গ্রামের বিষয় কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বলিয়াছিলাম। তিনি উত্তর করিলেন যে Hunter's Statistical Account নামক গ্রন্থে আপনার

প্রশ্নের অনেকগুলির উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমি কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা এই তথ্য-গুলি সংগ্রহ করিতে চাহি। একটী "তরফের" তহশীলদার সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ তরফে দ্বাদশ বৎসর কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করাতে দেখিলাম যে, তিনি প্রায় কিছুই ঠিক বলিতে পারেন না। তাঁহার সঙ্গে দুইজন মাতব্বর প্রজা ছিল। তাহারা অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিল। অনেক সুশিক্ষিত জমিদার কংগ্রেস বা প্রদর্শিনীতে যোগ দিতেছেন তাহা সুখের বিষয়। তাঁহারা যদি নিজের জমিদারির প্রজা, ভূমি, ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি নানা বিষয় বহুজ্ঞাতব্য তথ্যসংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের মহাফেজখানায় রাখেন, এবং সংগৃহীত বিবরণী আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের জমিদারীর ও প্রজার অবনতি বা উন্নতি হইতেছে, এবং কি হইলে উন্নতি হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার চেষ্টা করেন এবং যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা যদি প্রদর্শিনী বা কংগ্রেস কমিটীর হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা দেশের অনেকটা উপকার করিতে পারেন, এবং অনেক তথ্যও সহজে সংগৃহীত হইতে পারে। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশের প্রজাগণের, অর্থাৎ শতকরা ৯০ জন লোকের, অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অথচ তাঁহারা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিস্তৃত বক্তৃতা করিতে বা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে সকল সময়ই প্রস্তুত। সুতরাং আমাদের স্বদেশপ্রেমিকতা অনেক সময় স্বদেশীয় অনভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত। এই অনভিজ্ঞতা দূর করা প্রদর্শিনী বা কংগ্রেসের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

আমি পুর্ব্বে বলিয়াছি যে রাজনৈতিক কংগ্রেস ক্রমে কৃষি-শিল্প-কংগ্রেসে পরিণত হইবে; তাহার পর কৃষি শিল্প-কংগ্রেস শিল্পী-ও-কৃষক-শিক্ষা-কংগ্রেসে বিকশিত হইবে। তৎপরে কংগ্রেস দেখিবেন শিল্প ও কৃষি বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে একটু সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক। সংক্ষেপে, কংগ্রেস ক্রমে বুঝিবেন যে লোকশিক্ষা—এমন শিক্ষা যাহাতে অন্ধের চক্ষু ফুটে, শিল্পী ও কৃষক নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের উপকার লাভ করে, এবং সাধারণ লোকের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সুগম হয়—স্বার্থপর স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করে—ভীরুর সাহস হয়, দুর্ব্বলের শক্তি হয়, চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, প্রীতি বর্দ্ধিত হয়—এমন এমন লোকশিক্ষা জাতীয় জীবনের একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশা। তখন কংগ্রেস জাতীয় জ্ঞানমন্দির রূপে পরিণত হইবে।

সে শুভদিন শীঘ্র আনয়ন করিবার জন্য, আমাদিগের সম্মিলিত জাতীয় কার্য্যে যাহাতে আরও একটু সরলতা প্রবেশ করে তাহা করা আবশ্যক। আমরা দেশের উন্নতি উন্নতি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিব! অথচ যখনই আমাদিগের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর একটু হাত পড়িবে, তখনই দেশের সাধারণ লোকের মঙ্গলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শাসকদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিব? ইহাতে শাসকগণ আমাদিগের স্বদেশহিতৈষিতা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন।

"দরবার" যেমন আমাদিগকে জড় শক্তির একটা দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তেমনি কংগ্রেসকে স্বার্থত্যাগের একটা জলন্ত প্রমাণ দেখাইতে হইবে। দরবার, সেনা-সঙ্গিন-গোলাগুলি-জড়শক্তির মূর্ত্তি। কংগ্রেস করুণা-দয়া-ধর্ম্ম-স্বার্থত্যাগ সম্বলিত প্রশান্ত-ধ্রুব-ধর্ম্মশক্তির মূর্ত্তি হইবে। শুনা যায় পরাজিত গ্রীস তাহার সাহিত্য ও শিল্পে জেতা রোমকে সভ্য করিয়াছিল। আমরা আশা করি, কংগ্রেস হিন্দুর পবিত্র স্বার্থত্যাগ-পরহিত-ব্রত, সদনুষ্ঠানময় ধর্ম্ম ইংরাজকে শিখাইয়া আরও সভ্য, শান্ত, ও ধর্ম্মপরায়ণ করিবেন। তখন "কংগ্রেসে"র নিকট "দরবার" দয়াধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। এবং দরবারের নিকট কংগ্রেস জড়শক্তি লাভ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবে। তখন জিত ও জেতা, উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখিবে। তখন জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব পবিত্র অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।

কংগ্রেসের ক্রমবিকাশে

১। প্রথমে কংগ্রেস রাজনৈতিক মহাসম্মিলনী। ২। তৎপরে জাতীয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী। ৩। তৎপরে জাতীয় জ্ঞানমন্দির। ৪। তৎপরে জাতীয় ধর্ম্ম মন্দির। ৫। তৎপরে জেতা জিত, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, ইংরাজ ও ভারতবাসী, ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

প্রবাসী।

কে তুই রে দেবশিশু, পথ-ভ্রমে ভুলে
এসেছিলি দুখিনীর কোলে
না মিটাতে, হৃদয়ের, অনন্ত স্নেহের ক্ষুধা
অনায়াসে ফেলে গেলি চলে।
এখনো যে শূন্য গৃহে, ওই সে সুন্দর মুখে,
দেখিতেছি হাসি সুমধুর,
এখনও ভাঙ্গা প্রাণে, মিষ্ট মা মা সম্বোধনে,
ডাকিস রে অতি দূর—দূর—!
একদিনো অযতনে, কারো কাছে কোন খানে,
রাখি নাই মুহূর্ত্তেক তরে,
আজি নিরাপদ হয়ে অনন্তেতে মিশাইয়ে,
হাসিতেছ স্বরগ উপরে।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী

হোমাগ্নি।

[পূজনীয়া শ্রীমতী মোহিনী দেবীর "স্মৃতি" শীর্ষক কবিতা * পাঠ করিয়া লিখিত। নবপ্রভা ১ম খণ্ড, ১৫২পৃঃ দ্রষ্টব্য]

কি মন্ত্র শুনালে আজি, বিশ্ববিমোহিনি,
অয়ি যাদুকরী কবি? একি শোকগাথা?
এ তো নহে বিষ—এ যে সুধা নির্ঝরিণী
চন্দন প্রলেপে যেন জুড়াইলে ব্যথা!
দীপ্তমণি-শিখা মাঝে পড়ে গো যেমতি
পতঙ্গ অনল ভ্রমে অপূর্ব্ব হরষে;

---

* আজিকালিকার কবিতা যাহা সচরাচর প্রকাশিত হয় তাহাতে কেমন এক morbid pessimism এর ভাব আছে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, প্রাণকে অবসাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শ্রীমতী মোহিনী দেবীর কবিতায় এ দোষ আদপে নাই। এই জন্য ইহা এত সুন্দর, এত প্রীতি-দায়িনী।—লেখক।

তবু নাহি হয় দগ্ধ ;—আমিও তেমতি
তোমার ও কবিতার জ্বলন্ত পরশে !
হে সুন্দর শিক্ষাদাত্রি ! কি অপূর্ব্ব শিক্ষা
পাইলাম—পাইলাম দিব্যচক্ষু আজি !
(গুরুমন্ত্রে শিষ্য যথা পেয়ে নবদীক্ষা
লভে গো দ্বিজত্ব চারু) একি ভোজবাজী !
বুঝিয়াছি "লোলজিহ্বা দীপ্ত দুঃখানল
নহে, নহে চিতা—শুভ্র হোমাগ্নি উজ্জ্বল !"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কুম্ভ মেলা।

রাশির মধ্যে কুম্ভরাশি * যেমন, মেলার মধ্যে কুম্ভমেলাও তদ্রূপ ; অথচ এতাদৃশ ভারতপ্রসিদ্ধ এই কুম্ভ মেলার কথা কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ মেলার আবির্ভাব কোথা হইতে ইহা অনেকেই অবগত নহেন। অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিলাম।

১২ বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরীতীর ও অবন্তিক এই ৪ স্থানে কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভমেলার ন্যায় অন্য কোন মেলাতেই এরূপ সাধু সমাগম হয় না। কত সাধু সন্ন্যাসী যে এই মেলাতে আসেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এরূপ সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিয়া ইহা তাঁহাদিগেরই মেলা, এক প্রকার সন্ন্যাসী কংগ্রেস, ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন। কেহ কেহ মনে করেন, "ফ্রী মেসনস" (Free Masons) যেরূপে গূঢ় ভাবে কার্য্য ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন সমুদয় সন্ন্যাসিগণও তেমনি গূঢ়ভাবে কার্য্য ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যদিও সন্ন্যাসিগণ আপাততঃ দেখিতে বিক্ষিপ্ত তথাপি তাহারা পরস্পরের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ। বার বৎসর অন্তর, সমুদয় সাধু-সন্ন্যাসি-সমাজের কিসে মঙ্গল হইতে পারে, তাহা গূঢ় ভাবে এই কুম্ভমেলায় আলোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। এই মেলায় যাইলে অনেক প্রকৃত সাধুর দর্শন পাওয়া যায়।

---

* কুম্ভ রাশিতে যাহার জন্ম সে ব্যক্তি চতুর, মেধাবী, হস্তি ঘোটকাদি ধনসম্পন্ন হয়।

প্রবাদ আছে যে এই মেলা সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত। যখন শঙ্করাচার্য্য দেখিলেন মানবগণ অনেকেই নাস্তিক পথের পথিক হইতেছে তখন তিনি দয়াবিগলিত চিত্তে সনাতন ধর্ম্ম ও সদাচার প্রচার পূর্ব্বক যাহাতে উৎপথ প্রবৃত্ত জন সাধারণকে উদ্ধার করিতে পারেন ও নাস্তিক জনের কুতর্ক কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া সনাতন ধর্ম্ম মার্ত্তণ্ডকে প্রকাশিত করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করেন এবং অভিনব মত জাল ছিন্ন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন; তৎকালে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার একছত্র আধিপত্য। তদানীং অনেকেই সংসার মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, এমন কি বন্যার প্লাবনের ন্যায় দিন দিন তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা দেখিয়া শান্ত দান্ত ধীরবুদ্ধি পরিব্রাজকাচার্য্য চিন্তা করিলেন যেরূপ ক্রমশঃ শিষ্যবৃদ্ধি হইতেছে, ইহারা সকলে অতিথি হইলে সাধারণ গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত সৎকার করিতে অক্ষম হইবেন, আর যাঁহারা সক্ষম, তাদৃশ ধনিসংখ্যাও অধিক নহে। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি শিষ্যগণকে আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, তোমরা এক স্থানে থাকিও না, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচরণ কর; তাঁহার আদেশ শ্রবণে পরমভক্ত শিষ্যবর্গ বিনয়কাতর বচনে বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু আমরা ঐ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আপনার অদর্শন দুঃখ আমাদিগের সর্ব্বথা অসহ্য হইয়া উঠিবে, অতএব আমাদিগের এক সময় নির্দ্দেশ করুন যাহাতে আমরা সকলে সমবেত হইয়া শ্রীচরণ দর্শনে কৃতার্থ হই।" শিষ্যবৃন্দের প্রার্থনায় শ্রীমদাচার্য্য স্বামী অনুমতি করিলেন, তোমরা তিন বৎসর অন্তর সকলে একত্র সমবেত হইবে, এবং ঐ সমাগম উপলক্ষে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরী ও অবন্তিকায় কুম্ভমেলা নামে এক অপূর্ব্ব সাধু সমাগম হইবে। তদবধিই ঐ পর্ব্বের প্রচলন। শঙ্করাচার্য্য সেবকগণ ঐ পর্ব্বকে কুম্ভভূমিও বলিয়া থাকেন।

প্রাচীন বিষ্ণুযাগ গ্রন্থে ইহার পৌরাণিক কথা আছে। নিম্নে তাহা উল্লেখ করিলাম।*

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কণশোৎপতিমুত্তমান্।
উত্তরে হিমবৎ পার্শ্বে ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ॥

---

* এ বিষয় সবিস্তর বৃত্তান্ত বৃন্দাবনের শ্রীদুর্গাদত্ত শর্ম্ম কৃত কুম্ভ পর্ব্ব ব্যবস্থায় আছে।

আরব্ধং মন্থনং তত্র দেব দানব পূর্ব্বকৈঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বাতু বাসুকিম্॥
মূলে কূর্ম্মস্তু সংস্থাপ্য বিষ্ণোর্ব্বাহু চ মন্দরম্।
মথ্যমানে তদা তস্মিন্ ক্ষীরোদসাগরোত্তমে॥
কলসশ্চ সমুৎপন্নো ধন্বন্তরি করোল্লসন্।
মুখান্তং সুধয়া পূর্ণঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মনোহরঃ॥
দৃষ্টা তু তৎক্ষণাদেব মহাবল পরাক্রমঃ।
জয়ন্তোঽমৃতমাদায় গতো দেব প্রচোদিতঃ।
দেবকর্ম্ম সমালোচ্য দৈত্যাঃ শুক্রেণসূচিতাঃ।
জগ্মুস্তত্পৃষ্ঠতো লগ্না ভীতঃ সোঽপি পলায়িতঃ॥

ইত্যাদি—বিষ্ণুযাগ গ্রন্থে—

বাহুল্য ভয়ে সমস্ত উদ্ধারে বিরত হওয়া গেল। তাৎপর্য্য এই—"হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র, মন্দর পর্ব্বত লইয়া দেবদানবগণ সেই সমুদ্র মন্থন করিলে ধন্বন্তরি অমৃত কলস লইয়া উত্থিত হন। ইন্দ্রনন্দন জয়ন্ত সেই অমৃত লইয়া পলায়নোন্মুখ হইলে দেবে দৈত্যে সংগ্রাম বাধে। বিবাদ করিতে করিতে সেই অমৃতকুম্ভ দেবগণের হস্তচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয়। যে যে স্থলে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে পর্ব্ব হইয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি ও শনি মিলিয়া সেই কুম্ভ রক্ষা করেন, এইজন্য যে বৎসর সূর্য্য চন্দ্র বৃহস্পতি সংযোগ হয় সেই সেই বৎসরে সেই সেই নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে কুম্ভযোগ হয় *। আমাদিগের বৎসরে দেবতাদিগের একদিন, সুতরাং আমাদিগের দ্বাদশ বৎসরে দেবতাদিগের দ্বাদশ দিন হয়। অতএব ১২টী কুম্ভ পর্ব্বই হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চারি স্থলে সুধাকুম্ভ নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতে চারিটী মাত্র কুম্ভযোগ হয়—ঐ গ্রন্থেই প্রমাণ যথা—

পৃথিব্যাং কুম্ভযোগস্য চতুর্দ্ধা ভেদ উচ্যতে;
চতুঃস্থলে নিপতনাৎ সুধাকুম্ভস্য ভারত॥ ইত্যাদি

কোন্ সময় হরিদ্বারে কুম্ভযোগের সম্ভাবনা?

পদ্মিনী নায়কো মেষে কুম্ভরাশি গতো গুরুঃ।
গঙ্গা দ্বারে ভবেদ্ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥

---

* মূলে না থাকিলেও শনিও যোগকারক ইহা অনুমেয়, কারণ শনিও সুধাকলস রক্ষাকালে সহায় ছিলেন।

কুম্ভরাশিং গতে জীবে যদ্দিনে মেষগেরবৌ।
হরিদ্বারে কৃতং স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্॥

সূর্য্য মেশ রাশিতে গমন করিলে যদি বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে থাকেন তাহা হইলে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হয় (বচনান্তরে—মেষসংক্রম দিন বলিয়া উল্লেখ আছে) ঐ যোগে তথায় গঙ্গাস্নান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। হরিদ্বারের কুম্ভযোগেই কুম্ভরাশির কথা আছে অন্যত্র নাই। অনেকেই মনে করেন কুম্ভযোগ কুম্ভরাশিতে হয় অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে হয়—তাহা ভ্রমসংস্কার। উল্লিখিত যোগ ১২ বৎসর অন্তরই হয়। কারণ বৃহস্পতির পুনরায় কুম্ভে আসিতে ১২ বৎসরের অগ্রে হয় না। এই ১৩১০ সালে—কুম্ভে বৃহস্পতি—এই জন্য বৈশাখ মাসে কুম্ভমেলা হরিদ্বারে হইয়া গিয়াছে।

প্রয়াগের কুম্ভমেলার কাল,——

মাঘে মেষগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।
অমাবস্যা যদা যোগঃ কুম্ভাখ্য তীর্থনায়কে॥

মাঘ মাসের অমাবস্যাতে মেষে বৃহস্পতি ও মকরে রবি ও চন্দ্র থাকিলে তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়।

ধারায় কুম্ভমেলা কোন্ সময় হয়?——

ধারায় (In Dhar) মেলার কাল কার্ত্তিক মাস; ঐ কার্ত্তিক মাসে যে বৎসর অমাবস্যা তিথিতে কুম্ভে চন্দ্র ও শনি থাকে সেই বৎসর ধারায় কুম্ভযোগ।

প্রমাণ—

ঘটে সৌরিঃ শশী সূর্য্যঃ কুহ্বাং দামোদরে যদা।
ধারায়াস্তু তদা কুম্ভো জায়তে খলু মুক্তিদঃ॥

গোদাবরীতে কুম্ভমেলার সময়,——

রবি কর্কট রাশিস্থ হইলে (শ্রাবণ মাসে) যে বৎসর ঐ কর্কটেই বৃহস্পতি ও চন্দ্র থাকিবেন এবং ঐ যোগ যদি অমাবস্যার দিনে হয় তবেই গোদাবরীতে কুম্ভযোগ হয়।

প্রমাণ—

কর্কে গুরু স্তথা ভানু শ্চন্দ্র শ্চন্দ্র ক্ষয়স্তথা।
গোদাবর্য্যাং তদা কুম্ভো জায়তেঽবনিমণ্ডলে॥

এ সমস্ত প্রমাণই বিষ্ণুযাগ গ্রন্থের।

কুম্ভমেলায় কুম্ভরাশির যোগকারকতা (influence) কেবল হরিদ্বার ও ধারাতেই আছে। সুতরাং রাশি অনুসারে মেলার নাম প্রবর্ত্তিত ইহা বলা যায় না; সুধাকুম্ভের নামেই হইয়াছে ইহাই উপলব্ধি হয়।

জনৈক সংস্কৃতাধ্যাপক।

বিদুষী আনন্দময়ী। *

প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গীয় অন্তঃপুরে শিক্ষার আলোকরশ্মি স্তিমিত ছিল না। বস্তুতঃ সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইলে অবরোধক্লিষ্টা বঙ্গীয় সীমন্তিনীগণও যে পুরুষদিগের সমকক্ষভাবে সরস্বতীর প্রসাদ-লাভে সম্পূর্ণ উপযুক্তা তাহা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর রচনা পারিপাট্য হইতেই বিশেষরূপ উপলব্ধি হয়। আনন্দময়ীর রচনার শব্দ বৈভব ও পাণ্ডিত্য সন্দর্শনে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি, এ— এম্ এ" উপাধিধারিণী মহিলাগণ অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন বলিয়া অনুমিত হয় না; ইতিপূর্ব্বে 'ভারতীতে' ও দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" আনন্দময়ীর রচনার আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে। আমি কবির পরিচয় দিয়া, তাঁহার রচনারাজি সংগ্রহ করিয়া, বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈদ্যকুলোদ্ভব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য পৈত্রিক আবাসভূমি ইটনা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিক্রমপুরে আগমন করেন। তিনি বিল-দায়নীয়া (রাজনগর), জপসা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া নিবাস স্থাপন করেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এই বেদগর্ভ সেনের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর। যে শাখায় রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর গোপীরমণ সেন একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম নবাব সরকারের চান্দপ্রতাপ পরগণার রাজস্ব আদায় করিতেন। কৃষ্ণরামের পুত্র রামপ্রসাদ, তৎপুত্র রামগতি; আনন্দময়ী এই রামগতি সেনেরই কন্যা। আনন্দময়ীর মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। রামগতি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ও সুকবি ছিলেন। তিনি তদীয় কন্যার শিক্ষার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;

---

* এই প্রবন্ধটি Dacca Wellingtion Instituteএ পঠিত হইয়াছিল।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে অম্পা গ্রামে রামগতি সেন এই কন্যা রত্ন লাভ করেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে নবম বর্ষ বয়সে পয়োগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম কবীন্দ্রের সঙ্গে আনন্দময়ীর শুভপরিণয় কার্য্য সমাধা হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু পত্নীর বিদ্যাবত্তার খ্যাতিতে তাঁহার যশ নিমগ্ন হইয়াছিল। আনন্দময়ীর খুল্লতাত, রামপ্রসাদের অপর পুত্র জয়নারায়ণ সেন হরিলীলা, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে তিনি হরিলীলা গ্রন্থ রচনা করেন ও তদীয় বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন।

আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত আছে;—রাজনগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে সংস্কৃত শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি দৃষ্ট হওয়াতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, কিন্তু সেই সময়ে রামগতি পুরশ্চরণে ব্যাপৃত থাকায় নিজে পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ ছিলেন। আনন্দময়ীর পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল, সুতরাং আনন্দময়ীকেই উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। যথা সময়ে আনন্দময়ী সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। পরে রাজসভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা কাহারো অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন। আনন্দময়ীর রচনা হইতে আমরা যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব তাহাতে তাঁহাদেরও অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ থাকিবে না।

জয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই দুইটি পংক্তি আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন——

"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম।
খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম" ॥

অতি সংক্ষেপে ভগবানের দশরূপ বর্ণনা আনন্দময়ী ব্যতীত অন্য কোনও কবি

করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই প্রসঙ্গে কথিত আছে, একদিন জয়নারায়ণ কাব্যরচনায় এরূপ দৃঢ় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে বেলা দ্বিতীয়প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তদীয় কাব্য পিপাসার বিরাম হইতেছে না দর্শন করিয়া, আনন্দময়ী খুল্লতাতকে স্নানাগার করিতে অনুরোধ করেন। জয়নারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্রীর নিকট কিছুই গোপন করিতেন না। তিনি বলিলেন, আর অতি অল্পই বাকী আছে, ভগবানের দশ অবতার সংক্ষেপে বর্ণন হইলেই উঠিতে পারি। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর একান্ত অনুরোধে নিজ সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে স্নানের জন্য চলিয়া গেলে আনন্দময়ী উপরিউক্ত দুইটি পদ যোজনা করিয়া দেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে 'হরিলীলা' গ্রন্থ প্রণয়নে আনন্দময়ী খুল্লতাতকে বিশেষ সহায়তা করেন। নিম্নে 'হরিলীলা' হইতে আনন্দময়ীর রচনার একটু আভাস পাঠকবর্গকে দিতেছি। সদাগর পুত্র চন্দ্রভানের সহিত সুনেত্রার বাসিবিবাহ উপলক্ষে কবি কি লিখিয়াছেন দেখুন,——

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা।
সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কত ক্ষীণমধ্যা, সুভাঙ্গা সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥
দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥
করে দৌড়াদৌড়ি, মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ডঘৃষ্টা।
প্রাদুষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা॥
অনঙ্গাস্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণ বর্ণা।
বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা॥

কারো ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার কুর্পা, পরিভ্রস্ত কক্ষে॥
* * * *
কারো বাহুবল্লি কারো স্কন্ধদেশে।
রহিয়া সাধুবাক্য বক্তে, প্রকাশে॥
সুকক্ষে, নিতম্বে উর হেমকুম্ভে।
এ ভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে॥
তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে।
পরে হেলি ঢুলি অনঙ্গ জরেতে॥
সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভানে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে॥
সুগন্ধে ঢালিছে সর্ব্ববারি অঙ্গে।
ঝনৎ ঝনৎ গলৎ গলৎ পড়ে নীর অঙ্গে॥
সখী চন্দ্রভানে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলাতে॥
শুনি চাতুরী দম্পতি হেটমাথে।
ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্বতাতে॥"
(চন্দ্রভান ও সুনেত্রার বাসিবিবাহ, হরিলীলা)

অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের বোধ হয় স্বভাবজ, সুতরাং এ ক্ষেত্রে রমণি-কবি বিশেষ কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নে আনন্দময়ীর সহজ রচনার নমুনা দিতেছি। চন্দ্রভান ব্যবসায় কর্ম্ম উপলক্ষে ডিঙ্গা সাজাইয়া শ্বশুরের সহিত সুদূর প্রবাসে চলিয়া গিয়াছেন, বিরহিণী সুনেত্রা নানা ছন্দে বিনাইয়া বিলাপ করিতেছে। বস্তুতঃ এ চিত্রটি কবি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে অশ্লীলতা-দুষ্ট হইলেও এত মনোহর হইয়াছে যে সে অংশটুকুর কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। যে একটু অশ্লীলতার পচা দুর্গন্ধ রচনা মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে সেজন্য সুধু আনন্দময়ী কেন, সেই যুগের কোন কবিই অধুনাতন সুরুচিসম্পন্ন, সমালোচকের তীব্র কসাঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। কবি লিখিতেছেন,—

"আসি দেখহ নয়নে।
হীন তনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে॥

হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অতি।
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আমি তোমা পথপানে॥
*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*
ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥ ইত্যাদি
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাধিছ আপনি।
তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীতভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্টমনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষাপাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥
তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥
আর তব শ্লাঘ্যধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন"॥

আমাদের দেশে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আনন্দময়ীর রচিত গান গীত হইত। গানগুলি লিপিবদ্ধ না হওয়াতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, নব্যা রমণীগণ মাঙ্গলিক কার্য্যে আজ কাল সমস্বরে গান করিতে বড় ইচ্ছুক নহেন; সুতরাং আনন্দময়ীর গানগুলির মর্য্যাদা লোপ পাইয়াছে। জপ্সা, মুলঘর, পয়োগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আনন্দময়ীর রচিত গানের প্রসার প্রতিপত্তির কথা শ্রুত হওয়া যায়। পাঠকগণও দেখিবেন রমণী কবির গ্রাম্যগীতিগুলি অতি উপাদেয়। আমরা নমুনা স্বরূপ গুটি দুই সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রায় সমুদয় মাঙ্গলিক গান সমূহের নায়ক নায়িকাই আদর্শ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও তদীয় সাধ্বী স্ত্রী সীতাদেবী। আমাদের

প্রবন্ধোল্লিখিত রমণী কবিও এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই।

বিবাহের গান,——

"যাত্রা করি রঘুনাথ করিলেন গমন।
জানকী করিতে বিয়া চলেন নারায়ণ॥
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে জনক রাজার বাড়ী।
রঘুনাথ করিবেন বিয়া জনককুমারী॥
সর্ব্বলোকে বলে ধন্য সীতার জননী।
তাহানে দিবেন সেবা দেব রঘুমণি॥
নারীগণে বলেন রাণী শুন গো বচন।
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন॥
সীতারে সাজায় রাণী রত্তি করি চুর।
কঙ্কন মেখলা দিল পঞ্চম নুপুর॥
নাসায় বেশর দিল শিরে শিরোমণি।
ঠেকীতে তরুয়া যেন ধরিয়াছে ফণী॥
তাহার পরে পরাইল তার কেজুর।
আভরণ জলে সীতার শশী কার চুর॥
মণিময় আভরণ পরাইল শেষে।
রঘুনাথ বরিতে চলেন মনের হরিষে॥
বিচিত্র সেউতিপুষ্প সীতাদেবীর শিটে।
গগনে ঠেকিয়া গৈল রামের মুকুটে॥
বিচিত্র পঙ্কজ পুষ্প গন্ধ মনোহর।
উদয়ে ফুলের জ্যোতিঃ জিনি নিশাকর॥
পঙ্কজের দল জিনি জানকীর হাত।
ভ্রমর গুঞ্জরে পাশে হাসেন রঘুনাথ॥
ভ্রমর বলে শশী নয়নোদয় পদ্মাবর।
শশধর হৈলে হেথা আসিত চকোর॥
রাম বামে জানকীর বিবাহ হইল।
কৃত্তিকা সহিতে যেন শশী লুকাইল॥

বিবাহ হইল সীতার রাম বামে বসি।
লাজে লুকাইল তখন শরদের শশী॥
বিবাহ হইল সাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন।
পাণিগ্রহ সাঙ্গ কৈল কৌশল্যানন্দন" ॥

"অপূর্ব্ব বসন্ত ঋতু মদনের সখা।
যাহে নব নব কুসুমের দেখা॥
বিকসিত রসাল-মঞ্জরী নানা মতে।
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে।
স্তবকের ভরে নত কুসুমের লতা।
যেন গুরু কুচ ভরে নিতম্ব নিলতা॥
পৃথিবী রজতময় হইয়াছে কিশোরে।
কিংশুকে ভুবন পূর্ণ স্বর্ণ অলঙ্কারে॥
কুসুমের বনে কত কত অলিকুল।
গুণ গুণ শব্দ করে গন্ধেতে আকুল॥
মলয়কন্দর হইতে মন্দ সমীরণ।
বিরহিণীর যম হেতু বহে ঘন ঘন॥
কারো হার খুলি ঘুরায় বারে বার।
কেহ খসাইয়া পুনঃ দেয় অলঙ্কার॥
কদলি বেদীতে রাম জানকী আনিয়া।
কত নাট কত ঠাট করে বিনাইয়া॥
শুভক্ষণে সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া রঘুপতি।
সীতা সঙ্গে ঘরে চলেন অতি হর্ষমতি" ॥

অন্নপ্রাশনের গীতের নমুনা,——

"ছয় মাসের রঘুনাথ জননীর কোলে।
কেলী করে দেখে রাজা মন কুতুহলে॥
নব শশী জিনি কান্তি বাড়ে দিন দিন।
কতপূর্ণ শশী মুখ হেরিয়া মলিন॥
অন্নপ্রাশনের হেতু কৈলা অনুমতি।
আসিলেন বশিষ্ঠ ঋষি অতি হৃষ্টমতি॥

শুভ তিথি বার আর নক্ষত্র বিহিত।
বিচারিয়া শুভক্ষণ কহেন পুরোহিত॥
নানা মতে করিলেন মঙ্গল রচন।
নানা স্থানে নাচে গায় যত রামাগণ॥

পাঠকগণ এই গান সমূহে আমাদের দেশাচার, স্ত্রীআচার, প্রভৃতি রীতি নীতির খুটিনাটির একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইবেন। শেষোক্ত সঙ্গীতটিতে সুবৃহৎ নিমন্ত্রণাদিতে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যের একটি সুদীর্ঘ তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গীতে ছন্দঃপতন দোষ সর্ব্বত্র রক্ষা করা যায় না, সুতরাং ছন্দঃপতন দোষ যাহা সঙ্গীতসমূহে পরিলক্ষিত হয় তাহা গণনীয় নহে।

আমরা এই বিদুষী রমণী কবির রচনার ভঙ্গী ও ভাষার জোর দেখিয়া যথার্থই বলিতে পারি যে তিনি প্রাচীন কবির আমলে অতি উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। জপসার পক্ষে ইহা নিতান্তই গৌরবের কথা; আর সুধু জপসাই বা বলি কেন, সমস্ত বঙ্গীয় কুল ললনাগণই আনন্দময়ীকে তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়া ভাবিয়া গৌরব করিতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

হিন্দু বিধবার একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র।

১ম পত্র।

২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল।

পরমপূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল্.

"নবপ্রভা" সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

সম্পাদক মহাশয়!

আজ কদিন হ'লো আমার শৈশব সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি. এ, আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আপনার সেই

পত্রের ভিতর তাঁহারই প্রাণাধিকা পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীর লিখিত, তাঁহার নামিক পত্রখানিও আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। গত চৈত্রের ২৫শে তারিখে, সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী অনুপমাদেবী বালিকা বয়সে স্বামীকে হারাইয়া বিধবা হইয়াছেন। এখন সেই সংসার-জ্ঞান-শূন্যা বালিকার পক্ষে একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করা কতদূর কষ্টকর—তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। শ্রীমতী স্বর্ণ তাই স্বামীকে পত্র লিখিয়া তাঁহার (সুরেন্দ্রনাথের) মত চাহিয়াছেন যে, একাদশীতে নিরম্বু উপবাসে অশক্ত হইলে, বিধবারা ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া কঠোর একাদশীর ব্রত পালন করিলে, আমাদের দেশের ও সমাজের কোন ক্ষতি আছে কিনা এবং তাহাতে কোন পাপ স্পর্শে কি না? সুহৃদ্বর আপন পত্নীর প্রশ্নের কোন সুমীমাংসা করিতে না পারিয়া পত্নীর পত্রখানি সহ আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণের পত্র দুই খানি পাঠ করিয়া, আমি আমার সহজ জ্ঞান ও সরল বিশ্বাসানুসারে যে উত্তর দান করিয়াছি—এখন আমার এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত হইয়াছে কি না, তাহারই যথাযথ বিচার করিবার জন্য, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা, সুহৃদ্বর সুরেন্দ্রনাথ,—উভয়ের পত্র দুই খানির ও আমি সুহৃদ্বরের পত্রের উত্তরে যাহা লিখি, এবং সুহৃদ্বর পত্নীর পত্র প্রাপ্তে তাঁহাকে যে উত্তর দেন,—মোট এই চারিখানি পত্রের অবিকল নকল "নবপ্রভা"য় প্রকাশার্থ অদ্য আপনার সমীপে পাঠাইলাম। বিষয় গুরুতর; সুতরাং দেশকাল ও পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া আমি আমার যে মত দিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে কিনা,—তাহার সম্যক্ বিচার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এবং আশা আছে যে, এই পত্র কয়খানি নবপ্রভায় প্রকাশিত হইলে, নবপ্রভার সদাশয় পাঠক ও লেখকদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিয়া, যাহাতে চিরহতভাগিনী বঙ্গের বিধবাদের প্রকৃত কোন উপকার হয় তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। তবে বলিয়া রাখি যে, আমি সুহৃদ্বরকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে নিরম্বু উপবাস সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ কালে, আমি শাস্ত্রালোচনা এককালীন পরিত্যাগ করিয়া, শুধু দেশ, কাল ও লোকের বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মতামত প্রকাশ করিয়াছি। এখন নবপ্রভার স্বনাম খ্যাত লেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্তসাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত লালমোহন

বিদ্যানিধি ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মহোদয়েরা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রদত্ত মতামত সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেশের হতভাগিনী বিধবাদের প্রতি শাস্ত্রানুমোদিত তথা দেশকালপাত্রভেদে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া হতভাগিনীদের উপকার সাধন করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন,—ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আশা করি, আপনার নবপ্রভায় এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা যাহাতে হয়, আপনি তাহার যথোচিত চেষ্টা করিবেন। আপনার নিকট আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি বলিয়াই এ সম্বন্ধে আপনার আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া আপনারই আশ্রয় লইলাম। নিবেদনমিতি

প্রণত

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়

বেলঘরিয়া (চক্‌পাড়া)

পাটুল পোঃ, নাটোর (রাজসাহী)

২য় পত্র।

স্বামী সুরেন্দ্রনাথ প্রতি শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীর পত্র।

শিবনগর। (পাবনা।)

২৬শে বৈশাখ,, ১৩১০।

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্তেশ্বর সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি. এ,

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

শতসহস্র প্রণাম জানিবেন :—

প্রাণেশ্বর! ক'দিন হতে আপনার পত্রের উত্তর দিব দিব মনে করিতেছি; কিন্তু, কি ছাই লিখিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। এখানকার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া, আর একদণ্ডও আমার মন টিঁকিতেছে না এবং সর্ব্বদা মনঃকষ্টে কাল কাটাইতেছি। আপনি শুনিয়াছেন যে, গত ৩রা বৈশাখ শ্রীমতী অনুপমা এই বালিকা বয়সে নূতন বেশে এখানে আসিয়াছে—শ্রীমতীকে দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু কি করিব—উপায় নাই। একে

এই কচি বয়স, তার পর এই নূতন শোক—বিষম বৈধব্য যন্ত্রণা, আর সব চাহিতে একাদশীর কঠোর নিরম্বু উপবাস, তারপর এবারকার এই কাল বৈশাখের দিন, এমন দিনে সহজ মানুষ আমরা—আমাদেরই দিন কাটে না; আর এই সব হতভাগিনীদের দিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে, একমাত্র ভুক্তভোগী ও বিধাতা ভিন্ন—কেহই জানেন না। এবারকার বৈশাখের মতন কাল বৈশাখ বুঝি জীবনে আর কখন দেখি নাই,—ঈশ্বরের নিকট জোড়হাতে প্রার্থনা করি, জীবনে আর কখন যেন এমন কাল বৈশাখের দিন দেখিতে না হয়। শ্রীমতী অনুপমা বড় কষ্টে ও বড় হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় প্রথম একাদশী কাটাইয়াছিলেন, তার পর গতকল্যকার একাদশী—কল্যকার একাদশীর কথা মনে করিলে এখনও বুক ফাটিয়া যায়। গতকল্য যেমন প্রখর রৌদ্র—তেমনি প্রখর গ্রীষ্ম, তারপর কঠোর উপবাস। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইতে না হইতেই শ্রীমতী তৃষ্ণায় এক প্রকার জীবন্মৃতা হইলেন। আমি জীবনে অনেকের অনেক যন্ত্রণা নয়নে দেখিয়াছি; কিন্তু, শুধু এক বিন্দু শীতল জলের জন্ম অমন হৃদয়বিদীর্ণকারী অসহ্য যন্ত্রণা কখন দেখি নাই। শ্রীমতীর এই ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া মা (শাশুড়ী ঠাকুরাণী) ও শ্রীমতীর শাশুড়ী (তিনি গতকল্য এখানে আসিয়াছেন)—উভয়েই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শেষ, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, অনুপমার যন্ত্রণা নিজ চক্ষে দেখিতে না পারিয়া, অনুপমার সাক্ষাৎ দেবীতুল্যা স্নেহময়ী শাশুড়ী শ্রীমতীকে ফলমূল খাইয়া জলপান করিতে অনুমতি করেন—মাও এ কথায় সায় দেন। কিন্তু, হঠাৎ সেই সময়ে পণ্ডিত পাড়ার আপনাদের সেই অশেষ গুণশালী পণ্ডিত কৃষ্ণকমলবিদ্যাভূষণের পুত্র পণ্ডিত নালাম্বর বিদ্যালঙ্কারের দিদি কাত্যায়নী ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝির ফলমূল খাইয়া একাদশীর ব্রত পালনের কথা শুনিয়া মা ও ঠাকুরঝির শাশুড়ীকে কড়া কড়া দশ কথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন। তখন মনে করেছিলাম যে, বোধ হয় এই ফলেই শেষ হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, এখনও শেষ হয় নাই। কাত্যায়নী ঠাকুরঝির মুখে এই কথা শুনে বিদ্যালঙ্কার ঠাকুর গ্রাম মাথায় করে বসেছেন এবং আমাদিগকে একঘরে করবার জন্ম বিধিমতে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। বিদ্যালঙ্কারের কথায় গ্রামের সকলেই আমাদের বিপক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু মাখন ঠাকুরপো আমাদের পক্ষ হ'য়ে সবার সাথে লড়িতেছেন। এ দিকে কাত্যায়নীর সেই কথা শুনে, ইচ্ছাসত্ত্বেও মা ও ঠাকুরঝির শাশুড়ী আর কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না, শুধু কাঁদিতে লাগিলেন।

অন্ত দিকে অনুপমাও কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কিছুই খাইলেন না—জল পর্য্যন্ত নহে, সারা রাত্রি কাতরাইয়া কাটাইলেন। এখন আপনার নিকট আমার একটা অনুরোধ—আপনি শিক্ষিত ও পণ্ডিত, আপনি এই একাদশীর কোন একটা নূতন বিধি ব্যবস্থা করিতে পারেন না কি? শুধু অনুপমা কি? এ সংসারে অনুপমার মত কত হতভাগিনী বিধবাই যে এই কঠোর একাদশীর উপবাসে একবিন্দু জলের জন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে,—ইহার কি কোনই প্রতিকার হয় না,—কোনই কি প্রতিকার করিতে পারেন না। আগে সেকালে লোকে উপবাস করিত সত্য, কিন্তু তখন লোকের যথেষ্ট শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল; আর এখন দিন দিন রোগে শোকে লোক সম্পূর্ণ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় উপবাস করিবার শক্তি কোথায়? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—একাদশীতে নিরম্বু উপবাস না করিলেই কি ধর্ম্ম হয় না? এই দেখুন কাত্যায়নী ঠাকুর ঝি একাল আর সেকাল কি না করিলেন—কত ভ্রূণহত্যা না করিলেন, অথচ এই কাত্যায়নী কেবল বিদ্যাভূষণের কন্যা বিদ্যালঙ্কারের বোন আর একাদশীর উপবাস করেন (?) বলে ধর্ম্মের ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতেছেন। তারপর এই বিদ্যালঙ্কার—ইনি পণ্ডিত, সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি দেন, অথচ ইনি সমাজের বুকে বসিয়ে মাধি হাড়িনীকে নিয়ে কি লীলাই না করিতেছেন,—অথচ সমাজে বা দেশে ইহার কোনই প্রতিকার হয় না; বরং এই বিদ্যালঙ্কারই সমাজের নেতা—কর্ত্তা, যা করেন তাহাই হয়। যাহা হউক, আপনি একবার কোন ভাল পণ্ডিতের কাছেই হউক অথবা কোন প্রকৃত লেখাপড়া জানা চরিত্রবান লোকের কাছেই হউক, এ বিষয়ে কোন প্রতিকার হয় কিনা এবং বর্ত্তমান কালে আমাদের কোন পথ অবলম্বন করা উচিত, তাহার বিধি ব্যবস্থা নিয়ে, যাহা আমাদের পক্ষে ভাল হয় করিবেন। ফলতঃ আমি আমার সরল ও সহজ মেয়েলি বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি, তাহাতে একাদশীর উপোস করি আর না করি,—মন যদি জগদীশ্বরের চরণে অর্পণ করে সতত ধর্ম্মপথে রাখিতে পারি,—মনে হয়, সব চেয়ে তাহাই ভাল। আর দেখুন, সমাজে এখন সবই চলিতেছে—যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতেছেন, অথচ প্রকৃত ধর্ম্মপথাবলম্বিনী অভাগিনী বিধবাদের বেলাই সমাজের এ কঠোর শাসন কেন বুঝিতে পারি না। বিদ্যালঙ্কারের ভগ্নী কাত্যায়নীর মত ব্যভিচারিণী হয়ে একাদশীর উপোস করাই ভাল, না আমার

ঠাকুরঝির মত প্রকৃত ধর্ম্মচারিণী হইয়া একাদশীর উপবাসে অশক্ত হইলে নিরম্বু উপবাস না করিলেই কি মহাপাপ হয়,—একবার আপনি বিচার করিয়া দেখিবেন। আমার বাবা, কাকা উভয়েই ঠিক বিধবাদের ন্যায় একাদশী করিতেন—নিত্য দিনান্তে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহারা সততই বলিতেন যে, সমাজে বিধবাদের যেমন ভাবে চলিতে হইবে, ব্রাহ্মণকেও ঠিক তেমি ভাবে চলিতে হইবে, এবং তাঁহারাও ঠিক তেমি ভাবে শুদ্ধাচারে আপনাদের জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন. আমি আমার শ্বশুরকে স্বচক্ষে দেখি নাই, তবে লোকের মুখেই শুনে আসিতেছি যে, তিনিও ঠিক আমায় বাবা ও কাকার মতন আপনার পুণ্যময় জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। অথচ, তাঁহারা সতত বলিতেন যে, আত্মচিত্তশুদ্ধি, অহিংসা ও পরোপকার সংসারে পরম ধর্ম্ম, —ইহা অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ধর্ম্ম জগতে আর নাই। লোকে উপোস করে ধর্ম্ম করুক আর না করুক—একমাত্র চিত্তশুদ্ধি ও জয়ই ধর্ম্মলাভের প্রথম ও প্রধান উপায়—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, অথচ, বলিতে দুঃখ হয় যে সংসারে লোকের এখন আর কিছুমাত্র চিত্তশুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নাই—এখন আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহে জড়ীভূত হইয়া আপন আপন হৃদয়পূর্ণ করিয়াছে, তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না,—ব্রাহ্মণে সতত কুকার্য্য ও কদাচারে রত; অখাদ্য ভক্ষণ ও অগম্যাগমন লোকের এখন অঙ্গের ভূষণ তাহাতে আমাদের সমাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, শুধু ক্ষতি হয় অভাগিনী বিধবাদের বেলায়—এ কঠোর সমাজনীতি কেন, বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, যাহাতে এই কঠোর সমস্যার সুমীমাংসা হয়, আপনি প্রাণপণে তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ, ইহার একটা সুমীমাংসা হওয়া বড়ই প্রয়োজন; কেন না সংসারে কাহারো গৃহেই অনাথিনী বিধবা ছাড়া নাই এবং সকলেই কিছু আপনাদের গুণধর বিদ্যালঙ্কার বা কাত্যায়নী নন যে, সব তাতেই নাক শিট্‌কাইবেন। এ বিষয় অধিক আর কি লিখিব, আপনার মায়াই অধিক; তবে অনুপমার যাতনা আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন না, আমাদিগকে অহরহঃ স্বচক্ষে দেখিতে হইতেছে—ইহাই যা' এখন যাহা ভাল হয় করিবেন এবং এ বিষয়ে আপনার মতামত আমাকে লিখিবেন—আপনার পত্র পাইলে, আমার আর যাহা বলিবার আছে বলিব। এখানকার আর সব মঙ্গল, কিন্তু কাহারো চিত্তেই সুখ নাই—মনে শান্তি নাই, ঘোর অশান্তিতে দিন

কাটিতেছে। আপনার শ্রীচরণের কুশল সংবাদে সুখী করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি

শ্রীচরণের দাসী—সেবিকা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবী।

(ক্রমশঃ)

ছবি।

(বুড়োবুড়ী।)

যাপন করি' দীর্ঘ দিবা, দুঃখে সুখে একত্রে সে,—
এখন সন্ধ্যা বেলা,
—এখনো সে পরস্পরে বিভোর আছে হৃদয় দুটি,
খেলছে প্রেমের খেলা।
কত ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া প্রবাহিয়া, যুগ্মতরী,
প্রকৃত প্রস্তাবে,
আজি পৌঁছিয়াছে শেষে দ্বীপের উপকূলে এসে
অবিচ্ছিন্ন ভাবে।

২

অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে,
এ প্রেম সঙ্গোপনে ;
নিভৃতে, এক গ্রামের কোণে, শুভক্ষণে, অলক্ষিত,
দূরে উপবনে,
জেগেছিল সুদিনে সে।—সূর্য্যের মধুর কিরণ গায়ে
লেগেছিল এসে ;
বহে'ছিল মধুর বাতাস : গেয়ে ছিল পাখী ; আকাশ
চেয়েছিল হেসে।
সে তরুটি ক্রমে ক্রমে বড় হোল ; কুসুমরাশি
ফুটলো কত গাছে ;
কত শীতে, কত রৌদ্রে, কত ঝঞ্ঝায়, এ তরুটি
আজো টিকে আছে।

৩

বড়ই মধুর প্রথম প্রেমের প্রথম আবেগ, প্রথম বিকাশ,
প্রথম মিলন আশা ;

বড়ই মধুর পরস্পরের চুরি করা প্রথম দৃষ্টি,
প্রথম প্রেমের ভাষা।
বুড়োবুড়ির প্রেমে নাইক সে উচ্ছ্বাসটি, সে তরঙ্গ
কল্লোল আজি যদি,
এ প্রেম বহে সুনীল, স্বচ্ছ সমুদ্র সঙ্গমের মত,
গভীর নিরবধি।

৪

দুইটি হৃদয় দুইটি ইচ্ছা একটি সূত্রে চিরজীবন
বাঁধা আছে যবে,
হয়নি কভু তা'দের বিবাদ বিলাপ বিরাগ পরস্পরে,
কে শুনেছে কবে ?
মানুষ স্বতঃই স্বার্থমগ্ন ; নিজের সুখটি সবার চেয়ে
নিত্য বোঝে বটে ;
যে তার বাধা যে তার বিঘ্ন—তা অবশ্যম্ভাবী হোলেও
তার উপরে চটে ;
তবু দুজন পরস্পরে ভালবাসে—লুপ্ত নহে—
গুপ্ত অনুরাগে ;
'আধি ব্যাধি,' দুঃখ, দৈন্য, একের হোলে—হাজার হো'ক্ না—
অন্যের প্রাণে লাগে।
বিবাদ বিরাগ (তাও সে বলি) যদি নেহাৎ আঁধার করে
গৃহে সুখের আলো ;
সে বিবাদ দম্পতীর মধ্যে, যতই অল্প সময় হয় সে,
ততই সেটা ভালো।
রোগের প্রতি আক্রমণে, শরীরখানি, ক্রমে নুয়ে
পড়ে অন্তিমে সে ;
প্রতি ভূমিকম্পে, বাড়ী দৃঢ় হলেও, ক্রমে ক্রমে
ভেঙে পড়ে শেষে।
যতই বিবাদ ততই বিরাগ, যতই বিরাগ ততই প্রভেদ,
ক্রমাগত বাড়ে ;

কথনো বা শেষে এমন অবস্থাটি এসে পড়ে
ঔষধে না সারে !]
ছেয়ে তাদের যুগলজীবন গেছে হেন কতই বিষাদ
বিপদ আপদরাশি
এখনোত টি'কে আছে ; হর্ষ আছে মনের ভিতর
মুখে আছে হাসি।

৫

তাইত বলি এ দৃশ্যটি একটি অতি মধুর বস্তু ;—
এ অপূর্ব্ব জুড়ী ;
পরস্পরে বিভোর আছো পরস্পরের হাতটি ধরে'—
বুড়ো এবং বুড়ী।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মায়া।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিলাসভবনে।

হে রাজন্! অনন্তর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন ধারণ করিয়া—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সভাপর্ব্ব, মহাভারত।

Arbaces came nearer to her—his breath glowed fiercely on her cheek; he wound his arms around her—she sprang, from his embrace. After some exchange of words he caught (again) Ione in his arms; and, in that ferocious grasp was all the energy—less of love than of revenge. But to Ione dispair gave supernatural strength she again tore herself from him;—she rushed to that part of the room by which she had entered—she half withdrew the curtain—he seized her—again she broke away from him—and fell, exhausted, and with a loud shriek, at the base of the column which supported the head of the Egyptian goddess. *The Last Days of Pompeii* by Lord Lytton.

নটবর নায়েবের ক্ষুদ্র বাগান বাড়ী, নির্জ্জন স্থানে, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারে সারি সারি নারিকেলের ও সুপারির গাছ আছে। প্রাচীরের বাহিরে বড় বড় আম্রবৃক্ষের বাগান। ঘরের ভিতর একটী কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। তাহাতে একখানি পালঙ্ক রহিয়াছে। পালঙ্ক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শোভিত। পালঙ্কের পার্শ্বে একটী পাপিষ্ঠা বৃদ্ধা বসিয়া আছে। কুমুদিনী সেই শ্বেত কোমল সুখস্পর্শ শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। সে এখনও সংজ্ঞাহীন। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় ঐ বৃদ্ধা তাহার কেশ সংস্কার করিয়াছে, মুখ ও সমুদয় গাত্র মুছাইয়া দিয়াছে—একখানি শান্তিপুরে সূক্ষ্ম শুক্লাম্বর পরাইয়া দিয়াছে।—তাহার অসংবদ্ধ ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, মস্তক ও গ্রীবা আবৃত, করিয়া মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কতক উপাধানে, কতক শয্যায় বিস্তৃত হইয়াছে—বোধ হইতেছে যেন নীলনীরদমণ্ডিত চন্দ্রমা। কুমুদিনীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে—দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী। কিন্তু মুখে বিলাসের চিহ্ন নাই। কেমন একটা পবিত্র ভাব তাহার বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়াছে। সংজ্ঞা নাই, অথচ নয়ন হইতে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু দুই একটী ঝরিতেছে। আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় কেহ পীড়ন করিলে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে,—নিদ্রিত অবস্থায় যেমন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদে তেমনি কুমুদিনী মাঝে মাঝে ফুঁপিয়া উঠিতেছে। বৃদ্ধা তাহাকে বাতাস করিতেছে। বৃদ্ধা ডাকিল "বৌ বৌ"। উত্তর নাই। আবার ডাকিল। এবার "উঁ"—অতি মৃদু অস্ফুট স্বরে যেন উত্তর পাওয়া গেল। একটু পরে একটী পুরুষ পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে প্রবেশ করিল; সে দুয়ার খুলিয়া কুমুদিনী যে ঘরে রহিয়াছে সেই ঘরে আসিল।

পুরুষ বলিল—"এক্ষণও কি চৈতন্য হয় নাই।"

বৃদ্ধা—"ঘুমাইতেছে বোধ হয়।"

পুরুষ—"ডাকিয়াছিলি?"

বৃদ্ধা—"ডাকিয়াছিলাম অনেকবার। সাড়া পাই না। এক্ষণই যেন একবার সাড়া পাইয়াছিলাম।"

পুরুষ—"আচ্ছা তুই যা"। বৃদ্ধা উঠিল। পুরুষটী আস্তে আস্তে কুমুদিনীর গায় হাত দিল। গায় পুরুষের হাত পড়ায় কুমুদিনীর কেমন সংজ্ঞা হইল। কুমুদিনী বলিল "কে?—আমি কোথায়?"

পুরুষ বলিল—"ভয় নাই—আমরা ডাকাতের হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করেছি—তুমি নির্ব্বিঘ্নে এক্ষণে ঘুমাও।" কুমুদিনী ভাল করিয়া চক্ষু মেলিল। দেখিল, একটা হাঁদা মিনসে খাটের উপর বসিয়া তাহার আপাদমস্তক সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। কুমুদিনী খাটের উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল। যে দিকে দরজা খোলা ছিল, সেই দিকে ছুটিল, অন্য একটী কক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল তাহার দরজা বন্ধ, খুলিতে পারিল না, জানালার নিকটে গেল, তাহার গরাদে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল, অবশ্য পারিল না। পুরুষও "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া সেই ঘরে আসিল। কুমুদিনী আবার সেই ঘর হইতে যে ঘরে পূর্ব্বে ছিল সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিল। সেখানে বৃদ্ধা এক্ষণও দাঁড়াইয়া। কুমুদিনী বলিল—"বিশি তুই মেয়ে মানুষ, তোর দয়া আছে—তোর পায়ে পড়ি—আমাকে বাঁচা" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বৃদ্ধার পা জড়াইয়া ধরিল।—বিশি বলিল—"বাছা, নায়েব মহাশয় যখন তোকে এখানে এনেছে, তখন আর কি তোকে ছেড়ে দেবে তুই নায়েব মহাশয়ের কথা শোন, সুখে থাকৃবি।" নায়েব ইত্যবসরে কুমুদিনীর বাহুলতা ধরিয়া তাহাকে তুলিল। কুমুদিনী হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইল। তখন নায়েব তাহাকে যে সকল পাপ কথা বলিল তাহা লিখিয়া লেখনী দূষিত করিব না, নায়েবের নির্লজ্জ ঘৃণিত কথা শুনিয়া রাগে কুমুদিনীর গা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিল—"পিশাচ! দূরে দাঁড়াইয়া থাক্। কাছে আসিস্ না—তোর যদি যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছা না থাকে, এক্ষণি আমাকে ছেড়ে দে—জানিস আমি কার স্ত্রী?"

নায়েব। তুমি যার স্ত্রী সে এক্ষণ জেলে। আর আমি যদি তাকে রক্ষা না করি তার ফাঁসি হবে, জান? তুমি যদি মহেশকে ফাঁসি হতে বাঁচাতে চাও আমাকে সন্তুষ্ট কর। মহেশ খালাস হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। আর তোমাদের জমী জরাত, যা কেড়ে নিয়েছি, সব ফিরিয়ে দিব। তোমরা আবার পরমসুখে থাকবে। মহেশ কিছু জান্‌তে পার্‌বে না।"

কুমুদিনী—"পাষণ্ড! তুই জানিস্ না—স্ত্রীর ধর্ম্ম বেচে আমার স্বামী জীবন চায় না। আমিও সতীত্ব দিয়ে তোর হাতে আমার প্রাণ বাঁচাতে চাহি না। তুই আমাকে মেরে ফেলতে হয়, মেরে ফেলিস। কিন্তু তুই আমাকে কখন রাজি করিতে পারিবি না, খুব জানিস। ছুঁচো—পাজি—সরে দাঁড়া।"

নায়েব তখন একটু পৈশাচিক হাস্য হাসিল। "আমি তোকে ভাল

কোরে বুঝালাম, তুই বুঝলিনি—এক্ষণি দেখবি, তুই আমার বশীভুত হোস্ কি না ।" তার পর যে নারকীয় ভাষা বলিল তাহা লিখিব না। এ দিকে কুমুদিনীর কোপে তাহার সৌন্দর্য্য আরও যেন বাড়িয়াছিল। সুক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া, সুন্দরী যুবতী শয়ন ঘরে একাকিনী—পিশাচের সম্মুখে—হায় কে কুমুদিনীকে রক্ষা করিবে! নরাধম অধম রিপুমদে মত্ত। সে কুমুদিনীর কাপড় ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। এমন সময় দূরে প্রিং প্রিং শব্দ শুনা গেল—কে একতারা সঙ্গে গান গাইতেছে।—

গান।

কি কর কি কর, বংশীধর,
　　ছাড় ছাড় অঞ্চল আমার হে।
আমি সরম ধরম, ছাড়িব কেমনে,
　　ডুবিয়ে পাপে, কেমনে মজিব পরপুরুষে হে॥
আমি কুলবালা, কলঙ্কের ডালা,
ক্ষণ সুখ আশে, মাথায় চাপাইও না হে॥
কুলমান রাখি, সতী সাধ্বী থাকি,
ভজি নিতি নিজ-পতি-পদ-পঙ্কজ হে॥
তোমার পীরিতি, তোমার আদর,
শঠরাজ, ব্রজরাজ, নটরাজ, (নটবর) চাহি না হে॥
পরদারে কেন, মাত তুমি হেন,
হয়ে নারায়ণ, নরক গমনে কেন মতি হে॥
সরলা অবলা আমি, ধূরত লম্পট তুমি
তুমি নহে নারায়ণ, তুমি লম্পট চূড়ামণি হে,
তুমি পামর লম্পট হে॥
ঐ দেখ গুরুজন, করিতে তোমা শাসন,
আসিছে ধেয়ে, হুঙ্কার দিয়ে,
পালাও পালাও, পরাণ বাঁচাতে যদি চাহ হে॥

(ক্রমশঃ)

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

বৈশাখ, ১৩১০।

১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল। বিজ্ঞাপিত হয় যে ১১ই বৈশাখ বা ২৪শে এপ্রিলের পর, ট্রান্সভালে কেপ কলোনির দ্রব্যের উপর আর কর লাগিবে না।...প্রকাশিত হয় যে বগ্‌দাদ রেল-কোম্পানীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিকাংশ সভ্যই জার্ম্মানী।

২রা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল। ডব্‌লিনে বাণিজ্য ও শিল্প সভা স্থাপনের জন্য একটি মহতী সভা হয়। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ক্যান্সাস্ মদ্য বিক্রয় বন্ধ রাখিতে কৃতসংকল্প হয়েন।

৩রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল। আমাদিগের সম্রাট্ মাল্টায় পঁহুছান।...ল্যাণ্ডবিল বিষয় আলোচনার্থ ডবলিনে আইরিসদিগের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের আরম্ভ হয়।...অপর্টোতে পর্ত্তুগীজদিগের একদল পদাতিক সৈন্য বিদ্রোহী হয় এবং সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করে।

৪ঠা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল। ডব্‌লিনে স্থির হয় যে আয়রলণ্ডের পক্ষে স্বায়ত্তশাসন একান্ত আবশ্যক।...চিনের নিকট হইতে আমেরিকার ক্ষতিপূরণ রজতমুদ্রায় দিতে হইবে বলিয়া পুনর্ব্বার ঘোষিত হয়। "বাক্সারস কমিশন" পুনর্ব্বার তাহাতে আপত্তি করে।

৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল। সম্রাট্ মাল্টা ত্যাগ করেন।

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল। শ্বেত ফস্‌ফরস হইতে দিয়াশালাইয়ের প্রস্তুত করণ রিক্‌স্‌ট্যাগ দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল সম্রাট্ নেপল্‌সে উপনীত হন।...কর্ণেল শয়ানের নিকট হইতে সংবাদ আসে যে, সোমালী যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজদিগের ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৮০ জন সৈন্য ও ১০ জন সেনাপতি হত হয়।

১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল। রুষিয়ার 'চার্জ্জি ডি য়্যাফেয়ারস্' প্রিন্স চিঙ্গকে জানান যে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের চুক্তি-পত্রে সহি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিবার জন্য আর কিছুই করিবেন না।

১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল। তার আসে যে কর্ণেল কাব্‌সের সৈন্য নিরাপদে জেনারেল ম্যানিঙ্‌এর সহিত যোগ দিয়াছেন এবং গালাফ্রিতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৪ই বৈশাখ, ২৭শে এপ্রিল। সম্রাট্ রোমে উপনীত এবং তথায়ও তাঁহার খুব আদর অভ্যর্থনা হয়।

১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল। কানাডার আলবার্টা প্রদেশে ভূমিকম্প হয়। ৭৫টি হত এবং বিশাল ভূখণ্ড বিধ্বস্ত হয়।

১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল। সম্রাট রোমনগর ত্যাগ করেন।

১৮ই বৈশাখ, ১লা মে। ব্রিটিস্-রাজ প্যারীসে প্রেসিডেণ্ট লুবেট্ ও মন্ত্রিসমাজ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হন।

২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে। সম্রাট্ প্যারীস ত্যাগ করেন।

২২শে বৈশাখ, ৫ই মে। সম্রাট পোর্ট-স্মাউথে প্রত্যাগত হন।

২৪শে বৈশাখ, ৭ই মে। চীনদেশীয় ছাত্রীগণ যুদ্ধে সেবা করিতে শিক্ষা করিবার জন্য টোকিওতে একটি সভা গঠিত করিয়াছেন।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ভবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড। আষাঢ়, ১৩১০। ৫ম সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৷৹ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য।৹ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, আষাঢ় ১৩১০ সাল [৪র্থ সংখ্যা।

দেশভেদে আচারভেদ।

সমাজসংস্কারকগণের কার্য্যক্ষেত্র বঙ্গদেশে যতদূর সুপ্রশস্ত উড়িষ্যায় ততদূর নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি উড়িষ্যায় অনেক জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত এবং এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের যৌবনকালে বিবাহ হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। এমন কি হাটবাজার স্ত্রীজাতির এক চেটিয়া। এই সকল "হাটুয়া জাতি"র মধ্যে যৌবন বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকাতে, হাটবাজারে যে কেবল বাহিরের জিনিষের কেনা বেচা হয় এবং অন্তরের কোন কোন বস্তুর কেনা বেচা হয় না, তাহা অনুমান করা দুঃসাহসের কার্য্য। পাশ্চাত্য সমাজে নৃত্যগীতভোজনাদির আমন্ত্রণ সভা যেমন যুবক যুবতীর মধ্যে প্রেম বিনিময়ের প্রশস্তক্ষেত্র, এই সকল হাট বাজারেও সেইরূপ অনেকানেক চারি চক্ষুর মিলন হইয়া পরিশেষে বিবাহাদি ব্যাপার সংঘটিত হয়। সুতরাং ঐসকল হাটবাজার সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সেখানে কেহ ধান চাউল বেচিয়া ঘরে যায়, আবার কেহ বা মন-প্রাণ বেচিয়াও ঘরে ফিরে।

বেশভূষা সম্বন্ধেও উৎকল রমণীগণ কতক পরিমাণে সংস্কারগ্রস্ত, কিন্তু উল্‌টা দিকদিয়া। কথাটা একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিলাসিনীগণ যেমন উপরের দিক হইতে কতকটা দূর পর্য্যন্ত অনাবৃত সভ্যতায় অভ্যস্ত, উৎকলরমণীগণ নিম্নদিক হইতে কতকটাদূর (অর্থাৎ হাঁটু পর্য্যন্ত) তদ্রূপ নগ্ন সভ্যতায় অভ্যস্ত। এক বিষয়ে কিন্তু উড়িয়া রমণীগণ অগ্রেই পূর্ণ সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাঁহাদের চুরুট খাওয়া—অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে।

উড়িষ্যায় পারিবারিক সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ অনেক গুলি "ভেস্তা" হইয়াছে। "মা" নামের ন্যায় মধুর নাম জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ। শিশু সর্ব্ব-প্রথমেই এই "মা" কথা বলিতে শিখে। আর্য্য জাতির মধ্যে এই মা-নাম কোন না কোন আকারে মাতৃসম্বন্ধ জ্ঞাপক। কিন্তু উড়িষ্যায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে "মা" হইতেছেন "বৌ"! ভগিনীকে বলে "অপা"; দাদাকে বলে "নানা"; "খুড়া" কে বলে "দাদী" বা "খুড়তা"; ভাইপোকে বলে "পুতরা"; জ্যেঠা কে বলে "জ্যেষ্ঠ পিতা" বা "জ্যেঠ পা"; বেহাই কে বলে "সম্বন্ধী"। তবে শালাকে অবশ্যই বলে "ছড়া"।

রাজাদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার উত্তরাধিকারী হয়, আর আর ছেলেরা কেবল খোরাক পোষাক পায়। রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এই নিয়মটী খুব ভাল। কিন্তু পুত্র সংখ্যা বেশী হইলেও আবার খোরাক পোষাক দিতে দিতে দুই এক পুরুষেই রাজ্যক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। আমি একটী ছোট রাজাকে জানি, তাঁহার এলাকায় মাত্র ২৬ খানি গ্রাম। তাঁহার বংশ বৃদ্ধিও আবার যথেষ্ট। তাঁহার পিতার আমল হইতে তাঁহার খুড়াদিগকে খোরাক পোষাক দিতে দিতে ৩।৪ খানা গ্রাম বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আবার তিন পুত্র, ইঁহার দুই পুত্রকেও দুইখানি গ্রাম দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আবার তিন পুত্র; তাহার প্রথমটী ভবিষ্যতে রাজা হইবে, আর দুইটী অন্ততঃ দুইখানি গ্রাম খোরাক পোষাক পাইবার প্রত্যাশা করে। এই রূপে খোরাক পোষাক দিতে দিতে সেই রাজার ক্ষুদ্র "রাজ্যটী" অচিরে লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

বাজে লোকের মধ্যেও সব ছেলে সমান ভাগ পায় না। অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু বেশী অংশ পায়। তাহাকে "জ্যেষ্ঠাংশ" বলে। বাকী সম্পত্তি আর আর ছেলেরা সমান অংশে ভাগ করিয়া লয়। উড়িষ্যায় মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত।

উড়িষ্যায় অবস্থান কালে আমার একটী পোষা হরিণ ছিল। একদিন দেখি একটী ব্রাহ্মণ সেই মৃগশিশুর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছেন। এ আবার কি ব্যাপার? অনুসন্ধানে জানিলাম, হরিণ বা মৃগ হইতেছে সেই ব্রাহ্মণের "গোত্র"। অনেক জাতির এইরূপ গোত্রদ্যোতক জন্তু বা পশু (totem) আছে। যাহাদের কাশ্যপ গোত্র, "কচ্ছপ" তাহাদের নিকট এইরূপে পূজনীয়। যাহাদের বাৎস্য গোত্র, গো-বৎস তাহাদের নিকট পূজনীয়। এইরূপে কোন কোন জাতির নিকট নাগ বা সর্প পূজনীয়! দুঃখের বিষয় হরিণ দেবতাকে

যেরূপ প্রণাম করিতে দেখিয়াছিলাম, সর্প কিম্বা কচ্ছপ দেবতাকে সেরূপ প্রণাম করিতে দেখি নাই। এইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম পাইয়া সর্প দেবতা তাঁহার ভক্তের শিরোদেশে ছোবল মারিতেন কিনা, এবং কচ্ছপ দেবতা তাঁহার মস্তকোপরি আরোহণ করিতেন কিনা তাহা আমার কৌতূহলের বিষয় রহিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে যাহারা নাম দস্তখত করিতে পারে না, তাহাদের নাম যেমন অন্যে বকলম বা নিসান সহি দস্তখত করে, উড়িষ্যায় ঠিক সেরূপ করে না। উড়িষ্যায় এক এক জাতির এক একটী "সগুক" বা চিহ্ন আছে। যেমন ব্রাহ্মণের "সগুক" ফুলবটু (বা ফুলের পুত্তলিকা), করণের সগুক লেখন (বা লোহার কলম), খণ্ডাইতের সগুক খণ্ডা (বা খাঁড়া), গউড়ের (গোয়ালার) সগুক "খোয়া" (বা মন্থনদণ্ড) ইত্যাদি। স্ত্রীলোক মাত্রেরই সগুক "মুদি" অর্থাৎ অঙ্গুরী। সম্প্রতি প্রকাশিত আদম-সুমারি (census) রিপোর্টে গেট্ সাহেবও কতকগুলি প্রচলিত সগুকের ছবি দিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক সেই রিপোর্টের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিবেন।

আমাদের দেশে শাস্ত্রবিচারশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নস্যের কৌটা একরকম নিত্য সহচর। উড়িষ্যায় কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির ধূমপান একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই অভাবটা তাঁহারা পানের দ্বারা সুদ সমেত আদায় করিয়া ছাড়েন। "মাস্তান ব্রাহ্মণ" নামক এক শ্রেণীর তথা কথিত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের কিন্তু ধূমপান নিষিদ্ধ নহে। এই জাতিটী উড়িষ্যায় যথেষ্ট দেখা যায়—বেহারে এই শ্রেণীর নাম বোধ হয় "বাওন"। মাস্তান ব্রাহ্মণগণ বলভদ্র গোত্রী। খণ্ডাইত, চাষা ও অন্যান্য জাতির যে উপাধি, মাস্তান ব্রাহ্মণদিগেরও সেই উপাধি। চেহারা দ্বারাও এই সকল জাতি হইতে মাস্তান ব্রাহ্মণকে বাছিয়া বাহির করা কঠিন। গলায় এক গাছ পৈতা ঝুলান এই মাত্র প্রভেদ। ব্যবহারেও ইহারা অন্যান্য কৃষক শ্রেণীর ন্যায় ফসল চাষ করে, মোট বহে ইত্যাদি। কিন্তু জগন্নাথ মহাপ্রভুর অনুগ্রহে মাস্তান ব্রাহ্মণ এক বিষয়ে খুব উচ্চে উঠিয়াছে। ইহারাই জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধন করিবার অধিকারী, সুতরাং পুরীতীর্থ যাত্রী মাত্রেই ইহাদের হাতে খাইতে বাধ্য। মাস্তান ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। শ্রীশ্রীবলরাম ঠাকুর একদিন মদ খাইয়া নানা জাতির ঘরে 'পশিয়া' ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও সেই সেই জাতীয় রমণীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ঠাকুরের বরে ব্রাহ্মণ

পদে উন্নীত হইল, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ জাতীয় পদবী রহিয়া গেল। আর একটী প্রবাদ এই যে পুরীর কোন এক রাজা এক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণের অনাটন হইল। তখন তিনি হুকুম দিলেন, "রাস্তায় যাহাকে পাও, তাহাকেই ধরিয়া আন।" রাজার হুকুমে এইরূপে অনেক জাতীর লোক ধৃত হইয়া আসিল। রাজা তাহাদের প্রত্যেকের গলায় এক এক গাছ পৈতা "পকাইয়া" দিয়া, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বানাইয়া যজ্ঞ করিতে বসাইয়া দিলেন। সেই সকল কল্পিত ব্রাহ্মণের বংশধরই হইতেছেন মাস্তান ব্রাহ্মণ। (১)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

আমি কে?

শুনিতে পাই, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ শান্তি অথবা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা হইতেই সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি। এই দুঃখ নিবৃত্তির মূলে "আমি কে?" এই প্রশ্ন বর্ত্তমান আছে। দেখা যাউক এই প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা হয়। মনুষ্য যখন প্রথম চিন্তা করিতে বসে "আমি কে?" তখন বোধ হয় আপন দেহ হইতে সে আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করে। এই জন্য কোন কোন স্থলে "আত্মা" অর্থে "দেহ"। এই জন্যই বোধ হয় অজ্ঞান মনুষ্য দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ মানব দেহের সুখ দুঃখেই আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করে। দেহের হ্রাস বৃদ্ধিতে নিজের হ্রাস বৃদ্ধি মনে করে। ফল কথা, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে দেহ ও আত্মা একই পদার্থ। কিন্তু যিনি বুঝিয়াছেন যে, দেহ ও আত্মা এক বস্তু নহে, তিনি অবশ্য "আমি কে?" নির্ণয় করিতে যাইয়া নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই দেহ 'আমি' নহি। দেহ যদ্যপি 'আমি' নহি, তবে ইহা একটি স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু স্বতন্ত্র বস্তু

(১) উড়িষ্যার বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত 'উড়িষ্যার চিত্র' নামক উপন্যাসে দেখিতে পাইবেন। বই ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে। —লেখক।

হইলেও ইহার সহিত আমার জীবিতকালাবধি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। দেহকে বাদ দিয়া আমার তিলার্দ্ধ কালও চলে না। দেহকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা বিরাজমান আছেন। অতএব দেখা যাউক দেহ কি? দেহের তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে এই স্থির হয় যে দেহ পাঞ্চভৌতিক পদার্থের সমষ্টি। পঞ্চভূত তবে কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্, ইহারাই পঞ্চভূত। এই পঞ্চভূত কোথা হইতে আসিল? ইহারা প্রত্যেকে মৌলিক পদার্থ কি না? উত্তরে এই স্থির হয় যে, কোন অর্থে ইহারা মৌলিক পদার্থ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহারা মৌলিক পদার্থ নহে। অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে স্থূল, ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত স্থূলতর পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চভূতের মূলে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, কিম্বা পঞ্চতন্মাত্র আছে। যথা, ব্যোম বা আকাশ তন্মাত্র হইতে আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু তন্মাত্র হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, অগ্নি তন্মাত্র হইতে তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ। এ স্থলে বলা আবশ্যক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'জল' বা 'বায়ু' ইহাদের কাহাকেও মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা সগর্ব্বে দেখাইয়া দেন যে Oxygen ও Hydrogen নামক গ্যাসদ্বয়ের সংযোগে জলের উৎপত্তি এবং oxygen ও nytrogen নামক বাস্পদ্বয়ের সমবায়ে বায়ুর উৎপত্তি। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকগণের পঞ্চতন্মাত্রের কথা চিন্তা করিলে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গর্ব্ব নিতান্ত বালকোচিত মনে হয়। ফল কথা হিন্দুদিগের মত বায়ু কিম্বা জল ইহাদের একটিও মৌলিক পদার্থ নহে, কিন্তু বায়ু ও জল তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন পদার্থ বিশেষ মাত্র। এখন 'তন্মাত্র' কি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বস্তু সকলের অতি সূক্ষ্ম মৌলিক অবস্থা, যাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অবস্থা আর ধারণা করা যায় না, তাহাই তাহাদের তন্মাত্র। শব্দ তন্মাত্র বলিতে শব্দের উচ্চ, মধ্যম, কিম্বা নিম্নাবস্থা ইহার কিছুই নহে। শব্দ তন্মাত্র উদারা, মুদারা, তারার কোন অবস্থা ভেদ নহে। কিন্তু যে শব্দের উচ্চাদি কোন অবস্থা নাই, অথচ যাহার অস্তিত্ব আছে এমন শব্দকেই শব্দ তন্মাত্র বলে। তন্মাত্র, তৎ মাত্র, অর্থাৎ কেবল শব্দ মাত্র, purely abstract শব্দ, তাহার সহিত আর কোন গুণ বা অবস্থার অনুমান করিবার নাই। অনেকে এই তন্মাত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে যখন কোন কৌশলে ইন্দ্রিয়-গোচর করিয়া দিবার উপায় নাই তখন অবিশ্বাসী পাঠকের সহিত আমাদের

বাদানুবাদ করা নিষ্ফল। এইরূপ পাঠকদের উদ্দেশ্য করিয়াই Madame Blavatsky তাঁহার Master দের ভাষায় বলিয়াছেন— "Let rather the planetary chains and other super and subcosmic mysteries remain a dreamland for those who can neither see, nor yet believe that others can. * এস্থলে বলা যাইতে পারে যে যোগীরা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তন্মাত্র সকল, এমন কি তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বিষয় সকলের অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম পঞ্চতন্মাত্র হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি। সে কিরূপ দেখা যাউক।

এইবার পাঠকগণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি লয় করিয়া ফেলুন। মনে করুন এই ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। সকলই অন্ধকারময়, সর্ব্বত্র নিবিড় অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার। এই ঘনান্ধকার হইতে কিরূপে সৃষ্টির আরম্ভ হইল চিন্তা করা যাউক। এই নিরবচ্ছিন্ন তমোরাশির মধ্যে কোন ভৌতিক পদার্থ ছিল না, এমন কি আকাশের অস্তিত্বও ছিল না। কিছুই ছিল না, কিন্তু সমস্তই ছিল। এই নিবিড় অন্ধকার, এই মহামেঘপ্রভা শ্যামাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রসূতি। তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টায় মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে করিতে Herbert Spencer বোধ হয় ঐরূপ একটা কিছু সত্যের অস্ফুট আভাস পাইয়া থাকিবেন। তাই বুঝি বলিয়াছেন—that our harmonious universe once existed potentially as formless diffused matter and has slowly grown into its present organised state is a far more astonishing fact than would have been its formation after the artificial method vulgarly supposed" এই অন্ধকারের মধ্যেই জগতের আদিকারণ, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব নিহিত ছিল। অন্ধকার সামান্য বস্তু নহে। অন্ধকার সম্বন্ধে theosophy কি বলিতেছেন শুনুন: — " Darkness is father—mother : Light their son, says an old Eastern proverb. Light is inconceivable except as coming from some source which is the cause of it ; and as in the instance of primordial light, that source

---

* আমরা এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে ইংরেজ লেখকগণের মতাদি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইয়াছি। স্থানাভাবে ইংরেজি অংশ সকলের অনুবাদ দিতে পারি নাই। ইংরেজি অনভিজ্ঞ পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহারা ইংরেজি অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। (লেখক)

is unknown, though as strongly demanded by reason and logic, therefore it is called "darkness," by us, from an intellectual point of view. * * * * * Darkness then is the eternal matrix in which the sources of light appear and disappear. * * Scientifically light is but a mode of darkness and *vice versa.* Yet both are phenomena of the same noumenon." এক্ষণে তমোরূপী আদি কারণ হইতে কিরূপে ভূতাদির সৃষ্টি হইল দেখা যাউক। এস্থলে বলিয়া রাখি সুবিখ্যাত দার্শনিক Kant এর আবিষ্কৃত এবং Laplace প্রমুখ গণিতবেত্তাগণ কর্ত্তৃক সুদৃঢ়ীকৃত nebular theory কে আমরা সৃষ্টিবিষয়ক সম্পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করি না। উহাতে সৃষ্টিক্রমের প্রথম কয়েকটি স্তর এক কালে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং মূল তত্ত্ব আদৌ নির্ণীত হয় নাই। তবে উহাতে আংশিক সত্য আছে, এ কথা ঠিক। শ্রীমতী Besant তাঁহার Building of the cosmos নামক সুপাঠ্য বক্তৃতায় যেরূপে সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনা যোগ্য, এবং ঐ বক্তৃতা পাঠে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। পাঠকগণ দেখিবেন উক্ত বক্তৃতায় মনস্বিনী বক্ত্রী বলিয়াছেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকগণের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ে Professor Crookes অনেকাংশে সত্যাবধারণে সমর্থ হইয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণের মত অনেক স্থলেই অলীক কল্পনা মাত্র। যাহা হউক, শাস্ত্রাদিপাঠে সৃষ্টিবিষয়ে আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দর্শনাদি আলোচনা করিয়া আপনার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবেন। যাঁহাদের তত চেষ্টা বা অনুসন্ধান নাই, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত বিষয়গুলি স্থির চিত্তে পাঠ করিলে ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না।

আমরা বলিয়াছি সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, কেবল অনন্তব্যাপি ঘনান্ধকার ছিল। 'কিছুই ছিল না' অর্থে ব্রহ্মাণ্ড বা সৃষ্টি ছিল না এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ অবশ্য বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা Ex nihilo nihil fit. কিছু না থাকিলে কিছুই হইতে পারে না। তবেই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই অনাদি, অনন্ত পরম কারণ মহেশ্বর বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই সাংখ্যোক্ত "পুরুষ" এবং যোগীগণের পরম ব্রহ্ম। T'eosophist গণ এই "পুরুষ" কে First Logos কিম্বা

অব্যক্ত Unmanifested being সৎ অর্থাৎ pure or absolute existence বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, যেন সুষুপ্ত। ক্রমে তাঁহাতে চৈতন্যের সঞ্চার অথবা সিসৃক্ষার উদয় হওয়াতে তিনি 'চিৎ' ও 'আনন্দ' স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দু পাঠক এই সময় কারণ সলিলে নারায়ণের যোগনিদ্রাসম্ভোগ, অথবা বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শয়নের অপরূপ চিত্র মানস পটে দর্শন করুন। আমরা আর একটি অদ্বিতীয় চিত্রের কথা পরে উল্লেখ করিব। পাঠক দেখিবেন, এই দুই চিত্রে সৃষ্টিরহস্যের মূলতত্ত্ব সকল কত সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল চিত্রকে আমরা আধ্যাত্মিক রূপক আদৌ মনে করি না। সূক্ষ্মতম-লোকে ঐ সকল চিত্রের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু সে কথা এখানে নয়। আমরা বলিতেছিলাম নির্গুণ পরব্রহ্ম সিসৃক্ষু বা সগুণ হইলেন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম হইলেন। Theosophist গণ ইঁহাকে Second Logos, (manifest and unmanifest) বলিয়াছেন। এই Second Logosই সাংখ্যোক্ত 'প্রকৃতি' এবং পুরাণের মহাবিষ্ণু। এ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা তদীয় শক্তি হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ব্রহ্মের সৃজনী, পালনী, ও সংহারিণী শক্তিকে স্থূল ভাবে প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি, এই জন্য সৃষ্টির অপর নাম কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতি। বিষ্ণুপুরাণ এই প্রকৃতির প্রধান নাম দিয়াছেন। সৃষ্টির মূলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের কার্য্যকারিতা আছে, এই জন্য প্রকৃতি সত্ত্বরজঃতমোময়ী। প্রকৃতিতে যখন এই গুণত্রয়ের সংক্ষোভ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আর যখন উক্ত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হয়, তখন সৃষ্টি লোপ হয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয়, এবং প্রকৃতি স্বয়ং পুরুষে লিপ্ত বা মিলিত হইয়া যান। পুরুষ তখন নির্গুণ অর্থাৎ যোগনিদ্রাগত হইয়া অনন্ত শয্যায় শয়ান থাকেন। বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় সেই নিদ্রিত আদিপুরুষের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অনন্ত কোটি জগত সৃষ্টি হইতেছে, এবং সংহৃতি হইতেছে।

যাহাহউক, সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতি হইতে, ভূতাদি সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব অর্থে সর্ব্বব্যাপি চৈতন্য বা চৈতন্য সমষ্টি বুঝিতে হইবে। ইংরাজিতে বলিতে হইলে ইহাকে Universal consciousness বলা যায়। এই চৈতন্য সমুদয় বা Universal consciousness

হইতে জীবগণ ব্যক্তিগত, পৃথক পৃথক চৈতন্য অর্থাৎ individual consciousness প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কোন ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই। কেবল সর্ব্বব্যাপি চৈতন্য বা একটি মহা চৈতন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহত্তত্ত্বকে কেহ কেহ আদি ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব দর্শনে First Logos কিম্বা পরম ব্রহ্মের নাম শ্রীকৃষ্ণ বা 'বাসুদেব', প্রকৃতির নাম 'সঙ্কর্ষণ', এবং মহত্তত্ত্বের নাম 'প্রদ্যুম্ন।' সমষ্টিভূত চৈতন্য হইতে ক্রমে ব্যষ্টিভাবে জীব চৈতন্য বা ব্যক্তিগত চৈতন্য উৎপন্ন হয়। এই ব্যক্তিগত চৈতন্য বা individual consciousnessএর নাম 'অহঙ্কার'। বৈষ্ণব দর্শনে অহঙ্কারের নাম 'অনিরুদ্ধ।' 'বাসুদেব', 'সঙ্কর্ষণ', 'প্রদ্যুম্ন', 'অনিরুদ্ধ' এই চারিটি তত্ত্ব লইয়া বৈষ্ণব দর্শনের চতুর্ব্যূহ। বলা আবশ্যক, পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এ সকলই সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের ব্যবহৃত শব্দ। অধিকাংশ পুরাণে সৃষ্টির ক্রম বর্ণনা কালে সাংখ্যমতই গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" বলিয়া সাংখ্যমতেরই প্রশংসা করিয়াছেন। যাহাহউক মহত্তত্ত্ব হইতে কিরূপে তন্মাত্রাদির সৃষ্টি হয় দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণেরই ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে মহত্তত্ত্বও সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব হইতে দেবতা ও মানবাদির সাত্ত্বিক অংশ সৃষ্ট হয়। রাজস মহত্তত্ত্ব হইতে মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জীবের রাজসিক অংশ সৃষ্ট হয়। এবং তামস মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, স্থাবর, জঙ্গম, তির্য্যক্ প্রাণিগণ এবং মনুষ্যাদির তামসিক অংশ সৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রাণিগণের সৃষ্টিকার্য্য না চিন্তা করিয়া, কিরূপে পঞ্চতন্মাত্রাদি ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি হয় দেখা যাউক।

মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইবার সময় সর্ব্বপ্রথম শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দই প্রণব বা পরাবাক্ শক্তি। ইহা অব্যক্ত। ব্যক্তাবস্থায় প্রণব যথাক্রমে 'পশ্যন্তিবাক্', 'মধ্যমাবাক্' ও 'বৈখরীবাক্' এই তিন নাম ধারণ করে। এ তিন প্রকার প্রণবের কার্য্যক্ষেত্র যথাক্রমে 'কারণ জগৎ', 'সূক্ষ্ম জগৎ' ও 'স্থূল জগৎ'। কারণজগতাদির তত্ত্ব বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত আছে। শব্দের সাহায্যে কিরূপে সৃষ্টি হইতে পারে তাহা বৈজ্ঞানিক পাঠক অবশ্য জানেন। কারণ, যাহাকে vibration বলে তাহা শব্দেরই নামান্তর; এবং vibration হইতেই বেগ, তাপ, আলোক, তড়িৎ, প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শব্দের

শক্তি সম্বন্ধে Theosophistগণের কোন পুস্তকে কি লেখা আছে তাহার কিঞ্চিৎ পাঠ করুন—

Alike in Kosmos and in man there is the power of sound —sound without which form cannot be, sound which is the builder of form, which generates form, every sound having its own form (as proved by western science) and every sound being of this triple character, that it generates form, that it upholds form, that it destroys form. Thus once again the trimurti appears, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, & মহেশ্বর, * * * * The sacred word ওঁ expresses the one and latent being, every power of generation, of preservation and of destruction. Preservation I say, since without sound nothing exists; everything is in constant motion; one sort of motion creates form, another preserves it, and the third disintegrates it; and the destruction of one form is only the building of another. That which is destroyed in one shape is created in another. There is no annihilation.

হিন্দুরা কিজন্য প্রণবকে সকল তত্ত্বের মূল বলিয়া স্বীকার করেন এক্ষণে তাহা কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতেছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে প্রণবের যে সমস্ত রূপ আছে তাহা মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্রে এবং তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের নিকট জ্ঞাতব্য। আমরা কেবল কতকগুলি দুর্ব্বোধ শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের অধিক কিছু বলিবার অধিকার নাই। সংক্ষেপে এই মাত্র উল্লেখ করিতে পারি যে ব্রাহ্মণের উপাস্য বেদমাতা গায়ত্রীর অর্থবোধ করিতে হইলে এই সকল তত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

যাহাহউক, মহত্তত্ত্ব হইতে সর্ব্ব প্রথম শব্দের সৃষ্টি হইল। শব্দ আকাশের গুণ। এই শব্দ হইতেই আকাশ তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল। আকাশ হইতে বায়ু তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল। বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। বায়ু হইতে বহ্নি তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল। বহ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। বহ্নি হইতে জল তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল। জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। জল হইতে ক্ষিতি তন্মাত্রের সৃষ্টি হইল। ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এস্থলে বলা আবশুক, মহাভারত এবং মনুসংহিতাদির কোন কোন স্থলে সর্ব্বপ্রথমে জলের সৃষ্টি হইল এইরূপ বর্ণনা আছে। এস্থলে দার্শনিক তত্ত্বের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলেও

একরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে। হয়ত মহাভারতাদিতে সৃষ্টির ক্রমিক স্তরগুলি যথাযথ ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। না হয়, জলকে সাঙ্কেতিক শব্দরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। পুরাণাদিতে সাঙ্কেতিক শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে তাহা বলাই বাহুল্য। Theosophistগণও বলেন 'fire' and 'water' are sometimes used as symbolic names for 'spirit' and 'matter' respectively and express the duality of the Second Logos or ব্রহ্ম। যাহাহউক, পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত সম্বন্ধে শেষোক্ত গুণটিকেই প্রধান গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, ইত্যাদি। এইরূপে মহত্তত্ত্ব হইতে একদিকে পঞ্চভূতের সৃষ্টি, অপরদিকে অহঙ্কার বা ব্যক্তিগত চৈতন্যের সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, এবং চরাচরস্থ স্থূল সূক্ষ্ম তাবৎ প্রাণিপুঞ্জের সৃষ্টি হইল। এখন বুঝা যাইতেছে পঞ্চভূত ও ব্যক্তিগত চৈতন্য অর্থাৎ অহঙ্কারের সংযোগে মনুষ্যাদি জীবগণের সৃষ্টি। দেবগণের দেহ স্থূল ভূতে গঠিত নহে। সূক্ষ্মভূত বা পঞ্চতন্মাত্রের সমবায়ে তাঁহাদের অলৌকিক দেহ রচিত হইয়া থাকে। এই জন্য দেবতাগণ ও সূক্ষ্ম জগত সকল মনুষ্যের স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর। সাধনবলে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইলে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি লাভ করা যায়।

এক্ষণে 'আমি কে'? এই প্রশ্নের আংশিক মীমাংসা হইয়াছে। আমি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত এবং অহঙ্কার বা ব্যক্তিগত চৈতন্যের সমবায়ে উৎপন্ন জীব। তাহা হইলেই আমাতে পঞ্চতন্মাত্র হইতে গণনা করিয়া একাদশটি তত্ত্ব নিহিত আছে দেখিতেছি। কিন্তু অহঙ্কার পর্য্যন্ত স্থির হইলেই সমস্ত তত্ত্ব নির্ণীত হইল না। যেমন ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব আছে, সেইরূপ ত্রিবিধ অহঙ্কারও আছে। মহত্তত্ত্বকে macrocosm অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, এবং অহঙ্কারকে microcosm অর্থাৎ জীব সম্বন্ধে বুঝিলেই কোন গোল থাকিবে না। বস্তুতঃ macrocosm সম্বন্ধে যাহা সত্য, microcosmসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই জন্যই বলে "যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে"। একটি ব্রহ্মাণ্ড ও একটি পরমাণু একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। বিশেষতঃ জীব দেহ ও ব্রহ্মাণ্ডদেহ এতদুভয়ে বড়ই সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়েরই গঠন ও কার্য্যাবলী এক। কেবল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই মাত্র পার্থক্য। ফলকথা, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি চৈতন্যের নাম মহত্তত্ত্ব, এবং জীব দেহস্থ বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জীবদেহে বুদ্ধি, মন এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের উৎপত্তি হয়। পাঠকগণ

স্মরণ করুন, আমরা এইজন্যই "অতীন্দ্রিয় জগৎ"* নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে জীব দেহস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যমূলে এক একটি দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ দেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী। রাজস অহঙ্কার হইতে জীবদেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে তামস অহঙ্কার হইতে জীবদেহে পঞ্চতন্মাত্র. ও পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক, হিন্দু দার্শনিকেরা 'মন'কে ইন্দ্রিয় মধ্যে গণনা করিয়াছেন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারিটিকে, এক সঙ্গে সংক্ষেপে অন্তঃকরণ বলে। 'চিত্তে' ও মহত্তত্ত্বে' ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রভেদ মাত্র। Individualসম্বন্ধে যাহাকে চিত্ত বলি, Universeসম্বন্ধে তাহাই মহতত্ত্ব। বুদ্ধি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের রুদ্র, এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা।

তবেই দেখা গেল, জীবদেহে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত বা মহত্তত্ত্ব লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২৪টি তত্ত্ব আছে। ইহারাই সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের পর কেহ কেহ 'প্রকৃতি' ধরিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব গণনা করেন।

এতক্ষণে আমরা 'আমি কে ?' এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইলাম। আমি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব সম্বলিত জীব। আমি প্রকৃতির অধীন এবং সর্ব্বথা প্রকৃতির দ্বারা চালিত। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান আমার যতদিন না হইবে তত দিন আমি জন্মমরণাদি ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে বাধ্য। যে দিন আমি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিব, সে দিন আমি মুক্ত বা শিব। এই প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানই জীবের চরম সাধনা। এই জ্ঞান সাধন করিতে হইলে আত্মাকে সর্ব্বদা দেহ হইতে পৃথক ভাবনা করিতে হয়। দেহের সুখ দুঃখে আত্মাকে যত্ন পূর্ব্বক উদাসীন রাখিতে হয়। আত্মা স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত হইলেও দেহের সান্নিধ্যবশতঃ সমল ও আসক্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। জীব বা microcosm পক্ষে দেহ ও আত্মার যে পার্থক্য, ব্রহ্মাণ্ড বা macrocosm পক্ষে প্রকৃতি ও পুরুষেও সেই পার্থক্য। পুরুষ যেন প্রকৃতিরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া বিরাজমান আছেন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

---

* নবপ্রভা, ২য় খঃ, ৪র্থ সং, ১৬২ পৃঃ।

প্রভাবতীর ছানাবড়া।

১

তোমার এ ছানাবড়া নানা সুষমায় গড়া,
চর্ব্বণেতে সর্ব্বদুঃখহরা ;
কিবা সু-তনুর ছাঁদ, যেন সপ্তমীর চাঁদ,
তারি মত পীযূষেতে ভরা ;
মরি, কি সুন্দর বর্ণ, নিন্দিয়া কষিত স্বর্ণ,
(যাহা, হায়, মোর ঘরে নাই,—
কিবা আসে যায় তাতে, যদি প্রতিদিন পাতে
হেন দুটি ছানাবড়া পাই !)
আহা, কি সুন্দর গন্ধ, জিনিয়াছে মকরন্দ,
জুটিছে অলির অন্ধ ঝাঁক,
আবরণ খোলা দায়, আসিয়া বসিতে চায়,
পাইলেই এতটুকু ফাঁক।
কেমন নধর কান্তি, হৃদয়ে উপজে ভ্রান্তি,
জিহ্বায় মাখায়ে দেয় লালা,
যদবধি না মিলন, কেবলি সে উচাটন,
রাধার বিরহে যথা কালা !
সে পূত মিলন হলে, যবে তার তনু গলে,
হৃদয়ের টুটে আবরণ,
কি দেখি ভিতরে তার ?— কোমলতা মধুতার
অনবদ্য সুচারু মিলন !—
পেস্তা-আঁটা বাটা ক্ষীর, শুভ্র শোভা নবনীর,
তায় এলাচির দানা রাজে,
বৃন্তে ঘেরা যথা বেলী,—আশা-বাঁধা প্রেম-কলি,
সুরভি বিরহ মাঝে মাঝে !
কেবা আছে বঙ্গবধূ, দিতে পারে হেন মধু,
যেমন তোমার ছানাবড়া,
রূপে, গুণে, ঠিক পাকে, সবে এর দূরে থাকে,—
কেউ থসথসে, কেউ কড়া।

২

মহাকবি কালিদাসে, বঙ্কিমের উপন্যাসে,
হেম-রচা হৈম কবিতায়,
রবীন্দ্রের কাকলীতে, নবীনের যুদ্ধ-গীতে,—
কোথাও না দেখিলাম, হায়,
লয়ে রসনার প্রীতি কেহ রচেছেন গীতি ;
রসনা কি এতই অসার ?
চক্ষুঃ, কর্ণ, ত্বক্, ঘ্রাণ, কি কারণে সত্ত্ববান্
পেতে পদ্যমহলে পসার ?
বলে কবি,—"শোভাময়ি, গানমাখা-কণ্ঠে, অয়ি,
অধরের পরশে শিহরি,
তোমার অলক-গন্ধ, যেন সামবেদ-ছন্দঃ,
ধমনীতে নাচায় লহরী !"—
বলে জিহ্বা,—"শুন কবি, মোরা পাঁচ ভাই সবি
এক ঘরে এক অন্নে রয়ে,
কাটাতেছি জন্মাবধি ; মনে করে দেখ যদি,
পড়িয়া থাকিবে বোধোদয়ে।
তবে কেন মোর প্রতি হেন অবিচার অতি ?
কাব্যে কেন মোর স্থান নাই ?
আমার তৃপ্তির কথা, না জাগায় কবি-ব্যথা,
কেন তাহা শুনিবারে চাই।
আমার নির্ম্মল আশা, শৈশবের ভালবাসা,
জননীর-স্তন্য-পূত কথা,—
তাহে না কবিতা জুটে ? তাহে না উপমা ফুটে ?
গদ্যময় হেন সরলতা ?"—
অবজ্ঞায় বক্র ঠোঁটে, কবি সেথা হতে ওঠে ;
রসনা কাঁদিয়া তবে কয়,—
"দেখ, দেখ হে ঈশ্বর,— ব্যক্ত গুপ্ত কবিবর,
বিদ্যার সাগর মহাশয় !"

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

মন্দ্র।

(শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় রচিত মন্দ্র পাঠে)

আজ তোর নিস্তরঙ্গ ভাব সিন্ধুবুকে,
কার এ উদার মন্দ্র, হাঁ মা বীণাপাণি!
কে তোর ও শুষ্ক তন্ত্রী চেতাইয়া সুখে
গাহে এ ভৈরব স্বনে, হে কল্পনা-রাণি!
ক্ষীণ-প্রেম-গীতি মুগ্ধ শ্যাম কুঞ্জে তোর
এ উন্মাদ আশা ভেরী বাজিল কাহার?
নির্ভয়ে, বিচারি' কেবা নিগড় কঠোর
ছিঁড়িল, টুটিল গর্ব্বে পীড়িতা ভাষার?
কোটি মৌন কণ্ঠ মাঝে স্থির, অচপল
কার আজি উঠিল এ সতেজ ঝঙ্কার?
কে দেখাল, কে বুঝাল, কি দীপ্তি প্রবল,
তোর বক্ষে মাতৃভাষা! করিছে সঞ্চার?
কোন্ বর পুত্র তোর কমল-আসনা
করিল এ সঞ্জীবনী বিজয়-ঘোষণা?

শ্রীগিরিজা কুমার বসু

জলস্তম্ভ।

চুম্বক শলাকা যেমন মেরুমুখী হয় সেইরূপ আকাশের দিক হইতে বাষ্পাগ্রভাগও উত্তাল তরঙ্গায়িত অম্বুরাশির দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। কখনও কখনও অতি অল্প দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে। স্তম্ভ পুচ্ছটী আর অবতরণ করে না। জলস্তম্ভের লক্ষ্য ভ্রষ্টতাই ইহার কারণ, এই যুক্তি নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। বাষ্পস্তম্ভ অম্বুরাশির নিকট হওয়া মাত্র উহার বক্ষদেশ স্ফীত হইতে থাকে।

১৭৫১ সালে জালাবার্ট (M. Jalabert) জেনেভা হ্রদে পূর্ব্বোক্ত

দৃশ্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীপরিবেষ্টিত হইয়াও এই ক্ষুদ্র হ্রদটুকু তাড়িতের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় নাই। জালাবার্ট বলিয়াছেন "মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ও অম্বুরাশি উদ্বেলিত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু অনতিদূরে বায়ুমণ্ডল স্থির নিস্পন্দ।" (১)

১৭৫২ সালে এই হ্রদ হইতে একটি ভয়াবহ সরল স্তম্ভের শূন্যে উঠিবার প্রয়াস জালাবার্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। উর্দ্ধে মেঘের চিহ্ন মাত্রও নাই, তথাপি স্তম্ভটি অদৃশ্য শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শূন্যে উঠিতে লাগিল। কিন্তু উর্দ্ধে মেঘ না থাকাতে স্তম্ভটি অনির্ভর অবস্থায় আর অধিক দূর উঠিতে পারিল না। অল্পদুর মাত্র উঠিয়াই হ্রদ-বেলা-ভূমিতে প্রবল বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইল; আর অমনি তটদেশে জলপ্লাবন উপস্থিত হইল।

নিউজিলণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী স্মিথদ্বীপের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে প্রিন্সেস্ চার্লটী (Princess Charlotte) উপসাগরে কাপ্তান কুক, ১৭৭৩ সালের ১৭ই মে তারিখে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী পণ্ডিতপ্রবর ফরেষ্টারকে সমভিব্যাহারে যে জল যাত্রা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দেখিয়াছেন যে অতি সন্নিকটে সমুদ্র উদ্বেলিত ও ফেনিল হইতে লাগিল, এবং শীঘ্রই শুভ্র ফেনরাজি ফুলিতে আরম্ভ করিল, এবং নাবিকগণ সমুদ্র মধ্যে জলের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ উত্থিত হইতেছে দেখিতে পাইল। এই স্তম্ভটি অবশেষে মেঘের সঙ্গে মিলিত হইয়া গেল; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আরও তিনটি সুবৃহৎ স্তম্ভ প্রথমটির চারি দিকে উৎপন্ন হইল। তন্মধ্যে প্রধানটী জাহাজ হইতে অর্দ্ধমাইল মাত্র অন্তরে অবস্থিত ছিল। ক্ষণকাল মধ্যেই ইহা অতি আশ্চর্য্যজনক ভৌতিক কার্য্য সংঘটন করিয়া আরব্য উপন্যাসের দ্বিতীয় অবতারণা করিয়াছিল। সূর্য্যকিরণসম্পাতে জলস্তম্ভ পীতবর্ণে রঞ্জিত হইল এবং চারুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শকবৃন্দের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

কাপ্তান নেপিয়ার তাঁহার জলযানের সন্নিকটে একবার জলস্তম্ভ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যেমন দেখিলেন অমনি রিভলবার লইয়া স্তম্ভকে গুলি করিলেন, স্তম্ভটী বিচলিত হইল, আবার রিভলভার ছুড়িলেন এইবার গুলি স্তম্ভের ক্ষীণ ভাগে স্পর্শ করিল এবং স্তম্ভটি ছিন্ন করিল। স্তম্ভটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। কিন্তু উহা পুনরায় মিলিত হইবার জন্য যেন ছিন্ন সর্পের

(1) Thunder and Lightning by W. DE. Tonvielle.

ন্যায় হেলিতে দুলিতে লাগিল। হেলিয়া দুলিয়া পুনরায় দুইটী অংশ মিলিয়া গেল। এবারে কিন্তু ইন্দ্রজাল ভেদ হইল। যে ভ্রমরকৃষ্ণ নিবিড় মেঘরাশি সূর্য্য দেবকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল বারিবর্ষণে তাহা অপগত হইল, এবং যেন নির্ম্মুক্ত প্রভাকর আবার সুনীল গগনে জগৎকে আলোকিত করিল। যেন বৃষ্টি হয় নাই; সকলি যেন অলীক, স্বপ্নের ছায়া মাত্র।

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি জলপথে একবার পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইতেছি, সহসা নদীবক্ষে জলস্তম্ভ সন্দর্শন করিলাম। শরৎ কাল,—নদী পূর্ণসলিলা, ধলেশ্বরীর জল রাশি তর তর বেগে ছুটিয়াছে—ভাস্করপ্রভায় বসুধা দীপ্তিময়ী; ধীরে ধীরে আকাশের এক প্রান্তে একখণ্ড নীরদ উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে মেঘখানা আকাশে পরিব্যাপ্ত হইল, প্রভাকরকে ঢাকিল, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দেখিলাম—পশ্চিম গগনে হস্তিশুণ্ডের মত একখণ্ড মেঘ দুলিতেছে। একটি দুইটী করিয়া আরও কয়েকটী মেঘখণ্ড এই প্রকারে আকাশ হইতে ঝুলিয়া পড়িল, উহার মধ্য হইতে একটী নদীবক্ষ স্পর্শ করাতেই সেখানকার জলরাশি উচ্ছলিত হইল এবং একপ্রকার সোঁ সোঁ শব্দ শ্রুত হইল। আমরা ত্রস্তব্যস্তে সন্নিহিত একটি ঝোড়ার মধ্যে আশ্রয় লইয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে জলস্তম্ভের বিষয় পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি নাই। আনন্দ, বিস্ময় ও ভয় যুগপৎ আমার হৃদয় পরিপ্লুত করিল। আমি তন্ময় হইয়া উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হইল, তাহার পরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এক্ষণে গল্পাংশ পরিত্যাগ করিয়া আমরা ইহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব।

আবর্ত্তন নিবন্ধন বায়ুস্তম্ভের মধ্যস্থলে কেন্দ্রবিমুখ শক্তির (Centrifugal force) উদয় হয় এবং তদ্ধেতু স্তম্ভের মধ্যস্থল একেবারে বায়ুপরিশূন্য হয়; চারিদিকে বায়ুরাশি অবিরত প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং কোনও প্রাসাদপৃষ্ঠ দিয়া এই ঘূর্ণমান বায়ুস্তম্ভ প্রবাহিত হইলে প্রাসাদোপরি বায়ুর বাহ্যিক চাপ (external pressure) হঠাৎ হ্রাস হইয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ে প্রাসাদমধ্যস্থিত বায়ুরাশি একবারে বহির্গত হইতে না পারায় দেওয়ালে ও ছাদে প্রাসাদমধ্যস্থিত বায়ুরাশির চাপ অত্যন্ত অধিক হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রাসাদের বাহিরের ও মধ্যের বায়ুর চাপ সমান ছিল, কিন্তু এক্ষণে বাহিরে

বায়ুর চাপ কিছুই না থাকাতে, আভ্যন্তরিক চাপ অত্যন্ত অধিক হয়। (১) এই আভ্যন্তরিক চাপনিবন্ধন দেওয়াল ও ছাদ প্রভৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

এক্ষণে, সমুদ্র বক্ষে এই প্রকার বাত্যাবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জলস্তম্ভ উদয় হয়। ইহা প্রথমতঃ অতি ঊর্দ্ধে মেঘমণ্ডলে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায়। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী স্থানে উপরের স্থান অপেক্ষা বায়ুর গতির প্রতিরোধ অনেক বেশী, সুতরাং ঊর্দ্ধেই বায়ুর আবর্ত্ত প্রথম আরম্ভ হয়, এবং নিম্নস্থ শীতল বায়ুরাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। এই শীতল বায়ুরাশি তূর্ণ মধ্যস্থিত উচ্চ ও আর্দ্র বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলেই বাস্পরাশি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মেঘরাজিও হস্তিশুণ্ডাকারে পরিণত হয়। বায়ুস্তম্ভের আবর্ত্তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পৃষ্ঠের নিকটস্থিত প্রতিরোধ অতিক্রম করিতে থাকে। এবং শুণ্ডের অগ্রভাগ ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে। এই প্রকারে স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান সমুদ্রবক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই শূন্যস্থান দিয়া জলরাশির ঊর্দ্ধে উঠিবার ঝোঁক থাকে; এবং বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধ বক্রগতি কর্ত্তৃক জলরাশি ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘস্তম্ভের সহিত মিলিত হইলেই জলস্তম্ভ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। (২) জলরাশি ঊর্দ্ধে উঠিবার ঝোঁক অন্য কারণেও সংঘটিত হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঘূর্ণমান বায়ুস্তম্ভের মধ্যস্থিত বায়ু একবারে শূন্যতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই বায়ুস্তম্ভ সমুদ্রবক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে সমুদ্রবক্ষকে যে স্থানে বায়ু স্পর্শ করে তাহার মধ্যবর্ত্তী স্থান বায়ুভারশূন্য হয় কিন্তু উহার চতুর্দ্দিকে বায়ু তন্নিম্নস্থ বারিরাশি পূর্ব্ববৎ চাপিতেছে, সুতরাং চারি দিকের বায়ু চাপ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া চাপহীন স্তম্ভ মধ্যস্থিত জলরাশি স্ফীত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। সুতরাং বায়ুচাপে যেরূপ ভাবে পীচকিরী ভিতর জল উঠে সেইরূপে বায়ুস্তম্ভের ভিতর জল উঠিয়া জলস্তম্ভের উদয় হয়। এই শেষ যুক্তিটী একেবারে প্রবল না হইলেও অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিবুধমণ্ডলী পূর্ব্বোক্তযুক্তিসমূহ দ্বারা জলস্তম্ভের কারণ তত্ত্ব মীমাংসা করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

---

(১) ১বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ১৫ পাউণ্ড বা ৭½ সের ভারের চাপ যাহা হয় সেই হারে।

(২) W. Ferrel in Mathametical Monthly.

বলদ পঞ্চানন।

নারদীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে

(শ্বেতবরাহকল্পে চাতুর্য্যপর্ব্বে ষোড়শ অধ্যায়)

এই পঞ্চানন স্বয়ং সিদ্ধবিদ্য মহামহোপাধ্যায়—ইঁহার নামই পঞ্চানন, বলদ এই শব্দটী উপাধি। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কখন কখন পদ সংস্থানের পৌর্ব্বাপূর্ব্ব ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, সুতরাং "বলদ" পদটি উপাধি। এ উপাধিটা উপহাসজনক নহে। আভিধানিক অর্থের দ্ব্যর্থ থাকিলেও আমরা ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ লইব ; অর্থাৎ বল-দান করে যে ; অথবা বলধ্বংসকরে যে।

উপাধিটি কোথা হইতে পাইলেন? কার্য্য দেখিয়া সমাজ দিলেন, রাজা তাহা অনুমোদন করিলেন। বলদ শব্দে ব্যবসায়ী লোকের ভারবাহী বলীবর্দ্দ নহে, ঠিক জানিবেন। তবে বুদ্ধির অত্যন্ত স্থূলতা বা সূক্ষ্মতার চরম সীমা অতিক্রান্ত হেতু বলীবর্দ্দে লক্ষণা করা যাইতে পারে।

পাঠক এখন জিজ্ঞাসা করিবেন ইনি কোন শাস্ত্রে পণ্ডিত? আমরা কহিব ইনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। তাহা না হইলে উপাধি পাইলেন কেন? পাঠক কহিবেন " উপাধি ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে।"

বিদ্যা আছে। " কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বাক্যে মারেন পুড়িয়ে" এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

১। কুড়েমীর অধ্যাপনায় ইহাঁর তিনটী ছাত্র ছিল। একটির নাম বাদসাই আল্‌সে, দ্বিতীয়ের নাম গোঁপ খেজুরে, তৃতীয়ের নাম গুলিখোরের ইয়ার।

বাদসাহ পরীক্ষার জন্য ঘরে আগুন দিলেন, অনেকে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আধা আল্‌সে কহিল "কও রবি জ্বলে"। বাদসাই আল্‌সে কহিল "কে বা আঁখি মেলে"। বাদসাহ কহিলেন "সাবাস সাবাস সাবাস সাবাস্, বলিহারি যায়"।

গোঁপ খেজুরে পথে গাছতলায় শুইয়া আছে, গোঁফে খেজুর পড়িয়াছে, কে মুখে তুলিয়া দিবে? একজন পথিক কহিল, "তোমার মুখে খেজুর রহিয়াছে, খাইতেছ না কেন"? সে উত্তর দিল "তুমি জান আমি নবাবী আলসে, অনুগ্রহ করিয়া শ্রীচরণাঘাতে আমার মুখে ফেলিয়া দিলে খাইতে পারি। আমার উদ্যোগ শূন্য পুরুষ, আমাকে এখনও আলসেমির আর একপৈঠা উঠিতে হইবে।"

তৃতীয় আলস্যের কথা। গুলিখোরদিগের সঙ্গীর এক জনের মস্তক কাটা যায়। তাহার পুত্রাদিরা মুণ্ড লইয়া রাজ দ্বারে অভিযোগ করিল। রাজা সেই মুণ্ড কাহার জানিবার জন্য গুলিখোরদিগকে সাক্ষিস্থলে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই মুণ্ডটি তোমাদের সঙ্গী গুলিখোর রামকান্তের কিনা।" তাহারা কহিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা বহু দিন হইল একত্রে উহার সহিত গুলি খাইতাম বটে—কিন্তু কখনও তাহার মুখত দেখি নাই"। রাজা বুঝিলেন যে ইহারা এত বড় আলসে যে কেহ কাহারও মুখ দেখিবার অবসরও পায় না।

২। পঞ্চানন ভোজন পটুতা শাস্ত্রাধ্যাপনায় অনেকগুলি ছাত্র পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুই জন কৃতকর্ম্মা ও প্রাপ্তোপাধিক হইয়া তাঁহার কালেজ হইতে বাহির হয়েন। একজনের নাম মহাপেটুক বিদ্যাবাগীশ, আর এক জন তাঁহার দাদা দামোদর। মহাপেটুককে একটা নিমন্ত্রণের ভোজনের পর চারি পাঁচ জনে ধরিয়া পংক্তি হইতে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া দিল। সে কষ্টে স্বষ্টে দুই চারি পাদ গমন করিয়া ক্রমশঃ আস্তে আস্তে শয়ন করিল। লোকে কহিল "তুমি বড় পেটুক্"। সে কহিল "দেখ হাম্ ক্যাসা খায়া, খানেওয়ালা দেখ ভি হামারা দাদাকো দেখ, হাম পাঁওদলমে আতেহেঁ। দাদাজীভি এয়ছা ভোজন লিয়া উন্‌কা উঠ্‌নেকা তাগুদ হেয় নেয়। উছিছে উন্‌কী জরু ও লেড়কী খাটিয়া পর উঠাকর লে আতা হেঁ।"

পরান্নং পবিত্রং মন্যে ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভং।
যাবদ্দেহে স্থিতাঃপ্রাণাস্তাবদ্ গৃহ্ণন্তি পেটুকাঃ॥

বলদপঞ্চাননের শেষাবস্থায় চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ শব্দ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনিও বাচ্‌লামীতে লোককে জ্বালাতন করিতেন।

শেষ বয়সে লোকে প্রায় হরিপরায়ণ পরম ভাগবত হয়। বলদপঞ্চানন এই প্রথার অনুবর্ত্তী না হইবেন কেন? তিনি তিলকসেবা আরম্ভ করিলেন, হরিনাম করিবার নানা বর্ণের ঝুলী ও ঠকঠকী গ্রহণ করিলেন, মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। অবলাকুলের শেষ বিশ্বাস ভাজন হইলেন। ভক্ত বৃন্দ আসিয়া সেবা করিতে লাগিল। একদিন দুই সতীর্থ শিষ্যের পরস্পর একটা শব্দ লইয়া ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। একজন "বদরী" ফলকে কচু বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। আর একজন কহিলেন "না তুমি প্রভুর নিকট শিক্ষা কালে মনোযোগ দেও নাই। বদরী ফলের অর্থ কাঁচকলা।"

শিষ্যদ্বয় প্রভু বলদ পঞ্চানন গোস্বামী মহোদয়ের নিকট আসিয়া উভয়ের অর্থ উভয়ে বিজ্ঞাপন করিল। প্রভু হতবুদ্ধি হইলেন বটে, কিন্তু চাতুর্য্য প্রভাবে কহিলেন, "জ্ঞানদাস বাপাজী যে বদরীকে ব্যাখ্যা করিয়াছ কচু, সেটা তোমার পক্ষে অতি উত্তম হইয়াছে। না হইবে কেন? তুমি ভাগবত চুড়ামণি। তুমি বাগ্‌দী কুলের প্রহ্লাদ স্বরূপ। তোমার মহড়া নেয় কে। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘায়ু হইয়া আমার তিরোভাবের পর তুমি আমার মঠরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।"

দ্বিতীয় শিষ্যের নাম চৈতন্য দাস। ইহাকে আলিঙ্গন ও অষ্টাঙ্গে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাপু আমি তোমার ব্যাখ্যা শুনে অবাক্ হইয়াছি। তাই ভাবিতেছি প্রভু কি আবার যুগান্তর না হইতেই ধরণী মণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন? বদরীকে কাঁচকলা ব্যাখ্যা করিয়াছ। কোন অভিধান কর্ত্তা এতাদৃশ অর্থ দেখিতে বা শুনিতে পান নাই। তোমাকে ত আমি কোন আশীর্ব্বাদ করিতে সাহসী হই না। তবে বলি, তুমি আমার সালোক্য সাযুয্য প্রাপ্ত হও এবং নেড়া নেড়ি আঁটকুড়ীদিগের সমাজে বিরাজমান হও। তাহারা তোমার সেবক হউক।" চৈতন দাস, কহিল "প্রভু কি মীমাংসা করিয়াছেন! উভয়ের কি মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন! না হবে কেন, যেমন বংশে জন্ম। গোস্বামীর ঔরসে জাত, নাম বলদপঞ্চানন। সার্থক জন্ম, সার্থক নাম।" (উভয়ের কোলা কুলি ও দশা প্রাপ্তি, আর হরি বোল শব্দ)।

আর এক শিষ্য কহিল "গোঁসাই প্রভু আমার একটী সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।" প্রভু কহিলেন, "বৎস প্রশ্ন কর।"

সে বলিল,

"নমো নলিন নেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে।
রাধাধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে॥"

কবিতা শুনিয়া পঞ্চাননের চক্ষু হইতে অনবরত নদীর স্রোতের ন্যায় ধারা বহিতে লাগিল। শিষ্যগণ নিস্তব্ধ!—প্রভুর কি হইল! একজন কহিল, "দশা উপস্থিত না হয়।"

প্রভুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপর শিষ্য কহিল "আর ভয় নাই, প্রভুর চৈতন্য হইয়াছে। প্রভুর বদনে সকলে জলোচ্ছ্বাস দিন। জলপান করিতে-দিন।" তাম্বুল ও তাম্রকূটাদি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া প্রভু সজীব হইলেন। এখন প্রভু কহিলেন, "গৌর, তুমিই জীবের কল্যাণে রত তোমাকে নমস্কার করি।

শিষ্য নিত্যানন্দ দাস! শুন,—"নমো নলিননেত্রায়" এটুকু বোধ হয়, না জানে এমন বৈষ্ণব কেহ নাই। সুতরাং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন" ভক্তগণ বলিল "আহা"। তৎপরে "বেণু বাদ্য বিনোদিনে" এই অংশটুকু যে বৈষ্ণব না জানে সে পামর কুলপাংশুল, পাষণ্ড ও নাস্তিক, অধিক আর কি বলিব, যে বলিবে জানি না, তাহার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেলি।" ভাবুক শ্রোতৃগণ বলিল "আহা আহা।" গুরুপরায়ণ ছাত্র অবৈষ্ণব পরিগণিত হইবার ভয়ে আর কোন কথা কহিল না। গুরু আবার বলিতে লাগিলেন, "তবে—'রাধাধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে' এটুকুর অর্থ অবশ্য আমি করিব। স্বামী লাগুক না লাগুক তাহাতে আমার কি?" বলদ সাহঙ্কারে—"আগে গ্রন্থটা শুন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার মিলন হইলে, একদিন উভয়ে একত্র উপবেশন করিয়া নানা কৌতুকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভক্ত শৌচ কার্য্য না করিয়া প্রভুকে সভক্তিক একটি পান দিল। ঐ পানটা খাইতে শ্রীকৃষ্ণের মনে একটু দ্বৈধভাব হইল। তিনি ভাবিলেন শ্রীরাধা স্ত্রীজাতি কিছু বুঝিতে পারিবেন না; তাঁহাকে দেওয়া যাউক। তাই প্রিয়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শ্রীরাধে! তাম্বুল ধর। শ্রীরাধা তাম্বুলটী হস্তে লইয়া কহিলেন, "সুধাপান"। শ্রীরাধার এই শ্লেষ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মনে ক্রোধ হইল, কহিলেন, "তুমিত আমার সত্যভামা বা রুক্মিণী নহ। 'শালি নে'—এখানে শালি অর্থে শ্যালিকা। শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রণয় সূচক অশ্লীল ও কঠোর বাক্যে শ্রীরাধা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "বনমালি! নে"। কেমন ব্যাখ্যা ঠিক হইল কিনা।" সকলেই এক বাক্যে কহিল, "প্রভু যেখানে অতিশয় প্রেম সেই খানেই প্রেমের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন।" আর এক শিষ্য কহিল "এ শ্লোকটা তবে রসোল্লাসের নহে, রসাভাসের।" বলদ পঞ্চানন গোস্বামী কহিলেন, "তাই বটে।"

এক শিষ্য কহিল "এ ব্যাখ্যায় স্বামী লাগিবে কি?" বলদপঞ্চানন কহিলেন, "না লাগিবে কেন? শ্রীরাধার যে প্রকার রাগ দেখা যাইতেছে, ও জটিলা কুটিলে ও বড়াই বুড়ী আনা গোনা করিতেছে, শ্রীরাধার রাগটা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাড়িলে, আমার আয়ান দাদার প্রতি অনুরাগে পরিণত হইবে। সুতরাং স্বামী আপনি লাগিবে অর্থাৎ স্ত্রীর পতিতে অনুরাগ হইবে।"

এক শিষ্য কহিল, "প্রভু! আমি আপনকার কৃত অর্থটা আমরা আমাদিগের সম্প্রদায় মধ্যে আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক অদ্ভুত পাষণ্ড ঘোর শাক্ত আসিয়া দাঁড়াইল, 'নমো নলিননেত্রেত্যাদির' ব্যাখ্যা শুনিয়া হাস্য করিয়া

কহিল "ওরে ভূত, বোকা অভাগা, শোন তোদের গোস্বামীর কথা আর কি বলিব—নিতান্ত মূর্খ।

যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ, যিনি বংশী বাদনদ্বারা সকল জীবকে মোহিত করেন, এবং যিনি রাধার অধরামৃত পানে অত্যাসক্ত অর্থাৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাঁহাকেই নমস্কার করি—শ্লোকের অর্থ এই।"

"প্রভু আর কি বলিব! নমস্কার কথাটা শুনিয়া আমার গা জ্বলিয়া উঠিল। বেটাকে সকলে মেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম। আস্পর্দ্ধা! অখিলের পতি কৃষ্ণ, তাঁহার সহিত সাম্যভাব, তাই নমস্কার!

বলদ পঞ্চাননের যেমন শব্দ শাস্ত্রে ও ব্যাকরণাদিতে পাণ্ডিত্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রে-ও তদপেক্ষা পাণ্ডিত্যের ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না।

একটী ছাত্র পঞ্চাননের নিকট প্রশ্ন করিল, "গুরু শুনিয়াছি, চন্দ্রের যোলটী মাত্র কলা, পোনেরটী আমরা দেখিতে পাই, একটি দেখিতে পাই না। কেন সেটা দেখা যায় না এবং উহা কোথা থাকে, সব লোপ হইলে আবার কোথা হইতে আইসে?" পঞ্চানন কহিলেন. "শুক্লপক্ষের চন্দ্র অর্থাৎ যখন জ্যোৎস্না হয়, তখন ষোল কলা। যখন কৃষ্ণপক্ষ আঁধার—তখন চৌষট্টী কলা। ভারতের উক্তি আছে যথা,—"চন্দ্র সবে ষোল কলায়, কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়।" তখন ছাত্রগণ সমস্বরে বলিল—আহা মরি! কি ব্যাখ্যা! পাঠকও বলিলেন—"আহা মরি বলদ পঞ্চাননও পরিপূর্ণ চৌসটি কলায়।"

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

মেঘদূত।

কোথা কবি! কবে কোন্ আষাঢ়ের দিনে,
নবনীল মেঘভার হেরিয়ে গগনে,
কল্পনা-কুসুম-বনে করি বিচরণ
করেছিলে কাব্যসৃষ্টি, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
সে দিন কি বিরহের দারুণ হতাশে
কেঁদেছিল প্রাণ তব? তাই কি উদাসে

এহেন করুণ-গীতি ? রামগিরি শিরে,
তাই কি বিরহী যক্ষ ভাসে আঁখিনীরে ?
বরষে জলদ-জাল, চমকে বিজুরী,
প্রিয়ার বিরহ-শোকে শিহরি শিহরি
কাঁদে প্রাণ ঘন ঘন, ময়ূরী হরষে
অঙ্গ ভঙ্গ করি নাচে, শ্যামস্নিগ্ধ দেশে,
হাসে পুষ্প পুঞ্জে পুঞ্জে, আকুলিত হিয়া,
দৌত্য কার্য্যে মেঘ যায় প্রিয়ার লাগিয়া।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সমালোচনা।

বেতালে বহুরহস্য। শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম এ প্রণীত
মুল্য ।০ চারি আনা।

আমি আমার "প্রবন্ধ লহরী"তে চন্দ্রনাথ বাবুর কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিয়াছি। যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত কাহারও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে, যদি আমার চিন্তার গতি ফিরিয়া থাকে তাহা ভূদেব বাবু, বঙ্কিম বাবু, ও চন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া; গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহা লইয়াছি, তাহাতে কৃতজ্ঞতা; যাহা লই নাই, তাহাতে প্রতিবাদ। সেই জন্য যেমন ঐ তিন জনের নিকট কৃতজ্ঞ আছি; তেমনি তিন জনের লেখার বিরুদ্ধেই সময় সময় প্রতিবাদ করিয়াছি। অদ্য যে পুস্তিকার সমালোচনা করিতেছি, তাহার মুখ্য কথাতে আমাদের প্রতিবাদের কিছুই নাই। কেন না তাহা আমাদেরও মর্ম্ম কথা।

বৈতাল পঁচীসী নামক হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাতে নানা মনোহর গল্প আছে। তাহার মধ্যে একটী গল্প এই—

"ধর্ম্মপুরে গোবিন্দনামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন ভোজন বিলাসী; অর্থাৎ অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত

তাহা দুর্জ্জেয় হইলেও ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী; অর্থাৎ শয্যায় কোন দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ইহার মধ্যে ভোজনবিলাসী নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি আহার করিতে উপবেশন করিয়া, শ্মশান সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের অন্নে—শবগন্ধ পাইয়া আহার করিতে পারে নাই। আর একজন শয্যাবিলাসী—দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়াও ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ ছিল বলিয়া, তাহাতে নিদ্রা যাইতে পারে নাই।" এই দুইটী গল্পে অত্যুক্তি থাকিলেও ইহা অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ছিল, এক্ষণে সে তীক্ষ্ণতা নাই, ইন্দ্রিয়ের ও দেহের অবনতি হইতেছে, গ্রন্থকার এই গুরুতর তথ্যের আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। আমরা ক্ষিপ্ত অনুকরণে, বিলাসানলে পতঙ্গবৎ ছুটিয়া পড়িতেছি, দগ্ধ হইতেছি, ছটফট করিতেছি—তবুত ঐ দীপশিখাভিমুখে না ছুটিয়া থাকিতে পারি না। ভাদ্রের ভরা পদ্মার আবর্ত্ত যেমন নৌকাকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া, তাহাকে অতলজলে ডুবাইয়া দেয়, তেমনি তথাকথিত সভ্যতার বিষময় সৌখীনতার এক ভয়াবহ আবর্ত্ত আমাদিগকে সর্ব্বনাশ গর্ভে নিমগ্ন করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

আমাদের জীবনীশক্তির বিলোপ হইতেছে আমরা নির্জ্জীব নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের সেই পূর্ব্বের সাহস, স্ফূর্ত্তি সামাজিকতা প্রভৃতি আর নাই। আমাদের বালকেরা পর্য্যন্ত যেন বৃদ্ধের ন্যায় গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। আমরা সকলেই ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছি। যে ভীরু, নির্জ্জীব, বিকলাঙ্গবৎ সে আপনাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না অপরকেও বিশ্বাস করিতে পারে না ** মনে যাহা করি কাজেত আমরা কিছুই করি না—কাজে আমরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় পড়িয়া আছি। আমাদের দেহের পক্ষাঘাতে আমাদের মনও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে।—(২০-২১পৃ)

চন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালি জাতির কায়িক ও মানসিক রোগ নিরূপণ করিয়া তাহার নিদানতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন :—

আমরা ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত, তৃষ্ণায় আমরা জলপান না করিয়া বিষপান করি; আমরা বিকৃত অবিশুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করি; দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরই শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে; আমরা ভাত পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পারি না। অথচ বিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত; দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আমরা অভিভূত; আমাদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে। * * সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি গুরুতর কার্য্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সুনিয়ম ভঙ্গ করিতেছি' (২৩ পৃঃ)।

এই সকলই যে কেবল মাত্র কারণ তাহা নহে, এইরূপ নানা কারণ আছে।

তাহা ধীর ভাবে নিরূপণ করিবার জন্য চন্দ্রনাথ বাবু সকলকেই অনুরোধ করিতেছেন। এই হতভাগ্য জাতি যে জীবন মরণ সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছে অচিরাৎ এই সমস্যার সমাধান না হইলে, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, এই অনপলাপ্য সত্য, গভীর বিষাদের সহিত, আন্তরিক সরল স্বদেশ প্রেমিকতার সহিত তিনি ঘোষণা করিতেছেন। এই গুরুতর বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া এক্ষণে তুচ্ছ বিষয় লইয়া দেশের ধুরন্ধরগণ যে উন্মত্ত হইয়াছেন তাহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কায়স্থ হইয়াও বৈদ্যের উপরে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত নহেন। তিনি বসু হইয়া আপনাকে অস্ত্রধারী বীর ক্ষত্রিয় সন্তান প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য ও ওজস্বিনী ভাষা নিয়োগ করেন নাই। তিনি অবগত আছেন—যেমন ব্রাহ্মণগণ যদি মোক্ষমুলর-পদছায়ায় বসিয়া, অদ্য গবেষনা বলে নবতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া, "আমরা ইংরাজ ইংরাজ" বলিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে তাহারা জেতা ইংরাজের অধিকার বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না; তেমনি কায়স্থগণ যদি "আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা ক্ষত্রিয়" অথবা "আমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ" বলিয়া তারস্বরে বঙ্গদেশ প্রতিধ্বনিত করেন, তাহা হইলে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ করিবার বা আহার করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মই অবনতির হেতু, কর্ম্মই উন্নতির মূল। যে ব্যক্তির বা যে বর্ণের, বা যে জাতির কর্ম্মের পুণ্যবল আছে, সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও তাহার উন্নতির বাধা দিতে পারে না, তাহার শ্রেষ্ঠতা খর্ব্ব করিতে পারে না। পুণ্যে সমাজের উন্নতি, পাপে অধোগতি। তাই চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন যে

আমাদের পাপেই আমরা এমন হইয়াছি' (পৃঃ ৪০)

লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু। তাই আমরা মৃত্যুমুখে। আমাদিগের এক্ষণে লোভ, বিলাস বৈভবে। টাকা আমাদের উপাস্য দেবতা। মান খোয়াইয়া হউক, তঞ্চকতা করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, টাকা কর, ভাই টাকা কর। একবার টাকা করিয়া ফেল, তখন আর তোমার চুরির কথা কেহ বলিবে না। তখন তুমি মান্য, গণ্য, পূজ্য। যে সমাজ ধনের দাস, যে সমাজ পাপে পরিবর্দ্ধিত, যে সমাজ ঈশ্বর-পরিবর্জ্জিত, তাহার দুর্দ্দশার অন্ত কোথায়?—চন্দ্রনাথ বাবু বলিতেছেন,

বোধ হয় যে আমরা বিশ্বনাথকে ভুলিতেছি (৪০ পৃ)

আমরা বলি, "বোধ হয়" কেন—নিশ্চিতই আমরা বিশ্বনাথ, বিশ্বনিয়ন্তা

বিশ্বনিয়ম ভুলিতেছি। তাই আমাদের এত দুর্গতি। চন্দ্রনাথ বাবু প্রথমে বর্ত্তমান হিন্দুজাতির রোগ নির্ণয় করিলেন। তাহা কায়িক ও মানসিক পক্ষাঘাত।

তৎপরে তাহার কারণ নির্ণয় করিলেন। তাহা স্বাস্থ্যজনক পেয় ও খাদ্যের অভাব এবং স্বাস্থ্য জনক প্রবৃত্তির অভাব। এই উভয় অভাবের মূলে স্বকৃত পাপ গূঢ়াধিষ্টিত।

রোগের চিকিৎসা—বিশ্বনাথের প্রতি ভক্তি—যে ধর্ম্মভিত্তির উপর হিন্দু সমাজ সংস্থাপিত ছিল, সে দৃঢ় ভিত্তির উপর আবার তাহাকে সংস্থাপিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে, বৃথা কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স, বৃথা শিল্পাদির প্রদর্শনী, বৃথা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগিরি। সুধী চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার বেতালে বহুরহস্য নামক পুস্তিকাতে জাতীয় জীবন মরণ তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের দেশে অধিকাংশ লেখকই দেশের বর্ত্তমান সমস্যা আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ। এই দুর্দ্দিনে চন্দ্রনাথ বাবু আমাদিগের অনেকটা আশা ভরসা। তাঁহার "বেতালে বহুরহস্য" শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ও আলোচ্য। তাহাতে মহার্থযুক্ত বাক্য আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মাই থাই।

(প্রথম প্রস্তাব)

নবপ্রভার পাঠক মহাশয়েরা পৃথিবীর পুরাতন ভুগোল শাস্ত্র পাঠ করিয়া বহুল দেশ ও মহাদেশের নাম, প্রকৃতি এবং ইতিহাস বিষয়ে প্রকৃষ্ট রূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু মনোরম "মাই থাই" মুলুক পৃথিবীর কোন্ অংশে অবস্থিত তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারেন? ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রণীত ভুগোলাদির নব্য পাঠকপুঞ্জের নিকটে, ভারতবর্ষ ও চীন দেশের মধ্যস্থিত যে প্রাচীন মুলুক "সাম" বা "সায়াম" (Siam) নামে

পরিচিত, তাহারই প্রকৃত নাম মাই থাই।* 'মাই' শব্দের অর্থ দেশ, 'থাই' শব্দের অর্থ স্বাধীন—অর্থাৎ "স্বাধীন দেশ" (The land of the free)। সামবাসীদিগকে তাহাদের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এখনও মাই থাই বলিয়া পরিচয় দেয়, সাম বা সায়াম শব্দ তাহাদের প্রাচীন বা নবীন ইতিহাসে কিম্বা ভূগোলে নাই। তাহাদের জন্মভূমিকে "সামদেশ" বলিয়া আখ্যাত করিলে তাহারা বিষাদ ও বিস্ময়ের সহিত আখ্যাকারীকে তিরস্কার করে এবং এই অশ্রুতপূর্ব্ব নাম শ্রবণ করিয়া উপেক্ষার সহিত মৃদু মধুর হাস্য করিয়া থাকে। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক মহাশয়েরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তবে সাম বা সায়াম নাম কোথা হইতে বা কেমনে উৎপন্ন হইল ?" ইহার সদুত্তর এই যে, মুসলমানেরা যে সময়ে এ দেশে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল এবং বিশেষতঃ যে সময়ে তাহারা এদেশে ইসলামীয় ধর্ম্ম ও অধিকার বিস্তার করিতে প্রয়াস করিয়াছিল, যে সময়ে চীন পিতার ঔরসে এবং সায়ামী মাতার গর্ভে উৎপন্ন যে সকল সঙ্কর বা অন্ত্যজ জাতি মিনামা নদী তটে বাস করিত, তাহারা সান্ বা সাম (shan or sham) নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, এই সান্ শব্দ হইতে মুসলমানী সাম শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। এই জন্য এ দেশ এখনও ইউরোপীয় ও ইসলামীয় সমাজে সাম নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সানদিগের বংশ অদ্যাপি সাম দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা বাষ্পীয় অর্ণব পোত হইতে অবতরণ করিয়া সায়ামী তরণী যোগে মিনামা নাম্নী মনোহারিণী তটিনী অতিক্রম পূর্ব্বক সামের রাজধানী বঙ্গকঙ্ক (Bangkok) নগরে উপনীত হইলাম।† এই স্রোতস্বতীর উভয় কূলে বিবিধ বিচিত্র দেবালয়সমূহ দর্শন করিলে পথিককে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। নদীর নির্ম্মল সলিলে যখন এই সকল অসংখ্যাসংখ্য অট্টালিকা ও মনোহর দেবমন্দিরের অপরূপ ছায়া নিপতিত হয় তখন সে সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে মনোমধ্যে এক অবর্ণনীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মিনামা নদীর

---

* রোমকেরা ভ্রম ক্রমে মাই থাই (Muang Thai) মুয়ং থাই বলিয়া উচ্চারণ করিত, এজন্য এখনও ইংরাজেরা সামকে 'মুয়ং থাই' কহিয়া থাকে।

† ইংরাজি ভূগোলের পাঠকেরা সামের রাজধানীকে ব্যাংকক্ বলিয়া উচ্চারণ করেন, ইহা ভ্রম। এই নগরের প্রকৃত নাম বঙ্গকঙ্ক; এ কথা প্রস্তাবান্তরে বিশদ রূপে বুঝাইব। বৌদ্ধদেশের অনেক শব্দ ইংরাজিতে অতীব বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়—তদ্যথা, কং চং ফু শব্দ ইংরাজীতে Confucius কন্ ফিউশশ্ নামে উচ্চারিত হইয়া থাকে।—লেখক।

স্থানে স্থানে সামাধিবাসীদিগের বংশনির্ম্মিত কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কুটির এমন সুন্দর ও সুদৃঢ় যে প্রবল বন্যা বা ঝটিকায় তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে না অথবা ভাসিয়া যায় না। এখানে এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা বংশপরম্পরায় জলচর জন্তুর ন্যায় কেবল জলের উপরেই বাস করে। ঘাটে উপস্থিত হইবা মাত্র নানা প্রকারের বহুলোককে আমরা আহার্য্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে দেখিয়াছিলাম। এই সকল ভোজ্য দ্রব্য বিক্রেতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মধ্যে মধ্যে এক একজন লোককে "আইশা—কি" "আইশা—কি" বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে দেখিয়া আমরা বিস্ময় সহকারে একজন ফিরিঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আইশা-কি" শব্দের অর্থ কি? মৃদু মধুর হাস্য করিয়া সাহেব কহিল "বিক্রেয় পদার্থের নাম Icecream (আইশ্ক্রম্) অর্থাৎ বরফের কুল্পী"!!

নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বস্থানেই বহুসংখ্যক সারমেয় দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম, পৃথিবীর কোনও স্থানে বোধ হয় এত কুকুর একত্রে থাকে না। এই সকল কুকুরের গায়ের রং শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি। এক একটা কুকুরের গায়ের চর্ম্ম চিতা বাঘের গাত্রের চর্ম্মের ন্যায় চিত্রিত। ইহারা এদেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করে কিন্তু উপদ্রব করে না। এই সকল কুকুরেরা দেখিতে সুন্দর বটে কিন্তু ইহাদের আচার অত্যন্ত জঘন্য। কুকুরেরা মেথরের কার্য্য করে এবং ইহাদের দেহ হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয়; সময়ে সময়ে সেই দুর্গন্ধ অসহনীয় হইয়া উঠে। উগ্র প্রাকৃতিক নয় বলিয়া পথিকেরা প্রায়ই সারমেয় কর্ত্তৃক দংশিত হয় না। নগরে প্রবেশ করিয়া যে সকল স্ত্রীলোক দেখিলাম তাহাদের একটিও অলঙ্কার বর্জ্জিতা নহে; শেষে জানিতে পারিলাম, এখানকার স্ত্রীলোকেরা এরূপ অলঙ্কার প্রিয়া যে, খাইতে পাউক আর নাই পাউক, ইহাদের গাত্রে অলঙ্কার থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এই জন্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের অভাব হইলে লৌহ, তাম্র, কাষ্ঠ, টীণ প্রভৃতি নির্ম্মিত অলঙ্কারও ইহারা ব্যবহারা করিয়া থাকে। কুমারী কিম্বা সধবা অথবা বিধবা সকল স্ত্রীলোকই অলঙ্কারকে শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করে।

রাজধানী ব্যাংককে আমি অনেক দিন ছিলাম, কিন্তু প্রথম সপ্তাহ কাল অতীত না হইতে হইতে আমি সায়ামী জাতি ও সায়াম দেশ সম্বন্ধে যাহাকিছু জানিতে পারিলাম তাহাতে আমার কৌতুহল বৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল।

প্রথম কথা এই যে, সায়ামী দেশের লোকের মুখের চেহারায়, শরীরের গঠনে, আহার ও গার্হস্থ্য ক্রিয়ায় এবং বিশেষতঃ তাহাদের মাতৃ ভাষার এবং কথোপকথন কালে উচ্চারণ পদ্ধতিতে আমি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। তাহার পরে তাহাদের ভাষার অক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, অনেক অক্ষর আমাদের বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ, ঈকার, উকার, রেফ্, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু, রফলা প্রভৃতি অবিকল বাঙ্গালার নিয়ম প্রণালীমত। গ, ম, খ, ষ, ঘ প্রভৃতি অবিকল বাঙ্গালা। "ছিঃ ছিঃ" "খাই কি না খাই" "পথ চোল্ (চল)" প্রভৃতি কথা প্রত্যেক অণুতে অণুতে বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে মিলে। এখানকার প্রধান প্রধান প্রখ্যাত প্রবৃদ্ধ পণ্ডিতেরা ব্যাংককৃকে "বঙ্গ কক্ষ নগর" বলিয়া পরিচয় দেয়। এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া ভাবিলাম, বুঝিবা কোনও সময়ে এদেশে বাঙ্গালীর গতি বিধি ছিল। পরিণামে প্রকৃষ্ট অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি, সামদেশ এক সময়ে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল; কেবল হিন্দুরাজ্য নহে, এই সুদূরবর্ত্তী সামদেশ বাঙ্গালী জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালী জাতি কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। একজন সায়ামী সৈনিকপুরুষের গৃহে আমি তাহার এক কন্যার গলদেশে রৌপ্যনির্ম্মিত একটা মাদুলি দেখিয়াছিলাম, ঐ মাদুলীর পার্শ্বে একটা সুবর্ণের কবচ ছিল। কবচের আকার চতুষ্কোণ, ইহার উপরে যাহা খোদিত ছিল তাহা এক্ষণে সুস্পষ্ট ভাবে পাঠ করা যায় না, কিন্তু যে কয়েকটি অক্ষর এখনও পড়া যায় তাহার অধিকাংশই খুব পুরাতন বাঙ্গালা। চিত্র দ্বারা না দেখাইলে তাহা আমি পাঠকদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিব না; যদি সায়ামী ভাষার বর্ত্তমান অক্ষর সমূহ বাঙ্গালা অক্ষরের সহিত মিলাইয়া চিত্র করিতে পারিতাম তাহা হইলে পাঠক মহাশয় বুঝিতেন, সায়ামের অক্ষরের সহিত বাঙ্গালা ভাষার অক্ষর প্রায় এক। কবচে যে কয়েকটা অক্ষর পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা এই—

"রৌব নাম শ্রীজঙ্গম পতি···ছে" এই সকল মহাপ্রয়োজনীয় কথার আলোচনা, তৃতীয় প্রস্তাবে বিশদরূপে করিবার আকাঙ্খা আছে। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা উচিত, আসিয়ার, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিলে আজিও বাঙ্গালাক্ষরে খোদিত মুদ্রা এবং তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নগরীতে আমি এক খুব প্রাচীন মুদ্রায় বাঙ্গালা অক্ষর দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি মেদিনীপুরের "মেদিনীবান্ধব" নামক সাপ্তাহিক সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, উক্ত জেলান্তর্গত গড়বেতা নামক সমৃদ্ধি সম্পন্ন

পুরাতন গ্রামে মাটির নিম্নদেশ হইতে একটা সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; তাহার একদিকে সুস্পষ্ট বাঙ্গালা অক্ষরে যাহা খোদিত আছে, তাহা এই—

"শ্রীরাধা গোবিন্দচরণ সেবকস্ত" অপরদিকে বাঙ্গালাক্ষরে নিম্নলিখিত কথা গুলি খোদিত দেখা গিয়াছে—

"শ্রীগম্ভীরসিংহ নৃপবরস্ত চন্দ্রাব্দ ১০৪৩" এই সকল প্রমাণাদি দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালী নৃপতিদিগের শাসন সময়ে বাঙ্গালা অক্ষরে ধাতুমুদ্রা খোদিত হইয়া জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত হইত। এই সকল পুরাতন অক্ষরের বিশ্লেষণ করিতে পারিলে বাঙ্গালা ভাষার ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সমুদয় স্যামদেশে একটি সায়ামী লোকেও রজকের (ধোবার) কার্য্য করে না। এখানে যাহারা ধোবার কার্য্য করে তাহারা চীনের লোক, ইহাদের একজনও শ্যামবাসী নহে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানকার স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সোমবারে যে রংএর কাপড় পরিতে দেখিয়াছ, মঙ্গলবারে সে রংএর কাপড় পরিতে দেখিতে পাইবে না। এইরূপে প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন রংএর কাপড় পরিহিত হইয়া থাকে, তদ্যথা—রবিবারে লোহিত, সোমবারে শ্বেত, মঙ্গলবারে বাসন্তী রং, বুধবারে সবুজরং, ইত্যাদি ইত্যাদি। সামান্য (দরিদ্র) লোকেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় আর কোনও দেশে বস্ত্র সম্বন্ধে এরূপ প্রথা নাই।

শ্যামদেশে বাঙ্গালীর আগমন, উপনিবেশ স্থাপন, রাজবিস্তার এবং অধঃ-পতনের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে, সায়াম দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপে অভিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। সায়ামের স্বর্ণ, টীন, কাষ্ঠ, শ্বেত হস্তি, মাংগোস্তীন ফল এবং মৎস্য ব্যবসায়ে পৃথিবীর বহুজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। লোক সংখ্যা প্রায় ৯৬ লক্ষ; ইহার মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। পুরুষদিগের মধ্যে এক লক্ষের ভিতর একজনেরও দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই দাঁত কৃষ্ণ বর্ণ, ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দাঁতকে কালো করে; আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় একজন সায়ামী বলিয়াছিল কুকুরের মত শুভ্র দন্ত অথবা মুসলমানের মত দাড়ি রাখা ভদ্রলোকের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম নহে"। যাহারা ধনবান তাহারা নখ কাটেনা, এক এক জন ধনীলোক বা উচ্চপদস্থ

কর্ম্মচারীর অঙ্গুলির নখের যদি চিত্র দেখাইতে পারিতাম তাহাহইলে পাঠক মহাশয়েরা আমোদ ও আশ্চর্য্য অনুভব করিতেন। কাহারও কাহারও নখের অগ্রভাগ বিশুদ্ধ ও মূল্যবান স্বর্ণ দিয়া বাঁধান থাকে। সকলেরই গলায়, হাতে বা কোমরে তাবিজ, মাদুলী, পদক বা কবজ ঝোলান আছে ইহা দেখিয়াছি; পুরোহিতেরা ভূত, প্রেত, দৈত্য ও যাদুকরদিগের হস্ত হইতে শিষ্যের পরিত্রাণ জন্য এই নিরাপদাত্মিকা মাদুলী পরিতে দেন; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে পুরোহিত মহাশয়েরা নিজেই এক একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বা প্রেত !! সামদেশ বাসীরা ভাত খায়; চা, চুরুট ও পানের (তাম্বুলের) প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু সুরার প্রচলন প্রায়ই নাই। গৃহ নির্ম্মান করিতে হইলে, কুঠরীর সংখ্যা বিযোড় করিতেই হইবে, অর্থাৎ ২ ৪ ৬ ৮ প্রভৃতি সংখ্যার কুঠরী (Rooms) থাকিলে সে গৃহে কখনই মনুষ্য বাস করিবে না; ১ ৩ ৫ ৭ ৯ প্রভৃতি সংখ্যার গৃহ হওয়া চাই, নতুবা সে গৃহ ভূত ও প্রেতেরই উপযুক্ত, মানবাধি বাসের যোগ্য নয়। গ্রহাচার্য্য, গণৎকার, জ্যোতিষিক প্রভৃতির প্রভুত্ব সর্ব্বত্রই প্রবল। ভূত ভবিষ্যৎ গণনাকারীদিগের কথায় মাই থাই দেশের লোকেরা মরে ও বাঁচে। "রোজা" বা "অদৃষ্ট গণনাকারী"র সহিত পরামর্শ না করিয়া ইহারা কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করেনা।

সাম দেশে বার বৎসরে এক যুগ হয়, যে যে বৎসরে যে যে জীবের প্রাধান্য থাকে তাহা এই—মূষিক, গাভী, ব্যাঘ্র, শশক, সর্প, কীট, অশ্ব, ছাগ, বানর, মোরগ, কুকুর ও শুকর। যাঁহারা বলেন, সায়ামে জাতিভেদ নাই, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত; এদেশে কথায় কথায় জাতি ভেদ দেখা যায়, এদেশের লোকের হাড়ে হাড়ে জাতি ভেদ প্রথার প্রভাব প্রকৃষ্ট প্রকারে প্রবেশ করিয়াছে। এখানকার নৌকা অতি সুন্দর; মৎস্য ধরিবার প্রণালীও চমৎকার। নরপতির প্রায় একশত খানি নৌকা আছে, তন্মধ্যে প্রধান নৌকা খানি স্বর্ণ মণ্ডিত। রাজার পরিচ্ছদের বর্ণ পীত, রাণীর পরিচ্ছদের বর্ণ লোহিত, এবং সেনাপতির পরিচ্ছদের বর্ণ সম্পূর্ণ শুভ্র।

এদেশের আদালত সমূহের বিচার প্রণালী অদ্ভুত। অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির কুমারী, ভিক্ষুক ও জুয়ারী (Gamblers) এই কয়েক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আদালতে কোনও মোকর্দ্দমায় "সাক্ষী" স্বরূপে আহূত হয় না। পুত্র যদি পিতার পীড়ার সময় যথাসাধ্য সেবা না করে অথবা তাহার মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি যথারীতি সম্পন্ন না করে তাহা হইলে পৈতৃক ধন ও সম্পত্তি

হইতে সে বঞ্চিত হয়। হত্যাকারীর অপরাধ সাব্যস্থ হইলে তাহাকে থলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে লাঠি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলা হয় এবং ভূমিতে তাহার রক্ত পতিত হইবার পূর্ব্বে মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যদি কেহ কাহারও প্রাণদণ্ডের কারণ হয় তাহা হইলে মিথ্যা সাক্ষীকে হাতির পায়ে বাঁধিয়া দিয়া নগরে ঘুরাইয়া আনা হয়, তাহাতে তাহার প্রাণত্যাগ না হইলে বড় বড় কুকুরের দ্বারা তাহার মাংস খাওয়াইয়া দেওয়া হয়। ব্যভিচারীগণ প্রকাশ্যপথে বেত্রদ্বারা আহত হইয়া থাকে; বলাৎকারীর কপোলে বা কপালে অঙ্গারতপ্ত লৌহ-শলাকার দাগ দেওয়া হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তস্করেরা পশুশালায় ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত হইয়া রাজার হাতির জন্য ঘাস কাটে। নরপতির বার্ষিক আয় প্রায় দুই কোটি টাকা, এখানে টাকার নাম "টাইকল"। বাজারে শস্যাদির পরি-মাণের সময় দোকানদারেরা যে মাপ ব্যবহার করে তাহা অতীব কৌতুকাবহ; তাহা এই—

৮৮০	তিন্তিড়িবীজে	...	...	অর্দ্ধনারিকেল।
২৫	অর্দ্ধনারিকেলে	...	...	একটা বাঁশের ঝুড়ি।
৮০টা	বাঁশের ঝুড়ি	...	...	একটা শকটভার।
১২টা	শকটভারে	...	...	অর্দ্ধরাজত্ব।
২৪টা	রাজত্বে	...	...	এক সংসার।
৩	সংসারে	...	...	এক জাহাজ।
১২	জাহাজে	...	...	এক সমুদ্র।

ছোট ছোট বালকদিগের পাঠশালায় একদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম; দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা, রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে কেমনে পত্র লিখিতে হয় তাহাই তখন শিক্ষা করিতেছিল। রাজাকে পত্র লিখিবার প্রথা এই—"মহামহিমান্বিত তরু লতা ও জল এবং স্থলের কর্ত্তা, শ্বেত-হস্তির অধিপতি সুবর্ণের সমুদ্র, সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের নায়ক, নৌকার মালিক, বালকদিগের প্রধান, বালিকাদিগের ভাবী পতি শ্রীলশ্রীযুক্ত স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের সর্ব্বসুন্দর রাজা শ্রীশ্রীশ্রী—" ইত্যাদি!!! চতুর্থ শ্রেণীর বালকেরা একটা কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, তাহার অবিকল বাঙ্গালানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সকলেই স্বার্থপর, সকলেই গর্‌জি।
আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে, কি কর্‌বে দর্জ্জি॥

বাঘ মরে, ছাগ মরে, মরেনাকো মন।
বিদ্যা যদি নাহি থাকে, কি করিবে ধন॥
বুদ্ধ বুদ্ধ সদা ভজ, বাড়িবেক বুদ্ধি।
বুদ্ধিতে শুদ্ধিবাড়ে, শুদ্ধি হোতে সিদ্ধি॥

ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র।

(বারাণসীর আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী সভাতে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীর বক্তৃতা।)

সম্পাদক মহাশয়, বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীজীর দুইটী মাত্র বক্তৃতা "নবপ্রভা"তে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে ঐ বিষয় আর যে দুইটী বক্তৃতা প্রেরণ করিয়াছি তাহা অদ্যাবধি প্রকাশিত না করার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমি শুনিয়াছিলাম যে স্বামীজীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি নবপ্রভার গ্রাহক হইয়াছেন, এবং কোন কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সম্পাদক, শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কে, তাহা জানিতে সমুৎসুক। এবং দেশের কোন অতি উচ্চপদস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বারাণসীতে আগমন করিবেন। তবে আপনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় বক্তৃতা আর ছাপাইতেছেন না কেন? কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রকাশিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও বঙ্কিমভক্ত পাঠকগণ অতিশয় ব্যথিত বা কুপিত হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় দুই দিকে যাহা বক্তব্য আছে তাহা নিরপেক্ষভাবে "নবপ্রভা"তে প্রকাশ করায় কোন দোষ হইতে পারে না। যাহা হউক, সম্প্রতি কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে স্বামীজি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। যদি কোন আপত্তি না থাকে প্রকাশ করিবেন, অথবা আমাকে ফেরত পাঠাইবেন।—

রাত্রি ৮টা, সভাগৃহ সজ্জাপূর্ণ। এক্ষণও স্বামীজী আসেন নাই। সকলেই প্রবেশ দ্বারের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ঐ স্বামিজী—সেই প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় গৈরিক-বসন-পরিহিত, তাঁহার মস্তক দীর্ঘকেশ-সম্ভারশোভিত, বদনমণ্ডল গম্ভীর-চিন্তা-ব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সভাসীন ব্যক্তিগণ যুগপৎ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সভাপতি মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইয়া মঞ্চের উপর বক্তার আসনে বসাইলেন এবং নিজেও বসিলেন। সকলেই প্রতীক্ষামগ্ন।

সভাপতি মহাশয় উত্থান করিয়া বলিলেন—কবি হেমচন্দ্র মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। স্বামীজী আমাদিগের অনুরোধে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যে ছয়টী বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা আপনারা শুনিয়াছেন। এবং তাঁহার সমালোচনা প্রণালী আপনারা অনেকটা অবগত হইয়াছেন। তাঁহার চিন্তার তেজস্বিনী স্বাধীনতা, তাঁহার স্বাভিমত প্রচারের নির্ভীকতা, তাঁহার বেগময়ী ভাষা, তাঁহার হৃদয়দ্রাবি ভাবুকতা—কতবার আমাদিগকে আনন্দিত ও মোহিত করিয়াছে, আপনারা জানেন। আমি এক্ষণে আর কিছু বলিব না। স্বামীজী দয়া প্রকাশে হেমচন্দ্র বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

স্বামীজী দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি চারিদিক হইতে করতালি-ধ্বনি হইল। আবার সভা নিস্তব্ধ। তখন স্বামীজী গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

হে ব্রাহ্মণগণ!—ব্রাহ্মণ কবির তিরোধান হইয়াছে। অদ্য তাঁহার আসন কে লইতে পারে? ব্রাহ্মণ উপন্যাসিক বঙ্কিম গিয়াছেন; ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্রও গত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ-প্রাণ হিন্দুসমাজকে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন, আর কে বুঝিতে পারে? ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে তাহার দুঃখে কাঁদিতে পারে? ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে তাহার বিষাদ-পূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গাইতে পারে? ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কে বিপ্রের কঠোর স্বার্থ-ত্যাগ-স্বরূপ অস্থির বজ্র-শক্তির মহিমাকে অপূর্ব্ব মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারেন? মনুষ্য হৃদয়ে, অবনীতলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, চিরকালই দেবাসুরের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। উত্তমে ও অধমে, পাপে ও পুণ্যে, রিপু ও বিবেকে, ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, দেব ও দৈত্যে এই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। জীবদিগের মধ্যে এক শ্রেণী ধর্ম্মের ও মহৎ উদ্দেশ্যের সহায়, আর এক শ্রেণী ধর্ম্মের ও মহৎ উদ্দেশ্যের বাধা ও শত্রু।

মহাকবিগণ তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক-যুগ্মের সংগ্রামে এই দুই শ্রেণীর বিবাদ ও মহৎপক্ষের পরিণাম-জয় প্রদর্শন করেন।—

তাই মহাকবি হোমর, একিলিস্ এবং হেক্টরে,—কবিবর ভার্জিল, টর্নস (Turnus) এবং ইনিয়সে (Æneas)—কবিগুরু বাল্মীকি, রাম ও রাবণে—ব্রহ্মর্ষি ব্যাস, দুর্য্যোধন ও ভীমে—মহাকবি মিল্টন, ঈশ্বর ও সয়তানে,—শেলী, জুপিটর ও প্রেমিথিয়সে—এবং হেমচন্দ্র, বৃত্র এবং ইন্দ্রে—বিচিত্র যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মহাকবির কাব্যে বিশেষত্ব দেখুন, দেব ও দৈত্য সংগ্রামে—দেবতার পরিত্রাতা ব্রাহ্মণ দধীচি। হেমচন্দ্র পতিত ভারতে, অবসন্ন হিন্দুহৃদয়ে, ব্রাহ্মণ মহিমা কাব্যে প্রচার করিবার জন্য, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের কবিতাতে আমি চারিটী স্তর দেখিতে পাই।

১। ব্যক্তিগত। যথা, "হতাশের আক্ষেপ" ও "উন্মাদিনী"।

২। স্বদেশগত। "ভারত সঙ্গীত" ও "ভারত বিলাপ"।

৩। সমগ্র মানব (দেব-দৈত্য) জাতি গত। যথা "বৃত্রসংহার"।

৪। অখিলব্রহ্মাণ্ডগত। যথা, "দশমহাবিদ্যা"।

হেমচন্দ্রের কবিতাতে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রতিহত প্রণয় হইতে, বিশাল অপ্রতিহত প্রীতি, অবিরাম আনন্দ প্রবাহ—যাহা চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—তাহা ক্রমবিকাশে বিকশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকবি ক্ষুদ্র সংসার হইতে সুরাসুরের যুদ্ধ, সুরাসুরের যুদ্ধ হইতে বিপুল বিশ্ব-সৃষ্টি, বিপুল-ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি হইতে পরব্রহ্মাদিকে পাঠককে আকর্ষণ করিতেছেন। কোনও অব্রাহ্মণ কবির পক্ষে ঈদৃশ রচনা সম্ভব নহে। যে বর্ণ জগৎকে রামায়ণ ও মহাভারত দিয়াছে, সেই বর্ণই জগৎকে বৃত্রসংহার মহাকাব্য দিতে পারে। যে ব্রাহ্মণজাতি, নিজে আপনার জন্য দারিদ্র্য-দুঃখ-সার ভিক্ষাবৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া পরহিতব্রতের অমর উদাহরণ জগতের চক্ষে ধরিয়াছিল—কেবল সেই জাতীয় কবি, পরহিতার্থে প্রাণত্যাগী দধীচি মুনির মহিমা প্রচারার্থে, মহাকাব্য লিখিতে সমর্থ। "বৃত্রসংহার" কি ধর্ম্মপুস্তক নহে? ইহার প্রতি সর্গে, প্রতি শ্লোকে, কি আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই? ইহা হিন্দু জাতির মহতী গীতি, পতিত জাতির উদ্ধারের এবং মানব জাতির মোক্ষ-পন্থার এক মহাশাস্ত্র। হে হিন্দু! ইহার গূঢ় অর্থ কি তুমি আজিও বুঝিলে না? অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কি তুমি বৃত্রসংহার পাঠ কর নাই? হে ব্রাহ্মণগণ! অন্য লোকে ইহার অর্থ না বুঝিতে পারে, আপনারা ইহার অর্থ বুঝিবেন। আমি

তো নিশীথে, আমার নির্জ্জন পর্ণকুটীরে নিবাতনিষ্কম্প দীপালোকে, ইহা কতবার পড়িয়াছি—সন্ন্যাসী হইয়াও কতবার পড়িয়া কাঁদিয়াছি, কতবার অশ্রু-মোচন করিয়া বাতায়নপথে তারকা-খচিত অনন্ত গম্ভীর নীলাকাশ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছি। (করতালি) হে ব্রাহ্মণগণ! এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথার অর্থ বুঝিলেন কি? (বুঝিলাম, বুঝিলাম)।

এক্ষণে আমি যে চারিস্তরের কথা বলিয়াছি তাহা একে একে সমালোচনা করিয়া দেখি।

প্রথম স্তরে "হতাশের আক্ষেপ।" ব্যক্তি সম্বন্ধে হতাশের আক্ষেপ যাহা, হিন্দু জাতি সম্বন্ধে "ভারত বিলাপ" তাহাই। আমার যাহা তাহা আমার নহে, উভয় কবিতাতে এই কথা।

"হতাশের আক্ষেপে" প্রণয়ী বলিতেছেন,

"হায় সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল";

"ভারত বিলাপে"ও স্বদেশ প্রেমিক গান করিতেছেন,—

না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস?

"ভারত বিলাপের" মূল কথা, আমার দেশ আমার নহে। হতাশের আক্ষেপের মূল কথা, আমার প্রণয়িনী আমার নহে। উভয়ই প্রেমের বিচ্ছেদ কাহিনী। একটীতে প্রণয়ীর প্রেম, অপরটীতে স্বদেশানুরাগীর প্রেম। উভয়প্রেম বিফলীকৃত, নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত, মহীয়ান্ কবিত্বে মুখরিত।

আবার "হতাশের আক্ষেপে" যেমন পুরুষের নৈরাশ্য বর্ণিত হইয়াছে, "উন্মাদিনী" কবিতাতে তেমনি নারীর প্রণয়ে নৈরাশ্য চিত্রিত হইয়াছে। তবে উন্মাদিনী যেন "হতাশের" অপেক্ষাও আর এক গ্রামে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, "হতাশের আক্ষেপে" হেমবাবুর পুরুষ রমণীবৎ শোকবিহ্বল, আর উন্মাদিনী পুরুষের ন্যায় তেজস্বিনী অগ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী। অর্থাৎ হেমবাবুর পুরুষ রমণীবৎ, তাঁহার রমণী পুরুষবৎ। ইহা ভ্রম মাত্র। পুরুষ সতত বিষয়কার্য্যে রত। প্রণয় তাহাকে একবারে গ্রাস করিতে পারে না। কিন্তু প্রণয় রমণীর জীবন-সর্ব্বস্ব। সুতরাং প্রণয়ের নৈরাশ্যে পুরুষকে একবারে উন্মাদ করিয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু রমণী প্রণয়ে হতাশ্বাস হইলে, বঙ্কিমের ভ্রমরের ন্যায় ভগ্নহৃদয়া হইয়া দিন দিন শয্যায় বিলীন হইয়া ধরাধাম ত্যাগ করে, অথবা

কুলের ন্যায় বিষ পান করে, অথবা হেমচন্দ্রের উন্মাদিনীর ন্যায় ক্ষেপী সাজিয়া দেশে দেশে আপন মনে গান করিয়া থাকে। ক্ষিপ্ততা বলের চিহ্ন নহে, দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

হেমচন্দ্রের আদর্শ প্রায়ই ইংরাজি কবিতা। কিন্তু তাঁহার বিশেষ প্রশংসা এই যে, তিনি ইংরাজি আদর্শ হইতে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে পরিণত করিয়াছিলেন, দেশ কাল পাত্র ভেদে যাহা অস্বাভাবিক তাহা হেমচন্দ্রের কবিতাতে পাওয়া যায় না।

হেমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার কবিতা ইংরাজি কবিতার সহিত তুলনা করা আবশ্যক। শেলির স্কাইলার্ক (Skylark) হৈমহস্তে চাতকপক্ষী হইয়া বঙ্গ সাহিত্যাকাশে উড্ডীন হইল, অনুক্ষণ সুখে সুধাস্বর বর্ষণ করিয়া ভূমণ্ডল সুধার ধারায় ভাসাইতে লাগিল। ড্রাইডেনের "আলেক্‌জাণ্ডর্স ফীষ্ট"এ হেমচন্দ্রের কল্পনা "অমরপুরীতে ইন্দ্রের সুধাপান" রূপ গ্রহণ করিল। ড্রাইডেনের প্রসিদ্ধ শ্লোক

> Happy happy happy pair
> None but the brave
> None but the brave
> None but the brave deserves the fair

হৈম-লেখনীতে প্রবেশ করিয়া দেবকন্যার মাধুরী ছাড়াইয়া নিঃসৃত হইল—

> আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
> যার কোলে হেন নারী মনোহর,
> কত সুখ তার হয় রে ;
> বীর বিনা আহা রমণীরতন
> বীর বই আর রমণীরতন,
> কারে আর শোভা পায় রে ?

মহাকবি মিল্টন তাঁহার মহাকাব্য "প্যারাডাইজ্ লষ্টের" প্রথমে লিখিলেন,—

> Of Man's first disobedience, and the fruit
> Of that forbidden tree, whose mortal taste
> Brought death into the world, and all our woe
> With loss of Eden, till one greater Man
> Restore us, and regain the blissful seat,
> Sing heavenly Muse!

হেমচন্দ্র, বৃত্র সংহারের ২য় খণ্ডের আরম্ভে, লিখিলেন,—

কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, বরস্তনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধামে ?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা ব্যাপি ব্যোমদেশ,
জ্বালিত করিলা যবে ত্রৈলোক্য মণ্ডল।

* * * *

কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে
লভিলা দধীচি-অস্থি ? বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র—ভীম প্রহরণ ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র, বৃত্র মহাসুরে ?

"প্যারাডাইজ লষ্টে" One greater Man হইতে স্বর্গের পুনর্লাভের উল্লেখ হইল। "বৃত্র সংহারে" One greater Man ব্রাহ্মণ দধীচি হইতে স্বর্গের উদ্ধার হইল।

আবার "প্যারাডাইজ লষ্ট"এ পরাজিত "এঞ্জেল"গণ যেমন নরকে বাদানুবাদ করিতেছে, তেমনি দানব-পরাজিত দেবগণ পাতালপুরে তর্ক বিতর্ক করিতেছে। এরূপ সাদৃশ্য হেমচন্দ্রের কবিতাতে এবং ইংরাজি কবিতাতে অনেক পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের "দশমহাবিদ্যা" ডার্ব্বিনের ক্রম বিকাশের (Evolution) পরমেশমুখী মহীয়সী গীতি।

বোধ করি আপনারা প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি টেনিসনের "লক্স্লি হল" কবিতা পাঠ করিয়াছেন। এই কবিতার সহিত "হতাশের আক্ষেপে"র কি সাদৃশ্য আছে দেখুন। উভয় কবিতাতেই নায়কের যাহার সহিত প্রণয় হইয়াছিল, তাহার সহিত পরিণয় হয় নাই।

"হতাশের আক্ষেপে" গগনে সুধাংশু দেখিয়া প্রণয়ীর হৃদয়োচ্ছ্বাস হইল। "লক্স্লি হল" কবিতায় নায়িকার অন্যের সহিত বিবাহ হওয়ায় নায়ক নৈরাশ্যে সেনা-দল ভুক্ত হইয়াছেন, "লক্সলিহল" ভবনের নিকট দিয়া গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ হইত। এই স্থানে প্রাতে দুই জনে বিচরণ করিতেন, দুই জনে সায়াহ্নে সাগরতটে বসিয়া দূরগামী অর্ণবপোত নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাই এই স্মৃতিময় স্থানে আবার উপনীত হওয়ায় নায়কের হৃদয় উদ্বেল হইল। এক্ষণে নায়িকা অন্যের পরিণীতা পত্নী এই চিন্তায় নায়কের চিত্ত আসন্ন :—

O my cousin, shallow hearted, *O my Amy, mine no more !*
O the dreary, dreary moorland ! O the barren barren shore !

অই শশী অই খানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি !
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি !

উভয় কবিতায় নায়ক নায়িকার মা বাপের উপর আক্রোশ আছে। হেম বাবুর কবিতায়—

লোক লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল।
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।

টেনিসনের কবিতায়—শাসক পিতার ও ব্যাপিকা মাতার উল্লেখ আছে। তবে হিন্দুর কন্যা পিতামাতার অধীন, তাই হেম বাবুর কবিতায় নায়িকার কোন নিন্দা নাই। ইংরাজ কুমারী ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে, তাই নায়ক হতাশ্বাস হইয়া নায়িকার নিন্দা করিতেছেন।

Falser than all fancy fathoms falser than
all songs have sung
Puppet to a father's threat, and servile
to a shrewish tongue !

উভয় কবিতাতে সামাজিক প্রথার প্রতি ভ্রুকুটী আছে। হেম বাবু বলিতেছেন—

"ওরে দুষ্ট দেশাচার,—কি করিলি অবলার"।

টেনিসনের হতাশ প্রাণে বলিতেছেন—

Cursed be the social wants that
Sin against the strength of youth !
Cursed be the social lies that warp
Us from the living truth !

"হতাশের আক্ষেপে", ও "লক্‌স্‌লিহল" কবিতায় প্রণয়বিরোধী বিবাহকে বৈধব্য বলা হইয়াছে।

কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ"
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

Then a hand shall pass before thee, pointing to his drunken sleep
To thy *widowed marriage-pillows*, to the tears that thou wilt weep.

উভয়ে জাতিগত বৈষম্য আছে—

হিন্দু কবির কবিতাতে নায়ক ও নায়িকার জন্মান্তরের কথা আছে। নায়ক বলিতেছেন—

অরে বিধি, তারে কিরে জন্মান্তরে পাব না ?

নায়িকা বলিতেছেন—

" ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে"।

ইংরাজ "জন্মান্তরে" বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহার কবিতাতে "জন্মান্তরের" কথা থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালী বাহ্যিক ঘটনাতে অভিভূত হয়। ইংরাজ বাহ্যিক ঘটনাতে অভিভূত হইতে চাহে না; একদিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার দেখিলে, অন্যদিকে আলোকের সন্ধান করে; উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেও আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে। বাঙ্গালী হতাশ হইলে ক্রন্দন করে, বা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, বা ধরাসনে শূন্যমনে বসিয়া থাকে, অথবা কবিতা লেখে। ইংরাজ, প্রণয়ে হতাশ হইলে, দুস্তর-সাগর লঙ্ঘন করিয়া, নবজীবনের অঙ্কপাত করে, অথবা ভেরীর রণোন্মাদে মত্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, স্বদেশের জন্য শোণিত-প্রাণ পাত করে। তাই টেনিসনের কবিতাতে bugle horn শৃঙ্গধ্বনি শুনিতে পাই।—

Hark,my merry comrades call me sounding on the bugle horn

এক্ষণে আমরা ব্যক্তিগত স্তর পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় স্তর নিরীক্ষণ করি। " ভারতসঙ্গীত " এই দ্বিতীয় স্তরের কবিতা। হতাশের আক্ষেপে হেমের হৃদয় করুণ রসে দ্রবীভূত; ভারত সঙ্গীতে হেমচন্দ্র বীরভাবে উদ্দীপিত। একটী সায়াহ্ন সমীরণের বিষাদোচ্ছ্বাস, অপরটী জ্বালামুখীর তরল ধাতুনিস্রব।

হেমচন্দ্র শৃঙ্গনিনাদে "ভারতসঙ্গীত" গাহিলেন। নগরে, কাননে—কুটীরে,

রাজপ্রাসাদে,—তুষার-ধবল হিমাচলে, গম্ভীর-নাদী বিশাল বারিধি-বক্ষে সেই নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইল। সেই সঙ্গীত সুকুমার বালকের চপল-চিত্ত, কামিনীর কুসুম-পেলব হৃদয়, যুবার আকাঙ্ক্ষা-তপ্ত মানস,—বৃদ্ধের অবসাদ-অসাড় জীবন—এক নবভাবতরঙ্গে কল্লোলিত করিল। বিহঙ্গ মুখরিত অরুণালোকিত প্রভাতে, ভারতবাসী ভাবিল, "ভারত শুধু ঘুমাইয়া রয়"। মধ্যাহ্ণ মার্ত্তণ্ডমথিত ধরায়, ভারতবাসী ভাবিল—

"সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমাইয়া রয়"।

দিবাবসানে, স্বভবনমুখ ভারতবাসী রাজপথে যাইতে যাইতে ভাবিল—"ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়"। নিশীথে, শয়ন কক্ষে উপাধানন্যস্তমস্তক ভারতবাসী কি শুনিল?

ঐ যে দূরে, গগনমণ্ডল বিষাণরবে নিনাদিত হইতেছে—

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে
শুনিয়া ভারত জাগুক সবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

নিদ্রাকর্ষণে, নিমীলিত নেত্রে, স্বপ্নাবেশে, ভারতবাসী কি দেখিল? দেখিল—

——মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
(রয়েছে দাঁড়ায়ে) জনেক যুবা।
আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী
বদনে (ভাতিছে) অতুল আভা।

কে ঐ সন্ন্যাসী? মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্য স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করি-

তেছেন। হে ব্রাহ্মণগণ! পুনর্ব্বার দেখ, সন্ন্যাসী কে? দেখিতে দেখিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের স্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ গায়ক হেমচন্দ্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইতেছি। এ হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী হেমচন্দ্র নহে, ভারতের মুখপত্র, চন্দনচর্চ্চিত-ললাট, নামাবলী-পরিহিত ব্রাহ্মণ-কবি হেমচন্দ্রাচার্য্য। আর স্বপ্ন দেখিতেছি না। কিন্তু হৃদয় মন্দিরে ঐ প্রতিধ্বনি শুনিতেছি।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

হেমচন্দ্রের সঙ্গীতে ভারত জাগে নাই। তাই দেখ, হেমচন্দ্র পর্ব্বত শিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দূরে শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া রাজধানীতে একা গঙ্গাতটে দণ্ডায়মান। আবার "বিলাপ"—"ভারত বিলাপ"—ভারতের দুঃখকাহিনী। যখন হেমচন্দ্র ভারত-সঙ্গীত এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত করিবার জন্য প্রেরণ করেন, তখন মহাত্মা ভূদেব বলিয়াছিলেন, 'এক্ষণে সঙ্গীতের সময় নহে।' মহাকবি হেম বুঝিলেন "ভারত সঙ্গীতে" ভারত বিলাপ নিহিত রহিয়াছে। তাই "ভারত বিলাপ" লিখিলেন। বঙ্গদেশের অবস্থা যদি ভিন্নরূপ হইত, তাহা হইলে সঙ্গীতের পর বিলাপ লিখিবার কারণ হইত না। কেননা তাহা হইলে এ সঙ্গীতে চতুর্দ্দিকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকিত। ভারত সঙ্গীত প্রকাশ করায় হেমচন্দ্র বিপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘকালেও এই কবিতাতে কোন বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা নাই। উদার বাঙ্গালিবন্ধু স্যার এশলি ইডেন "জাতীয় সঙ্গীত" রচয়িতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার আবশ্যক নাই বুঝিয়াছিলেন, এবং দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হেমচন্দ্রকে কোনরূপে লাঞ্ছিত করেন নাই। ইহা ইংরাজের গৌরব।

দুইটী মাত্র কবিতার সমালোচনে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। হে ব্রাহ্মণগণ! আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্তরে উপনীত হইলাম। "বৃত্র সংহার" হেমচন্দ্রের অদ্ভুত সৃষ্টি। এই কবিতাতে ব্রাহ্মণের অনন্ত মহিমা, পরহিতব্রতের অমর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইলে জীবের দুঃখ।—তাই, "হতাশের আক্ষেপ", তাই "ভারত বিলাপ" "ভারতসঙ্গীত"

সুরলোক হইতে বিতাড়িত অমরবৃন্দ স্বাধিকারচ্যুত। তাই তাহাদিগের ক্ষোভ। কি "হতাশের আক্ষেপ" ও "উন্মাদিনী", কি "ভারত বিলাপ" ও "ভারত সঙ্গীত", কি "বৃত্রসংহার"—এই তিন সুরের মূলে একই কথা—জীব স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইলে দুঃখ পায়। স্বাধিকার লাভ করিলে জীব সুখী হয়। আবার, আত্মাতে যে আমাদের প্রকৃত অধিকার আছে তাহা লাভ করিলে চরম সুখ, অবিরাম আনন্দ, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়। ইংরাজগণ অধুনা যাহাকে self-realization বলেন, তাহার গন্তব্য স্থান আধ্যাত্মিক স্বাধিকার; স্বকীয় আত্মাকে লাভ করাই self realization।—নিজের আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, অন্যের আত্মার সহিত, অন্যের সুখ দুঃখের সহিত মিশিতে হইবে, নিষ্কামচিত্তে পরহিতব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি পরহিতব্রতধারী তাঁহার গুণে ও পুণ্যে, স্বর্গচ্যুত অমরবৃন্দ আবার সুরলোকে প্রবেশ করেন, এবং তিনি নিজে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। বৃত্রসংহারে দেখিতেছেন, পরহিত ব্রত এমনি মহৎ, এমনি শক্তিশালী, ব্রাহ্মণের নিষ্কাম যোগ এমনি মহীয়ান্ যে দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পরহিতব্রত ব্রাহ্মণের কৃপায়, ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগে, তাহা লাভ করিতে পারেন। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"উৎপত্তি রেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী", ব্রাহ্মণের দেহ, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি।

ব্রাহ্মণ পরহিতে নিজপ্রাণ দিতে কাতর নহেন। তাই মুনীন্দ্র দধীচি বলিতেছেন,—

এভব মণ্ডলে—

পরহিতে প্রাণদিতে পায় কতজন!
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে অবোধপ্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?

* * *

হে শিষ্যমণ্ডলী—

জগতকল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ, এ জগতীতলে।

হে ব্রাহ্মণমণ্ডলী—ঐ দেখুন দধীচির প্রাণ বিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব দৃশ্য—দেখুন, ঐ—

বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়
পুষ্পাধার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

হে বিপ্রগণ! ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র আপনাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন? যেদিন ভারতে ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পরহিতব্রতে তনুত্যাগ করিবেন, সেই দিন দেবতারা সুরলোকে প্রবেশ করিবেন।

কবি একদিকে যেমন ধর্ম্মের ও পুরুষকারের জয় প্রচার করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে অদৃষ্ট বা ভাগ্য বা নিয়তির প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন। এই নিয়তির ভিতরে কর্ম্মফল নিহিত আছে। তাই কবি বলিতেছেন,—

"আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি
কে রক্ষিতে পারে তারে।"

"দুষ্ট বৃত্রাসুরজায়া দানবী দাম্ভিকা,"— ক্রোধ-মদ-মাৎসর্য্য-পাপরূপিণী ঐন্দ্রিলা, দৈত্য মহিষী; অসুররাজ রূপজ মোহে মুগ্ধ। তাই শচীপীড়ন। তাই ব্যোমমার্গে মহেশের ক্রোধাগ্নি দেখিয়া দুষ্টদানব ভীত হইয়া বলিল বটে—"শচীরে ছাড়িব আমি ভুবনে মহেশ"। কিন্তু কুটিলা মহিষীর মায়াকুহকে পড়িয়া মতিচ্ছন্ন হইয়া আবার—মহিষীকে

কহে দৈত্যপতি "তোমায় সুন্দরি—
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র সহচরী;
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি,—
পূরাও মহিষি; ফণা চূর্ণকরি—
আনো ফণিনী।"

তাই ঐন্দ্রিলা সর্ব্বনাশিনী—"ভীমা তুলিলা চরণ শচী বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ" হায়! ইন্দ্রাণীর বক্ষে দানবীর পদাঘাত! হা বিধাতঃ! এত অত্যাচার বরদাতা মহেশও সহ্য করিতে পারেন না। তাই, আবার শিবের ক্রোধাগ্নি। কবি বলিতেছেন সকলেরই সীমা আছে অত্যাচারেরও সীমা আছে। যখন

বিজয়ী বিজিত জাতিকে কেবল স্বাধিকার ভ্রষ্ট করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তাহাদের পুরাঙ্গনাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করেন, তখন অত্যাচারের শেষ সীমাও উপস্থিত হয়; তখন মহাদেব তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিকেও দণ্ডিত করেন, তখন মহাদেবের ক্রোধে, অপরিমেয় দৈত্য-শক্তি অজেয় ত্রিশূল সবই বিফল হয়। তখন "অদৃশ্য হয়'রে শূল মহাশূন্যকোলে"। পুরাকালে এক দিন বিজেতা স্বাধীন আর্য্যঋষি বৃত্রসংহার আখ্যান লিখিয়াছিলেন। অদ্য বিজিত অধীন আর্য্য কবি তাহা মহাকাব্য রূপে গান করিলেন। সেই দিন—আর এই দিন; হেমচন্দ্রের সমুদয় বৃত্রসংহার মহাকাব্য "সেই দিন আর এই দিনের" বিষাদময় তারতম্যের করাল ছায়ায় আচ্ছন্ন। পতিত আর্য্যের ধমনিতে প্রাচীন ঋষিশোণিত আজও প্রবহমান, তাহা বৃত্রসংহার কাব্য প্রমাণ করিতেছে।

এক্ষণে আমরা হেমচন্দ্রের কবিতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিলাম। ব্রাহ্মণ যখন নিষ্কাম কর্ম্মযোগে, বা পরহিতব্রতে, মোক্ষ লাভ করেন, তখন তিনি সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, দিব্যচক্ষু লাভ করেন, তখন নারদের রূপ গ্রহণ করিয়া গান করেন

জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাওরে প্রেমভরে মনোহর বাদনে?
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কিবা সাধুজন জীবনে?

তখন মহাদেবের কৃপায়

মহাঋষি নারদ পুলকিত হরষে
অনিমেষ লোচনে, নিরখিছে অবশে॥
চক্ররেখাতে ঘুরি সারি সারি সাজিয়া।
দশদিকে শোভিতে দশ ছবি হাসিয়া॥
পরতেক মণ্ডলে মহারূপ ধারিণী।
লীলানিরত সতী স্মরহর ভামিনী॥

দেখিতে দেখিতে

মিলাইল দশরূপ, উমারূপ ধরিল
হরগৌরীরূপে সতী হিমালয়ে উদিল।

দশমহাবিদ্যায় কবি একটী তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিলেন। নারদ প্রকৃতি দেবীর লীলাতে জীবের দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

সতীর লীলার মধ্যে জীবের উৎকট দুঃখ দেখি কেন? সতী কি অশিব, অমঙ্গল অশুভ?

"জীব দুঃখ তবে কিগো অনাদ্যা রচনা?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা?"

মহাদেব তাহার উত্তর দিলেন

"দুঃখের কারণ নহে জীব লীলা"

এই জগতে ক্রমবিকাশে পূর্ণসুখ লাভ হইবে; জীব ক্রমে পূর্ণ কাম হইবে, শোক দুঃখ তাপ সকলই দমন হইবে, তোমাকে যে দশ জগৎ দেখাইলাম তাহার অর্থ এই যে এই দশ জগতে জীব ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে।

"পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি"

টেনিসনের কবিতাতেও এ কথা।

Yet I doubt not thro' the ages one
increasing purpose runs
And the thoughts of men are widen'd
with the process of the suns.

আর বৃত্রসংহারেও ঐ কথা — অশুভ চিরস্থায়ী নহে—যদি স্বর্গচ্যুত হইয়া থাকে, মহেশের আরাধনা কর ও অধ্যবসায়ের সহিত কাল প্রতীক্ষা কর, সংগ্রাম কর, চেষ্টা কর,—ত্রিদশালয় লাভ করিবে। সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, কিরূপে সাধনা করিতে হয়, বৃত্রসংহার কাব্য তাহারই বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। ক্রমে ক্রমে জীব উন্নতি লাভ করিতেছে, সিদ্ধি ও গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতেছে। দশমহাবিদ্যাতে কবি দুঃখকাতরজীবের নিকট এই আনন্দবাণী প্রচার করিতেছেন।

আমি যে স্বাধিকার উদ্ধার (বা রক্ষার) কথা বলিয়াছি, তাহা রামায়ণে, মহাভারতে, তাহা ইলিয়দে, তাহা দান্তের ডিভাইন কমেডিতে, তাহা শেলির (Prometheus unbound) "প্রোমিথিয়স অন্‌বাউণ্ড"এ লক্ষিত হয়।— রামায়ণে ও ইলিয়দে বনিতার উদ্ধার, মহাভারতে ও বৃত্রসংহারে অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার, প্রোমিথিয়স্ অন্‌বাউণ্ডে, কুসংস্কার বন্দীকৃত মানবজাতির উদ্ধার—এই সকল গুলিতেই স্বাধিকার উদ্ধারের জন্য একটা মহতী চেষ্টা, একটা বিপুল সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বৃত্রসংহারের বিশেষত্ব

এই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধিকার, অর্থাৎ আত্মার মুক্তি লাভ—দীপ্তিময় অনলাক্ষরে দধীচি মুনির তনুত্যাগে বর্ণিত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্মে, আত্মার মুক্তি। মহাভারতে মহাপ্রস্থানেও দেখা যায় ধর্ম্মবলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিলেন। যতগুলি মহাকাব্য আছে তাহাতে মূলে একই কথা—মনুষ্য হৃদয়ে রিপু ও বিবেক স্বরূপ যে দেবাসুর আছে, অনবরত হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার যুদ্ধ চলিতেছে। বিবেকের জয় লাভই স্বর্গলাভ, স্বাধিকার লাভ।—ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে যাহা সত্য, মনুষ্য জাতি সম্বন্ধেও তাহা সত্য। বিবেকের দয়ার ও প্রীতির যতই বিকাশ হইবে, ততই নরলোক সুরলোকে পরিণত হইবে। যখন জ্ঞান ও প্রীতি পূর্ণ বিকশিত হইবে, তখনই "পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে"—তখন জীব দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শিবশান্ত সচ্চিদানন্দ হইবে। এবম্বিধ শিক্ষাপ্রদ হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও দশমহাবিদ্যা ভারতের বর্ত্তমানযুগের ধর্ম্মসংহিতা। হে ব্রাহ্মণগণ! শুনিয়াছেন, পুরাকালে এথেন্স মহানগরীতে একটা নিয়ম ছিল যে প্রতিবৎসরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমুদয় ইলিয়দ মহাকাব্য আবৃত্তি করিতে হইবে। হে বিপ্রগণ! যদি আপনারা হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরে একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে হেমচন্দ্রের স্বদেশ-হিতৈষণা ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ কবিতাগুলি সমুদয় বঙ্গদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আবৃত্তি করিবেন, এবং তাহার প্রচারিত স্বার্থত্যাগে আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিবেন। আর, বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, হেমচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষভাগে, অর্থাভাব নিবন্ধন কষ্টে দিনপাত করিয়াছিলেন। ইহা বঙ্গবাসীর কলঙ্কের কথা। এক্ষণ হেমচন্দ্রের বিধবা শোকাকুলা, অনাথিনী, দারিদ্র্যপীড়িতা। সুতরাং যিনি হেমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে চাহেন, অগ্রে তাঁহার বিধবা পত্নীর সাহায্যার্থে অর্থ প্রেরণ করুন। হেমচন্দ্র আমাদিগকে যে একটা বিপুল সাম্রাজ্য দান করিয়া গিয়াছেন তাহার বিনিময়ে, অথবা কৃতজ্ঞতা স্বীকাররূপে, তাঁহার বিয়োগবিধুরা পত্নীকে সাংসারিক কষ্ট হইতে আপনারা মুক্ত করুন।

গম্ভীর বিষাদপূর্ণস্বরে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। এবং তিনি আসন পুনগ্রহণ করিলে করতালি ধ্বনির পরিবর্ত্তে শ্রোতাদিগের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস সম্মিলিত হইয়া উত্থিত হইয়াছিল।

জনৈক কাশীবাসী।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ই মে। রুসিয়া রাজ্যে য়িহুদী দিগের অত্যন্ত নিপীড়ন সংবাদ প্যাওয়া যায়। বাইত্রিশ হাজার য়িহুদী রুসিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটেন ও আমেরিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।... পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন বন্ধ হয়। ... মেলবোর্ণ ধর্ম্মঘট মিটিয়া যায়।

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে। বুলগেরিয়ার মন্ত্রী-সভা ভঙ্গ হয়। ফ্রাসীস সৈন্য কর্ত্তৃক টিউটান অবরোধ উন্মোচিত হয়।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে। প্যারী নগরে ধর্ম্ম-যাজকবিদ্বেষীগণ (Anticleric1l) মহা উৎপাত করিয়াছে সংবাদ পাওয়া যায়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে। রুসিয়ায় অশান্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ইউকার শাসনকর্ত্তা নিহত। এবং কিপ চিনিয়োর শাসনকর্ত্তা পদচ্যুত হন ...৪ঠা মে তারিখে আবিসিনিয়ানদিগের সহিত মোলার সৈন্যের ওরেব সেরিলাইতে যুদ্ধ হয় এবং মোলার সৈন্য পরাজিত হয়। ... পুনা নগরে ভয়ানক ঝড় হয়।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে। ব্রাসভালে ব্যবস্থাপক সভা সংগঠিত হয়। ... বুলগেরিয়ায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি স্বনামধন্য মহাকবি শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় পরলোক গমন করেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে। ২৯শে এপ্রিল তারিখে তুরস্ক প্রদেশের আর্ম্মেনিয়া নগর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয় [illegible]।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন। আলজেরিয়া রাজ্যে অশান্তির সূচনা হইয়াছে। তথাকার গবর্ণর জেনারেলকে বিদ্রোহীগণ আক্রমণ করে [illegible] বিতাড়িত হয়।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ৫ই জুন। দক্ষিণ আমেরিকায় ভীষণ দাবানল প্রজ্জলিত হইয়াছে সংবাদ পাওয়া যায়। এই অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় নগর সমূহের চতুর্দ্দিক ধূমাবৃত হইয়াছে এবং ২০০শত লোক বাসশূন্য হইয়াছে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ৮ই জুন। শুনা যায় আমেরিকায় জলপ্লাবনে ২৫০০০ লোক গৃহশূন্য এবং ২০০,০০০ একর ভূমি নিমগ্ন হইয়াছে।... ফরাসী গোলন্দাজগণ ফিগনিগের উপর গোলা বর্ষণ করে এবং দুইটি পর্ব্বতশিখর অধিকার করে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন। ফিগনিগ [illegible] বাসীগণ ফরাসী দিগের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ... সার্ভিয়ার রাজা ও রাণী বিদ্রোহী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রাজপ্রাসাদে নিহত হন। এই সকল বিদ্রোহী সেনা কারাগিয়ারভিটকে (Karageargevitch) সার্ভিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করে।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন। শুনিতে পাওয়া যায় যে মোল্লা বাড্‌ডল এবং বারবেরার মধ্যে টেলিগ্রাফিক তার এবং সংবাদ পাঠাইবার অন্যান্য উপায় সকল বন্ধ করিয়াছে। ... কারাগিয়ার ভিটজ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সার্ভিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষিত হন।

নিবেদন।

নবপ্রভা তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিল। এখনও অনেকের নিকট নবপ্রভার মূল্য বাকি। তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া সত্বর নবপ্রভার মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। নচেৎ আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ভিঃ পিঃ পাঠাইতে হইবে।

"নবপ্রভার নিয়মাবলী।

১। "নবপ্রভার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা, ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।০ চারি আনা। নমুনা চাহিলে চারি আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে। "নবপ্রভার" ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য লওয়া হয় না। এক বৎসরের কমে মূল্য দিলে প্রতি সংখ্যা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে।

২। ব্যারিং বা ইন্‌সফিসিয়েণ্ট পত্র গৃহীত হয় না। পত্রের উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ডে বা অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্পসহ লিখিতে হয়। মোড়কের উপর যে নম্বর থাকিবে তাহাই গ্রাহক নম্বর। গ্রাহকগণ মনিঅর্ডার ও পত্রাদি পাঠাইবার সময় সেই নম্বর উল্লেখ করিবেন। গ্রাহকগণ মনি অর্ডার ও পত্রাদি পাঠাইবার সময় তাঁহাদিগের স্ব স্ব নাম ও ঠিকানা পরিস্কার ও স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ মাসের ৭ই তারিখের মধ্যে প্রেরিতব্য। ঠিকানার গোলমালে কাগজ না পাইলে আমরা দায়ী নহি।

৩। কেহ কোন মাসের কাগজ না পাইলে তৎপরবর্ত্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইবেন তৎপরে আমরা দায়ী নহি।

৪। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না। লেখকগণ কপি রাখিয়া প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

৫। সাধারণ নিয়মানুসারে বিজ্ঞাপন দিলে প্রতি লাইন তিন আনা, অর্দ্ধ পেজ ২॥০ টাকা, এক পেজ ৪, টাকা।

৬। চুক্তির নিয়ম। তিন মাসের কমে চুক্তি করা হয় না।। চুক্তি অনুসারে বিজ্ঞাপন দিলে নিম্নলিখিত হারে মূল্য লওয়া হয় :—

	এক লাইন,	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা,	এক পৃষ্ঠা।
তিন মাস হইতে ছয় মাস	দশ পয়সা,	দুই টাকা	সাড়ে তিন টাকা
সাত মাস হইতে এক বৎসর	দুই আনা	দেড় টাকা	তিন টাকা

৭। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৮। প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্র, পত্রিকা ও সমালোচনার্থ পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে, এবং মনিঅর্ডার, চিঠিপত্র, টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপনাদি আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

নবপ্রভা কার্য্যালয়,
[illegible]নং চন্দ্রনাথ চাটর্জ্জির ষ্ট্রীট, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।
সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

তৃতীয় খণ্ড। শ্রা[illegible] ১৩২০। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩১০ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ষষ্ঠ প্রপাঠক।

(উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গ)

উদ্দালক বলিলেন বৎস শ্বেতকেতো! এই যে সুমহৎ জগন্মণ্ডল তোমার নয়ন গোচর হইতেছে, যাহার সূক্ষ্ম অবস্থা ও ব্যবস্থানিচয় চিন্তা করিলেও মানবের মানস-সরোবরে এক অদ্ভুত বিস্ময়রসের তরঙ্গ-মালা খেলা করিতে থাকে, যাহার কার্য্য-কারণপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে অতি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন, এবং যাহার আদি ও অন্ত তত্ত্ব প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তুমি নিশ্চয় জানিও, ঈদৃশ বিশাল জগতের মধ্যেও একটা সুনিয়মিত কার্য্যকারণভাব সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে; যাহার বলে এই প্রকাণ্ড জগচ্চক্র অনন্তকাল এক অব্যভিচারী নিয়মে চলিতেছে ও চলিবে। মানব বুদ্ধি যতকাল সেই কার্য্যকারণ-ভাবের গূঢ় রহস্য বুঝিতে সমর্থ না হয়, অন্তত বুঝিবার জন্য অগ্রসরও না হয়, ততকাল ঐহিক বা পারলৌকিক মঙ্গলময় কোন শুভফলের আশা করিতে পারে না।

ইদানীন্তন বিজ্ঞান বিদ্যাবিশারদ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই অব্যভিচারী কার্য্য-কারণ ভাবের গূঢ় গবেষণার ফলেই বিস্ময়াবহ বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের সেই পুরাতন "অঘটন ঘটন পটীয়সী মহামায়ার" আসন অধিকার করিতেছেন। এই কার্য্যকারণ-ভাবের অভিজ্ঞতা-বলে আমাদের

পূর্ব্বতন ঋষিগণ কতশত লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি সম্পাদন করিয়া জগজ্জনের বিস্ময়-বিস্ফারিত মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই চিরন্তন কার্য্যকারণ-ভাব ভুলিয়া যাওয়ায় এত আজ আমাদের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আজ দূরদর্শী মহামুনি উদ্দালক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রিয় পুত্রকে সেই কার্য্যকারণ-ভাবের গূঢ় রহস্য উপদেশ দিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, বৈষয়িক সমুন্নতি বা প্রতিপত্তি লাভ এই উপদেশের উদ্দেশ্য নহে, এই উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম-তত্ত্বোপলব্ধি।

উদ্দালক বলিলেন, বৎস শ্বেতকেতো! তোমাকে নিত্য নিরাময় যে ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি, সেই ব্রহ্ম প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক দেহে, প্রত্যেক ভূতে, অধিক কি জগতের প্রতি অণুতে অণুতে বিরাজমান রহিয়াছেন। যদি সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র হইতে এক একটী করিয়া সমস্ত সূত্র, কিম্বা স্বর্ণ-নির্ম্মিত বলয় হইতে সমস্ত স্বর্ণাংশ পৃথক করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে যেমন সেই বস্ত্রের "বস্ত্রত্ব" ও বলয়ের "বলয়ত্ব" উড়িয়া যায়, কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত জগন্মণ্ডল হইতে ব্রহ্ম সত্তাকে বাহির বা পৃথক্ করা যায়, তাহা হইলে কল্পনাতীত এই বিশাল জগতেরও অস্তিত্ব থাকে না বা থাকিতে পারে না। কোন উষ্ণ বস্তু দেখিলে যেরূপ তাহাতে তাপ-সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ "সৎ" বা 'সত্য' রূপে প্রতিভাসমান এই জগতের অভ্যন্তরেও সেই ব্রহ্ম-সত্তার অনুমান করিতে হয়।

জীবও অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান সেই ব্রহ্ম নাম (রাম, শ্যাম ইত্যাদি) ও রূপ (আকার)-বিরহিত, নিত্য, নির্ব্বিকার পরম সূক্ষ্ম ও সর্ব্ব-কারণ। তাদৃশ সূক্ষ্ম কারণ হইতে তুচ্ছ তৃণআদি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত নাম-রূপাত্মক এই বিশ্ব প্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়া জীবের বিবিধ ভোগ সম্পাদন করিতেছে।

পিতার উল্লিখিত উপদেশ পরম্পরা-শ্রবণে মন্দ-মারুতান্দোলিত লতার ন্যায় শ্বেতকেতুর প্রশান্ত হৃদয় সংশয়ে কিঞ্চিৎ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি পিতার প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও তাঁহার মন যেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেছে না,—সে প্রতিনিয়ত সংশয় উত্থাপন করিয়া উদ্দালকের উপদেশের গূঢ় রহস্য নিষ্কাসিত না করিয়া নিরস্ত হইতেছে না। তাই শান্তশীল শ্বেতকেতু বিনয়-পূর্ব্বক পিতার চরণ-প্রান্তে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন যে, গুরো! আপনার উপদেশ হইতে বুঝিলাম যে, বিশাল আকাশ যেরূপ জগতের ভিতরে ও বাহিরে

বিদ্যমান আছে, এবং সূক্ষ্ম সূত্র যেরূপ বস্ত্রের মধ্যে ওত-প্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মও এই জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আর, কোন উষ্ণ বস্তু দেখিলে যেরূপ তন্মধ্যে তেজের সূক্ষ্ম সত্তা অনুমান করা যায়, তদ্রূপ মিথ্যা জগতে সত্তা ব্যবহার দেখিয়া ইহার মধ্যেও ব্রহ্মসত্তার অনুমান করিতে পারা যায়। এ সমস্ত কথা বুঝা যায় বটে, কিন্তু নামরূপ-বিবর্জ্জিত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর ব্রহ্ম হইতে নাম-রূপাত্মক এই স্থূলতর জগৎ যে কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে, তাহা ত আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, যেরূপ উপাদান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্য ঠিক সেই উপাদানেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। সাদা সূতার দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করিলে, সেই কাপড় কখনই সাদা ভিন্ন বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয় না। কিংবা সুবর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কার সুবর্ণময় না হইয়া কখনও মৃণ্ময় হয় না। সেই প্রকার যাহার নাম নাই, রূপ নাই, নাই বলিতে কোন গুণই নাই, তাদৃশ ব্রহ্ম হইতে এই নামরূপময় জগৎ-সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

মহর্ষি উদ্দালক পুত্রের ঈদৃশ সংশয় সন্দর্শনে চমৎকৃত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার প্রসন্নগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস শ্বেতকেতো! সূক্ষ্ম হইতে স্থূল সৃষ্টি হওয়াই জগতের রীতি, দেখ, দুইটী অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূল একটী দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় এবং তিনটী দ্ব্যণুকে একটী স্থূল "ত্রস-রেণু" প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বৎস! ইহা যদি তোমার প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণ কর।

এই যে, সম্মুখে বহু-শাখা-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূভাগ-ব্যাপী একটী বিশাল বট বৃক্ষ দেখিতেছ, যাহার এক একটী শাখা এক একটী বৃক্ষের সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়, বৃক্ষটী শাখা-বাহুগুলি প্রসারিত করিয়া সৌরকর-ক্লিষ্ট জগৎ-জীবকে আশ্রয় দিতেছে এবং সেই দুঃখ দগ্ধ পৃথিবীর কথা সূর্য্যদেবকে বলিবার নিমিত্তই যেন আকাশের গায়ে হেলিয়া শির সমুন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৎস! এই বট বৃক্ষ হইতে একটী ফল আনয়ন কর। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শ্বেত-কেতু পিতার কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটী বটফল লইয়া আসিলেন। এবং "ইদং ভগব উপাহৃতং", ভগবন্ এই আনিয়াছি, বলিয়া পিতার সমীপে অর্পণ করিলেন। পিতা বলিলেন, "ভিন্ধি" ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু ফলটী ভাঙ্গিয়া বলিলেন, "ভিন্নং ভগবঃ"। পিতা বলিলেন,

ইহার ভিতরে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন, সূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায় কতকগুলি বীজ দেখিতেছি। পুনশ্চ উদ্দালক বলিলেন, ইহার একটী বীজ আবার ভাঙ্গ? এবং তাহার মধ্যে কি দেখিতে পাও, তাহা আমাকে বল। তখন শ্বেতকেতু সেই সূক্ষ্ম বীজটী চূর্ণ করিয়া বলিলেন,—"কিঞ্চন ন ভগবঃ", ভগবন্ কিছুই দেখিতেছি না। পুত্রের এই কথা শেষ হইবামাত্র মহর্ষি উদ্দালক বলিতে লাগিলেন, বৎস! যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই আছে, আর যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই নাই, এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কখনও মনে স্থান দিও না। কারণ, এরূপ বহুতর পদার্থ আছে, যাহা তুমি আমি না দেখিলেও যুক্তিযোগে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। দেখ, এই যে, বটবীজ ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরে আর কিছু দেখিতে পাইলে না, এবং "কিছু নাই" বলিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিলে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, যে কারণ না থাকিলে কখনও কার্য্য হইতে পারে না। অতএব, তুমি যাহা দেখিতে পাও নাই, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই বিশাল বটবৃক্ষও সেই সূক্ষ্ম বীজাণুতে অবস্থিত ছিল এবং তাহা হইতেই বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখা-পরিশোভিতরূপে প্রাদুর্ভূত বা অভিব্যক্ত হইয়া লোকের লোচন রঞ্জন করিতেছে। এই প্রকার সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম হইতেই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমার এই কথায় অশ্রদ্ধা করিবার কোন কারণ নাই, বাক্যে শ্রদ্ধা বা দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে দুরধিগম্য তত্ত্ব কখনও হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে না। সেই জন্য প্রথমে, গুরু বা আচার্য্য-পদাভিষিক্ত ব্যক্তির কথাগুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, পরে সেই বাক্যে কোনরূপ সংশয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যুক্তিদ্বারা সেই সংশয়ের কারণ গুলি ক্রমে বিদূরিত করিতে হয়। ইহাই লৌকিক বা অলৌকিক সর্ব্ববিধ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের সমীচীন উপায়।

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতম সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত এই জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে, তিনিই পরম সত্যরূপী আত্মা, "তৎত্বমসি" অর্থাৎ তুমিও তাঁহা হইতে অভিন্ন,—সেই ব্রহ্ম স্বরূপ।

শ্বেতকেতু পিতার নিকট এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশ যতই শ্রবণ করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই যেন তাঁহার হৃদয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পুনর্ব্বার তিনি সংশয় অপনোদনার্থ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—তাত! সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম যদি জলে, স্থলে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তবে তাঁহাকে দেখা যায় না কেন? যাহা নয়নগোচর

হয় না, তাহার অস্তিত্ব মানিবার কারণ কি? অতএব, অনুকম্পা-পুরঃসর পুনর্ব্বার এ বিষয় আমাকে বুঝাইয়া দিন।

শ্রদ্ধাবান্ পুত্রের মনোরথ পরিপূরণাভিলাষে সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষি উদ্দালক আরও একটী উত্তম দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন। যাহা শ্রবণমাত্রে সংশয় সমাকুল চিত্তও বিশ্বাস-বারি-বিধৌত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

মহাপ্রাজ্ঞ উদ্দালক একখণ্ড সৈন্ধবলবণ শ্বেতকেতুকে দেখাইয়া বলিলেন, বৎস শ্বেতকেতো! এই যে সৈন্ধবখণ্ড দেখিতেছ, আজ রাত্রিতে ইহা একটী জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া দাও, কল্য প্রাতঃকালে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও? 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শ্বেতকেতু চলিয়া গেলেন এবং পিতার আদেশে পরদিন প্রাতে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া উপদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উদ্দালক প্রিয় পুত্রের তাদৃশ নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া ধীরপ্রশান্তভাবে বলিলেন, শ্বেতকেতো! গত রাত্রিতে যে সৈন্ধবখণ্ড জলে রাখিয়াছিলে অদ্য তাহা আমার নিকট আনয়ন কর। এই আদেশমাত্র শ্বেতকেতু সেই জল মধ্যে সৈন্ধবখণ্ডের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে যখন বহু অনুসন্ধানেও জলমধ্যে সৈন্ধবখণ্ড পাইলেন না, তখন পুনরায় পিতার নিকট প্রত্যাগত হইয়া বিষণ্ণহৃদয়ে বলিলেন, পিতঃ! সে সৈন্ধবখণ্ড নাই—জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উদ্দালক বলিলেন, বিলীন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তা'বলে ঐ জলেও নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করিও না; কারণ, উহাতেই সেই সৈন্ধব লুক্কায়িত আছে। ইহা যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে উহার উপর, নীচ ও মধ্যভাগ হইতে কিছু কিছু জল পান কর, তাহাতেই সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিবে। এই কথানুসারে শ্বেতকেতু সেই জল আস্বাদন করিলে পর উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি রস আস্বাদন করিলে? পুত্র বলিল, লবণ,—এ জলের সর্ব্বত্রই কেবল লবণরস বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন, উদ্দালক অবসর বুঝিয়া বলিলেন, দেখ বৎস! এ জগতে যে সমস্ত বস্তু বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত যে কেবল একমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, এমত নহে। এজন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর প্রাণিদিগকে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুরই শক্তি বা ক্ষমতা যেরূপ পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষমতাও সেইরূপ পরিমিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কারণেই চক্ষু থাকিতেও বধির ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারে না এবং কর্ণ

থাকিতেও অন্ধ ব্যক্তি কোনরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অনেক কারণে প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর না হইতে পারে। যেমন, অতি দূরত্বনিবন্ধন প্রকাণ্ডকায় হস্তিপ্রভৃতি, আর অতি সান্নিধ্যবশতঃ নিজ নয়নাঞ্জন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়ের বিনাশ ও বিকলতা, মানসিক চঞ্চলতা, দৃশ্যবস্তুর সূক্ষ্মতা প্রভৃতি অনেক কারণ আছে, যাহার প্রভাবে জীবগণ বিদ্যমান বস্তুও প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। অতএব হে শ্বেতকেতো! তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার বা আমার চক্ষুর দৃশ্য হয় না বলিয়াই কোন বস্তুর অভাব হইতে পারে না। যুক্তি ও প্রমাণান্তর দ্বারা যাহার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহা "ধ্রুব সত্য" বলিয়া মানিতে হইবে। যেমন অগণন পরমাণু নিচয় নিয়ত নয়ন পথে থাকিয়াও দৃষ্ট হইতেছে না, বলিয়া জগতে পরমাণু নাই এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অতএব, জানিও, পরমকারুণিক পরমেশ্বর এ জগতের অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন। রূপ না থাকায় আমাদের কর্ণদ্বয় তাঁহাকে শুনিতে পায় না, রস নাই বলিয়া আমাদের রসনা তাঁহার আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারে না। বৎস শ্বেত-কেতো! রসনার রসাস্বাদে যেরূপ জলাভ্যন্তর-বিলীন লবণের সত্তা উপলব্ধি করিয়াছ, সেইরূপ এই জগন্মণ্ডলের অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মকে জানিতে হইলেও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনের প্রয়োগ করিতে হয়, এবং দিগ্‌ভ্রান্ত বৈদেশিক পুরুষ কোনও অপরিচিত দেশে উপস্থিত হইয়া যেরূপ বিশ্বস্ত সাধু-পুরুষের উপদেশে আপন আপন গন্তব্যদেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব সেই ব্রহ্মকে জানিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেও উপযুক্ত আচার্য্যের শরণাগত হইতে হয়; নচেৎ কিছুতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। অতএব, হে শ্বেতকেতো! "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। অর্থাৎ যিনি উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। একথা তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

মাই থাই।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

সায়াম দেশে রমণী সমাজ মধ্যে শিক্ষার প্রথা প্রচলন নাই; স্ত্রীসমাজে শিক্ষার প্রথা প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু শতকরা প্রায় ৯০ জন স্ত্রীলোক চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞা!! এই ৯০ জনের মধ্যে প্রায় ৮৮ জন "হাতুড়ে"!! কেবল শুনিয়া শুনিয়া এবং দেখিয়া দেখিয়া অথবা কেবল কল্পনা দ্বারা ইহারা চিকিৎসা করে। এই সকল চিকিৎসা-ব্যবসায়িনী সায়ামী স্ত্রীলোকের মতে মানবদেহ ৩২ অংশে বিভক্ত, এই "৩২ অংশ বিভক্ত মানবদেহ" খানি ৯৬টী রোগের আশ্রম অর্থাৎ প্রত্যেক অংশ তিন তিনটি রোগের আগার বা উৎপাদক। সায়াম দেশে রোগের সাধারণ নাম "বায়ু।" পীড়িত ব্যক্তিবর্গের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসিকাগণ যে সকল ব্যবস্থা (Prescriptions) দেয় তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। আমি একটা জ্বরগ্রস্ত ও উদরাময় রোগীর ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, নিম্নে তাহার সমুদয় অবিকল বাঙ্গালানুবাদ দিলাম——

"শ্রীশ্রীশ্রীবুদ্ধদেব।

নদীর জল	এক সের
হ্রদের জল	এক সের
ঘরের বাসী জলকে উষ্ণ করিয়া লইয়া তাহার ...	এক সের
যুবতী স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ	এক তোলা।
পুরাতন (বৌদ্ধ) দেবালয়ের পুরাতন দেওয়ালের মাটি	অর্দ্ধতোলা
মুক্ত মীর্গাশা (নিম্ব) পত্রের রস	২ তোলা
লবণ	½ তোলা
কর্পূর	"
গোমূত্র	১ তোলা
ঘোল	অর্দ্ধ পোয়া
শর্করা	একতোলা
হিরণবী (নামক তিক্ত লতার) রস	একতোলা
ফীণা (নামক মৎস্তের) উদরস্থ পিণ্ড	½ তোলা

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মিলাইয়া, পুরোহিত (যাহার নাম আচ্ছুগিরি কান্দীর) মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তে কিছুক্ষণ রাখিয়া এবং তাহাকে অর্দ্ধরৌপ্য-দক্ষিণা দিয়া, তিন বার প্রণাম পুরঃসর, ৫৬ বার বুদ্ধ বুদ্ধ নামোচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে ঔষধ গলাধঃকরণ করিলে, তিন দিনে, না হয় ৫ দিনে, না হয় ৭ দিনে, অথবা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়—৯ দিনে রোগী আরোগ্য হইবেই হইবে। ইতি”

স্বাক্ষর——

চিকিৎসক।

আর একটা কৌতুকাবহ ব্যবস্থাপত্র অবিকল এইরূপ—

“শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব।

অহং সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছাম।

শ্রীশ্রীআনন্দং শরণং গচ্ছাম।

“রোগী কহিল তাহার মাথার ব্যথা আছে, কোমরে বেদনা আছে, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না, মল কঠিন, উদরে অজীর্ণ, বুকে বেদনা, মনে অশান্তি এবং রাত্রিতে ভূতের ভয়; তদ্ভিন্ন অর্দ্ধরাত্রে কুস্বপ্ন দেখে, বোধ হয় যেন কোনও দৈত্য তাহাকে কামড়াইতে আসে। এতদ্ব্যতীত পা ফুলে, হাত ফুলে, চক্ষু জ্বলে, পৃষ্ঠে ব্যথা ও গায়ে জ্বর আছে। আরও দেখা গেল, প্রেত ও রাক্ষসদিগের প্রভাববশতঃ মধ্যে মধ্যে প্রবল হিক্কা হয়। পাতালের প্রেতিনি-গণের অশুভ আগমনে কাশের উৎপত্তি হইয়াছে, মুখ হইতে অল্প অল্প রক্ত উঠে। যাহা হউক চিন্তা বা ভয় নাই।

“গণনা দ্বারা জানা গেল, রোগীর জন্ম-লক্ষণ শুভপ্রদ। বর্ত্তমান বর্ষে তাহার গ্রহ অশুভ দায়ক নহে। বুদ্ধমন্দিরে একটা বিরাট ব্রতের আয়োজন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তদ্ভিন্ন ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতির শান্তি জন্য মহাব্রতের আয়োজন করিতেই হইবে।

“ঔষধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, তিল ভিজাইয়া সেই জলে মর্কটপুষ্পের রস এক ছটাক মিলাইয়া ৫৬ বার বুদ্ধ নাম স্মরণ পূর্ব্বক তাহা পান করিবে।

“পথ্য।—পশু, পক্ষী, মৎস্য এবং ভেক মাংসের মধ্যে যাহা সুলভে পাওয়া যায় তাহাই প্রধান খাদ্য। ভাত দিবসে তিনবার, রাত্রে একবার।

স্নান বন্ধ। ফল ২২টার অধিক খাইতে পাইবে না। নিদ্রা সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম নাই। পুরোহিতকে প্রতিদিন প্রণাম করিতে হইবে।" ইত্যাদি

স্বাক্ষর———

চিকিৎসক।

একদিন একটা রোগী একটী চিকিৎসিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি সকল ব্যবস্থাপত্রেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবার কথা লিখিয়া থাকেন, কিন্তু যদি আমি এই রোগ হইতে আরোগ্যলাভ না করি তাহা হইলে কি হইবে?" চিকিৎসিকা উত্তর দিল "তাহা হইলে তোমার ভাগ্যকে মন্দ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিও।" সুচতুর রোগী কহিল "যদি সন্তোষ না জন্মে তাহাহইলে কি করিব?" চিকিৎসিকা বলিল "তাহাহইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে জানিও।" রোগী কহিল "যদি মৃত্যুই হয় তাহা হইলে কি করিব?" চিকিৎসক মহাশয় রোগীর মাথায় হাত দিয়া কহিলেন "আমার হাতে মৃত্যু হইলে বুদ্ধের শরণাগত হইবে ইহা নিশ্চয়, অথবা চিন্তা বা ভয় নাই। সাধুরা তোমার সহায় আছেন, আমরাও সহায় হইলাম।" এই কথা কহিয়া মৃদু মধুরহাস্য সহ চিকিৎসিকা সুদূরে পলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ভ্রমণকারী ইয়ং সাহেব(Kingdom of Siam, Page 122) একখানা অদ্ভুত পৃস্ক্রুপ্‌শন্ (ব্যবস্থাপত্র) দেখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে এই দেবদুর্লভ ব্যবস্থাপত্র খানির অবিকল অনুবাদ দিয়াছেন। পাঠকদিগের আমোদের জন্য আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে ইহা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পৃস্ক্রুপ্‌শনের অনুবাদ।

(ভয়াবহ বিপদজনক জ্বরের ব্যবস্থাপত্র)

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব।

গণ্ডারের শৃঙ্গ চূর্ণ	...	...	১ তোলা
হাতির দাঁত চূর্ণ	...	...	ঐ
বাঘের দাঁত ঐ	...	...	ঐ
কুম্ভীরের দাঁত ঐ	...	...	ঐ
ভল্লুকের ঐ	...	...	ঐ
শকুনির অস্থি চূর্ণ	...	...	২ তোলা
হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ...	...	...	ঐ

চন্দন চূর্ণ	...	...	ঐ
টীকটীকীর লেজ চূর্ণ	...	...	ঐ
কর্পূর ...	...	...	২ তোলা
মহিষের গায়ের ঘাম	...	...	১ তোলা
কালো বিড়ালের চক্ষু	...	...	একটা
পুরাতন লৌহ চূর্ণ...	...	...	½ তোলা
ছাগ শিশুর বুকের হাড় চূর্ণ	...	...	একছটাক

"এই সকল দ্রব্য, পচা দধির সহিত মিশাইয়া, পাথরের উপরে উষ্ণ জল সহ এরূপে পেষণ করিবে যে, পেষণ করিতে করিতে ঔষধগুলি মাখমের ন্যায় কোমল ও তরল হইয়া যায়। দেখিও যেন একটু ও শক্ত না থাকে; অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর, শ্বেতবর্ণের ছাগলের দুগ্ধ সহ, যে কয়েক দিন ইচ্ছা হয়, খাইও। ইহাতে নিশ্চয়ই জ্বর-দস্যু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া যাইবে। অত্র বিষয়ে সন্দেহো নাস্তি।"

স্বাক্ষর——

শ্রীচিকিৎসক।

বলা বাহুল্য, ঐ রোগী একজন ধনবান্ লোক ছিল, সুতরাং চিকিৎসকের পুরস্কারটা যথোচিত হইয়াছিল বলিয়াই সকলের বিশ্বাস আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঔষধ আদৌ মিলে নাই; যদিও পাওয়া যাইত তাহা হইলে ঔষধ পেষণ করিতে করিতে বোধ হয় দশজন লোকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল!! সায়াম দেশের চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থাপত্রের শতকরা প্রায় ৯৮ টা প্রেস্ক্রিপ্শনের ঔষধগুলি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রদেশে পাওয়া যায় না!!

সায়ামের রাজধানী ব্যাংকক্ নগর মিনামা নদীর তটে অবস্থিত; খ্রীষ্টীয় ১৭৬৭ অব্দ হইতে ঐই নগর সামের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। রাজধানীতে প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ সহস্র লোকের বসতি। এখানে দেখিবার অনেক আশ্চর্য্য ও মনোহর পদার্থ আছে; বাহুল্য ভয়ে তাহার বিবরণ দিলাম না। কোরাট, পচ্যবুরী, সিংগরা, চিংমল, চংতাবুম, অউথিয়া প্রভৃতি নগর দেখিবার যোগ্য। রেশমের দোকান, হাতির দাঁতের কারখানা, ভোজ্য দ্রব্য সমূহের পাকশালা, রাজার বাটী, নৌকা নির্ম্মাণের কার্য্যালয় প্রভৃতি দর্শন করিলে পথিকেরা আশ্চর্য্য হইতে পারেন।

একদিন আমি একজন সামামী গ্রহাচার্য্যের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি মনুষ্যের অদৃষ্ট গণনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আচার্য্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি প্রয়োজন?" আমি বলিলাম "আপনারদ্বারা আমার অদৃষ্টটা একবার গণনা করাইয়া দেখিতে চাহি"। আচার্য্য আমাকে একটা ঘরে বসিতে বলিল, সেই ঘরের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে যাহা খোদা ছিল তাহা এই—

"ভাল কিম্বা মন্দ; মন্দ কিম্বা ভালো।
যদি নাহয় সাদা, তাহ'লে হবে কালো॥
সকলই সত্য, সকলই মিথ্যা;
সকলেই বাঁচলো, সকলেই মোলো।
যদি না হয় অন্ধকার, তাহ'লে হবে আলো॥"

গ্রহাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বিপুল বপু খানিকে লোহিত চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া আমার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে আমার এবং আমার পিতার, পিতামহের, প্রপিতামহের, বৃদ্ধপ্রপিতামহের, মাতার, মাতামহীর, প্রমাতামহীর প্রভৃতির নাম জিজ্ঞাসা করায়, আমি বলিলাম "আমি এখানে তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করিতে আসি নাই, কেবল অদৃষ্ট গণনা করাইতে আসিয়াছি।" গ্রহাচার্য্য কহিল "তবে একটা গরুর নাম বলুন"। আমি বলিলাম "মানুষের মত গরুর নাম থাকে নাকি?" গরুর নাম থাকে না শুনিয়া জ্যোতিষী মহাবিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল, ধীরে ধীরে বলিল "আমাদের দেশের প্রত্যেক গরুর নাম আছে। যাহা হউক, একটা মানুষের নাম বলুন"। আমি বলিলাম "মহামহোপাধ্যায় অমরেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বেদান্তচঞ্চু"; লোকটা বিরক্ত হইয়া বলিল "এত বড় কর্কশ নামে কাজ চলে না, একটা সরল নাম বলুন"। আমি বলিলাম "ফটীকচাঁদ"। গ্রহাচার্য্য কহিল "তবে অঙ্ক পাতিয়া হিসাব করি।" তিনঘণ্টা অঙ্ক পাতিয়া হিসাব হইল কিন্তু হিসাবের শেষ না হওয়ায় আচার্য্য কহিলেন "অদ্যকার নক্ষত্র ভাল নয়, সময়ও খারাপ, আপনি আর এক সময়ে আসিবেন; যাহাই হউক, আপনার দেহে শুভচিহ্ন দেখা যাইতেছে, অতি অল্পকাল মধ্যেই আপনার শুভগ্রহ উদয় হইবে বলিয়া বোধ হয়। আমাকে কিছু টাকা দিয়া যাউন"। আমি কিছুই না দেওয়ায়, সক্রোধে জ্যোতিষিক কহিয়া উঠিল" আচ্ছা তবে যাও কিছু টাকা না দিলে অশুভগ্রহ

তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে। অশুভ গ্রহগণ আমাদের অনুগত।” আমি বলিলাম—“তোমরাই এক এক জন অশুভগ্রহের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি!” এই কথা কহিয়া আমি তাহার গৃহ হইতে চলিয়া আসিলাম; লোকটা তাহার স্ত্রীকে কহিল “এমন লক্ষ্মীছাড়া লোকের আগমন হইলেই আমাদের ব্যবসার সর্ব্বনাশ দেখিতেছি!!” আমি একবার সাতজন গ্রহাচার্য্যকে আমার একজন বন্ধুর এক খানা জন্মপত্র (কোষ্ঠি) প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম। ইহাদের কেহই পরস্পরকে চিনিত না এবং কেহই জানিত না যে অপর কাহাকেও কোষ্ঠি প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছে। কোষ্ঠি প্রস্তুত হইলে দেখিলাম, সাতখানি কোষ্ঠি ভিন্ন ভিন্ন; কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই!! কিন্তু কয়েকটা কথা সকল কোষ্ঠিতেই ছিল, তাহা এই———“দীর্ঘজীবন, ধনলাভ, উত্তম বন্ধু প্রাপ্তি, ধার্ম্মিক স্বভাব এবং সুস্থশরীর।” পরীক্ষাদ্বারা জানা গেল, সাত জনেই প্রবঞ্চক এবং সাতখানা কোষ্ঠিই জাল!!

সামদেশে চা বিক্রেতাদিগের বড় বড় দোকানে বড় বড় অক্ষরে যাহা লেখা থাকে তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম। এখানে প্রতিদিন অনেক টাকার চা বিক্রয় হয়। চা দোকানের সম্মুখস্থ কাষ্ঠ খণ্ডে লেখা থাকে———

“চুমুখ দিয়ে চা খাও চোঁচা পাখির মত।
গরম্ গরম্ চা খেলে আয়ু বাড়ে শত॥”

সামদেশে ইংরাজ-প্রভুত্ব ছিল না, সম্প্রতি বৃটীশ বিক্রম ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইবার উপায় হইয়াছে। কেদা, পাটানি, কেলোণ্টম, তিরিগানু প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ সাম রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিবাসীরা সায়াম নরপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় বৃটীশ-সিংহ আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং সেইজন্য এই সকল দেশে বৃটিশ রেসিডেণ্ট, বৃটীশ সেনা এবং বৃটীশ বণিক থাকিবার সুবিধা হইয়াছে। কিছুদিন পরে ইংরাজ প্রভু এদেশগুলিকে ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে আমরা আশ্চর্য্য হইব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্রাদ্ধ মাহাত্ম্য।

শ্রাদ্ধ (প্রীতি, মায়া, ভক্তি)

"পিতাধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেনগচ্ছন্নরিষ্যতে॥"

মনু।

"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্তচ্ছ্রাদ্ধং"।

এই বাক্যের বাচ্যার্থ ধরিলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহাকে যাহা দেয় তাহাই তাহার শ্রাদ্ধদ্রব্য বলিতে হয়। বস্তুতঃ শ্রাদ্ধ শব্দে সেরূপ অভিধেয়ার্থ নাই। শ্রাদ্ধ বলিলেই রূঢ়ি অর্থদ্বারা মৃতব্যক্তির স্বর্গ কামনায় তদুদ্দেশে তর্পণাদি সহিত পিণ্ডদান, তিলকাঞ্চন দান, ভূম্যাদি ষোড়শ দান, বৃষোৎসর্গ, ব্রাহ্মণাদির ভোজন ক্রিয়া এবং প্রকৃত নিরন্নব্যক্তিবর্গের ভূরি ভোজন সম্পাদন করাই আর্য্যজাতির শ্রাদ্ধ শব্দের প্রকৃত অর্থ হয়।

এখন দেখা যাউক কেবল ভারতীয় জাতি চতুষ্টয়ই কি মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, কি অন্য জাতি মধ্যেও শ্রাদ্ধ অথবা তাদৃশ কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রথা প্রচলিত আছে কি না?

জ্ঞানিগণ মধ্যে সকল জাতিরই পিতৃ পিতামহাদির মৃত্যুতে একটা বিশেষ কষ্ট হয়। সেইরূপ কষ্ট হয় কেন? জনক অপত্য স্নেহের অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হইয়া, সন্তানকে সমুদয় বিঘ্নের হাত হইতে যথাসাধ্য উদ্ধার করিয়া, মনুষ্য ভাবে পরিণত করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন।' প্রতিপালন সম্বন্ধে মাতৃদেবীর কথা উল্লেখ করা পিষ্ট পেষণ মাত্র, কারণ কে না জানেন যে মাতৃদেবী সন্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং সর্ব্বদেশীয় লোকেরই যে পিতৃলোকের প্রতি একটা বিশেষ ভক্তি আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঐ ভক্তির নামান্তর শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জনিত কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ।

প্রথমত দেখা যাইতেছে আর্য্যগণ সকল লোকের আদি ও আদর্শ। তাঁহারা যাহা করেন তাহারই অনুকরণ করা সকল জাতির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য; তবে আর্য্যজাতির অনুষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে পাছে

জাতীয় উৎকর্ষ এবং নবীনতার গন্ধ প্রকাশ না পায় এই হেতুবশতঃ তাঁহারা সৎক্রিয়া রূপ মহামায়ার হস্তপদাদি ছেদনপূর্ব্বক অঙ্গ বিকৃতি করিয়া একটা সং সাজান। সং সাজাইলেও তাহার মধ্যে একটা প্রগাঢ় ভাব নিহিত থাকে। আমরা সেই ভাবটীকে ভক্তি বা শ্রাদ্ধ শব্দে অনায়াসেই লক্ষ্য করিতে পারি।

মুষলমানেরা মৃতের উদ্দেশে প্রত্যেক দশা হাস্তে চতুর্থ দশাপর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪০ চাস্পে বলিয়া একটা প্রেতকৃত্য করিয়া থাকেন। ঐ প্রেতকৃত্যে সম্ভবমত দান ও মৃতের উদ্দেশে ধ্যান ও মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্ত্র পাঠকালে রোদনের বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায়। অনেকেই মহরমে জাজল্যমান প্রমাণ দেখিয়াছেন; মৃত হাসেন হোসেনের জন্য অনবরতঃ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করা হয়। এই কার্য্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করাও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। বুক চাপড়ান শোকপ্রকাশ ও ক্রন্দনকার্য্যে লোক ভাড়া করা হয়। নিরক্ষর ও ভক্তিহীন আমীর ওমরাগণ এই পথের পথিক। প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ভক্তিভাবে ক্রন্দন ও হৃদয়ে করাঘাত করেন। মুসলমানগণ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণাদি ভেদে চান্দ্র মাস গণনায় যে অনেক কার্য্য করেন তাহার অধিকাংশ মৃতের উদ্দেশে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

পৌষসংক্রান্তিতে অথবা অম্বুবাচির সময় পশুপক্ষীর হনন, পিষ্টক ও জলোৎসর্গ প্রায় সমুদায় মুষলমান মধ্যেই দেখা যায়। তবে যাহারা হেদা যৎ অর্থাৎ একেশ্বর বাদী তাঁহারা কোন কার্য্যই করেন না। কেবল লোকহিতার্থ কতকগুলি কার্য্য করা তাঁহাদিগের যেন মূল উদ্দেশ্য। তাহা সাধন করিতে যতটুকু জাতীয় গৌরব ও মুষলমান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখান আবশ্যক তাহারই চেষ্টা করেন মাত্র।

ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানগণও মুষা ও যিশুখৃষ্টের মৃত দিনকে পবিত্র জ্ঞানে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সুতরাং ঐ দিবসীয় সৎকার্য্য গুলিকে শ্রাদ্ধের অনুকরণ কহিতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয়ান ও ইহুদীজাতিরা মাতা পিতার স্বর্গোদ্দেশে দানাদি করিয়া থাকেন। এবং মলিন বেশে অনেকদিন সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঐ সময়টাকে অশৌচ কাল বলিতে পারা যায়। অপিতু পিত্রাদির স্মরণার্থ দানাদি ব্যাপারটীকে শ্রাদ্ধ শব্দেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সভ্যজগতের কথা বলা গেল। এখন অসভ্য বর্ব্বরেরা কি করে দেখা যাউক। তাহারাও মৃতব্যক্তিকে সহসা পরিত্যাগ করে না। রাখিবার চেষ্টা করে। যতদিন শবটি পচিয়া না যায় তাবৎকাল উহা বৃক্ষাদিতে সংস্থাপন করিয়া ফলপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত করিয়া প্রত্যহ দেখিতে থাকে। পচিয়া গেলে পশ্বাদিকে ভক্ষণ করায়, অথবা জলে ফেলিয়া দেয়, কিঞ্চিৎ বোধবিশিষ্ট অসভ্য লোকে মৃতব্যক্তির সমাধি দেয়। কুকীরা মৃতব্যক্তিকে ভক্ষণ করে। তাহার উদ্দেশ্য কি বলা যায় না। সে যাহা হউক অধিকাংশ জাতির উদ্দেশ্য ভক্তিপ্রদর্শন। সেই ভক্তিকে আমরা শ্রাদ্ধ বলিয়া আসিতেছি।

আমরা আর অন্যের কথায় কালক্ষেপ করিব না। আমরা কেন শ্রাদ্ধ করি তাহাই বলা কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা বেদ স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুযায়ী শ্রাদ্ধের অঙ্গ এবং শ্রাদ্ধ কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতার কিঞ্চিন্মাত্র বলিব।

যে ব্যক্তির যতদিন যেখানে বাস বা পরিচয় সেইস্থান এবং পরিচিতের সাহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং অনেক দিনের মায়া হেতু ত্যক্ত বস্তুতেও একটা মহামায়ার স্মৃতি হয়। সেই স্মরণ নিবন্ধন মৃতব্যক্তি স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়াও সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান পূর্ব্বক পরিচিতস্থান ও চিরপরিচিত সম্বন্ধ ভুলিতে পারেন না। পূর্ব্বপরিচিতের নিকট হইতে নিজের স্বচ্ছন্দতা ও পরলোকে সুখের কামনা করেন। ইহলোকে অবস্থান সময়ে নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি নিবন্ধন সুখ দুখের সীমা অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার ইহসংসারে জঠর যন্ত্রণা ও পরকালে যমদ্বারে পুন্নাম নরকে না যাইতে হয় বলিয়া পুত্র কামনা করেন। পুত্র শব্দে, পুত্র পৌত্রাদি সন্তান বর্গকে লক্ষণা করিতে হইবে।

(১) পুত্রই পুন্নাম নরক নিস্তারে পিতার একমাত্র সহায়। পুত্রই পিতার অংশ অর্থাৎ তাঁহার আত্মা হইতে জাত। এইজন্য পুত্র শব্দের প্রকৃত নাম আত্মজ। পুত্র দ্বাদশ প্রকার। অন্য একাদশ বিধ, আত্মজের প্রতিনিধি মাত্র। সেই একাদশ পুত্রপ্রতিনিধি মধ্যে দত্তক পুত্রই শ্রেষ্ঠ। দত্তক পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় বংশরক্ষক এবং পিত্রাদি ঊর্দ্ধতনপুরুষের পিণ্ড দাতা।

শ্রাদ্ধ না করিলে পুত্রাদির প্রত্যবায় ও অধর্ম্ম জন্মে। অধর্ম্ম হেতু

নরক গমন করিতে হয়। নরক আছে কি না সে সন্দেহ যাঁহারা করেন তাঁহারা নাস্তিক। আমরা নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত নহি। আস্তিক ব্যক্তি শাস্ত্র মানেন তাঁহাদিগের জন্যই এ প্রস্তাব।

শুনিতে পাই এখন অনেক নাস্তিকও, বিলাতি প্রেততত্ত্বের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের, দ্বারকা নাথ ঠাকুর ও রণজিত সিংহাদির ছায়া দেখেন, ও কথাবার্ত্তা শুনিতে পান, ও তদনুসারে নিজের অভীষ্ট ব্যক্তির সহিত হস্তলিপিতে কথা কহিতে চাহেন। তাঁহাদিগের অঙ্গে বিলাতী বিদ্যুতের অংশুর অংশ প্রবেশ করে; এবং অভীষ্ট ও প্রিয় ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে পান। ইঁহারা শ্রাদ্ধ বাদী।

স্বর্গকামনায় কাহাকে কিছু দিতে হইলে পরিশুদ্ধ হৃদয়ে ও পবিত্র শরীরে দিতে হয়। কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা না জন্মিলে দত্ত বস্তু স্বর্গে পৌঁছে না। সুতরাং দাতাকে সর্ব্বতোভাবে অগ্রে পবিত্র হইতে হয়।

মানুষ মরিলেই আত্মার ও ব্যক্তির শোক ও পরিতাপ জন্মে। যাবৎ শোক থাকে তাবৎ কাল সে ব্যক্তি অশুচি এই হেতু বশতঃ ঋষিবর্গ শোকের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে যেমন জ্ঞানী বা অজ্ঞান তাহার তদনুসারে শোক তাপ নিবৃত্তি হইবার কথা, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জ্ঞানিব্যক্তির অশুচি কাল অর্থাৎ অশৌচের অপেক্ষাকৃত অল্পতা দেখা যায়। এবং আকস্মিক বিপদ অর্থাৎ হঠাৎ দুর্দ্দৈব নিবন্ধন অপমৃত্যু স্থলে, অধিককাল ওরূপ বিষয়ে শোক করায়, অন্যবিধ অপকার্য্যের প্রবেশ হইবার সম্ভব বলিয়া, তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি বিধানের ব্যবস্থা দেখা যায়। অপমৃত্যুস্থলে ত্রিরাত্রাশৌচ তাহার প্রমাণ।

প্রেত শ্রাদ্ধে কি কি কার্য্য হয়। তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে শ্রাদ্ধ না করিলে মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহার হয় না। প্রেতের সুখের জন্য সন্ধ্যাকালে প্রত্যহ অথবা অশৌচান্ত দিনের সন্ধ্যাকালে নীর ক্ষীর দেওয়া হয়। ইহাদ্বারা শ্মশানানল দগ্ধের ক্লেশ এবং বন্ধুজন কর্ত্তৃক পরিত্যাগ জন্য দুঃখ দূর হইয়া থাকে। প্রেত ভাব দূর হইলে তিনি স্বর্গে পিতৃলোকের সহিত বাস করিতে অধিকারী হয়েন। এই কার্য্যটী সপিণ্ডীকরণ কার্য্য দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণে তিনি পিত্রাদি ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের সহিত একত্র অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পুত্রাদি অধস্তন ত্রিপুরুষ প্রদত্ত পিণ্ড ভোগ করেন। এইরূপে তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন হইলে তিনিও অক্ষয় স্বর্গভোগে অধিকারী হয়েন।

পতিপুত্রবিহীনা নারীর সপিণ্ডন নাই। তাহার কারণ স্ত্রীলোকের সপিণ্ডতা, অর্থাৎ পরলোকে পতির সালোক্য ও সাযুজ্যাদি প্রাপ্তি, সেই নারীর শ্বশ্রূ আদি ঊর্দ্ধতন শ্বশ্রূত্রয়ের সহিত অর্থাৎ শাশুড়ী বড়শেষ ও তাহার শাশুড়ীর সহিত। পতিপুত্র না থাকায় এইসকল স্ত্রীজাতির সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্তির উপায় নাই! মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ, পুত্রাদি তিন পুরুষের অধিকার। পুত্রহীনা অথচ পতিবত্নী নারীর সপিণ্ডতা স্বামীদ্বারা সাধিত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গ ও অর্দ্ধাঙ্গী, পতি পুত্র বিহীনা স্ত্রীর সে পথ নাই।

এক্ষণে কেহ কেহ কহিতে পারেন যে অপুত্রক অথবা সাপিণ্ড্য রহিত ব্যক্তির পিণ্ডদান কার্য্য হয় কিনা এবং তাহাদিগের রৌরবাদি নরক নিস্তারের পথ আছে কি না? পাঠক তুমি নিশ্চয় জানিবে যে আর্য্যেরা যে প্রকার ভক্তিমান, স্নেহবান, প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্বতই অপুত্রক অপহত ও দুর্গত লোকের প্রতি সমধিক দয়া ও তাহাদিগের ইহলোক ও পরলোকের তৃপ্তি ও সুখের জন্য প্রতি গৃহস্থের প্রতি আতিথ্য ও ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরলোকেগত ব্যক্তিবর্গের অপুত্রক ও বন্ধুহীনাদির অগ্রে পিণ্ডদান ব্যতিরেকে অভীষ্ট ব্যক্তির পিণ্ডদান সিদ্ধ হয় না; তর্পণাদি-তেও আত্মীয় অনাত্মীয় শত্রু মিত্র স্বজাতি বিজাতি ইহজন্মে ও পূর্ব্বজন্মের পরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবার কথা নয়; অগ্রেই নির্ব্বিকার চিত্তে এবং ভক্তিভাবে অপহতাদিগকে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা প্রীত করা আর্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। যিনি এই পথ পরিত্যাগ করিবেন তাঁহার পিত্রাদির পিণ্ডদান কার্য্য অসিদ্ধ হইবে। আর্য্যদিগের মনের ঔদার্য্য কত দেখ। গয়াশ্রাদ্ধে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ বুদ্ধি নাই। স্মরণপথে যত মৃত ব্যক্তির নাম উপস্থিত হয় তৎসমস্তেরই শ্রাদ্ধ তর্পণ ও তদুদ্দেশে দান করিতে হয়। গয়াশ্রাদ্ধে যে কোনরূপ অগতিক ব্যক্তির সদ্গতি করিতে হয়; অপিণ্ডক জন গয়াশ্রাদ্ধ প্রভাবে অক্ষয় সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই কার্য্যটী সাধারণের প্রধান কার্য্য। পিণ্ডদাতাকে স্বার্থপর বলা যায়না। শ্রাদ্ধে আরও একটি কৃতজ্ঞতার কার্য্য দেখা যায়। প্রথমে দেখা যায়, যে ঈশ্বর হইতে স্থাবর জঙ্গম অভিন্ন, ও যাঁহার দ্বারা ও যাঁহার অনুগ্রহে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে, জীবিত আছে ও অবশেষে যাঁহাতে লীন হইবে, তাঁহার স্মরণার্থ মন্ত্রের অগ্রে ও পশ্চাৎ প্রণব উচ্চারণ করা যায়।

দ্বিতীয়ে, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চনা, ইহাদ্বারা নিজের দেবসারূপ্য প্রাপ্তি। তদ্দ্বারা ঋষি পিতৃ ও দেবাদির অর্চনায় অধিকার জন্মে। নতুবা ক্রিয়ায় অনধিকার জন্মে এরূপ শ্রুতি আছে। তৃতীয়ে, বাস্তু পুরুষের আরাধনা। এই কার্য্যদ্বারা অধিষ্ঠান ভূতা পৃথীর অধিদেবতার তৃপ্তিসাধন হয়। ইহাতে নিজের অধিবাসের নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদন হয়। চতুর্থে, ভূস্বামীর পূজা। এই পূজাদ্বারা রাজার সহিত প্রজার পিতা পুত্রত্ব সম্বন্ধের স্পষ্ট প্রীতির নির্দ্দেশ অনায়াসে অনুভূত হয়। পঞ্চমে, সর্ব্বভূতের প্রীতি সাধন। তৎপরে অগ্নিদগ্ধাদি অসদগতিক ব্যক্তির পিণ্ডদান। এই কার্য্য হইলে অভীষ্ট ব্যক্তির স্বর্গোদ্দেশে পিণ্ডদান কার্য্যে অধিকার জন্মে।

অভীষ্টের পিণ্ডদান সময়ে ইতিহাস কীর্ত্তন করিতে হয়। কেন করা যায়? ভোজনকালে মনোহর গল্প শুনিলে যাদৃশ আনন্দ হয় তেমন আর কোন সময়ে হয় না। গল্প শুনিলে বিশেষ তৃপ্তি জন্মে। সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধকালে ইতিবৃত্তমূলক দুই একটি বৈদিক বা পৌরাণিক গাথা শুনাইয়া আসিতেছি। পূর্ব্বকালে সাম গান হইত, এক্ষণে সচরাচর বিরাটপর্ব্ব ও গীতা পাঠ হইয়া থাকে।

পিণ্ডদানের পর ভাবনা অর্থাৎ যদুদ্দেশে পিণ্ডদান হইতেছে তিনি সূক্ষ্ম শরীরী হইলেও, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া দ্বিতীয় সূর্য্যরূপে পিণ্ডদাতার হস্তচ্যুত অন্ন প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পিণ্ডদাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা কি নিতান্ত ভক্তি প্রীতি ও বিশ্বাসের কার্য্য নহে? বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিলেই, পরলোকস্থিত ব্যক্তিবর্গ ইহলোকে সূক্ষ্মদেহে আগমন পূর্ব্বক, ভক্তিভাবে প্রদত্ত পিণ্ডাদির সারভূত সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। কেহ কেহ কহিবেন, যেমন পিণ্ড তেমনই থাকে, মৃতব্যক্তির ভোজন দ্বারা পিণ্ডাদি উৎসৃষ্ট বস্তুর ক্ষয় হইতে দেখা যায় না। তদুত্তরে বলিব, সূক্ষ্মাংশ বহির্গত হইলে স্থূলাংশের পরিমাণের তারতম্য করা কখনই যাইতে পারে না। তাই আমরা উৎসৃষ্ট বস্তুকে যথাবস্থায় দেখিতে পাই।

পিণ্ডদানের পর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা আছে। তাহাতে পিণ্ডদাতার সর্ব্বাঙ্গীন শুভকামনা, এবং সন্তানবর্গের নিরন্তর অনাময় ও মঙ্গল প্রার্থনা, এবং অতিথিবর্গের অপ্রতিহত ভাবে অন্নপ্রাপ্তির হেতুভূত স্বকীয় সন্ততির অন্নবৃদ্ধির বর যাচ্ঞা (পশ্বাদির ন্যায় আত্মোদর পরিপূরণে) কাহারও নিকট না করিতে হয়, ইত্যাদি স্বাবলম্বন প্রকৃতি চিন্তাদ্বারা নিজের দৈন্যাবস্থা

দূরীকরণের অভিলাষ নীচমনার কার্য্য। প্রত্যাশী হওয়া কর্ত্তব্য নহে তাহার প্রার্থনা।

পিণ্ডদাতার অবস্থানুসারে শ্রাদ্ধের আড়ম্বর পারিপাট্য ও হীনতা হইয়া থাকে। উচ্চ অবস্থায় বিত্তশাঠ্য করিলে পিণ্ডদান কার্য্য পণ্ড হয়: প্রকৃত অসংস্থান সময়ে যথাশক্তি দানেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। এই নিয়মানুসারে বনবাসী রামচন্দ্র যথার্থ ভক্তিভাবে বালির পিণ্ড দিয়াও রোদন করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তদীয় পিতা রাজা দশরথের প্রেতত্ব পরিহার হয়!

এখন দেখ প্রীতি, মায়া ও ভক্তিই সকলের মূল। অসূয়া, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার প্রণোদিত শ্রাদ্ধ কোন কার্য্যকর নহে। সুতরাং মহারাজাকেও কহিতে হইবে যে আমি অন্নহীন, সৎক্রিয়াহীন, বিধিহীন, ভক্তিহীন পামর সদৃশ ব্যক্তি, অতএব আমার প্রদত্ত পিণ্ড আপনারা স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে গ্রহণ করিয়া আমাকে অঋণী করুন। আপনাদিগের দর্শনে ইহা সুধাময় হউক।

মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বর্ষান্তে একবার করিলেই হয়। কিন্তু পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ, যাহাতে ত্রৈপুরুষিক ক্রমে পিত্রাদিত্রয় ও মাতামহাদিত্রয় এবং বসুমত্যাদির পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে, উহা নিত্য অর্থাৎ প্রতি অমাবস্যায়, গ্রহণে, তীর্থে এবং দশবিধ সংস্কারে আভ্যুদয়িক কার্য্যে অবশ্য করণীয়।

আর্য্যগণ যখন যে কার্য্য আরম্ভ করিবেন তখন ষট্‌পুরুষের এবং দৈব পৈত্রাদির শ্রাদ্ধ না করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। বর্ষমধ্যে প্রথমে নূতন অন্ন গ্রহণ করিতে হয়। অমনি নবান্ন শ্রাদ্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল। অপূপ গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইল, তখনি অপূপাষ্টকা না করিয়া অপূপ আহার করার বিধি নাই। মাংস ভোজনের ইচ্ছা হইলে শাস্ত্রবিহিত মাংসদ্বারা মাংসাষ্টকার শ্রাদ্ধ অবশ্য করিতে হইবে।

উদরপূরণের ইচ্ছায় পশুহিংসা অবৈধ। বৈধহিংসা করিতে হইলে যজ্ঞ করিতে হইবে। যজ্ঞের প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মণ ভোজন। সুতরাং ব্রাহ্মভোজ্যে পশুবধ পাপজনক নহে। তদ্রূপ পশুহিংসা বৈধ।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে যিনি সংন্যাসাদি মুক্তিমার্গের দ্বারা অথবা কাশীপ্রাপ্তি দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সদগতি জন্য

পুত্রাদি সন্ততিবর্গের পিণ্ডদান কার্য্যের আবশ্যকতা নাই ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা পিণ্ডের প্রত্যাশা না করিলেও পুত্রাদির পিত্রাদির প্রতি ভক্ত্যতিশয়তা দেখান নিতান্ত কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্রাদির শুভফল ব্যতীত অশুভসম্ভাবনা নাই। বরং ঐ কার্য্যদ্বারা চিত্তের ক্ষোভ ও শোক তাপাদি অনায়াসে নিবৃত্তি হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধে, ত্রিপক্ষে, ষণ্মাসে ও সংবৎসর মধ্যে বৃষোৎসর্গ বিধানের প্রমাণ—যথা

একাদশাহে প্রেতস্য যস্যচোৎসৃজ্যতেবৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং সগচ্ছতি॥
আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষেবা ষষ্ঠেমাসিচ বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবন্নস্যাৎ সপিণ্ডতা॥

অগ্নিপুরাণ।

সুলক্ষণাক্রান্ত বৃষোৎসর্গ করা আবশ্যক। কারণ ঐ বৃষদ্বারা প্রেতের স্বর্গসাধন এবং আনুষঙ্গিক ইহলোকের গোজাতির গর্ভাধান সুন্দররূপে হইয়া থাকে। যথা

তাব্যঙ্গো জীববৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ সুতোবলী।
একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যো, ব, ক্যাদষ্টকাস্তুতঃ॥

কাত্যায়নসংহিতা।

বৃষোৎসর্গ ও গয়াশ্রাদ্ধের তুল্যতার প্রমাণ যথা—

ভ্রষ্টব্যা বহবঃপুত্রা যদ্যপেকোঽপি গয়াহব্রজেৎ।
গৌরীম্বাপ্যুদ্বহেৎ ভার্য্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

ব্রহ্মপুরাণ।

গয়াশ্রাদ্ধের ফলশ্রুতি। যথা—

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
নতচ্ছক্যময়াবক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি॥ ৪।২

বায়ুপুরাণোক্ত শ্বেতবরাহকল্পে গয়ামাহাত্ম্যং।

কাঙ্ক্ষন্তিপিতরঃ পুত্রান্নরকান্তরভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ১১।১।ঐ
মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াং প্রাপ্য বিনশ্যতি।
পিণ্ডং দদ্যাচ্চ পিত্রাদেরাত্মনোঽপি তিলৈর্বিনা॥ ১৪।১ ঐ

যদ্দ্বারা প্রমাণ হইল যে, নিজের পিণ্ডও নিজে গয়ায় দেওয়া যাইতে পারে। লোক ইচ্ছা করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ সময়ে নিজে দিয়া থাকেন।

গয়ামাহাত্ম্য-পিণ্ডদান মন্ত্রে দেখা যায়, অসদগতিকের পিণ্ড যে কেহ দিলেই তাহার সদ্গতি হয় যথা—

রৌরবে অন্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমংপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ৩৬।৬
যে হবান্ধবা বান্ধবাযে যেহন্যজন্মানি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডোময়াদত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং॥ ৪৪ ৬ ঐ

গয়াসুরের মস্তকে যে কোন ব্যক্তির নামে পিণ্ড দিলেই সে ব্যক্তি নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

গয়া শিরসি যঃ পিণ্ডান্ যেষাং নাম্না তুর্নিবপেৎ।
নরকাৎ স্বর্গ লোকাস্তে স্বর্গস্থা মোক্ষ মাপ্নুয়ুঃ॥ ৭৪।৭ ঐ

প্রেত শ্রাদ্ধে ষোড়শদানে কি কি দ্রব্য আবশ্যক তাহার নির্ণয় যথা ;—

ভূম্যাসনং জলংবস্ত্রং প্রদীপোহন্নং ততপরং।
তাম্বুলং ছত্রগন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃপরং॥
শয্যা পাদুকাপাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা॥
দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেত মুক্তিশ্চ দীয়তে॥

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব ধৃত মৎস্য পুরাণ।

শ্রাদ্ধে ভূস্বামীর পূজা অত্যাবশ্যক, সুতরাং অন্য যজ্ঞেও ভূস্বামীর নিমন্ত্রণ স্বতঃসিদ্ধ। যথা—

"যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরং ধ্যায়েৎ শ্রাদ্ধে বিষ্ণুং বিশেষতঃ।
পুরুষং বাস্তু সংজ্ঞঞ্চ ভূস্বামীন মৃষীস্তথা॥

ইতি আচার মাধবীয়ে শ্রাদ্ধকল্পে।

মৃতব্যক্তির প্রেতত্বে, বর্ষ মধ্যে পরিহার হয় না বলিয়া স্ত্রী পুত্রের শোক তাপ অন্য লোক অপেক্ষা অধিক হয়। যাবৎ কাল প্রেতত্ব থাকে তাবৎকাল স্ত্রী ও পুত্রের দেহাশৌচ থাকে। তৎকালে নৈমিত্তিক দেব কার্য্যে এবং পিতৃ মাতৃ কার্য্য ব্যতীত অন্য পৈত্র কার্য্যেও অধিকার হয় না। তবে পুত্রাদির অন্নপ্রাশন উপনয়ন ও কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে নিমিত্তক অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই প্রেতত্ব ও দেহাশৌচ দূরীকৃত হইয়া থাকে। যথা—

প্রসৃতৌ পিতরৌযস্য দেহস্তস্যাশুচি র্ভবেৎ।

নাপি দৈবং নবাপৈত্রং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ।

অর্বাক্ সম্বৎ সরাৎ বৃদ্ধৌ পূর্ণে সংবৎসরে হপিবা

শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেক।

ভর্ত্তৃ সমক্ষে মৃত পতি পুত্রবতী নারীর শ্রাদ্ধে চন্দনধেনু হয়, বৃষোৎ, সর্গ হয় না। প্রমাণ যথা—

তাতে জীবতি যো মাতুর্বৃষোৎসর্গং সমাচরেৎ।

বৃষযজ্ঞেন ভবতি পিতৃহাচোপ জায়তে॥

পতি পুত্রবতী নারী ম্রিয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ।

চন্দনেনাঙ্কিতাং ধেনুং তস্য স্বর্গায় কল্পতে॥

মদন পারিজাত ধৃত আপস্তম্ব বচন।

পতিপুত্র হীনা স্ত্রী জাতির সপিণ্ডিকরণ হয় না। যথা—

"পতিপুত্র বিহীনাযাঃ স্ত্রিয়া নাস্তি সপিণ্ডনং।" শ্রাদ্ধ তত্ত্ব।

পিত্রাদির উদ্দেশে অন্নদান সময়ে নিজের দৈন্য জানাইতে হয়। যথা—

অন্নহীনং ক্রিয়া হীনং বিধিহীনং মদর্চ্চিতং।

ভক্তি হীনং কৃতং শ্রাদ্ধ মচ্ছিদ্রং যৎ প্রসাদাতঃ॥

মদন পারিজাতীয় আপস্তম্ব বচনং

অন্নদানাদির পরে বৈদিক শ্রুতি পাঠ করিতে হয় যথা—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

ইত্যাদি মন্ত্র, সকলেই জানেন বলিয়া লেখা গেল না।

অসুরাদি হইতে হব্য কব্যের রক্ষা করা এবং অব্যয়াত্ম হরির স্মরণ আবশ্যক যথা—শ্রুতি

ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত কব্য ভোক্তা অব্যয়াত্মা হরির ঈশ্বরেত্যাদি মন্ত্র সকলেই জানেন।

শ্রাদ্ধের পিণ্ডদান সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিবর্গকে স্মরণ করিতে হয়। যথা—

'মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনেত্যাদি' মন্ত্র।

ইহার পরেই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠ করা রীতি। তদনুসারে মহাভারতীয় কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়। যথা—দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনীত্যাদি। যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমেত্যাদি মন্ত্র সকলেই জানেন।

স্বর্গীয় পিতৃলোকদের উদ্দেশে হীনগতিও, ভক্তি নিবন্ধন পিতৃলোকের অভক্ষ্য বস্তুর পিণ্ডদানের ফলে, জন্মের ক্রমোন্নতিতে ত্রিযোনি উত্তীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইহা কি সামান্য কামনার কথা। যথা—

সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু-মৃগঃ কালাঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃসরসি মানসে॥
তেঽভিজাতা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যো হ্যবসীদতঃ॥

অপুত্রক ও অপঘাতাদি মৃত্যুহেতু অসদ্গতিকের পিণ্ডদান অগ্রে কর্ত্তব্য। সে মন্ত্রটী সকলের জানা থাকিলেও আর্য্যজাতির মনের ঔদার্য্য প্রদর্শন জন্য লিখিত হইল।

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যে প্যদগ্ধা কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তাযান্তি পরাং গতিং॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু নৈবান্নসিদ্ধির্নতথা
নমস্তি তৎতৃপ্তয়ে হন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রয়ান্তু
লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥ শ্রাদ্ধপদ্ধতি।

স্বকীয়পিত্রাদির তর্পণেও এইরূপ দেখা যায়

যথা—দেবাযক্ষাস্তথানাগেত্যাদি,

ভীষ্মশান্তনবো বীরেত্যাদি, যে হ্বান্ধবা বান্ধবাবেত্যাদি আব্রহ্ম ভুবনেত্যাদি। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তেত্যাদি' যে চাস্মকং কুলেত্যাদি মন্দদ্বারা অগতিকের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করা হয়।

পিণ্ডদানান্তে দক্ষিণা বাক্যের পরই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ এই মন্ত্রটীও অনেকেরই জানা আছে তথাপি আস্তিকা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির স্মরণার্থ লিখিত হইল। যথা—

যাঞা ওঁ আশিষো মোদীয়তাং।
প্রত্যুক্তরং ওঁ আশিষঃ প্রতি গৃহ্যতাং।

ওঁ দাতারোনো বিবৰ্দ্ধন্তাং বেদা সন্ততি রেবচ। শ্রদ্ধাচ নোমা ব্যাগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোহ্ স্তিতি।

অন্নঞ্চ নো বহুভাব দতিথিঞ্চ লভে মহি।
যাচি তারশ্চ নঃ সন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন॥

অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু।
যস্মৈ সঙ্কল্পিতো দ্বিজস্তস্যাক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু।
এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু পিতৃবর প্রসাদোঽস্তু॥

শ্রাদ্ধ সময়ে পূর্ব্বকালে শ্রাদ্ধের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পূজার ও পিণ্ডদান জন্য ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হইত। এক্ষণে সদ্‌ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। তন্নিবন্ধন মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বে কুশময় ব্রাহ্মণের কল্পনা স্থাপন করা হয়।

আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পর দেব, ঋষি, ও পিত্রাদি গুরুজনের প্রতি সভক্তিক প্রণাম।

শান্তি মন্ত্র মধ্যে উদার চরিতের পক্ষে জগতের মঙ্গল কামনা যে স্বতঃ সিদ্ধ তাহারও প্রমাণ দেখান যাইতেছে। যথা—

ওঁ দ্যৌ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ। ইত্যাদি।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে পত্র।

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর।)

৩য় পত্র।

পত্নীর পত্র পাঠে, পত্নীর প্রতি সুরেন্দ্রনাথের উত্তর।

স্নেহের স্বর্ণ,

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীমতী অনুপমার কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহা পড়িলাম,—পড়িয়া আর কি করিব, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে কাঁদিলাম। আমাদের এই বর্ত্তমান সমাজে, কি ধর্ম্ম আর কি অধর্ম্ম—দীর্ঘকালেও তাহা বুঝিতে পারিলাম না, জীবনে কখন বুঝিতে পারিব কিনা—জানি না। যাহা হউক, তুমি আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছ, যাহাতে তাহার সুমীমাংসা হয় প্রাণপণে তাহারই যত্ন ও চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ ও ব্যবহার

দেখিয়া তাঁহাদের উপর আমার কিছুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস নাই। সুতরাং চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া, তোমার প্রশ্নের মীমাংসার ভার কোন বামুন পণ্ডিতের উপর না দিয়া, আমার জনৈক শৈশব সুহৃদের উপর দিয়া, অদ্যই তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তাঁহার পত্র পাইলে পর, যাহা করিতে হয় করিব এবং পুনরায় তোমাকে লিখিব। অদ্য এই পর্য্যন্ত—আমি ভাল আছি। ইতি

তোমার হতভাগ্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৪র্থ পত্র।

সুরেন্দ্রনাথের পত্র—(আমার প্রতি।)

দিনাজপুর, কালিতলা।
৩০শে বৈশাখ, ১৩১০।

প্রিয়তমেষু!

ক'দিন তোমার পত্র পাই নাই। এবার তোমার উপর একটা গুরুতর কার্য্যের ভার দিতেছি। তুমি সাধারণের চক্ষে পণ্ডিত না হইলেও, আমার নিকট তুমি সুশিক্ষিত এবং চরিত্রবান্; সুতরাং আধুনিক কুক্রিয়াশালী উপাধিধারী পণ্ডিতদের উপর এ কার্য্যের ভার না দিয়া, তোমার উপরই দিলাম। আমার পূর্ব্ব পত্রে তুমি শুনিয়াছ যে, আমাদের চিরদিনকার সুখের সংসার, এক্ষণে শ্মশান হইয়াছে—শ্রীমতী অনুপমার বৈধব্য দশা ভাবিয়া, এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া আছি। তারপর, গত কল্য আমার পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভার একখানি পত্র পাইয়াছি। স্বর্ণ লিখিয়াছে যে, শ্রীমতী অনুপমা একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। তাহাই এখন আমাদের শাস্ত্র ও সমাজ মানিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য—আমার মত চাহিয়াছেন। দেশের আধুনিক পণ্ডিতের উপরই আমার বড় একটা শ্রদ্ধা নাই। কেন যে শ্রদ্ধা নাই, তাহাও কি আবার তোমাকে লিখিতে হইবে? যদি চারিদিক না জান, তাহাই আমার পত্নীর পত্রখানি তোমার পাঠের জন্য এই সঙ্গে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। আমাদের গ্রামের বড় পণ্ডিত—বড উচ্চদরের (?) স্মার্ত্ত কৃষ্ণকমল বিদ্যাভূষণ ও তাহার পুত্র নীলাম্বর বিদ্যালঙ্কার—উভয়ে বড় পণ্ডিত হইলেও কুৎসিত চরিত্রের লোক এবং সমাজে সতত ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন এবং নিজেরাও সতত কুকার্য্যে লিপ্ত। ইঁহাদের এবং আর আর সকলের এইরূপ ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে

আশঙ্কা হয় বুঝি বা আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই এইরূপ নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক।

এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—আমার পত্নীর পত্রানুসারে এদেশের বিধবারা একাদশীতে যদি নিরম্বু উপবাস করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত হয়; তবে দেশ কাল পাত্রভেদে ফলমূল গ্রহণ করিয়া একাদশীর উপবাস ব্রত পালন করা যায় কিনা, এবং পালন করিলে তাহাতে কোন পাপ আছে কিনা, এবিষয়ে তোমার মতামত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তোমাকেই লিখিলাম আর শুধু যে আজ আমার প্রাণাধিকা অনুপমাই বিধবা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে এই তর্ক উঠীয়াছে, তাহা নহে। আমাদের দেশে ও সমাজে বর্ত্তমান-কালে আমার ন্যায় এমন অনেক হতভাগা আছে, যাঁহাদের গৃহে বিধবা ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ, বিধবা পুত্রবধূ বা কন্যা, বিধবা মা মাসী পিসী,—আছেন; কিন্তু, কৈ স্বার্থান্ধ পুরুষ আমরা—আমরা একবারতো সেদিকে,—এই চিরহত-ভাগিনী বিধবাদের মলিন মুখের পানে, একবারের জন্যও তো দৃষ্টিপাত করি-না। মনে হয়, আজি যদি আমার বড় স্নেহের অনুপমার এদশা না ঘটিত, তবে নিতান্ত স্বার্থদাস আমি,—আমিও এবিষয়ে আলোচনা করিতে কখনই অগ্রসর হইতামনা। যাহাহউক, এখন যাহা করিলে আমার পক্ষে ভালহয়—আমাদের সমাজে এই হতভাগিনী বিধবাদের কষ্টের কতকটা লাঘব হয়, তুমি তাহাই করিয়া আমার হৃদয় বেদনা দুর করিতে যত্ন করিও। কিন্তু, ভাই মনে রাখিও, শুধু আমার মনস্তুষ্টির আশায় যাহা তাহা না বলিয়া, আমার পক্ষে যাহা প্রকৃত ন্যায়ানুমোদিত হয়, তদুপদেশ দানে আমাকে সুখী করিও। আর একটা কথা, তুমি নিজে যথাসাধ্য সাহিত্যানুশীলনে রত, তুমি বাজে উপ-ন্যাস ও গল্প লেখা ছাড়িয়া দিয়া এইবিষয়ের একটা উৎকৃষ্ট আলোচনা করিতে পার না কি? করিলে, দেশের চিরহতভাগিনী বিধবাদের বড় একটা মহৎ উপকার হয় এবং নিজেও চিরস্মরণীয় হইতে পার,— কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিও। যাহা ভাল বুঝ—করিও, এবং যত সত্বর পার আমার পত্রের উত্তরদানে সুখী করিও। ইতি

তোমারই চিরহতভাগ্য—

(স্বাক্ষর) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

৫ম পত্র।

সুরেন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে মৎকর্ত্তৃক লিখিত :—

বেল ঘরিয়া (চক পাড়া) পাটুল P. O.

নাটোর (রাজসাহী।)

২৪ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০।

ভাই সুরেন! তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি আমাকে যে কার্য্যের ভার দিয়াছ, অনেক দিন হইতেই আমি এবিষয়ে শাস্ত্রানুমোদিত তথা দেশ কালোচিত একটা বিস্তৃত আলোচনা করিব মনে করিতেছিলাম; কিন্তু নিজের মানসিক ঘোর অশান্তি ও কঠোর অর্থচিন্তা এই সবে এবং এই হতভাগ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও লোকচরিত্র দর্শন করিয়া, এ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই। তবে আশা আছে যে, তোমাদের মত দুই দশ জন অকৃত্রিম সুহৃদের উৎসাহ পাইলে, হয়ত দুদিন অগ্র পশ্চাৎ এবিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিতে সমর্থ হইব। আমাদের দেশের লোক প্রকৃত পক্ষেই যে ঘোর স্বার্থান্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা শুধু নিজ নিজ সুখ ও বিলাস বাসনা লইয়াই ব্যস্ত—পরের ভাবনা ভাবিতে কেহই প্রস্তুত নহি। এ সংসারে এমন গৃহ নাই, যে গৃহে দুই একটী হতভাগিনী বিধবা রমণী না আছেন? হয়তঃ কাহারো বৃদ্ধা মা, খুড়ি মা, কাহারো গৃহে বালিকা কন্যা ও পুত্রবধূ; অন্যের গৃহে যুবতী ভগিনী বা ভ্রাতৃবধূ আছেন এবং সতত অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; কিন্তু কৈ সে দিকেতো একবারও আমরা দৃক-পাত করি না; করা আবশ্যক জ্ঞান করি না; কেবল আপন আপন স্ত্রীপুত্রের সুখান্বেষণে সতত ব্যস্ত এবং কি করিলে তাহাদের বিলাস বাসনা ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয়, তাহারই গভীর চিন্তায় সতত মগ্ন। তারপর, আর একটা মহৎ দোষ দিন দিন খুব প্রবল বেগে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে—ব্যভিচারিতা। তোমার কথাই ঠিক, এখন আমাদের সমাজে যাঁহারা ধনবান তাঁহারা অর্থের অপার মহিমা বলে সকল প্রকার কুক্রিয়া দিবা রাত্রি করিয়াও সমাজের স্থান অধিকার করিয়া আছেন, আর যাহারা আমাদেরই মত দরিদ্র তাহারা যদি কোন বিশেষ কারণবশতঃ অখাদ্য (নিষিদ্ধ মাংসাদি) ভোজন করিতে বাধ্য হন, তবে সমাজে তাঁহাদের দুরবস্থার শেষ নাই।

এখন আমাদের সমাজের এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, অর্থ থাকিলে সকল পাপই পূণ্য হইয়া দাঁড়ায়; আর অর্থ না থাকিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। শৈশব হইতে যাঁহাদিগকে দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল মনে করিয়া আসিতেছিলাম, এ অধঃপতিত দেশের একমাত্র আশাস্থল সেই সব যুবকেরাই এখন শিক্ষিত হইয়া আমাদের অদৃষ্ট দোষে দিন দিন আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া এহেন নিন্দিত ও কলুষিত সমাজ শাসন স্রোতে আপন আপন গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত যে, আমাদের এই ধর্ম্মশাস্ত্র পরিবর্ত্তনশীল কিনা? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-ব্যবস্থা ছিল, কি সকল যুগেই এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল,—যদি তাহা নাহয়, অর্থাৎ সত্যযুগের যে শাস্ত্রব্যবস্থা ত্রেতায় যদি তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপালিত না হইয়া থাকে অথবা ত্রেতার যে শাস্ত্র তাহাও যদি দ্বাপরে সম্যক্ প্রতিপালিত না হইয়া কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে কলিযুগে সে নিয়ম না খাটিবে কেন? কিন্তু, বেশ স্থির ও সংযতভাবে শাস্ত্রালোচনা করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইযুগত্রয়ে কেহ কখন একই শাস্ত্রের অধীন ছিলনা,—অসম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক যে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর আমাদের সেই সব প্রাচীন ঋষিরা এমন কোন কথা কোথায় বলিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়না যে, চিরদিন একই শাস্ত্রের অধীন হইয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে? আমাদের দেশের অবস্থা, লোকের শারীরিক ও মানসিক শক্তি দেখিয়া প্রাচীন ঋষিরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে যে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে,—কলিযুগে, যখন নানা কারণে বিশেষতঃ জল বায়ু প্রভৃতির সম্যক পরিবর্ত্তনে দিন দিন লোকে স্বাস্থ্যহীন এবং দুর্ব্বলপ্রকৃতি হইতেছে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহা অবশ্যম্ভাবিফল, তখন এখনকার এই দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক কেমন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়ের অনুশাসন মানিয়া চলিতে পারে,—স্থিরচিত্তে একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলেই চলিতে পারে। তার পর আর একটা কথা— শাস্ত্রটা কি? বর্ত্তমানকালে যে ভাবে আমরা Law এই শব্দের অর্থ বুঝ শাস্ত্রও সেই সামাজিক Law ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ইহা

স্থির নিশ্চয়। সমাজে সুশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যক। এবং আমার যতদুর বিশ্বাস, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন মানসেই আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহারা আপন আপন শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সমকালিন দেশের অবস্থা, জল বায়ু, লোকের শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহারা একার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং সেকালের অবস্থানুযায়ী বিধিব্যবস্থা সকলটাই যে একালে চালাইতে হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। সত্যযুগের শাস্ত্রমতে যাহা সে করণীয় কার্য্য, ত্রেতায় তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবার ত্রেতায় যাহা করণীয় কার্য্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল দ্বাপরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—ইহা স্থির নিশ্চয় এবং আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রালোচনা করিলেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগত্রয়ের বিধিব্যবস্থা কেন না বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কতকটা পরিবর্ত্তনযোগ্য? প্রত্যেক পরবর্ত্তি যুগেই যদি পূর্ব্ববর্ত্তি যুগের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; তখন এ যুগে কেন যে তাহা না হইবে, আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। আমাদের শাস্ত্রই যখন পরিবর্ত্তনশীল দেখা যাইতেছে, তখন বর্ত্তমান কালে হিন্দু বিধবার একাদশীর উপবাসের কতকটা পরিবর্ত্তন করিলে কোনই পাপ নাই—ইহাই আমার মত।

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যখন একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সমকালিন দেশের জল বায়ু প্রভৃতি এবং মনুষ্যের শক্তির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়াই একার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, এখন সেদিন আর নাই, দিন দিন প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জন্য দেশের জল বায়ু যতই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে, লোকের মানসিক ও শারীরিক শক্তিও দিন দিন তেমনই কমিতেছে; সুতরাং আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের যে কতকটা সংস্কার করা কর্ত্তব্য, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। আর আমাদের এই দেশে বর্ত্তমান কালে কোন্ কার্য্যইবা শাস্ত্রানুমোদিত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে যে, হিন্দুবিধবার একাদশীর উপবাসের কতকটা সংস্কার করিলেই ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করা হইবে? আমাদের সমাজে বর্ত্তমানকালে দিন দিন অহরহঃ যে প্রবল পাপ স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত

হইতেছে, তাহাতে শুধু হিন্দু বিধবারা যদি একাদশীতে নিয়মত উপবাস না করেন তবে তাহাতেই বা দোষ কি? তুমি যে কাত্যায়নী অথবা বিদ্যালঙ্কারের কথা বলিয়াছ—এমন কাত্যায়নী বা এমন বিদ্যালঙ্কারের অভাব আমাদের দেশে নাই, বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত আছে। আমি সময়ে সময়ে ভাবি যে আমাদের এ অধঃপতন কেন, আবার পরক্ষণেই মনে হয় যে, আমরা ভারতের ব্রাহ্মণেরাই আমাদের অধঃপতনের একমাত্র মূলকারণ। চারিবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বাসের সময় কলিকাতাবাসী জনৈক প্রকৃত ধর্ম্মশীল কায়স্থ সুহৃদের সহিত আমার তর্ক হয়, "হিন্দুর অধঃপতন সম্বন্ধে"। তখন, আমি আমার নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য সেই কায়স্থ সুহৃদের সহিত অনেক বাক্ যুদ্ধ করিয়া ছিলাম; কিন্তু জয়লাভ পারিয়াছিলাম না। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে,—"হিন্দুর অধঃ পতনের একমাত্র মূল কারণ ব্রাহ্মণ। ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণেরা যেদিন স্বেচ্ছায় আপনাদের জগৎ পূজ্য পবিত্র দেবচরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপিয়াছিলেন, সেইদিন সেই অতীব অশুভদিন হইতেই ব্রাহ্মণের এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর অধঃ পতন ঘটিয়াছে। সমাজে এখন যতপ্রকার পাপ ও দুষ্কার্য্য চলিতেছে ও ভবিষ্যতে চলিবে একমাত্র নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণেরাই সেই সমুদয় দুষ্কার্য্য ও পাপ সমূহের প্রথম ও প্রধান পথ প্রদর্শক। অগ্রে ব্রাহ্মণেরাই এইসব দুষ্কার্য্য সাধনকরিয়াছেন, তারপর ব্রাহ্মণের দেখাদেখি আমরা ভারতের আর আর জাতিরাও এইপথে পদার্পণ করিয়াছি।" আমার সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদের বাক্য যে খাঁটি সত্য একথা তখন বুঝিতে না পারিলেও এখন এই কয়েক বৎসরে ভাবিবার ও চিন্তিবার পর তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে হিন্দুর অধঃপতনের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণের অধঃপতন আর এই অধঃ পতন প্রকৃতই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাকৃত যখন সকল রকম পাপেই আমরা রত হইয়াছি, যখন, এখন আমরা পাপকে পাপ বলিয়া মনে করি না, তখন হিন্দু বিধবার বেলায় এ কঠোর বিধি কেন চালাইতে যাই বুঝিতে পারি না। একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে আমি বেশ জানি যে, শাস্ত্রে হিন্দু মাত্রকেই এই উপবাস করিতে হইবে,—কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বিধবা কি সধবা, সকলকেই এই উপবাস করিতে হইবে এবং না করিলে যথেষ্ট পাপ আছে কিন্তু কৈ, আমাদের দেশে আজকাল কয়জন ব্রাহ্মণে এই উপবাস করিয়া থাকেন? শাস্ত্রে একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও

বিধবার একই প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আমরা স্বার্থপর কুটিল ব্রাহ্মণ আমরা সে শাস্ত্র বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া একাদশীর দিন মনের সুখে ষোড়শোপচারে আহার করিয়া থাকি; আর আমাদেরই পরম স্নেহের ও পরম প্রীতির পাত্রী সংসারে যাঁহাদিগকে একমাত্র আপনার বলিয়া মনে করি, সেই সব চির হতভাগিনী বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূ, বিধবা ভগিনী ভ্রাতৃবধূ—তাঁহাদের একাদশীতে এই কঠোর উপবাস প্রচণ্ড নৈদাঘকালিন একাদশীতে তৃষ্ণায় এক বিন্দু জলের জন্য যন্ত্রণায় ছট ফট্ করিতে দেখিলেও, বন্যপশু আমরা, আমাদের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? সংসারে আজকাল সকলের গৃহেই বালিকা বিধবার অভাব নাই, অথচ সেদিকে আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই; যদি বা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি অভাগিনীদের দুর্দ্দশা ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেখিয়া কোন সংস্কার করিতে অগ্রসর হন, অমনি পিশাচ আমরা—আমরা তাহার যথেষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি। যাহা হউক আক্ষেপ করিয়া কি করিব? যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, ততদিন এ অসহ্য নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, চিরহতভাগিনী বিধবাদের এ কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতেই হইবে। সংসারের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধঃপতন—তাঁহারা সতত কুক্রিয়াগত; সুতরাং সমাজ সংস্কার করিতে হইলে এখন আমাদেরই অগ্রসর হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা শুধু নিজে নিজে স্ত্রী পুত্রের সুখান্বেষণে সতত ব্যস্ত, অনাথিনী বিধবাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিবার সময় ও ইচ্ছা আদৌ আমাদের নাই।

যাহা হউক, এখন বাজে কথা রাখিয়া কাজের কথা বলি। তোমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর মতন ব্যভিচারিণী হইয়া একাদশীর উপবাস করা অপেক্ষা, আপনার সতীত্ব ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি একাদশীর উপবাস না করিয়া জীবন কাটান যায়, আমার মতে তাহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই, বরং অনন্ত পুণ্য আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম উপবাসের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে, ধর্ম্ম আপনার মনে। যদি মন শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারি, হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ প্রভৃতির উচ্ছেদ করিয়া হৃদয়ে পুণ্যের পবিত্রচ্ছটা বিকাশিত করিতে পারি, তাহা হইলে, একাদশী বা অন্য যে কোন কিছুতে উপবাস না করিলেও যে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করি না। আসল কথা, আপনার চরিত্র

ও মন, এ যদি বিশুদ্ধ হয় তবে জীবন ধন্য ও পবিত্র হইবে। যেদিন হইতে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ এই মহৎ শিক্ষা চিরদিনের তরে কর্ম্মনাশার অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া রাখিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আমাদের—এই হিন্দুদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে ইহা স্থির নিশ্চয়। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ অতঃপর এইমাত্র বলিলেই হইবে যে, ধ ন আমাদের সমাজে বর্ত্তমানকালে প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া কোন বন্ধনই নাই, তখন হতভাগিনী বিধবাদের বেলায় এই কঠোর উপবাস শৃঙ্খল একটু শ্লথ করিলে যে কি ক্ষতি হয় বুঝিতে পারি না। তোমার গুণবতী-স্ত্রী যাহা যাহা লিখিয়াছেন, সবই সত্য এবং মনে হয় আমাদের এই দুঃখ দারিদ্র্য জরা মৃত্যু পরিপূর্ণ সংসারে সকল স্ত্রী পুরুষই যদি তোমার পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণের ন্যায় সহৃদয়া হইতেন, তাহা হইলে আমাদের অধঃপতিত এই সমাজে এত অশান্তি এত অমঙ্গলের ঝঞ্ঝা বহিত না। আমার আত্মীয় স্বজন মধ্যেও বিধবা আছেন, তাঁহারা শত কষ্ট ও শত অসহ্য যাতনা ভোগ করিলেও, আপন আপন অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একাদশাতে কঠোর নিরম্বু উপবাস করিয়া আসিতেছেন। মুখে শতবার শতছলে বলেন "আর উপবাস করিতে পারি না", অথচ পারি না বলিলেও, নিরম্বু উপবাসে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপবাস করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ কোন ফল হইয়া থাকে, আমি এমত বিশ্বাস করি না। কেননা ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় পালন না করিয়া কেবল দায়ে পড়িয়া উপবাস করিতেছি মনে করিয়া যে উপবাস করা হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাতে অতি অল্পই ফল লাভ হইয়া থাকে। আমি আমাদের আত্মীয় স্বজনস্থিত। বিধবাদের মধ্যে, একাদশী তিথি আসিবার তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতেই, আবার উপবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া, গভীর আক্ষেপ করিয়া আসিতে শুনিয়াছি। কি অন্ধ বিশ্বাস? পাছে দেশে ও সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইতে হয় এই মনে করিয়াই তাঁহারা সতত ম্রিয়-মান, এবং লোকের সেই নিন্দা ও গ্লানির ভয়েই প্রাণপণ করিয়া এই কঠোর উপবাস করিয়া আসিতেছেন। আমি আমার আত্মীয় স্বজনস্থ বিধবার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, প্রায় পনের আনা বিধবার সম্বন্ধেই যে আমার এই ব্যক্তব্য খাটে সে বিষয়ে আবার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আর এইমত বিধবাদের মর্ম্মকাতরা দেখিয়া মনে হয়, যে, সমাজের

সকলেই যদি একজোট হইয়া এই নিয়মের কতকটা ব্যতিক্রম করেন, তাহাহইলে তাঁহারাও যে ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া একাদশীর এই কঠোর উপবাসের দায় হইতে অনেকট রক্ষা পান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, আমাদের সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহারা আমাদের দেশের ও সমাজের নেতা, সেই সব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী আপন আপন জেদ্ বজায় রাখিতে সতত ব্যস্ত এবং নিজে হয়তঃ শ্মশান-দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিপত্নীক হইলে পুনরায় সংসার জ্ঞানশূন্যা বালিকার সর্ব্বনাশসাধনমানসে বৃদ্ধবয়সে দারপরিগ্রহ করিতে ব্যস্ত. অথচ এই কুলাঙ্গারদের বালিকা বিধবা পুত্রবধূ বা কন্যা, ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ নিদাঘকালীন কঠোর একাদশীতে তুচ্ছ এক বিন্দু জলেরজন্য ছট্‌ফট্ করিলেও, এবম্বিধ পিশাচদের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে স্নেহের একটুমাত্র স্নিগ্ধহিল্লোল প্রবাহিত হয় না,—হইবার কিছুমাত্র আশা নাই। সমাজের এই দুর্দ্দশা ও অভাগিনী বিধবাদের প্রতি এই অমানুষিক নির্য্যাতন দেখিয়া আমি পূর্ব্বাহ্নেই আমার পত্নী শ্রীমতী নিভাননী দেবীকে বলিয়া রাখিয়াছি যে, যদি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তিনি যেন বৃথা কুহকে মুগ্ধ হইয়া এই কঠোর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন; বরং আমার অভাবে যাহাতে আপনার চরিত্র পবিত্র রাখিয়া আমার ও তাঁহার—উভয়ের দুইকুল পবিত্র করিয়া যাইতে পাবেন, সেই দিকে যেন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন,—তাহাতে একাদশীতে বা অন্যকোন পালপার্ব্বণে নিরম্বু উপবাস করুন বা না করুন,—ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং আমি প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছি যে, তিনি যেন আমারই ন্যায় একাদশীতে ফলমূল গ্রহণ করিয়া একাদশীর ব্রতরক্ষা করেন, তাহাতে কোন পাপ বা নরকের ভয় নাই।

আমার এ কথায়, হয়তঃ দেশের অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলী আপন আপন নাশিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন যে, বিধবা উপবাসাদিতে অশক্ত হইয়া মরিলেই বা কি ক্ষতি আছে? এ কথার উত্তরে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, হিন্দু বিধবার পক্ষে, বিধবার ক্লেশকর জীবনের কোন মূল্য না থাকিলেও, আমাদের পক্ষে, হিন্দু সমাজের পক্ষে বিধবার জীবনের মূল্য খুবই যে বেশি—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর বিধবার পক্ষে বিধবার জীবন যদি বৃথা হয়—ইহাই মনে করি, তবে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের যোগী ঋষিদের জীবনও যে বৃথা,—ইহাই

বলিতে হয়। আমাদের এই অধঃপতিত দেশে, আজিও যে ঘরে ঘরে স্বার্থত্যাগের অমন উজ্জ্বল ও পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই; আজিও যে আমাদের গৃহে গৃহে কতকটা ধর্ম্ম আছে, কতকটা নীতি ও চরিত্রের আদর্শ আছে, আজিও যে আমরা সাধারণের নিকট হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, তাহার প্রধানতম কারণ আমাদের এই হিন্দু বিধবারা। আমাদের সমাজ দিন দিন স্বার্থপরতা, কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া আজিও যে আছে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ হিন্দু বিধবা; আজিও যে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে ধর্ম্মচর্য্যা, রোগচর্য্যা প্রভৃতি হইতেছে, দীনদরিদ্র প্রভৃতি মুষ্টিমেয় অন্ন বা ভিক্ষা পাইতেছে, তাহারও একমাত্র কারণ আমাদের এই হিন্দু বিধবা। সুতরাং বিধবার নিকট বিধবার কষ্টকর জীবনের কোন মূল্য না থাকিলেও, আমাদের সমাজের পক্ষে বিধবার জীবন তুচ্ছ নহে, বরং প্রভূত মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। সুতরাং, এ হেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী সরলতা ও পবিত্রতার আধার এই চির হতভাগিনী বিধবাদিগকে হেয় জ্ঞান না করিয়া, অধিকতর ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখাই আমাদের কর্ত্তব্য।

পত্র ক্রমেই বড় হইতেছে। যাহা হউক, এখন সংক্ষেপে দুইটী কথা বলিয়া পত্র শেষ করিব। প্রথম কথা, একাদশীতে নিরম্বু উপবাসের পরিবর্ত্তে ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া ব্রত পালন করিতে কোনই পাপ নাই,—ইহাই আমার মত। যখন নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, তখন সমাজের বা দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই; দিন দিনই দেশের লোক নানা কারণে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইতেছে, সুতরাং প্রাচীন কালের নিয়ম প্রতিপালন করা কঠিন, এজন্য পূর্ব্ব ব্যবস্থার সংস্কার করায় কোনই পাপ নাই। তাহার পর, দেশে এমন অনেক গুরুতর বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক সমাজের অবস্থা দেখিলেই প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও শাস্ত্রমতে একাদশীর উপবাস করিতে বাধ্য হইলেও, আত্মসেচ্ছাচারিতায় তাহা করেন না, বরং উপবাসের পরিবর্ত্তে ষোড়শোপচারে আপন আপন উদর পূরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে যদি এ দেশের ব্রাহ্মণদের কোন পাপ না হয়, তবে হতভাগিনী হিন্দু বিধবারা নিরম্বু উপবাসে অশক্ত হইয়া একাদশীর দিন ফলমূল গ্রহণ করিলে কেন যে তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী অথবা সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবেন,—ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে যে ভাবে একাদশীর উপবাস

চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে উপবাসে যে কোন পুণ্য লাভ বা ফল পাওয়া যায় এমন বিশ্বাস আমার নাই। কেননা, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা বলিয়াছেন যে,—"একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবে না, কেননা, ঐ তিথিতে ব্রহ্মহত্যাদি কতিপয় গুরুতর পাপ অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এজন্য একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর মহাপাপ অন্নগ্রহীতাকে আসিয়া বর্ত্তে।" সুতরাং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে হইলে, যে সময়টা প্রকৃত একাদশী, সেই সময়টার মধ্যেই অন্নাদি আহার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে, মন্বাদির মস্তকে আমরা পদাঘাত করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পদানত হইয়া, অনেক সময়ে পূর্ণ একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিয়া, দ্বাদশীতে অনর্থক উপবাস করিয়া থাকি—ইহাতে একাদশীর উপবাস যে কিসে সিদ্ধ হয়, ঈশ্বর জানেন। কলিকাতা থাকা সময়ে, আমার মনে হয়, একদিন হিতবাদী কার্য্যালয়ে, এই একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীযুত সখারাম গণেশদেউস্কর মহাশয়ের সহিত এবিষয়ে আমার কথোপকথন হয়। তাহাতে দে-উস্কর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "আজিও তাঁহাদের দেশে মন্বাদি ঋষি প্রণীত শাস্ত্রানুসারে একাদশীর ব্রত পালন হইয়া আসিতেছে, অর্থাৎ যতক্ষণ একাদশীতিথি ততক্ষণই মহারাষ্ট্রবাসীরা অন্নগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া অন্নগ্রহণ করেন না,—একাদশী ছাড়িয়া গেলে অন্নাহার করিতে কোনই আপত্তি নাই। তারপর, সেদেশে একাদশীর দিন অন্নের পরিবর্ত্তে অনেক বিধবারাই ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন পাপ হয় বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং আমাদের দেশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থাপিত এই একাদশীর দিনে ফলমূল গ্রহণ করিয়া একাদশীর ব্রত পালনে যে কি দোষ হয়, সহৃদয় পাঠক! তাহার বিচার করিবেন। অনেকে হয়ত, বলিবেন. বহুদিন হইতে এদেশের রঘুনন্দনের মতানুসারে আমরা চলিয়া আসিতেছি; তুচ্ছ বিধবার আত্মসুখজন্য সে উপদেশ প্রতিপালন করিতে বিরত হইবে কেন, —উত্তম কথা। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমানকালে আমরা কি রঘুনন্দনের সকল উপদেশানুসারে চলিয়া থাকি; যদি না থাকি, তবে এই চিরহতভাগিনী বিধবাদের বেলায় কেন এ শৃঙ্খল গাবদ্ধ করিয়া রাখিব, ইহাই আমাদের মনুষ্যত্ব, না বিবেকানুমোদিত উপযুক্ত কার্য্য? যে, আমাদের দেশের স্বার্থান্ধ পণ্ডিতেরা আপন আপন জেদ্ বজায় রাখিবার জন্য এ

শৃঙ্খল একটু অল্প পরিমাণে শ্লথ না করিলেন, আইস আমরাই কেন শৃঙ্খল কতকটা শ্লথ করিয়া দিইনা? যখন দেখিতেছি যে, দিবারাত্রি আমরা যেসব গুরুতর পাপ কার্য্য করিতেছি, তাহার তুলনায় একার্য্য করলে বিশেষ কোন ধর্ম্মহানি নাই, অথচ চিরহতভাগিনী বঙ্গের বিধবাদের জীবনের কষ্ট কতকাংশে লাঘব হয়; তখন তাহা নাকরিয়া, কেন হতভাগিনীদিগকে এই অসহ্য যাতনা ভোগ করাই? নৈদাঘকালীন একাদশীর উপবাস করা যে কি কঠোর একমাত্র ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? যদি বুঝিত, তবে এপাপ প্রথা অনেক দিনই এদেশ হইতে উঠিয়া যাইত। এখন, আইস আমরা আমাদের চিরহতভাগিনী বিধবাকন্যা ও পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ ও ভগিনী, বিধবা বৃদ্ধা মা ও খুড়মা প্রভৃতির একাদশীতে নিরম্বু উপবাসজনিত বিষাদ-মলিনমুখ মনে করিয়া, এই সংস্কার সাধন করি, ইহাতে আমার মতে কোন পাপ নাই, বরং অক্ষয় অনন্তপুণ্য আছে,—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতি

দীনহীন
শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়—

মায়া।

নায়েব ও কুমুদিনী উভয়ই আশ্চর্য্য হইয়া এই গান শুনিল। শুনিতে শুনিতে সেই গীতি নৈশ বায়ুতে বিলীন হইয়া নিস্তব্ধ হইল। গানের শেষ চরণে "দেখ দেখ গুরুজন করিতে তোমা শাসন" ইত্যাদি কথায় নায়েব প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই তাহার পাশবরৃত্তি আবার উদ্দীপ্ত হই, ভয় থাকিল না। তখন নায়েব কুমুদিনীকে বলিল—"ঐ শুনিলে, গান? কৃষ্ণরাধার প্রেম—আমি কৃষ্ণ তুমি রাধা, তুমি আমাকে নির্ভয়ে ভজনা কর। প্রাণেশ্বরী—জীবনসার্থক কর" এই বলিয়া কুমুদিনীকে আলিঙ্গন করিতে গেল। কুমুদিনী, এইবার নটবরের হাত ছাড়াইয়া খাটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, নটবরের স্থুল উদরে সজোরে পদাঘাত করিল! নটবর পদাহত হইয়া, কৃষকবধূর পদশক্তি অনুভব করিল, "উঃ উঃ" করিয়া উঠিল। কিন্তু এবার সে পালঙ্কের উপর লাফাইয়া উঠিয়া কুমু-দিনীর চুলের মুঠি ধরিয়া বিষম জোরে টানিয়া কুমুদিনীকে খাটের উপর

ফেলিল। কুমুদিনী মর্ম্মভেদীস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হে ধর্ম্ম, তুমি কি আছ?"—দূর হইতে কে বলিল "হাঁ ধর্ম্ম আছে" কুমুদিনী পুনরপি—বলিল—"মা দুর্গা, মা কালী, তুমি কোথায়? সতীর সতীত্ব রক্ষা কর"। নিকটে কে বলিল "ভয় নাই" "ভয় নাই" "মা কালী তোমাকে রক্ষা করিবেন"। কুমুদিনী দেখিল, চারিজন গৈরিকবসনধারী পুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দুইজন অতি ত্বরায় নায়েবকে খট্টাঙ্গে বন্ধন করিল। তাহার পর একজন বৃদ্ধসন্ন্যাসী "মা, ভয় নাই" বলিয়া কুমুদিনীকে তুলিয়া সেই গৃহ হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইল। অপর তিন জন সন্ন্যাসী তাহারা সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এদিকে কাছারীবাটী পোড়াইয়া বিদ্রোহী কৃষকগণ "মার মার" শব্দে নায়েবের প্রেমকুঞ্জে আসিয়া পড়িল। তাহারা ঘরের ভিতর আসিয়া দেখিল নায়েব পালঙ্কপাদে দৃঢ়বদ্ধ, কিন্তু বন্ধনমুক্ত হইবার জন্য ঝাকাঝাকি করিতেছে কোন মতে বন্ধন খুলিতেছে না। সেখানে মোকারিম, যদু, ষড়ানন ও কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলিতেছে "মার মার", কেহ বলিতেছে "বাঁধন খোল", কেহ বলিতেছে "উহার মাথা ভাঙ্গ"। কেহ বলিতেছে মহেশের "পরিবার কোথায়"? কেহ বলিতেছে "চারিদিক খোজ"। কেহ ঘরে ঘরে খুজিতে লাগিল, কেহ প্রাঙ্গন, কেহ আম্রকানন খুজিতে লাগিল। এদিকে ভীম বাগদী "নায়েব মহাশয়, তোর সেলামী নে", বলিয়া গুড়ম গুড়ম করিয়া নটবরের গরিষ্ঠ পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল। কালীকৃষ্ণ বলিল "বাঁচিয়া থাক্, বাবা ভীম"। ইতিমধ্যে একজন কৃষক লাফাইতে লাফাইতে ঘরে আসিয়া "বেটা পাপে কত সুখ এখন দেখ্", এই বলিয়া নটবরকে লাঠি মারিতে লাগিল। নায়েব চীৎকার করিল "মলাম" আর একজন বলিল "মরিয়া যাইবে, মরিয়া যাইবে"। কৃষক বলিল "খুন করিব, খুন করিব—দিন পেয়েছি খুন করিব"—ইহার বিধবা ভগ্নীকে নায়েব হরণ করিয়াছিল। সে নটবরের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলিত করিল। মোকারিম লাঠি ধরিল। কিন্তু ঘরে, বাহিরে চতুর্দ্দিকে কেবল "মার মার" শব্দ কৃষকগণ মারিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িতেছে. মোকারিম যদু, ষড়ানন ও ভীম তাহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। নটবর বলিতেছে, "দোহাই তোমাদের, আমাকে খুন করিও না, ও মোকারিম ভাই, ও যদু, তোমাদের পায় পড়ি, আমাকে রক্ষা কর, তোমরা যা বলিবে আমি তাই করবো—বাবা মোকারিম, বাবা যদু, আমার বাপ—তোমরা আমাকে বাঁচাও,

চিরকাল তোমাদের গোলাম হয়ে থাক্‌ব"। মোকারিম বলিল "মহেশের জেনানা লোক কোথায়"?

নটবর—"সন্ন্যাসী লইয়া গিয়াছে। মোকারিম "কোথায়?"

নটবর "জানি না"।

মোকারিম বলিল—"বাঁধন খোল" তথন একজন কৃষক বাঁধন খুলিল। ভীম নটবরের হস্ত রজ্জুতে বাঁধিয়া বাহিরে লইয়া আসিল; সঙ্গে সমুদয় কৃষক বাহিরে আসিল।

যদু বলিল চল হারাধনের সৎকার করিতে হইবে। তথন সেই কৃষকগণ নায়েবকে বাঁধিয়া লইয়া সারি সারি শ্মশানাভিমুখে চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

শ্মশানে ইহার পূর্ব্বেই হারাধনের জ্ঞাতিগণ তাহার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। এবং হারাধনকে চিতারোহণ করাইয়াছিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাহার শিখার রক্তিম আভায় নিকটে নদীবক্ষ, দূরে অপর পারের আকাশ কেমন গাম্ভীর্য্যময় শোকময় হইল। কৃষকগণের মধ্যে অনেকে সেই চিতার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে কেহ বলিতেছিল, "হারাধন তুমি সাধু, তুমি কোথায় চলিয়া গেলে"। কেহ দুঃখ করিতেছিল—"হায়, মহেশ তুমি এখন কোথায়? অদ্য তুমি বাঁচিয়া থাকিতে হারাধনের মুখাগ্নি কে করিল"? যথন ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে, ও হারাধনের আত্মীয়গণ বিলাপ করিতেছে, তথন একথানি ক্ষুদ্র নৌকা শ্মশানের ঘাটের দিকে সন্ সন্ করিয়া আসিয়া পড়িল। তাহাতে একটী বালিকা শয়ন করিয়াছিল। নৌকা শ্মশানের ঘাটের নিকটে আসিলে বালিকা নৌকার উপর উঠিয়া বসিল। একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকাইয়া থাকিল। এমন সময় একজন কৃষক বলিল "হা! হারাধন তোমার মেয়েকে, তোমার বেটার বৌকে কার কাছে রেখে চলে গেলে"? বালিকা তাহা শুনিল—দাঁড়াইল—উচ্চৈঃস্বরে বলিল "বৌ, বৌ, নায়েব বাবাকে বুঝি মারিয়া ফেলেছে—বৌ, বৌ, ঐ বুঝি বাবাকে পোড়াচ্ছে—হা, ঠিক—ঠিক, আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে—বৌ—বাবার কাছে যাই—বাবার পাশে শুয়ে আমিও বাবার সঙ্গে

পুড়িয়া মরিব, এই কথা বলিয়া বালিকা সেই পদ্মাবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। পদ্মার অগাধ জলে তলাইয়া গেল। বলিতে হইবে না, এই বালিকা হারাধনের কন্যা, আমাদের সেই মায়া।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

Sir Walter Vivian all a summer's day
Gave his broad lawns until the set of sun
Up to the people: thither flocked at noon
His tenants, wife and child, and thither half
The neighbouring borough with their Institute
Of which he was the patron.

The Princess by Tennyson.

পাঠক, চলুন এখন আমরা প্রবোধ বাবুর মহৎহাটা পরগণার কাছারিতে যাই, সেখানকার পবিত্র বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করি।

অপরাহ্ন হইয়াছে। কাছারীবাটীর প্রাঙ্গন বিস্তীর্ণ। তাহার একপার্শ্বে দেবালয়, আর একধারে বড় বড় গোলা। একজন ভৃত্য একটী গোলাতে আরোহিণী লাগাইয়া ধান্য বাহির করিবার জন্য উঠিতেছে। কতকগুলি কৃষক তাহার নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতেছে। তাহার অনতিদূরে দুইজন কৃষক বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে একজন বক্তা, একজন শ্রোতা। শ্রোতা শুনিতেছে আর তামাক খাইতেছে। বক্তা বলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ও হাত নাড়িতেছে। বক্তা নরেশ বাবুর জমিদারির বিদ্রোহী প্রজা। নায়েব নটবর মহেশের বাপ হারাধনকে খুন করিয়াছে, মহেশের স্ত্রীকে বেইজ্জত করিয়াছে, বিদ্রোহী প্রজারা কাছারী বাটী লুটিয়াছে, ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে, নটবর ঘোষ নায়েব মহাশয়কে বাঁধিয়া বেধড়ক মারিতেছে, এবং তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছে—মহেশের বুন মায়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বিদ্রোহী প্রজারা অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী লুঠ করিয়াছে, কলিকাতা হইতে পল্টন আসিয়াছে, শীঘ্র তাহাদিগরের সহিত বিদ্রোহী প্রজাদিগের ভারি একটা লড়াই হইবে—ইত্যাদি নানা কথা বক্তা বেশ একটু রংচড়াইয়া বর্ণনা করিতেছে। বক্তার নাম মতিলাল। শ্রোতার নাম পীতাম্বর। পীতাম্বর বলিল—মুই আগে বলেলাম—'মহেশভায়া ? লেখাপড়া শিখেছিস

বটে, কিন্তু তোর ডবগা বয়স। মোদের চুল পেকেছে। মোরা অনেক দেখেছি। প্রজা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ কোরে কেবল জেরবার হয়, খানে খারাপ হয়। চল প্রবোধ বাবুর জমিদারিতে মোরা পালাই—তবে যান মান সম্ভম সব থাক্‌বে—ছোঁড়া কোনমতেই আমাদের কথা শুনিল না। এক্ষণ নিজে কয়েদ, বাপ খুন, বোন খুন, ইস্ত্রি বেইজ্জত।

মতিলাল। তার পরিবার নাকি এখানে পেলিয়ে এসেছে। এখানকার নায়েব মহাশয়ের পরিবারের কাছে আছে।

পীতাম্বর। এখানে কবে এলো?—কারসঙ্গে? আমি শুনেলাম যে নায়েবমশায় তাকে বেইজ্জত করারপরে সে আপ্‌ঘাতী হয়েছে।

মতি। আরে, না। সন্নাসীঠাকুররা তার ধর্ম্ম রক্ষা করেছে আর তাকে সাতে লিয়ে এখানে রেখেছে। এই নায়েব মশায়ের বাসায় নাকি রেখে গিয়েছে!

পীতাম্বর আহা! বৌটা কত দুখো পেলে। এখানে যদি সত্যিই এসে থাকে তবে আর কোন ভয় নাই। এ নায়েবমশায় যেমন ভাল, তার পরিবারও তেমনি। কলিকালে এমন লোক আর হয়না।

মতি। ভাল শুনেইত তার হিল্লে লিয়েছে। এখন কপাল। পেলিয়ে আসবার সময় গুরু লাঙ্গলত কিছুই আন্‌তে পারিনি, দাদা। কোন প্রকারে হিম সিম্ করে কটাজান লিয়ে এসেছে।

পীতাম্বর। গোলমাল হবার আগে মুই উঠে এসেছি, গরু খেদিয়ে এনেছি। তোকেও আসবার জন্য ত তখন কত বল্লেম তুই কিছুতেই বুঝলি নে।

মতি। আরে "দাদা মুইকি তখন বুঝতে পেরেলাম যে গোল হাঙ্গাম দিন দিনই এমনি বাড়্‌বে। মোর চৌদ্দ পুরুষ যে ভিটেতে কাটিয়ে গিয়েছে, চট্ করে করে কি তা ছাড়া যায় আর এত কারকিতের জমি, নিজের জমি, বাপ পিতামহের জমি, তাহা ছাড়তে কি কষ্টটা হল,—কি আর বলব, পেতোম-দাদা মুই এখন পথের কাঙ্গাল। মোর না আছে এখন গরু, না আছে লাঙ্গল, না আছে টাকা। উঠিছিত এক কুটুমবাড়ী। এখন উপায় কি?

পীতম। কোন ভাবনা নাই। আমাদের নায়েব মশায় খুব ভাল লোক। তাঁর কাছে সব উপায় হবে। জমি পাবি, বীজ পাবি, গরু লাঙ্গল পাবি, টাকা ধার পাবি।

মতি। সত্যি ?

পীতম। সত্যি নয় কি মিথ্যা ?

মতি।—এখন অনেক প্রজা পেলিয়ে আস্‌তে লেগেছে। আমার ভয় হচ্চে, নায়েব মশায় রাগে পেয়ে পাছে একদম খাজনার নিরিখ বাড়িয়ে ফেলে।

পীতাম্বর। তেমনি নায়েব নয় রে, তেমনি নায়েব নয়। চল্, নায়েব মশায়ের কাছে চল্।

মতি। নায়েব মশায়ের কাছে এবে যাই কেমন করে। টাকা মুছলম্ নেই। নজর দেব কি ? যখন নায়েব বলবে 'আমার সঙ্গে দেখা করিতে এসেছিস, বেটা, নজরের টাকা কই' ? মুই তখন বল্‌ব কি ?

পীতাম্বর। আরে বলছি কি ? এ তেমনি নায়েব নয়। 'নজর' লাগ্‌বে না।

মতি। পেতম দাদা, বলিস কি ? নজর লাগবে না ?

পীতাম্বর। আরে, হাবা, না, না। মতি। জমী লেব তার সেলামী ত দিতে হবে ?

পীতাম্বর। সেলামী কিস্তিবন্দী করে নেবে।

শ্রীমতি। ভাল। কিন্তু "আমলা খরচ"ত লাগবে ? তা না দিলে ত পাট্টা কবুলতি হবে না। আমলা খরচ ত আর কিস্তিবন্দী হবে না। আমলা মহাশয়রা আগে ভাগেই হাত পাতে।

পীতাম্বর। আরে এ জমিদারীতে "আমলা খরচ" দিতে হয় না। নায়েব মশায় বন্দবস্তের সময় নিজেও "উপরি" কিছু লন না। অন্যেরও নেবার হুকুম নাই।

মতি। পেতম দাদা বলিস্ কি ? তুই কি মোর কষ্টির সময় ফষ্টী নষ্টি কচ্ছিস্ ?

পীতাম্বর। ফষ্টি নষ্টি নয়রে, সত্যি। মতি। উঁ হুঁ। মোর প্রত্যয় হল না।

পীতাম্বর। আরে মতে, পেত্যয় না হয়, তুই কাছারী এসেছিস। আমার সঙ্গে নায়েব মশায়ের কাছে আয়। আমি যা বলছি সত্য, কি মিথ্যা, এখনি দেখবি।

মতি। আচ্ছা, চল, দাদা। তোর কথাই যেন সত্য হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ বাবুর নায়েব বদমায়েস নহে, সাধু।

"There exists in him a heart-abhorrence of whatever is incoherent, pusillanimous, unveracious,—that is to say chaotic, ungoverned; of the Devil not of God. A man of this kind can not help governing!" * * * It is clear Abbot Samson had a talent; he had learned to judge better than Lawyers, to manage better than bred Bailiffs—a talent shining out indisputable, on whatever side you took him. * * * That he was a just clear-hearted man, this, as the basis of all true talent, is presupposed. How can a man, without clear vision in his heart first of all, have any clear vision in the head?' It is impossible!

Carlyle's *Past and Present.*

মহৎ হাটা পরগণার নায়েবের নাম শ্রীশিবনাথ লাহিড়ী। তাঁহার বাটি নবদ্বীপে। তিনি প্রকৃতই একজন ধার্ম্মিক পুরুষ, প্রজাদের পুত্র নির্ব্বিশেষ পালন করেন; পীড়ন করা দূরে থাকুক, প্রজাদিগের রোগে, শোকে, বিপদে, শিবনাথ স্বয়ং তাহাদিগের কুটীরে যাইয়া, ঔষধ পথ্য দিতেন, ও নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। জমিদার প্রবোধ বাবু যেমন সাধু, তাঁহার নায়েবও তেমনি সাধু।

নায়েব শিবনাথ কেবল সাধু নহে। তিনি অতি দক্ষ বৈষয়িক লোক। তিনি কাহাকেও ঠকাইতেন না। কিন্তু অতি চতুর লোকেও তাঁহাকে ঠকাইতে পারিত না। তিনি পরগণার সমুদয় সংবাদ রাখিতেন। অধিকাংশ প্রজা দিগকে তিনি চিনিতেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইতেন। পরগণার কোন্ জমীতে কি ও কত ফসল হয় তৎপ্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, কৃষকদিগের সহিত মিশিয়া, কি করিলে প্রজার ও জমির উন্নতি হইতে পারে, তৎবিষয় তথ্য নিরূপণ পূর্ব্বক কৃষক দিগকে শিক্ষা দিতেন। কর সংগ্রহার্থে কখন কোন প্রজা পীড়ন করিতেন না। তথাচ তাঁহার তহশীলাধীনে কোন প্রজার খাজনা প্রায়ই বাকী পড়িত না। তাঁহার আমলে কোনও প্রজার নামে বাকী খাজনার নালিশ হয় নাই। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য প্রবোধ বাবুর জমিদারী প্রণালী।

আশ্চর্য্য শিবনাথ নায়েব মহাশয়ের কার্য্যকুশলতা। নায়েব একশত টাকা বেতন পাইতেন। সপরিবারে বাসের জন্য জমিদারের একটী বাটী পাইয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর আদেশ মত, নায়েব অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল লোক সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতেন, তাহাদিগকে গোমস্তা নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার অধীন আমলাগণকেও নিজের কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, টাকা কড়ির ব্যাপারে তত্ত্বাবধান না থাকিলে, কোন কোন সৎলোকেও ক্রমে ক্রমে প্রলোভনে পড়িয়া অসৎ হইয়া যায়, প্রভুর টাকা পরে দিব ভাবিয়া ব্যয় করে, এবং শেষে দিতে পারে না। তিনি আরও জানিতেন, অধিকাংশ আমলা প্রথমে পরিশ্রমী থাকিলেও, উপরিতন কর্ম্মচারী তাহাদিগের কার্য্য নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহারা ক্রমে কেহ নিরুৎসাহ, কেহ অলস হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তিনি নিয়ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতেন। তিনি অন্য জমিদারের জমি কখন অন্যায় করিয়া প্রভুর জমিদারির অন্তর্গত করিবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু যদি অন্য কোন জমিদার বা তাহার লোক তাঁহার প্রভুর জমি বেদখল করিবার চেষ্টা করিত, তখন তাঁহার ভীমশক্তি দুর্জ্জেয় কৌশল অশনিপাতের ন্যায় শত্রু মস্তকে আসিয়া নিপতিত হইত।

শিবনাথ কাছারিতে গদির উপর বসিয়া আছেন। পীতাম্বর ও মতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিল।

নায়েব বলিলেন, কি চাও?

পীতাম্বর। এজ্ঞে মোরা জমি চাই—নায়েব। তুমিত জমি পেয়েছ।

পীতাম্বর। এজ্ঞে, মুই চাহি না। মতি চায়, ও নরেশ বাবুর জমি-দারী থেকে পেলিয়ে এসেছে।

নায়েব। কত বিঘা চাও।—মতি। ৪০/ চল্লিশবিঘা।—নায়েব। অত হবে না। ২০/ হবে।

মতি। দয়াকোরে মোকে যা দেন।

নায়েব। খাজনা কি নিরিখে দিবে?

মতি। হুজুর যা হুকুম করবেন মুই তাই দিব।

নায়েব। তবু, কত?

মতি। (ফুস্ ফুস্ করিয়া) পেতমদাদা কত বল্‌বো?

পীতাম্বর। তুই যা পারিস তাই বল।

মতি। নায়েব মশায়, মোরা প্রবোধ বাবুর জমিদারিতে বিঘাপ্রতি ৪৲ টাকা দেতাম।—নায়েব। জানি ?

মতি। এখন হুজুরের দয়া। ৩৲ করিয়া দিন।

নায়েব। তোমরা কজন লোক ?—মতি। ৬ জন।

নায়েব। হিসাব করে দেখ—গড়পড়তা যে ধান হবে, তা হতে গরুর খোরাক, লাঙ্গলের খরচা, তোমাদের খোরাক, তোমাদের কাপড় প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়া, কত টাকা থাকে দেখ। তা হইতে সিকি সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। তৎপরে যাহা থাকে তাহাই খাজনা বলিয়া দিতে পারিবে।

মতি। মোরা কি অতশত হিসাব কর্ত্তে পারি ?

শিবনাথ। যে খাজনা স্থির হইবে, বৎসর বৎসর তাহা দিবে। এ জমি- দারিতে বাকিখাজনার জন্য নালিশ নাই, পেয়াদার "রোজ" নাই। পার্ব্বণি নাই, কর্ত্তন নাই, হিসাবানা নাই। সকলেই নিজের নিজের খাজনা আপনি আসিয়া কাছারিতে দিয়া যায়।

মতি। মোকে কোন্ জমি দেবেন, তা দেখে মোরা যেমন পারি তেমনি হিসাব করে বলব।

নায়েব। হালসানা! এই প্রজাকে জমি দেখাইয়া দিবে। গিরিধর প্রামাণিকের জমির উত্তর হরিনাথ কয়ালের জমির দক্ষিণ যে ২০/ বিঘা জমি আছে তাহা।

হালসানা। যে আজ্ঞা।

নায়েব। তোমার গরু ও লাঙ্গল আছে ?

মতি। না। মোর কিছুই নাই। পেলিয়ে আসবার সময় কিছুই লিয়ে আসতে পারিনি।

নায়েব। গরু লাঙ্গল ও ঘরবাঁধার টাকা চাই ? কত টাকা হলে হবে ?

মতি। মুই কি বলব ? মশাই দেখুন।

নায়েব। ৪০৲ টাকা কর্জ্জ দেব। তোমার জামিন থাক্‌বে কে ?

মতি। মুই কি টাকা লিয়ে পালাব ?

নায়েব। জামিন দেওয়ার আপত্তি কি ?

মতি। মুই নূতন লোক, মোর এগ্রামে কে আছে ? মোর কে জামিন হবে ?

পীতাম্বর। মুই মতির জামিন হব। নায়েবমশায়! তুমি টাকা দেও। আপনার তোমার টাকার ভাবনা নাই।

মতি। মোশায়। সুদটার কথা— ?

নায়েব। সুদ লাগবেনা। চারি কিস্তিতে চারি সনে টাকা দিতে হবে।

মতি। (আশ্চর্য্য হইয়া) নায়েব মশায় সত্যি বলছ? (শিবনাথ একটু হাসিলেন)।

পীতাম্বর। আরে মতে, চুপমার, চুপমার নায়েবমশায় তোর সঙ্গে কি ঠাট্টা করছে?

নায়েব। কিস্তিখেলাপ করলে সুদ লাগবে। মাসে শতকরা আটআনা কিস্তিখেলাপি সুদ লাগবে।

পীতাম্বর ও মতি কাছারিতে থাকিতে থাকিতে সন্ধ্যা হইল। কাছারিবাটীর সমুদয় কক্ষ দীপে আলোকিত হইল। গোলাবাড়ীতেও প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। ক্রমে ক্রমে অনেক প্রজা আসিল। কেহ ধান্য চাহে, কেহ ঔষধ চাহে, কেহ পথ্য চাহে, কেহ পরামর্শ চাহে, কেহ খাজনা দিতে চাহে, কেহ টাকা কর্জ্জ লইতে চাহে। এদিকে কাছারিবাটীর সংলগ্ন দেবালয় দীপমালায় সুশোভিত হইল। এবং মন্দিরে হরগৌরীর আরতি আরম্ভ হইল। রুণু রুণু করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। শঙ্খের গম্ভীর কলনাদ শ্রুত হইল। ঢং ঢং করিয়া কাঁশর বাজিতে লাগিল। পুরোহিত ভক্তিভরে পঞ্চপ্রদীপ দেবদেবীমূর্ত্তি সম্মুখে মণ্ডলাকারে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কৃষকবৃন্দ দেবালয়প্রাঙ্গনে আসিয়া লগ্নীকৃতবাস হইয়া দেব দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিল। শিবনাথ ভক্ত হিন্দু, কপট হিন্দু নহে। তিনিও দেবালয়ে আসিয়া উপবেশন করিলেন, এবং হরগৌরীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল। শিবনাথ কাছারিঘরে আবার বসিলেন। তখন চারিদিকে আবার কার্য্যস্রোত বহিতে লাগিল। খাজাঞ্চী টাকা গুণিয়া লইতেছে, মুহুরি হিসাব লিখিতেছে, মুন্সি পাট্টা কবুলতি লিখিতেছে, নকল নবিশ পত্রের নকল করিতেছে, আমিন জরিপী চিঠা লিখিতেছে। যখন যাহার আবশ্যক হইতেছে নায়েবমহাশয়ের উপদেশ লইতেছে। গোলমাল গালিগালাজ নাই, কোন প্রজাকে জরিমানা করার কথা নাই। প্রজাগণ প্রফুল্ল। আমলাগণ কার্য্যোৎসাহী—নায়েব প্রজাবৎসল।

পীতাম্বর ও মতি এই রমণীয় দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া দেখিতেছে।

মতি বলিল—"পেন্নাম দাদা! এ কি জমিদারের কাছারি না স্বর্গ? না বৈকুণ্ঠপুরী? নায়েব মশায়কে দেখ্‌লেই তাঁর পার ধুলা নিতে ইচ্ছা যায়।

পীতাম্বর। মতে, চুপ মার্।

এমন সময় হরিদাস নামক একজন কৃষক সেই খানে আসিল। সে রাগে ফুলিতেছে। সে বলিল যে গোপাল ঘোষ আমার জমি বেদখল করিয়াছে। এমন সময় গোপালও আসিল। সে বলিল, "নায়েব মহাশয় দেখুন, হরে আমাকে মেরেছে, হরের জন্যে আমি আর এ গাঁয়ে টিকিতে পারি না।" নায়েব মহাশয় বলিলেন "পেস্কার বাবু, কল্য পঞ্চায়তের বৈঠক হইবে। এই মকদ্দমা পঞ্চায়তের দ্বারা বিচার হইবে"। পেস্কার খাতাতে ফরিয়াদি ও আসামীর ও সাক্ষীর নাম লিখিয়া রাখিলেন।

মতি জিজ্ঞাসা করিল, বিচারে অপরাধীর কি দণ্ড হয়—?

পীতাম্বর। প্রায়ই জরিমানা হয়।

মতি! জরিমানার টাকা নায়েব মশায় লন ত?

পীতাম্বর। না!—মতি। পঞ্চায়ত লয়?—পীতাম্বর। না।

মতি। তবে টাকা লয় কে?

পীতাম্বর। এখানে একটা ধর্ম্মশালা আছে। যত গরিব দুঃখী লাচার লোক তাতে খেতে পায়, কাপড় পায়, সেখানে থাকতে পায়। জরিমানার টাকা সেই ধর্ম্মশালার খরচের জন্য দেওয়া হয়।

মতি। জরিমানার টাকাতেই কি ধর্ম্মশালার খরচ চলে?

পীতাম্বর। তা কি চল্‌তে পারে? জমীদার বাবু তার খরচ দেন। তার উপর জরিমানার টাকা যা হয় লাচারদের জন্য খরচ হয়।

মতি। ধর্ম্মশালার খরচ পত্রের হিসাব লয় কে?

পীতাম্বর। নায়েব মশায় আর পঞ্চায়তরা।

মতি। পঞ্চায়ত বহাল করে কে?

পীতাম্বর। একজন পঞ্চায়ত নায়েব মহাশয় নিযুক্ত করেন। গ্রামের ভদ্রলোকেরা একজন বহাল করেন, কৃষাণরা একজন; কামার ছুতার, কুমোর, মিস্ত্রি, ও দোকানীরা একজন পঞ্চায়ত পাঠায়। আর এই চারিজন পঞ্চায়ত এক জন পঞ্চায়ত বাছিয়া লয়। মতে, আজগে এক্ষণ যাই। কা'ল আবার আস্‌ব। তোকে নিয়ে আস্‌ব।

মতি। আচ্ছা।

পীতাম্বর ও মতি নায়েব মহাশয়ের নিকট আবার অগ্রসর হইল। পীতাম্বর বলিল—নায়েব মশায়, আজগে মোরা বিদায় হই। মোরা কাল আস্‌বো। এই বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। এমন সময় নায়েব মহাশয়কে তাঁহার খানসামা বলিল—"ঝি বলিতেছে, আপনি একবার বাটীর ভিতর যান।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নায়েবের অন্তঃপুরে একটী সুন্দরী যুবতী আর একটী প্রৌঢ়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। প্রৌঢ়া নায়েব মহাশয়ের স্ত্রী, নাম দীন তারিণী বা তারিণী। যুবতী মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী।

দীনতারিণী। বাছা তুমি এত ব্যস্ত হইও না।

কুমুদিনী। মা, আমার এক্ষণ যে কেউ নাই। চারিদিক যে আমি আঁধার দেখিতেছি। কি জানি "তাঁর" কি হোল। লোকে বলছে, হাকিমে নাকি কি হুকুম দিয়েছে, আমি "তাঁকে" নাকি আর এজীবনে দেখ্‌তে পাব না। নাকি দ্বীপান্তর হবে—ও মা কি হবে—।

দীনতারিণী। না না, ও সব কথা তুমি শুনো না। তিনি বলেছেন, কোন ভয় নেই, মহেশ খালাস হবে।

কুমুদিনী। এমন দিন কি পাব? ঠাকুরদের যে আমি কত মান্‌ছি! তাঁরা কি দয়া করবেন না?— যেমন "তার" জন্যে হচ্ছে, তেমনি আবার মায়ার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। কোথায় গেলে সেই স্নেহের পুতুল আবার পাব? আমি কেন ডুবে মরলাম না? ঝাঁপ দিতে ত গিছলাম। আমাকে সকলে ধরলো কেন? আহা যখন মায়া বলিল "কে ঐ বাবাকে পোড়াচ্ছে আমি তার পাশে পুড়ে মরিগে" তখন তাঁর চাঁদপানা মুখে শ্মশানের চিতার আলো পড়েছিল, সেই মুখখানি আমি এখনও যেন দেখছি—মুখ খানি কেমন লাল দেখাল, স্নেহ মাখা সেই বড় বড় দুইটী চোখ কেমন আভাতে চিকচিক করিলি—মায়া আকাশ পানে একবার চক্ষু তুলে হাত যোড় করে—"মা দুর্গা, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাও" এই বলে সেই শিশু পদ্মার গর্ভে ঝাপ দিল। মায়া মানুষ নয়, দেবী ঠাকুরুণ, মায়ার জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আজগে কোথায় সেই ননীর পুতুল—কোথায় সেই যাদুমণি! কোথায় সেই আমাদের প্রাণের ধন! কোথায় সেই

স্বর্গের হাসিময় মুখ—মায়া, তোদের অভাগিনী বৌকে তুইও ছেড়ে গেলি! এত ভালবাসা সবই ভুলে গেলি হায়! শ্বশুরই কোথায় গেলেন। পাষণ্ডরা তাঁকে খুন করে ফেল্লে? এমন ভাল লোক—তাঁকে খুন করে ফেল্লে! আর মায়া তুই ইচ্ছা করিয়া তোর এত ভালবাসার বৌকে ফাকি দিয়া চলিয়া গেলি—ছি! ছি! তুই এত নিষ্ঠুর। তোর দাদাকে না দেখ্‌তে পেয়ে, তোকে নিয়ে যে এই পোড়াবুক একটু শীতল কর্‌তাম। মায়ারে! তুই কোথায়? একবার আয়, তোকে বুকে নিয়ে প্রাণ শীতল করি—বুক যে পুড়ে গেল—

দীনতারিণী অভাগিনী কুমুদিনীর বিলাপ শুনিতে শুনিতে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "বাছা! 'উনি' মায়ার খোজ করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন তা তুমি জান।

কুমুদিনী। সে কি আর বেঁচে আছে?

দীনতারিণী। আজকে একজন ভিখারিণী এসেছিল। সে বলিল যে রাধাপুর গ্রামের হাটে একটী মেয়ে দেখেছিল। সে ঠিক মায়ার বয়সি। মায়ার চেহারা তুমি যেরূপ বলিয়াছ তাহার চেহারাও সেইরূপ, সেই মেয়েটীও ডুবে গিয়াছিল। "বৌ, দাদা, বাবা" বলে বলে কাঁদে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের মায়া, কোন ভয় নাই, সে বেঁচে আছে।

কুমুদিনী। সে আমাদেরই মায়া। আমাদেরই মায়া! ঠিক! ঠিক! রাধাপুর গাঁ এখান থেকে কতদুর?

দীনতারিণী। কেন?

কুমুদিনী। আমি সেখানে গিয়ে মায়াকে খুজে বের করবো।

দীনতারিণী। তোমার যে বয়স ঘরের বাহিরে গেলেই তোমার পদে পদে বিপদ, তোমায় যাওয়া হবে না!

কুমুদিনী। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সে বিপদে পড়ে ছিলাম, মনে করিলে এক্ষণও বুক কাঁপে। আপনাদের আশ্রয়ে কোন বিপদ নাই। তবে মা, মায়ার তল্লাস কিরূপে হবে? মায়া একলা না জানি কত কাঁদ্‌ছে—সে কার কাছে রয়েছে? সে যে কেঁদে কেঁদে মারা যাবে।

দীনতারিণী। যখন মায়া জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তখনই একজন সন্ন্যাসী তাকে তুলিবার জন্য তোমাদের নৌকা হইতে জলে ঝাপ দিয়ে পড়ে ছিলেন। কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, তাই তিনি মায়াকে দেখিতে পান নাই। তা তুমি জানত।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড]　　কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩১০ সাল।　　[৭ম সংখ্যা।

মায়া।

কুমুদিনী। তাত জানি।

দীনতারিণী। সেই সন্ন্যাসী মহাশয় তোমাকে এখানে রেখে নদীর পারে গ্রামে গ্রামে মায়াকে খুঁজিবেন বলিয়া গিয়াছেন।

কুমুদিনী। আজিও যে তিনি ফিরে এলেন না।

দীনতারিণী। কদিনই বা হয়েছে? আর এখানকার নায়েব মহাশয়ও চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন।

কুমুদিনী। হাঁগা, নায়েব মহাশয় কি আজ রাত্রেই রাধাপুর গ্রামে মায়ার তল্লাসে লোক পাঠাইতে পারেন না? দেরি হলে, কে কোথায় আবার তাকে নিয়ে যাবে, তা হলে আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। মা, তোমার পায় পড়ি, তুমি নায়েব মহাশয়কে বল, তিনি আজ রাত্রিতেই লোক পাঠান্।

দীনতারিণী। তোমার বলিবার আগেই আমি তাঁকে খবর দিয়েছি। আস্‌ছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যে ঘরে কুমুদিনী ও দীনতারিণী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, শিবনাথ সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীনতারিণী বলিলেন, "কুমুদিনী মায়ার জন্ত বড় কাঁদিতেছে, আজ রাত্রিতে রাধাপুরে কি লোক পাঠান যায় না?"

শিবনাথ। কেন? মায়ার কোন খবর পাওয়া গিয়াছে?

দীনতারিণী। একজন ভিখারিণী বলছিল যে সে সেখানে একটী মেয়ে মায়ার মত দেখেছে।

শিবনাথ। আমিত সেখানেও লোক আগেই পাঠিয়েছি। সে এক্ষণও ফিরে নাই

দীনতারিণী। কুমুদ বল্‌ছে, আজগে রাত্রিই সেখানে লোক পাঠালে মায়াকে সেখানে পাওয়া যেতে পারে। আর একজন লোক আজ রাত্রিতে পাঠালে ভাল হয় না? বৌটি বড়ই কাতর হয়েছে। ননদের প্রতি এত ভালবাসা কখন দেখি নাই।

শিবনাথ। আমি রাত্রিতেই রামকৃষ্ণ পাইককে পাঠাইতেছি।

কুমুদিনী। মা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, মায়ার দাদার আর কোন খবর পেয়েছেন কি?

শিবনাথ এই কথা শুনিয়া বলিলেন "মা, কোন ভয় নাই। আমাদের জমীদার বাবুর পত্র অদ্য পাইলাম। তুমি আস্‌বামাত্র তাঁকে সব সংবাদ লিখেছিলাম। তিনি আমাকে হুকুম দিয়েছেন—মহেশের মোকদ্দমার খরচ তুমি সমুদয় দিবে। মোকদ্দমার ভাল করিয়া তদ্বির করাইবে, মহেশ নির্দ্দোষী, সে যাহাতে খালাস হয় তাহাই করিতে হইবে। আমি আজ মোক্তারের কাছে পাঁচ শত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি এবং জেলার প্রধান উকীল শ্যামাপদ বাবুকে নিযুক্ত করিবার জন্য লিখিয়া দিয়াছি, এবং যাহা যাহা উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, তাহাও আমি দিয়াছি। মা কোন ভাবনা নাই! তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমরা মহেশকে খালাস করিয়া দেব।"

কুমুদিনী অঞ্চল দ্বারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"ভগবান আপনাকে আর প্রবোধ বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি বড়ই দুঃখিনী, বড়ই নিরুপায়, আপনারাই আমার ভরসা।

হেমচন্দ্র।

১

কবিতা কাননে কোকিল কূজন
কেনরে সহসা নীরব আজ?
সুনীল গগনে নিবিড় নীরদ
আঁধারে আবরে তপন রাজ?

২

বাঁশরী জিনিয়া সুধার লহরী
ঢালিত বিহগ ললিত তান,
নবনী ছানিয়া অমিয় মাখিয়া
সে অমৃতধারা জুড়াত প্রাণ।

৩

কোথা আজ সেই কলকণ্ঠ পিক
ঝঙ্কারে যাহার মাতিত প্রাণ?
মধ্যাহ্ন ভাস্কর প্রতিভা যাহার
জাতীয় জীবন করেছে দান?

৪

সাহিত্য গগনে সুকণ্ঠ গায়ক
পঞ্চমে তুলিয়া গাহিত গান,
কেনরে নীরব সে গায়ক আজ
মধ্যমে পুরিয়া তুলেনা তান?

৫

পাবনা যে আর শুনিতে সে গান
যে গান শুনিতে উছলিত প্রাণ,
সিন্ধু গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী
যমুনা জাহ্নবী বহিত উজান।

৬

প্রশান্ত মুরতি উদার প্রকৃতি
বিজলীর ছটা নয়ন ভাতি,
শিশুর সমান সরল পরাণ
কোথা গেলে আজ ছাড়িয়ে সাথী ?

৭

কেরে রে নির্দ্দয় কেড়ে নিলি হায়
দরিদ্র বাঙ্গালী মুকুটমণি ?
ভারতী ভাণ্ডারে অমূল্য রতন
কে হরিলি বল্ সুধার খনি ?

৮

কোথা হেমচন্দ্র ভারত গৌরব
জনমে যাঁহার পবিত্র ধরা ?
কোথা হেমচন্দ্র জাতীয় সৌরভ
বিহনে যাঁহার সংসার কারা ?

৯

কাঁদ মা ভারতি সন্তান তোমার
পরায়ে তোমারে বিবিধ সাজ,
চুনি পান্না মতি প্রবাল হীরক
গিয়াছে চলিয়া কোথায় আজ।

১০

বল মা ভারতি যেজন তোমারে
আজন্ম সেবিল ভক্তের মত,
কোথা আজি তারে কি দোষের তরে
দিলে মা বিদায় জন্মের মত ?

১১

কেন মা ভারতি এ অখ্যাতি তোর
চিরদিন মাগো জগতে রবে,
যে জন সেবিবে ওপদ কমল
দারিদ্র্য অনলে দহিতে হবে ?

১২

ওহে কবিবর হয়েছ অমর
নিজ কীর্ত্তিবলে এভব ধামে,
যশের মুকুট মাথায় পরিয়ে
যাও দেব যাও অমর ধামে।

১৩

সংসারের পাপ সংসারের তাপ,
সংসারের জ্বালা নাহিক সেথা,
পারিজাত হার নন্দন কানন
মন্দাকিনী বারি হরয়ে ব্যথা।

১৪

ঐ শুন গায় তব যশোগান
দেববালা যত মোহিনী ছবি,
পাদ্য অর্ঘ লয়ে দাঁড়ায়ে দুয়ারে
পূজিতে তোমারে বঙ্গের কবি।

১৫

দেখিতে দেখিতে খুলিল দুয়ার
দেব বালা যত দাড়া'ল ঘিরে,
আদরে ধরিয়ে বাণীপুত্র কর
যতনে বসা'ল বেদীর' পরে।

১৬

সংসারে আসিয়া ভারতী সেবিয়া
পেয়েছ হে দেব কতই জ্বালা,
ত্রিদিবের সুধা দেবের বাঞ্ছিত
পিয় প্রাণ ভ'রে যুড়াবে জ্বালা।

১৭

কল্পনা কাননে ফুটন্ত প্রসূন
তুলিয়া যতনে গেঁথেছ মালা,
যে মালা পরিয়ে গৌড়বাসী জন
ভাবেতে বিভোর পাশরে জ্বালা।

১৮

কল্পনার হার যে "বৃত্রসংহার"
বঙ্গ মাতা গলে দিয়াছ তুমি,
লহরে লহরে মুকুতা ঝলকে
প্রভায় যাহার উজ্জল ভূমি।

১৯

"ভারত সঙ্গীত" কীর্ত্তিস্তম্ভ তব
বিজয় নিশান ভারত গান,
"দশ মহাবিদ্যা" অমৃতের ধারা
"বাজিমাতে" তব মাতায় প্রাণ।

২০

কত আর কব অতুল বৈভব
ভারতী ভাণ্ডারে রেখেছ যাহা,
যত দিন ভবে বঙ্গভাষা রবে
তোমার প্রতিভা ঘোষিবে তাহা।

২১

ওহে কবিবর কেঁদেছ বিস্তর
ভারত ললনা বিধবা তরে,
অই দেখ আজ ভারত রমণী
তিতে আঁখিনীরে তোমার তরে।

২২

ভাষার সরসে প্রফুল্ল কমল
তোমার রচিত কবিতা চয়,
গৌড় বাসী জন ভ্রমর নিকর
পান করে সুধা মাধুরী ময়।

২৩

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আঁখি হারা হয়ে
পর-ভিক্ষা-জীবী বঙ্গের কবি,
গেলে পুণ্য ধামে শান্তি নিকেতনে
লভ শান্তিসুধা অমর কবি। *

২৪

গেলে চলে যেব সংসার ত্যজিয়ে
ঋণ পাশে বাঁধা দরিদ্র মোরা।
কি দিয়ে তোমার ওহে গুণাধার
শোধিব এ ঋণ ভাবিয়ে সারা।

২৫

প্রীতির প্রসূন স্নেহ বিল্বদল
মমতা তুলশী মায়া দুর্ব্বাদল,
শ্রদ্ধার চন্দন ভক্তি গঙ্গাজল
ধর উপহার ভিখারী সম্বল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বসু।

মোহ।

(মৃতের কঙ্কাল দর্শনে)

১

ছিলে একদিন তুমি আমাদেরি মত,
ছিল রক্ত মাংসময়, ওই দেহ তব,
প্রাণের মাঝারে ছিল কথা শত শত,
আনন্দ পাইতে যাহে নিত্য নব নব।

২

ছিল তব প্রণয়ের কাহিনী সুন্দর,
যাহার কুহকে ভুলে মাতিয়া রহিতে,
ছিল আশা সরসীতে, আঁকা মনোহর,
মনোরম শিশু ছবি, আঁখি জুড়াইতে।

৩

ধনী হও দীন হও, ছিল তব তরে,
আরামের গৃহ মাঝে, নিশীথ বিশ্রাম;

পরিশ্রমে শ্রান্ত দেহে, শান্তি পাইবারে;
প্রেয়সীর যত্নে হ'ত কতই আরাম।

৪

এই অস্থিসার দেহ আছে যে পড়িয়া,
জাহ্নবীর কূলে আজি বালুকার মাঝে,
হবে মম এই দশা জানিয়া শুনিয়া
তবু মোহে বদ্ধ রই হৃদয় না বুঝে।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

"জগদ্গুরু" লিও।

কাঙ্গাল বন্ধু, সন্ন্যাসী সম্রাট, পোপ ত্রয়োদশলিও।

তিরা নব্বই বৎসর বয়সে, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগের প্রধান আচার্য্য ও নেতা, সত্যপরায়ণ, সর্ব্বজন পূজ্য, সর্ব্বলোক প্রিয়, রোমের পোপ সহৃদয় ত্রয়োদশ লিও গত ৪ঠা শ্রাবণ—ইং ২০ শে জুলাই, ১৯০৩ সাল—সোমবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এ নশ্বর জীবনের সমস্ত ভার, সর্ব্বকার্য্য, সমস্ত সুখ দুঃখ, মোহ মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। লিওর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎ শোকাকুল। কোনও সম্রাটের দেহত্যাগে লোকের হৃদয় এত চঞ্চল, এত আকুল হয় নাই। "অবিনশ্বর—রোম" এবং পোপদিগের দীর্ঘ রাজত্বের তুলনায়, সম্রাট ও সাম্রাজ্য সমূহ স্বপ্ন সদৃশ মনে হয়। এক সময়ে পোপের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য অতুলনীয় ছিল। অধুনা তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে সত্য, তথাপি তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বিভব ও গৌরব দেখিয়া, প্রাচীন রোমের বিপুল শক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্য, অনন্তকীর্ত্তির কথা স্মরণ হয়। নূতন নূতন রাজ্যের উত্থান ও পতন, নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি ও নাশ সম্ভবপর সত্য, কিন্তু রোম অবিনশ্বর বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। রোমীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায়, যে রোমান ক্যাথলিকদিগের জগদ্গুরুর বা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ, রাজবংশের পরিবর্ত্তনের বিষময় ফলে, ইতালী ও য়ুরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতে, জ্ঞান ও চিন্তার সংঘর্ষণে, প্রকম্পিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আপনার উন্নত শির কখন অবনত করে নাই। অনেকে মৃত পোপ

ত্রয়োদশ লিওর রাজত্ব আশান্তি ও অসুখকর হইবে এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁহার সুশাসন গুণে তাহা শান্তি ও সুখময় হইয়াছিল। পঁচিশ বৎসর কাল রোমীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় জনৈক সুশাসক আচার্য্য ও বিচারক কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারই যত্ন ও অধ্যবসায়ে, রোমীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদের গৌরব যতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, রোমীযদিগের পতনের পর হইতে মৃত পোপের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ধর্ম্মাধ্যক্ষের রাজত্ব সময়ে তাদৃশ গৌরবান্বিত হয় নাই।

মহাত্মা লিও ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ তারিখে অর্থাৎ ১২১৬ বঙ্গাব্দের সুখময় বসন্তে, অনিঞ্জি ধর্ম্মাধিকরণের অন্তর্গত কার্পিনেটো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাউণ্ট লিউডোভিকো পেট্‌চি (Count Ludovico Pecci) সাইনীজ বংশসম্ভূত এবং নেপোলিয়নের এক জন রণসঙ্গী ছিলেন। শৈশবে ভিনসেণ্ট জোয়াকিম রাফেল লুইস পেট্‌চি (Vincent Joachim Raphal Lewis Pecci) মহাত্মা লিওর এইরূপ নামকরণ করা হয়। অষ্টম বর্ষ বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভাইটার্বো নগরে জেসুইট কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রয়োদশ লিও ছয় বৎসর কাল বিদ্যানুশীলন করেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে তিনি রোম নগরে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া কালেজিও রোমানিও (Collegio Romanio) নামক বিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন এবং অঙ্ক শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এক বিংশে দর্শন শাস্ত্রে সম্মান স্বরূপ মালোপহার প্রাপ্ত হন এবং দ্বাবিংশে ধর্ম্মশাস্ত্রে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। পরে, রোমীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দৌত্যকার্য্য শিক্ষার্থ, সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত পাদরীগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত আকাডেমিয়া নামক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অধ্যবসায় ও যত্ন, তাঁর ন্যায়ানুমোদিত আচরণ এবং তাঁহার সর্ব্ব আমোদ প্রমোদ বিরাগ প্রভৃতি তাঁহার বাল্যজীবনে—শিক্ষাবস্থায়—পরিলক্ষিত হইত।

ইহার পরই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ—তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের আরম্ভ। ১৮৩৭ খৃঃ ষোড়শ গ্রেগরী তাঁহাকে আপন পরিবারের ধর্ম্মাচার্য্য এবং রেফারেণ্ডারী অব দি সিগনাটিউরা (Referendary of the Signatura) র পদে নিযুক্ত করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে বিশপের পদ প্রদান করা হয়। ইহার কিছু দিন পরে, বেনেভেণ্টো প্রদেশে শঠ বণিক ও

দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য, তাঁহাকে তথাকার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। এই কার্য্য তিনি অতি সুচারুরূপে, সুকৌশলে সম্পন্ন করেন, এবং তাহারই পুরস্কার স্বরূপ ১৮৪১ খৃঃ তিনি পেরুগিয়া প্রদেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন, তিনি সেই স্থানের বহুল সামাজিক ও নগর সম্বন্ধীয় উন্নতি করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে, তাঁহাকে বিশপের পদে উন্নীত করা হয়, এবং পোপের দূত স্বরূপ বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেল নগরে প্রেরণ করা হয়। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি পেরুগিয়ায় বিশপ হইয়া পুনর্ব্বার তথায় গমন করেন। ১৮৫৩ খৃঃ পোপ নবম পাইয়স তাঁহাকে 'কার্ডিনাল' পদে নিযুক্ত করেন, এই সময়ে কার্ডিনাল পেট্‌চি নূতন উপাসনা-মন্দির গঠন, পুরাতনের সংস্কার, সমাজের ও শিক্ষার উন্নতি, আপনার অধীনস্থ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মানসিক ও পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য সতত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১৮৭৭ খৃঃ কার্ডিনাল আণ্টনেলির মৃত্যু হওয়ায় পোপের গৃহাধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। কার্ডিনাল পেট্‌চি এই পদে নিযুক্ত হন। অল্প দিন পরে—নবম পাইয়সের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে—Lenten Pastoral নামক একটী প্রবন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত আধুনিক সভ্যতার কিরূপ সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করেন। বহু বৎসর পরে শ্রমজীবিদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যে আদেশ পত্র প্রচার করেন তাহা ইহার প্রতিলিপি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৮৭৮ খৃঃ পোপ নবম পাইয়স পরলোক গমন করেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রানুসারে পোপদিগকে চিরদিন অবিবাহিত থাকিতে হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের পুত্রসন্তানাদি না থাকায় কার্ডিনালদিগের মধ্য হইতে পোপ নির্ব্বাচিত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী—নবম পাইয়সের মৃত্যুর একাদশ দিবস পরে—৬২ জন কার্ডিনাল, পোপ নির্ব্বাচনের জন্য সিষ্টাইন ধর্ম্মমন্দিরে, আপনাদিগকে আবদ্ধ করেন। পরদিন কার্ডিনাল পেট্‌চি পোপ নিযুক্ত হইয়াছেন এইরূপ তাঁহারা প্রকাশ করেন। কার্ডিনাল পেট্‌চি সেণ্টলিওর স্মারকদিবসে পোপ নির্ব্বাচিত হন এবং দ্বাদশ লিওকে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিতেন এই দুই কারণে তিনি আপনাকে লিও নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ লিও পোপীয় সিংহাসনে অরোহণ করিয়া কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সর্ব্বপ্রথমে আপনার সাংসারিক আয়ব্যয় এবং অন্যান্য বিষয় সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন। তিনি

স্বীয় যত্নে শিক্ষিত পেরুগিয়া প্রদেশের স্বকীয় পাদরীগণের মধ্য হইতে কর্ম্মচারীবৃন্দের অধিকাংশ নির্ব্বাচিত করেন। সমস্ত রোমান কাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায় যাহাতে বিখ্যাত বিদ্যালয়সংস্কারক টমাস একুইনসের মতানুযায়ী ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য লিও বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন; এবং এই কারণ ঐ মহাত্মার নামানুসারে রোমে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁহার পুস্তক সকল প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ সঙ্কলনে সমর্থ এরূপ ব্যক্তিগণকে আপনার পুস্তকালয়ে দপ্তরখানায় অসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। মহাত্মা লিও নিজে শিক্ষিত ও বিদ্বান্, প্রাচীন সাহিত্যে পণ্ডিত, লাটিন কবি, এবং সুবক্তা সিসিরোর অনুকরণে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। এজন্য তিনি ধর্ম্মপ্রচারকগণ যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার সহিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং সাধারণ লোকে যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষালাভ করে, সে কারণ বিশেষ উৎসুক উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য একটী শিক্ষাসভা বা স্কুলবোর্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সভাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক—পাদরী এবং সাধারণ এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ—সভ্য নির্ব্বাচিত হইতেন। লিওর প্রতিষ্ঠিত এই সকল বিদ্যালয় এরূপ সুফল প্রদান করিয়াছিল যে ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আপনার শাসন সময়ে ত্রয়োদশ লিও খৃষ্টানদিগের বিবাহ, সামাজিকসূত্রে বদ্ধ গুপ্ত সম্প্রদায়দিগের বিধি ব্যবস্থা, কুলিমজুর প্রভৃতির অবস্থা এবং অন্যান্য কয়েকটি অবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় নূতন আদেশ ও বিধি প্রচারিত করেন। কুলিমজুর প্রভৃতির অবস্থাসম্বন্ধে যে নূতন আদেশপত্র বাহির হয় তাহাতে অতি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গতশতাব্দীর শিল্প ও সমাজ ব্যাপারে খৃষ্টীয়সমাজের প্রধান নেতা ও গুরু পোপ ত্রয়োদশ লিওকেও লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। স্বার্থের সাধারণত্বই সামাজিকবন্ধন এইমতের সহিত লিওর শেষোক্ত আদেশপত্রে প্রকাশিত বিধির এত অধিক ঐক্য ছিল যে তিনি "working-man's Pope" বা "শ্রমজীবির ধর্ম্মাচার্য্য" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিশ্বাস ও তাহার অনুসরণ, এবং ইংলণ্ড প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-

সম্বন্ধে মহাত্মা লিও যে সকল মত ও আদেশ প্রকাশ করেন, তাহা আন্দোলনে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ খৃঃ তাঁহার খৃষ্টীয়সমাজের পুনর্ম্মিলন (Reunion of Christendom) যে আদেশপত্র প্রকাশিত হয় তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও অন্যান্য স্থানে বেশ একটুকু আন্দোলন হইয়াছিল। ইংলণ্ডে, ঠিক এই সময়ে, ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই উভয়ে ধর্ম্মের কিরূপে সাম্য ও মিল হইতে পারে তাহার আলোচনা হইতেছিল, এবং কতিপয় আপত্তিকর বিধি-ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলে উভয় ধর্ম্মের মিল হইতে পারে, এইরূপ স্থির করিয়া লর্ড হালিফক্স প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা ইংরাজ তাহা প্রস্তাব করিবার জন্য মহাত্মা লিওর নিকট প্রেরিত হন, কিন্তু, তাঁহাদিগের বিশ্বাস যুক্তিকর নহে বলিয়া পোপের অনুমোদিত না হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

ত্রয়োদশ লিওর শাসন সময়ে, এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই যাহার নিমিত্ত লিওকে অপরাধী বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাঁহার রাজত্ব যেন রামরাজত্ব—নিষ্কলঙ্ক, নিখুত। তাঁহার পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী শাসন সুখময় ও শান্তিপূর্ণ এবং মৈত্রভাবাপন্ন ছিল; তাঁহার রাজত্ব জ্ঞান ও প্রীতির ভাণ্ডার। তাঁহার সুন্দর সন্ধিকৌশল রোমকে বহু বিপদ ও বিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছে। মহাত্মা লিওর চরিত্র নানা সদ্‌গুণে ভূষিত। তাঁহার আদর্শচরিত্র প্রভাবে আজ তিনি সর্ব্ব খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি শান্তিপ্রিয়;—এজন্য তিনি শান্তিকর উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভাল বাসিতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাচার্যদিগের ন্যায় "sword in one hand and Bible in the other" তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার বা ধর্ম্ম সংরক্ষণের মন্ত্র ছিল না;—এরূপ উপায় বা কৌশল অতিশয় কদর্য্য ও ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অসৎকার্য্যের জন্য তিরস্কার, সদ্বিষয়ে প্ররোচন, বিরুদ্ধবাদীদিগকে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা স্বমতে আনয়ন, তাঁহার সুনিপুণ ধর্ম্মনীতি এবং শান্তি সংরক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা তিনি শত্রুমিত্রের নিকট সুখ্যাতি ও সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যোগী, অধ্যয়নশীল এবং শাস্ত্রবিদ্‌। তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে কাতর হইত, পরের মঙ্গল কামনা করিত; নিজে পরহিতব্রতধারী এবং দীনবন্ধু ছিলেন। শ্রমজীবিদিগের কার্য্যাদি (Labor) সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সকল রোমীয় ইতিহাসে শীর্ষস্থান লাভ করিবে।

যখন বিশপ হইয়াছিলেন তখন হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণ দীন দরিদ্র অনাথ আতুরের অবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিল। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য এবং সুচিন্তা, তাঁহার পরমেশ্বরের বিশ্বাস ও প্রীতি, তাঁহার শক্তি ও পারমার্থিক সামর্থ্য, তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় ও চিরসম্মানিত করিয়া রাখিবে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

সাহিত্য দরবার।

প্রবাসী। আষাঢ়।

"অজবিলাপ"—কবিতাটী মন্দ নহে। কিন্তু উপযুক্ত ছন্দের অভাবে একটু মলিন হইয়াছে।

"কবি হেমচন্দ্র"—প্রবন্ধটী সুন্দর হইয়াছে; দারিদ্র্য-পীড়িত অন্ধ হেমচন্দ্রকে ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবি বঙ্গের কবিতার গীতি-প্রবাহ ফিরাইয়া দিয়াছেন। করুণ-রসের এক তন্ত্রীটা ছুড়িয়া ফেলিয়া ইহাঁরা গম্ভীর তানপুরার সঙ্গে তাঁহাদের ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত-রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছেন।"

দীনেশ বাবুর এই বর্ণনা মনোজ্ঞ। মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহার এই দুই কাব্য। একটী শৈলনিঃসৃতা মুক্তস্রোতা তরঙ্গিণী, অপরটী ঘনীভূত তুষার খণ্ড; একটীর উদ্দাম ও খর প্রবাহ আমাদিগকে আবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়, অপরটির বাক্য বিরলতা ও নীরব বিশালত্ব আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে। ... বৃত্রসংহার কাব্যে ভাষার আশ্চর্য্য সংযম আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—গূঢ় নাটকীয় কৌশলে কবি আমাদিগের নিকট দুই একটী ইঙ্গিতে সৌন্দর্য্যের অবতারণা করেন। এই ভাষার সংযম ও উচ্ছ্বাস সম্বরণ শক্তির জন্য কাব্যখানি একটু কঠোর শ্রী ধারণ করিয়াছে।"

এই সংযমের মূলে ইতিহাস ও কবিত্ব জড়িত। বৃত্রসংহার কাব্য খানি আমাদিগের নিকট কঠোর নহে। তবে যে পরিমাণে উদ্বোধক সে পরিমাণে প্রকাশক নহে। "বৃত্রসংহার" বিস্তৃত "ভারত সঙ্গীত"! বৃত্রসংহারে যে সকল গভীর বেদনার কথা আছে, যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাহা "মেঘনাদবধে" নাই।

আধুনিক কালে জাতীয় জীবনে যে অভিনব স্ফূর্ত্তি ও একতার লক্ষণ চতুর্দ্দিক হইতে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার প্রাগ্‌ধ্বনি হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত হইতে প্রাপ্ত। বঙ্কিম বাবুর "বন্দে মাতরং" ও রবীন্দ্র বাবুর "অয়ি ভুবনমোহিনী" সেই ধ্বনির মন্দীভূত সুন্দর ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।"

হেমচন্দ্র বঙ্গীয় কাব্যে পুরুষভাব সঞ্চার করিয়াছেন। এ গৌরব হেমবাবুর নিজস্ব। বাঙ্গালার ভবিষ্যতাকাশে তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অক্ষয় ও অমর।

"প্রেমের কবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবিষয়ে বঙ্গীয় কবিগণের অশিক্ষিত পটুতা ও সিদ্ধি সর্ব্বজনসম্মত। হেমচন্দ্রের নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি বঙ্গীয় বালক ও বধূগণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন; চন্দ্রোদয় দেখিলেই "আবার গগণে কেন সুধাংশু উদয় রে" অনেকে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

দীনেশবাবু কবি হেমচন্দ্রের ফটোগ্রাফ আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিয়াছেন, দীনেশবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

কংগ্রেস ও ক্রীড়া প্রদর্শনী—ভাবিবার বিষয় বটে।

অধুনা ভারতবর্ষে তিনটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ঐ আকাঙ্ক্ষাত্রয় তিনটি প্রবল সামাজিক শক্তি। প্রথমতঃ ঘোর দরিদ্রতায় প্রপীড়িত ভারতবাসীগণ স্ববৃত্তির মোহত্যাগ করিয়া শিল্প বাণিজ্যের দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ইহার প্রসর ক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষ। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক অধিকার-লালসা ভারতবাসী জনগণকে পিপাসিত করিয়া তুলিতেছে এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দ্বিতীয় স্থানীয়, কিন্তু প্রসার সংকীর্ণ, যেহেতু প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়েই ইহা নিবদ্ধ। তৃতীয়তঃ আজকল সর্ব্বত্রই শারীরিক উন্নতির প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। ইহা অতি বিস্তৃত; যেহেতু শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই নিজ শরীরের মঙ্গল কামনা করে।... এই দ্বিতীয় শক্তি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের উদ্ভব।... বর্ত্তমান অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষ একত্রিত না হইলে যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ হইবে না, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই।"

তাই কংগ্রেসের নেতাগণ শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়া ভারতের রাজকুল হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকল সম্প্রদায়কে স্বদলে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এখন চারিদিকে পরিলক্ষ্যমান শারীরিক উন্নতি প্রয়াসরূপ তৃতীয় সামাজিক শক্তি আত্মসহায় করিয়া লইলেই কংগ্রেস আশানুরূপ বললাভ করিতে পারিবে।"

কংগ্রেসের সম্বন্ধে নবপ্রভায় বিস্তৃতভাবে একাধিকবার আলোচনা করা হইয়াছে।

অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার—আণুবিক বিচলন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

জর্ম্মাণ দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ—গুয়েবর, বুলার, কীলহর্ণ. রাষ্ট, এগলিঙ্গ, জেকোবি এই ছয়জন পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বিদ্যার্থী—গল্পের উদ্দেশ্য ও সৌন্দর্য্য আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না।

আদিকাব্য—বিজয় বাবুর মতে রামায়ণ মহাভারতের পর রচিত হইয়াছে।

কোহিনুরের কথা—কোহিনুরের ইতিহাস! এ পুরাতন কাসুন্দি আর কেন?

বঙ্গদর্শন। আষাঢ়।

গ্রাম—কবিতা সুন্দর।

ভরত—দীনেশ বাবুর উপযুক্ত হইয়াছে।

"রামায়ণ কাব্যের একমাত্র আদর্শ চরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই"।

পিতা দশরথ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। পাছে ভরতের মন বিচলিত হয় এই ভয়ে ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই রামচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম ও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ মধ্যে মধ্যে নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন নাই। দশরথের মৃত্যুর পর কৌশল্যার কটুক্তিতে ভরতকে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। লক্ষ্মণও বারংবার "ভরতস্তবধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব" বলিয়া আস্ফালন করিয়াছিলেন।

"দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্য চরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।"

প্রকৃতি পুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সূত্র চালনা করিয়া কৈকেয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? বিশ্বময় যে ভরতকে সন্দেহ করিয়াছিল—তাহার মূল কৈকেয়ী।

"সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্ল পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক ব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্ট হইলেন। শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রীকামনায় কৈকেয়ী যেসকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। ভরত তাঁহার মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন তাহা তাঁহার মহা দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি। তুমি ধার্ম্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী।

তুমি আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।

একথা গুলি ভরতের উপযুক্তই হইয়াছে। ঘটনাবলী যতই জটিল ভাব ধারণ করুক না কেন, একটু প্রবেশ করিয়া দেখিলে সকলেই তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

"রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের অনেক কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্ব্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, কোন কোন জন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে তুমিও সেইরূপ করিয়াছ। কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুত নাই, পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে।

দীনেশ বাবু ভাল উকীল হইতে পারিতেন, ভাল বিচারক হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ভরতকে অনেকে সিংহাসন চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি চোর নহেন। ভরতের চরিত্রে অভাবাত্মক গুণ দেখা যায়, ভাবাত্মক গুণ অধিক দেখা যায় না। যন্ত্রণার অগ্নি পরীক্ষায় তাঁহার চরিত্র কখন দীপ্তিময় হয় নাই। চরিত্র গৌরব দোষের ন্যূনতায় নহে, গুণের আধিক্যে। পিতা পর্য্যন্ত যখন ভরতের চরিত্রে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই তখন বুঝিতে হইবে, ভরতের অসাধারণ চরিত্র মহিমা ছিল না। রামের বা সীতার বা লক্ষ্মণের চরিত্রে যে ত্যাগ স্বীকার আছে, ভরত চরিত্রে তাহা নাই। বাল্মীকি ইচ্ছা পূর্ব্বক ভরতের চরিত্র আদর্শস্থানীয় করেন নাই। দীনেশ বাবু তাহাকে ঠিক আদর্শ বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন।

মৃচ্ছকটিক—কাহারও মতে কালীদাসের সময়ের বহু পূর্ব্বে রচিত, আবার কেহ কেহ বলেন শকুন্তলার বহু পরবর্ত্তী সময়ে রচিত। বিজয় বাবুর মতে মৃচ্ছকটিক ৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ।

নৌকাডুবি—উপন্যাস। এখনও চলিতেছে। মন্দ নহে।

স্বপ্নতত্ত্ব—প্রবন্ধটি শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী।

মেঘোদয়—কবিতা মন্দ নহে।

বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন—কবিতাটি Holmes 'The oldman's Dream এর অনুকরণে লিখিত।

সার সত্যের আলোচনা—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর. ইহার সমালোচনা করা অনাবশ্যক; লেখকের নামই যথেষ্ট।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ, ও আষাঢ়।

"কাপুরুষতা" কথা সত্য।

"মহামতি গ্লাডষ্টোন ভারত বাসীর জন্ত কিছুই করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, ভারত-বাসী কাপুরুষ ; যে কাপুরুষ, সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং তাহার জন্ত চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র"। পুলিস যখন আসিয়া বলিবে. "তোমার জল নিমগ্ন পুত্রকে তুমি খুন করিয়াছ,অত-এব তোমায় চালান দিব" তখন তুমি যে তাহাকে ৫০০ টাকা ঘুষ দেও, ইহা কি তোমার কাপুরুষতা নহে? দেশে আইন আছে, বিচারক আছে, বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট আছে. লাটের কাউনিসল আছে, একবার বীরের ন্তায় দাঁড়াও দেখি ; বল, "দেও তুমি চালান আমি ঘুস দিব না"। তখনই দেখিবে পুলীস বাবাজীর মুখ চুণ হইয়া যাইবে।

একজন গোরা মদ খাইয়া গোলযোগের মধ্যে গুলি ছাড়িয়া দিল, নগরের ভূতনাথ নামক এক জনের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল। পুলিস আসিল, তোমরাও সকলে পলাইলে। ২।১ চাষাকে পুলিষ ধরিয়া সাক্ষী দিল, বহু সাহেবের মধ্যে কেহ সনাক্ত করিতে পারিল না, তাই ইউরোপীয় জুরীর বিচারে সে বেকসুর খালাস হইল। যদি তোমরা দশজন যাইয়া তাহাকে ধরিয়া দেখিতে পারিতে, এবং পুলিসকে ধরাইয়া দিতে পারিতে, তবে কি ইহার প্রতিবিধান হইত না?"

কথাটা শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করাই কঠিন। আশা করি লেখক নিজের উপদেশ গুলি নিজে কার্য্যে পরিণত করেন। Example is better than precept.

উত্তরাখণ্ড—উত্তরাখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আসিব—কবিতা। গোবিন্দ চন্দ্র দাসের লেখনী ক্রমে ভোঁতা হইয়া যাইতেছে। এই বেলা সাবধান হউন।

উপনিষদের উপদেশ—নিত্য নিরবয় ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এই অনিত্য সাবয়ব জগৎ প্রসূত হইল পিতা অরুণি শ্বেতকেতুকে বুঝাইয়া দিতেছেন। এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু নমুনাটি ভাল।

কয়লার খনি—যাহাদিগের কয়লার খনি আছে তাহারা ইহা হইতে অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা—একটিও ভাল লাগিল না।

"ইংরাজ রাজত্বে শিক্ষা"—এখনও চলিতেছে।

বিশ্বামিত্র—কবিতা মন্দ নহে!

নহি উপযুক্ত আমি, দেব দয়াময়,
লভিবারে ব্রাহ্মণত্ব ; আমার হৃদয়

স্নেহ প্রেম বিজড়িত। কহিলেন ঋষি।
কহিলেন ব্রহ্মা তারে, সাদরে আশ্বাসি,
স্নেহহীন নির্ম্মমতা ব্রাহ্মণত্ব নহে।
জানি, যে সন্তাপে সদা তব চিত্ত দহে।
সে সন্তাপ নাহি যার সে নহে ব্রাহ্মণ।
স্নেহময় লোক হিতে হও নিমগন।

ইহাতে অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিতে পারেন: কিন্তু আমরা আপত্তি করি না।

শ্রীমদত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর—জীবনী।

"শ্রীকৃষ্ণাবতার ব্রজভূমে এই যে দ্বাদশ গোপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন. তন্মধ্যে সুবাহু যে ব্রজে গোপা দত্ত উদ্ধারণখ্যাক "অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গাবতার তিনিই উদ্ধারণ দত্ত নামে বিখ্যাত।

১৪০৩ শকে ত্রিবেণী তীরবর্ত্তী সপ্ত গ্রামে শ্রীকর দত্তের ঔরসে ভদ্রাবতীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। পুত্রের নাম শ্রীনিবাস, উপাধি দত্ত, ও শাণ্ডিলা গোত্র; তিনি ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করেন। ৬বৎসর নীলাচলে, এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে অর্থাৎ ১৪৫৩ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী দিবসে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। শ্রীবৃন্দাবনের বংশী তটের নিকট এখনও তাহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের যে স্থানে বাস ছিল, সেই স্থানে একটি বহু কালের মাধবী লতা আছে। প্রবাদ আছে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে অন্ন ভোজন করিয়া "ভাতের কাঠি" এস্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন, তাহাই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। এস্থান বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ পীঠের মধ্যে একটি পীঠ। হুগলী বালীগ্রাম স্বর্গীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে পূর্ব্বকালের ভাস্কর নির্ম্মিত দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের দারুময় স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছেন, প্রতিদিন তাঁহার পূজা হয়।

আর্য্য বংশের উৎপত্তি—চন্দ্র গুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক প্রভৃতি রাজাগণ যে বংশে সমদ্ভুত হইয়াছিলেন, তাহার নার নাম মৌর্য্যবংশ। লোকের মতে মৌর্য্যগণ প্রাচীন আর্য্যজাতির একটি শেষ শাখা; আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতে প্রবেশ করেন।

পঞ্জাবের পাঠান প্রদেশ—পঞ্জাবীয় পাঠান প্রদেশের বিবরণ। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের লেখনী সকলেরই সুপরিচিত।

হেমচন্দ্র—প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

কবির তিনটী জিনিস আবশ্যক.—পবিত্রতা সাধন ও সুকণ্ঠ। আমাদের আদর্শমত কবি মাইকেল হেমচন্দ্র বা রবীন্দ্র নাথ কেহই নহেন। প্রকৃত কবি এখনও বঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

হেমচন্দ্রও রবীন্দ্র নাথ অন্যান্য অনেক কবি অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রে তুলনা হয় না। উভয়ে ভিন্ন জাতীয়। হাতী ঘোড়ার কি তুলনা হয়?

রবীন্দ্রের বিশেষত্ব সুকণ্ঠে, এমন মধুর পদাবলী আর শুনি নাই। ইংরাজের টেনিসন বাঙ্গলার রবীন্দ্র, "সুকণ্ঠে রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গলা ভাষার অদ্বিতীয় কবি।

হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষত্ব এই তেজ এই উদ্দীপনা। তিনি যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, নিদ্রিতকে জাগরিত, অলসকে শ্রম-পরায়ণ, রোগীকে সুস্থ, বৃদ্ধকে যুবা, এমন আর কেহ পারেন নাই। অন্যান্য ভাবে কেহ তাঁহার সমকক্ষ, কেহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ আছেন, কিন্তু উদ্দীপনায় তাঁহার তুল্য কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তাঁহার আহ্বানে কত যুবা একদিন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল. অচল দৃঢ় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কতবার বিচলিত হইতে হইয়াছিল। স্বদেশ প্রেম হেমচন্দ্রকে উন্মত্ত করিয়াছিল।"

এরূপ কবিও "প্রকৃত কবি" নহেন কি?

হিন্দুত্ব এবং ত্রয়োদশ লিও।

ত্রয়োদশ লিও ধর্ম্ম-সংস্কার-সম্পাদন-প্রয়াসী ছিলেন। ইদানীং ইউ-রোপে খৃষ্টের জয়জয়কার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্ম যেন একবাক্যে বলিল "Back to Jesus"—"খৃষ্টে প্রত্যাবর্ত্তন কর"। ভারতেও অধুনা Back to Krishna "পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর" এই বাক্য শ্রুত

হইল। ইউরোপে—কাজে কিরূপ খৃষ্টভক্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, "ইম্পিরিয়ালিজম" এ, চীন সমরে, ট্রান্সভাল যুদ্ধে, এবং হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিত Re-barbarisation নামক প্রবন্ধে, তাহার দিব্য পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গে – শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় বর্ত্তমান কালে কিরূপ জাতীয় উন্নতি হইতেছে, বাঙ্গালীর স্বার্থপর, অর্থলুব্ধ, হেয় জীবনে, দিন দিন পরিবর্দ্ধমান কাপুরুষতায় পরিলক্ষিত হইতেছে। ইউরোপে এবং বঙ্গে, যুগপৎ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে বোধ হয়, বাহিরে যাহাই হউক না কেন, অন্তরে ক্রমেই ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট হইতেছে।

য়ুরোপে, বিজ্ঞান, আত্মসীমা অতিক্রম করিয়া, (ধর্ম্ম) বিশ্বাসকে অযথা আক্রমণে দুর্ব্বল করিয়াছে; বঙ্গে, ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী, শাসনকর্ত্তাদিগের বিলাসী বণিজিক জীবনের ধনোপার্জ্জন-লালসার দৃষ্টান্ত, হিন্দুকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। তাই, য়ুরোপে বাইবেলের ভূরি সংস্করণ হইয়াও, বাইবেল কেবল রসনায় নৃত্য করে, হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই, গীতার বিবিধ ব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়াতেও গীতা এক কর্ণে প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির্গত হয়, অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না, জীবন স্পর্শ করে না। তাই, য়ুরোপে জর্ম্মান সম্রাট্ হইতে মূর্খ সৈনিক পুরুষ পর্য্যন্ত, নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, লোমহর্ষণ পীড়নপূর্ব্বক নারীহত্যা প্রভৃতি বিবিধ পাপদিগ্ধ সংগ্রামে, খৃষ্টের এবং বাইবেলের উদ্বোধন করিতেছেন। তাই, বঙ্গেও, যিনি সম্পত্তিশালী হইয়াও দ্বারস্থ দরিদ্র আতুরকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে কাতর, যিনি অর্থ উপার্জ্জন কালে কোনই তঞ্চকতা বা পাপে পরাঙ্মুখ নহেন, যিনি ভরপুর বিলাস রসে মগ্ন—তাঁহারাও গীতা গীতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমে, অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবে, বিহ্বল হইয়া, নিজে মজিতেছেন দেশকে মজাইতেছেন। ইউরোপেএবং ভারতে বাহিরে সংস্কারের চেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু অভ্যন্তরে অবনতি স্রোতস্বতী প্রখরা—ক্রমশঃ অধিকতর বেগবতী হইতেছে। কেন? দার্শনিক ইহার উত্তর দেন।

ইউরোপে, খৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচারিত সাম্য, তাঁহার অনাথ সেবা, এক্ষণে শ্রমীদিগের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে, এবং দীনদুঃখী শ্রমীদিগের নেতা—রস্কিন টলষ্টয় প্রভৃতি, জীবন ও গ্রন্থ দ্বারা, তাহা প্রচার করিতেছেন। ত্রয়োদশ লিও তীক্ষ্ণদর্শী, হৃদয়বান্। তিনি বুঝিয়াছিলেন দরিদ্র সাধারণ লোকের উন্নতি ধর্ম্মের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্মনীতির উপর ধননীতিকে স্থাপিত করা উচিত। তাই, তিনি শ্রমজীবীগণ সম্বন্ধে একটী ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

ইউরোপে এক্ষণে একটা আশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবের অনুষ্ঠান হইতেছে। পরহিত-ব্রতধারী, উদারচেতা দীনবন্ধু, বীর পণ্ডিতগণের নেতৃত্বে ও শিক্ষায়, শ্রমীগণ দলবদ্ধ হইতে শিখিতেছে; এই বীর, নেতাগণ প্রায়ই ধনীর সন্তান; কিন্তু দরিদ্রদিগের দুঃখ এই ঋষিকল্প মহাত্মাগণের হৃদয়ে অসহ্য। তজ্জন্য তাঁহারা কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া দেশে বিদেশে চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। কার্য্যতঃ তাহারা খৃষ্টের শিষ্য—এই নবযুগে নব পিটার ও পল; লিয়োও খৃষ্টের এই নবযুগের শিষ্য-শ্রেণীর মধ্যে স্থান লইয়াছিলেন। তাই শ্রমীদিগের সম্বন্ধে ঘোষণাদি প্রচার করিয়াছিলেন। —হতভাগ্য নীচস্বার্থাকুল বঙ্গে, ধনীদিগের মধ্যে, জমীদারদিগের মধ্যে, শ্রমীগণের বন্ধু, শ্রমীগণের নেতা ও শিক্ষক, কবে আবির্ভূত হইবেন? বর্ত্তমান গীতাপাঠক ও শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যে কেহ কি লিওর ন্যায় দরিদ্রের জন্য কোন ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করিতেছেন? জমিদারদিগের মধ্যে কেহ কি কৃষকদিগের দুঃখ মোচনের জন্য নূতন জমীদারি কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করিবার জন্য চিন্তা করিতেছেন? কে?—এখানে যে কৃষকদিগের দুঃখ কেহ বলে না! উদার সংবাদপত্রও জমীদারের একটুকু অসুবিধা হইলেই, চীৎকারে কর্ণ বধির করিবেন, কিন্তু দরিদ্র প্রজা, দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীর, অশেষ কষ্ট দেখিলেও নির্ব্বাক নির্ব্বিকার। এখানে ধর্ম্ম প্রচারক দীন হীন কাঙ্গালের কুটীরে পদার্পণ করিতে তত অগ্রসর নহে, যত রাজপ্রাসাদ বা পৌর বাক্‌মন্দিরে আপনাকে শব্দিত করিবার জন্য ব্যাকুল। ক্যাথলিক সম্প্রদায়, পোপ যাহার চূড়ামণি, তাহা আজিও জীবিত আছে কেন? খৃষ্টান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে য়ুরোপে দেব দেবীর উপাসনা যেমন তিরোহিত হইল, তেমনি প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয় অভ্যুদয়ে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোপ হইল না কেন? তাহার কারণ, "রিফরমেশনর" আরম্ভের সময় হইতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র অর্থাৎ সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থ মহতী চেষ্টা, বিপুলত্যাগ স্বীকার—মহৎ জীবন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

হিন্দু ধর্ম্ম যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, তাহা হইলে সাধারণ লোকের যাহাতে মঙ্গল হয়, দরিদ্রের যাহাতে দুঃখ মোচন হয়, শ্রমী যাহাতে তাহার ধর্ম্মত প্রাপ্য পারিশ্রমিক লাভ করে, তৎপক্ষে হিন্দুগণের কায়মনো-বাক্যে চেষ্টা করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ, হিন্দু ধর্ম্মের আত্মা তাহা স্বীকার করিলেও, সর্ব্বজীবে ব্রহ্মকে দেখিতে শিখিয়া শূদ্র ও দরিদ্রকে ব্রাহ্মণ আপনার ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিবেন।

ত্রয়োদশ লিও এমন বিজ্ঞতা, উদারতা ও বিশাল-হৃদয়তার সহিত সমাজের সমুদয় বিষয়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, বিরুদ্ধ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ-রাজ এডওয়ার্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম্ম সমন্ধে অনেকের যে কুসংস্কার ছিল তাহা অনেকটা অপনীত হইয়াছে, এবং পোপের পদ এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও পূর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি ভাজন হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন পোপ পৃথিবীর তাবৎ ক্যাথলিকের সম্রাট, এক্ষণে পার্থিব জগতে ওরূপ একজন সম্রাট দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় জগতে প্রাচীন রোমক সম্রাট ঐরূপ ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মে বা অন্য কোন ধর্ম্মে এরূপ একছত্র সম্রাট দেখা যায় না। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য যদি একজনে সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে কি একটী মহীয়ান্ ব্যাপারের সংঘটন হয়। ন্যায়তঃ পোপ পার্থিব রাজত্বের অধিকারী লিও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। ঋষি ও রাজা যদি এক ব্যক্তিতে সম্মিলিত হয়, সেই রাজর্ষি দ্বারা জগতের মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। এবিষয় পাঠক জোলার "রোম" নামক উপন্যাস পাঠ করিবেন। ভারতবর্ষে যদি হিন্দু ধর্ম্ম এখন প্রচার হইয়া, প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী করিয়া প্রাদেশিক ধর্ম্মমণ্ডল স্থাপিত হয়, এবং এই প্রাদেশিক ধর্ম্ম-মণ্ডলীর সভাপতিসমূহ দ্বারা, সমুদয় ভারতবর্ষের একটী বিরাট ধর্ম্মমণ্ডলীর সভা-পতি নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মে পোপের মত একটা পদ কালে সৃষ্ট হইতে পারে। আপাততঃ যেমন রাজনৈতিক কংগ্রেস, সামাজিক কংগ্রেস বা কনফারেন্স, শিক্ষা কংগ্রেস হইতেছে, তেমনি যদি কিছুকাল পরে, হিন্দুধর্ম্ম কংগ্রেস স্থাপিত হয়, তাহার নির্ব্বাচিত সভাপতি, হিন্দু ধর্ম্মে পোপস্থানীয় হইতে পারেন। কোনও ভাবী হিন্দুধর্ম্ম-কংগ্রেস কি ভারতের গৌরব-কিরীটী মস্তকে ধারণ করিবে? কে বলিতে পারে?

আমরা ত্রয়োদশ লিওর জীবন আলোচনা করিয়া কিছু শিখিতে পারি।— (১) সাধারণের লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল হইলে ব্যক্তি বিশেষ প্রবর্ত্তিত সামাজিক সংস্কারে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। (২) প্রাচীন যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাহে, তাহাকে নবীনের সারভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) প্রকৃত ধর্ম্ম সাধারণ অর্থাৎ দরিদ্র ও মূর্খ লোকের উদ্ধারের জন্য প্রয়াসী। (৪) বৈচিত্র্যের ভিতরও ঐক্য থাকিতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের নানা শাখা প্রশাখা একজন সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মোপদেষ্টা কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইতে পারে।

শ্রীমতীর নিবেদন।

—o—

I am my beloved's and my
beloved is mine—Solomon.

প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ তুমি সে আমার—
আদরে হৃদয়ে ধর, অথবা বিরহে
দগধ করহে প্রাণ, অথবা চরণে
দলিত করহ মোরে, কিম্বা ব্রজকুঞ্জে
বাজাও মোহন বাঁশী, ব্রজের জীবন !
রহ যথা তথা, যে ভাবে রহহে তুমি,
রাধার হৃদয়-মণি তুমি, শ্যামধন ;
রাধার সর্ব্বস্ব তুমি, সর্ব্বপ্রাণময়,
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার চরণে,
বিলাস, বিহার, স্বপ্ন তুমি রাধিকার—
তাই, প্রাণনাথ ! বলি' সম্বোধিনু তোমা,
যদিও রয়েছ ছাড়ি চির-অধিনীরে ;
প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ বলি শতবার !
বরষি' উপল, তর্জ্জন গর্জ্জন করি
ত্রাশে জলধর ক্ষুদ্র-চাতকিনী প্রাণ—
চাতকিনী কিন্তু সদা মেঘবিলাসিনী।

প্রাণনাথ ! সত্য কি হে ভুলেছ আমারে !
সত্য কি ভুলেছ, শ্যাম, বৃন্দাবন-লীলা—
ময়ুর বন-বিহার, মধু-রাসোৎসব,
যমুনা-বেতস-বন, সে নীপ সুন্দর,
মধুর মধুর সব, মধুরতাময়—
সত্য কি ভুলেছ, শ্যাম, ব্রজগোপিনীরে !

(ক্রমশঃ)

———

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

অষাঢ়, ১৩১০।

১লা আষাঢ়, ১৬ই জুন। কারাগিয়ার পিটির সার্ভিয়ার সিংহাসন আরোহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।...হঙ্গারিয়া প্রদেশের পার্লিয়ামেণ্টের প্রধান সচিব হার জেলি (Herr Szelli) পদ ত্যাগ করেন। "অষ্ট্রো-হঙ্গারী সাম্রাজ্যে হার্জ্জিগোভিনা নগরে ১১৫ ডিগ্রী উত্তাপ পড়ে। ঐ স্থানে প্রায় ৮০০ শত সৈন্য কুচ কাওয়াজ করিতেছিল; তাহাদিগের অর্দ্ধেক অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—আবার ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলির মৃত্যু হয়।"—

২রা আষাঢ়, ১৭ই জুন সিনিয়র জানারজেলি ইতীলীর নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

৩রা আষাঢ় ১৮ই জুন। উল উইচ অস্ত্রাগার হইতে লিডাইট গোলা ফাটিয়া যাওয়াতে অনেক গুলি লোক হত ও আহত হয়, আটটি বাড়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং নগর কাঁপিয়া উঠে।

৫ই আষাঢ় ২০শে জুন। ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের রোমান ক্যাথালিক আর্চবিশপ কার্ডিনাল ভোগমের মৃত্যু হয়।

৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ' আমেরিকান, ডচ্ এবং তুরস্কীয় দূত সকল বেলগ্রেড পরিত্যাগ করে।

১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন। খিদিভ লণ্ডনে পঁহুছেন।

১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন। সম্রাটের জন্মোৎসব অদ্য সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বের ন্যায় কতক গুলি উপাধি বর্ষণ হয় কিন্তু ভারতবর্ষীয় একজন ব্যতীত সকল গুলি বিদেশীর লাভ হইয়াছে।

১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন। কাউণ্ট খুয়েন হেজবভরি হাঙ্গারী নূতন মন্ত্রী সভা গঠন করেন।

১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন। স্পেনে নাজেরিলা নদীগর্ভে একখানি ট্রেন নিমজ্জিত হয়। ইহাতে বহুলোক হত ও আহত হয়।

১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন। সংবাদ আসে যে গত ১লা মে তারিখে জেডস্থানে আবিসিনীয়ানগণ মোল্লার সৈন্যকে পরাজিত করে।

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই। খেদিভ লণ্ডন হইতে ইউরোপে প্রস্থান করেন।

২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই। রোমের পোপের শারীরিক অসুস্থতা ফুস্ফুসে বিকার হইয়াছে সংবাদ আসে। পীড়া অতি কঠিন ও সাংঘাতিক।

২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই। ফরাসী মন্ত্রী সভার সভাপতি প্রেসিডেণ্ট লুবে লণ্ডনে পৌছান এবং ইংলণ্ডেশ্বর, প্রিন্স অব ওয়েলস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই। গ্রীসে ভয়ানক অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছে। গ্রীকা মন্ত্রীসভায় সভাপতি থিয়টাকিস পদত্যাগ করিয়াছেন।

২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই। বুলগেরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে শীঘ্রই বিবাদ বাধিবে এইরূপ জানা যায়।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই। ডব্লিউ, ঈ, হেনলি কবি ও সমালোচকের, এবং অষ্ট্রো হঙ্গারীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব আয় ব্যয় সচিব বেঞ্জামন কালের মৃত্যু সংবাদ আসে।...বাজুরার নিবটবর্ত্তী দুইটি অরণ্য দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে শুনা যায়।

৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই। বেলুচী সীমান্ত প্রদেশস্থ মাজারি জাতির সর্দ্দার নবাব সার ইমাম বকস খাঁ কে, সি, আই, ই,'র মৃত্যু হয়।...পোপের অন্তিম অবস্থা জানিতে পারা যায়।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ভবানিপুর ১৬নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীরণেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড ভাদ্র, ১৩২০। ৫ম সংখ্যা।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম. এ., বি. এল. ও
শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি. এল. সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৷৷০ টাকা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১০ সাল [৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

রাজা বল্লালসেন।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবভুক্ত প্রমাণপুঞ্জ দ্বারা রাজা বল্লালসেনকে অক্ষত্রিয় এবং অ-বৈদ্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাঁহার কায়স্থজাতিত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি। রাজা বল্লালসেন যে কায়স্থবর্ণভুক্ত ছিলেন, নিম্নলিখিত প্রমাণ সমূহে তাহা জানা যায়।

১ম প্রমাণ।—বঙ্গের কায়স্থেরা সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐতিহাসিক কাগজ পত্র এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা জানিতে পারি, বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির অনেকে রাজা ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পাল উপাধিধারী ৩ জন, শূর উপাধিধারী ৫ জন, রায় উপাধিধারী ১১ জন, সিংহ উপাধিধারী ৩ জন, নন্দী উপাধিক ৭ জন, দত্ত উপাধিক ৪ জন, দাস উপাধিক ছয় জন, ভৌমিক উপাধিধারী ৬ জন, কায়স্থ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। মন্ত্রিকার্য্যে অধিকাংশ কায়স্থই নিযুক্ত হইতেন, বৈদ্যের নাম গন্ধও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় বল্লাল সেনকে কায়স্থ রাজা বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বা অসম্ভব হইবে কেন? ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, রাজার জাতির লোক রাজত্ব করিয়াছিল, ইহাই সঙ্গত ও সম্ভব।

২য় প্রমাণ।—শূর ও সেন এতদুভয়ই কায়স্থের উপাধি; শূর বৈদ্যের উপাধি নহে। ত্রিপুরা, মণিপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের শূরোপাধিক কায়স্থদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে,

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও এই প্রাচীন ও প্রখ্যাত প্রবাদে বিশ্বাস করিয়াছেন। সুতরাং সেন বংশ বা শূর বংশকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও অনেকে "মিত্র মজুমদার" এই উভয় উপাধি একত্রে ব্যবহার করেন; শূর-সেন অথবা সেন-শূর এই উপাধিদ্বয় এখনও কায়স্থ সমাজে প্রচলিত।

৩য় প্রমাণ। কায়স্থ জাতির প্রাধান্য স্থাপন, কায়স্থ জাতিকে মন্ত্রিত্ব এবং সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান, কায়স্থকে ব্রাহ্মণের ন্যায় কৌলীন্যে ও মৌলিক্যে বিভাগ করণ, ইত্যাদি কার্য্যে বল্লালসেনকে কায়স্থ স্থিরকরা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

৪র্থ প্রমাণ।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক (পঞ্চবটী) নগরের কয়েকক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ লুণামঠ (Loona Cave) অতি প্রাচীন বৌদ্ধাশ্রম। এইস্থানে যে সকল প্রস্তর ফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার একটিতে সেনবংশের কিঞ্চিৎমাত্র উল্লেখ আছে। লিখিত আছে—"বঙ্গাধীশ্বর বল্লাল করণঃ" ইত্যাদি। করণ, কায়স্থের নামান্তর মাত্র। আর একটিতে লিখিত আছে "ব্রাত্য ক্ষত্রিয়কুলেশ্বর বল্লাল নাম বঙ্গেশ্বর" ইত্যাদি। শ্রীমৎ গোপতিভট্ট তাঁহার বল্লালচরিত গ্রন্থে কায়স্থ দিগকে পুনঃ পুনঃ ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫ম প্রমাণ।—বল্লালসেনের চারিটি সহধর্ম্মিণী ছিল, ইহাদের দুইটি কায়স্থা, ইহারাই বল্লালের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বিবাহিতা পত্নী। চতুর্থী স্ত্রী অতি নীচজাতীয়া ছিল, তাহার বিবরণ পরে লিখিব, এটি রাজার উপপত্নী। তৃতীয়া স্ত্রীও উপপত্নী, এই রমণী বাঙ্গালিনী ছিল না, এ দক্ষিণাবর্ত্ত (সম্ভবতঃ দ্রাবিড়) হইতে রাজার পরিতুষ্টির জন্য আনীত হইয়াছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন "Vallal family also came from the Deccan" এইস্থানে family শব্দে শাস্ত্রী মহাশয় যদি "বংশ" বা "সহধর্ম্মিণী" অর্থ করেন তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দ্রাবিড় দেশ হইতে রাজবংশ আসিয়া বাঙ্গালায় এতটা প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের বিরোধী, শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় ভ্রম বশতঃ উপপত্নীকে family (স্ত্রী) বলিয়া এরূপ লিখিয়াছেন। শূর বা সেন বংশ বঙ্গদেশীয়, ইহাঁরা বিদেশীয় নহেন। কায়স্থ জাতীয়া কন্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় বল্লালকে কায়স্থ বলা অন্যায় হইবে কেন?

৬ষ্ঠ, প্রমাণ।—বঙ্গের ইতিহাসে আমরা বুদ্ধিমন্ত খাঁ, কালীদাস নন্দী, কচু

রায়, প্রতাপাদিত্য, দলপতি রায়, ঘনশ্যাম পাল, প্রেমানন্দ, চণ্ডদ্বীপাধিপতি, ভবানন্দ, রামচন্দ্র, বসন্তরায়, সীতারাম, পাতালভেদী, শিবচন্দ্র বিশ্বাস, বস সিংহ ভৃগু নন্দী, নারায়ণ দত্ত, কর্কট নাগ, মুকুট মণি প্রভৃতি অনেক কায়স্থ জাতীয় রাজার নাম পাইয়াছি ; অনেক কায়স্থ রাজবংশের পরিচয় পরিস্ফুট রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভৌমিক উপাধি ধারী পূর্ব্ব বঙ্গীয় ছয় জন কায়স্থ রাজা ছিলেন। আদিশূরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা অধিক পূর্ব্বে এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে বা অধিক পরে সমুদয় রাজবংশ কায়স্থ, সুতরাং বল্লালকে কায়স্থ বলা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। বল্লালসেন বৈদ্য হইলে তাঁহার ন্যায় দাম্ভিক নরপতি নিজবংশকে অকুলীন করিতেন না।

৭ম প্রমাণ।—ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শূর বংশ খুব প্রাচীন রাজবংশ, এই বংশের স্থানীয় ভাব (indigenous) দেখিয়া ইহাদিগকে বিদেশীয় বলা যায় না। এই শূর জাতীয় লোকেরা খুব সম্মানিত কায়স্থ জাতি। এখানে বৈদ্য জাতির লোকেরা কায়স্থাপেক্ষা সহস্র গুণে নিকৃষ্ট।

আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না ; অন্যান্য আরও অনেক কথা লিখিতে বাকী আছে। এস্থলে দুইটি আপত্তি খণ্ডন করা আবশ্যক। পাঠকেরা বলিতে পারেন —

(১) আদিশূরই বঙ্গে কায়স্থ জাতির সৃষ্টি করেন, তিনি নিজে কেমনে কায়স্থ বংশসম্ভূত হইলেন ?

(২) বল্লাল যদি কায়স্থ হইতেন তাহা হইলে "সেন" উপাধিধারী কায়স্থেরা কুলীন হইল না কেন ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাজা আদিশূর বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম কায়স্থ আনয়ন করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বেও কায়স্থ জাতির অস্তিত্ব ছিল। যজুর্ব্বেদ, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মৃচ্ছকটিক নাটক প্রভৃতি বহুল প্রাচীন পুরাণ ও কাব্যে কায়স্থের নাম আছে ; মনুসংহিতার করণ ও কায়স্থ একই। ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বঙ্গের কায়স্থ আদিশূরের বহুশতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ সহিত যে পাঁচজন সহচর আসিয়া ছিলেন তাঁহারাও কায়স্থ ছিলেন, আদিশূর তাঁহাদিগকে এ দেশীয় কায়স্থ সমাজে প্রবিষ্ট ও সংমিশ্রিত করিয়া কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যায় যে, কায়স্থ জাতির কৌলিন্য ও মৌলিক্য প্রথার দিকে প্রথমে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক ; নিম্নে তালিকা দিলাম।

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ।

শ্রেষ্ঠ মৌলিক—সেন, সিংহ, দাস, দে, দত্ত, কর, পালিত।

সাধারণ মৌলিক—৭২ ঘর।

বল্লালের সময়ে বৈদ্যেরা অতীব হীনাবস্থায় পতিত ছিল, ইহারা অতি জঘন্য বৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ব বঙ্গে দিনপাত করিত। রাজাদিগের উপদেশের বিরুদ্ধে সেনোপাধিক কায়স্থেরা বৈদ্যের সহিত সংশ্রব রাখায়, বল্লাল সেন "সেন" কায়স্থ দিগেকে কুলীনের মধ্যে গণ্য না করিয়া "তাজা মৌলিক" মধ্যে গণ্য করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে সেনদিগের সামাজিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এবং বল্লাল-মন্ত্রিগণ নিরপেক্ষতা, নির্ভীকতা এবং ধর্ম্ম পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন। বল্লালের এই খানে একটু প্রশংসা করিতে আমি বাধ্য, কারণ এই অভিমতে ও সিদ্ধান্তে বল্লাল সেন প্রতিবাদ করেন নাই। আদিশূর ত্রিপুরা ও মণিপুরের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সুবর্ণ গ্রামে বল্লাল সেনের জন্ম হইয়াছিল।

অতঃপর, আমরা রাজা বল্লালের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। বলা বাহুল্য, রাজা বল্লাল ঘোরতর মদ্যপায়ী এবং ব্যভিচারী ছিলেন। তিনি অনেক সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করেন; হিন্দু কুলে তিনি সেরাজুদ্দৌলা রূপে পরিগণিত হইতে পারেন।

একটা অতি নীচ ডোমজাতীয়া কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়া রাজা বল্লাল সেন তাহাকে পরিণামে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ডোমনী উপপত্নী রূপেই রক্ষিতা ছিল। দামোদর শর্ম্মা নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত "বল্লাল বিকারোদয়" নামে এক সংস্কৃত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; শ্রীনারায়ণ নামে এক পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় উঁহার সংক্ষিপ্ত সার (syllabus) প্রণয়ন করেন।

"দামোদর বানাইলা গোটা বল্লাল বিকার।
শ্রীনারায়ণ কৈলা ইপ্লো কুঞ্চমেতে সার॥

অর্থাৎ, দামোদর শর্ম্মা বল্লাল বিকারোদয় নামে যে বিস্তৃত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীনারায়ণ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। দামোদর শর্ম্মার পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীনারায়ণের পুস্তক বর্ত্তমান আছে, ইহা সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে বিরচিত। এই পুস্তকে বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দি, সংস্কৃত, এবং তেলুগু শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, কিন্তু পারস্য শব্দ একটিও দেখিতে পাই না। গ্রন্থকার শ্রীনারায়ণ তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তৈলঙ্গ

দেশ হইতে উড়িষ্যায় এবং উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালায় বসতি করেন। নানা ভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে তেলুগু ব্রাহ্মণ লেখকের এই প্রথম ও শেষ আবির্ভাব। বল্লাল সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ তাঁহার গ্রন্থে লিখিতেছেন

তেঁহ রাজা কৈলা বিয়া
ডোম কণে থুই হিয়া
পকাইলা সরম গাঁড়িপো
ভাঙ্গি থীলা ধরম গাঁড়িপো ইত্যাদি।

সার্দ্ধদুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার লিখিত যদুনন্দনের মূল ঠাকুর গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

কুক্রিয়া করিতে রাজার নাহি ধর্ম্ম ভয়।
যে কেহ নিন্দয়ে তারে দূর করি দেয়॥
মৃগয়া বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে।
শর্ব্বরী যাপন কৈলা ডোমলোকালয়ে॥
ডোমের ঘরেতে থুই তীর ধনু অসি।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
বিবাহ করিব বলি লইয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ায় তখনি॥

বাবু মহিমাচন্দ্র মজুমদারের "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" পুস্তকের ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"রাজার ব্যবহারে লক্ষ্মণসেন এবং ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। বল্লালসেন এক অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যাকে রাজধানীতে আনয়ন করেন।" ভাদ্র সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় লিখিয়াছেন "এই জন্য বল্লালের বাটীতে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা জলপান করিতে অস্বীকার করেন, রাজা তাঁহার কায়স্থ মন্ত্রীর শিরশ্ছেদের আদেশ দেন, কারণ সৎকুলসম্ভূত কায়স্থ মন্ত্রী রাজার এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।" বৈদ্যকুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে—

শুন সবে অতঃপর বল্লাল কাহিনী।
যে রূপেতে বল্লালেরে অধার্ম্মিক গণি॥
অতীব অধম জাতি ডোমের দুহিতা।

তাহারে বাটীতে রাখে লক্ষ্মণ যার পিতা ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ আদি সবে ছাড়ি গেলা।
বল্লালের কুকরমে বংশ ধ্বংস হৈলা ॥ ইত্যাদি।

মাননীয় H. H. Risley সাহেব মহাশয়ও তাঁহার প্রসিদ্ধ Bengal Castes and Tribes পুস্তক মধ্যেও এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লাল চরিতের পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত কথা গুলি পাঠ করা যায়—

"নিশ্চিতং জারজঃ সোপি দুষ্কর্ম্মা মন্দধীশ্চবৈ।
চণ্ডাল ডমকন্যাদৌ রতোহসৌ সাধুপীড়কঃ।
পরশ্রী কাতরো দ্রোহী পররাজ্য ধনেষু চ ॥"

অর্থাৎ "তিনি (বল্লালসেন) নিশ্চয়ই জারজ, দুষ্কর্ম্মান্বিত এবং মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি ডম প্রভৃতি (অন্ত্যজ জাতীয়া) কন্যাতে আসক্ত; সাধুব্যক্তি-দিগের তিনি পীড়াদায়ক, পরশ্রী কাতর এবং পররাজ্য ও পরধন অপহারক ছিলেন।" অন্যত্র আছে—

প্রভুশ্চ যৌবনস্থোপি তস্মিন্নাসী দ্বিবেকতা।
না হারি ব্রাহ্মণীকন্যা চর্ম্মারকোরি তনয়া ॥
কামাচারোপি দৃপ্তোপি স প্রিয়ঙ্কর কিঙ্করঃ।
কদাচিচ্চ পরস্ত্রীণাং জারত্বং না করোন্নৃপঃ ॥
অসেবি চাণ্ডাল কন্যা রাজ্ঞা দ্বাদশবার্ষিকী।
নটী কন্যা চ সিদ্ধার্থং পাষণ্ডমতবর্ত্তিনা ॥
যাবন্নাসীদ্ ভট্টপাদৈ রুপদিষ্টো মহীপতিঃ।
তাবৎ স কৃতবান্ কর্ম্ম তত্তৎ সজ্জনগর্হিতং ॥

অর্থাৎ "তিনি (বল্লালসেন) যৌবনকালে প্রভুত্ববশতঃ বিবেকশূন্য ছিলেন, এবং যদিও তিনি ব্রাহ্মণী হরণ করেন নাই, তথাপি চামার, কোরি প্রভৃতি অন্ত্যজ কন্যায় উপগত হইতেন। তিনি যথেচ্ছাচারী ও গর্ব্বিতস্বভাব ছিলেন, দ্বাদশ বার্ষিকী চাণ্ডালিনী নটী প্রভৃতি কন্যায় রত থাকিতেন।"

আমি আর অধিক প্রমাণ দিতে ইচ্ছা করিনা, আর অধিক লিখিবারও ইচ্ছা নাই। রাজা বল্লাল, সুবর্ণবণিক জাতি এবং সুবর্ণবণিকযাজী বৈদিক ব্রাহ্মণ বর্গের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন; তিনি কৈবর্ত্তজাতি এবং কৈবর্ত্ত যাজী পরাশর সম্প্রদায় ভুত ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরাশরী ব্রাহ্মণেরা ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ এবং মধ্যস্থ ব্রাহ্মণ

নামেও প্রখ্যাত। আমরা এ সকল কথার উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। প্রকৃত কথায় বলিতে হইলে, রাজা বল্লাল-সেন, রাজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ ছিলেন, তিনি উচ্চকে নীচ, নীচকে উচ্চ, সম্মানিত বংশকে অমান্য এবং মানহীন বংশকে অকারণে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন।

"বল্লাল যেমন করে তাহার তাহা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥
যাহার বিশংতিলোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানব্বইশকে না ছিল একদা॥

অর্থাৎ ৯৯৪ শকে যে বিংশতি গৃহস্থ অতীব অধম অবস্থায় পতিত ছিল, বল্লাল তাহাদিগকে মর্য্যাদা সম্পন্ন করিয়া দিলেন। কায়স্থদিগের "দত্ত" উপাধিধারীদিগকে তিনি প্রথমে কুলীনমধ্যে গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ডোমকন্যার সংসর্গের বিরুদ্ধে দত্তেরা ঘোরতর আন্দোলন করায়, বল্লালসেন ইহাদের কৌলীন্য রহিত করিয়া ইহাদিগকে মৌলিক মধ্যে গণ্য করিলেন। প্রবাদ আছে যে—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি॥"

শ্রীনারায়ণ তাঁহার সংক্ষিপ্তসার বল্লাল বিকার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বারেন্দ্র ভূমেতে যত কায়স্থ নিবাসী।
রাজ-অন্ন খাইল না, রহি উপবাসী॥
বৈদ্য সহ মিলি গেলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লালের মর্য্যাদায় বঞ্চিত উভজন॥
সুবর্ণবণিক আর কৈবর্ত্তকুলপতি।
রাজার অধর্ম্মে সব রহিলেক মাতি॥
সমাজের অধিপতি গদাধর দত্ত।
বল্লালের অপমানে ছাড়িগেলো সত্ত্ব॥

এইরূপে দেখান যাইতে পারে, বল্লালসেন নিতান্তই অবিবেকী পুরুষ ছিলেন। তিনি নানা প্রকারে আমাদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অত্যাচারে বহুল ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত হিন্দুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, অনেকের তিনি অকারণে প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। বল্লালের পিতার নির্ব্বুদ্ধিতায় আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছি, বল্লালের দুশ্চরিত্রতায় আমাদের

যাহা নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য স্বাধীনতা-রত্ন হইতে কম নহে। পিতা ও পুত্র উভয়েই আমাদের অহিতকারী। রাজা বল্লালসেন স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির কিছু মাত্র কল্যাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। আদিশূর সেন বংশের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ, বল্লাল এই বংশের শেষ রাজা। যে দোষে সেন বংশধ্বংস হইয়াছে—যে দোষে সেনবংশের চিহ্ণ পর্য্যন্ত নাই—ঠিক সেই দোষে ভারতে মোগল রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মোগলকুল শিরোমণি আকবর এবং ধর্ম্মগোঁড়া আওরেঙ্গ জেব্‌ ইহারা ধর্ম্ম ও জাতিকে এক করিয়া সমস্ত দেশের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হয়েন নাই, আদিশূর ও বল্লাল, জাতিও ধর্ম্মকে শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, উভয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে স্থাপন করিয়া হীনবল করিয়া গিয়াছেন। স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে রাজা বল্লালসেন বাঙ্গালার ইতিহাসে এক দুরপনেয় কলঙ্ককালিমার জীবন্তমূর্ত্তি।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

খুকুর মৃত্যুতে।

(কোন ব্যক্তির দুই পত্নী ছিলেন; কনিষ্ঠা, প্রিয়তরা পত্নীর তিনটি পুত্র ছিল; উহাদের মধ্যে একটি এক বৎসর কাল ব্যাধি ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠা পত্নীর একটি কন্যা জন্মিয়া ছিল, এই কন্যাই আমার কাব্যের 'খুকু'। খুকু বৎসর কাল জীবন ধারণ করিয়া সামান্য রোগে অনন্ত ধামে চলিয়া যায়। অভাগিনীর খুকুই একমাত্র সন্তান ছিল।)

(১)

অভিমানে চলে গেলে, খুকু,
ভালই করেছ, মাগো, যেয়ে
আমাকেই দুখ দিয়ে গেলে,
দিলে, দিলে, রহিব সহিয়ে।

(২)

ভাল করে মা দেখিতে, খুকু,
চলে গেলে তৃষা না মিটিতে—
বুকের বুকেতে তুলে নিয়ে
প্রাণ ভরা ভাল না বাসিতে।

(৩)

প্রাণ ভরা ভালবাসা, খুকু ?—
মুখের (ও) আদর করি নাই,
কত হেলা করেছি, বাছনি,
মা হয়ে, মা, তোমাকে সদাই।

(৪)

যে দিনে আসিলে হেথা, খুকু,
পুত্র ধন অন্তিম শয্যায়,
বিষাদ সাগরে ডুবেছিনু—
কে তোমার পানে ফিরে চায় ?

(৫)

সে গেল—সে চলে গেল, খুকু,
আমা দোঁহে অপরাধী করে;
তুমি দোষী জনমিয়া বাছা,
আমি—তোমা' ধরিয়া জঠরে।

(৬)

মেয়ে হয়ে খেদাইলে, খুকু,
সপত্নীর সোনার কুমার;
'ওমা, ওমা, কি রাক্ষসী মেয়ে ?'
সবাই বলেছে অনিবার।

(৭)

যে তোমা' পাঠিয়েছিল, খুকু,
সেই তো, মা, নিয়ে গেছে তায়,
তোমাকে দুষেছি অকারণে—
আসা, যা (ও) য়া বিধির ইচ্ছায়।

(৮)

বুঝেও তা' বুঝিনাই, খুকু,
দিবা নিশি করেছি, গঞ্জনা,
তাড়াতাড়ি পালাইলে তাই
সহিতে না পারিয়া যাতনা।

(৯)

লুকায়ে রেখেছি সদা, খুকু,
তোমাকে, মা, চোরের মতন ;
কেহ বা 'রাক্ষসী মেয়ে' বলে
শাপে দহে কোমল জীবন।

(১০)

আমি তো দেখিনি কভু, খুকু,
তোমাতে, মা, রাক্ষসী লক্ষণ,
একমাত্র তারা সম নভে
উজলিয়া ছিলে গৃহ কোণ।

(১১)

এমন মধুর মুখ, খুকু,
আঁখি দু,টি এমন (ই) তোমার—
মাগো মা, এ বিশাল ধরায়
এমন হেরিব কোথা আর ?

(১২)

কত হাসি হাসিতে যে, খুকু'
খেলিতে, মা, আপনার মনে,
সে হাসি, সে খেলা নিরখিয়া
ভুলিয়াছি সংসার যাতনে।

(১৩)

গভীর নিশীথে জেগে, খুকু,
জাগরিত করেছি তোমায়,
দু'জনেতে বিরলে বসিয়া
খেলাধুলা করিব আশায়।

(১৪)

দিবসে সাহস করে খুকু,
করিনাই আদর, যতন ;
নিশাকালে ঘুমুলে সকলে
কোলে নিয়ে বসেছি তখন ।

(১৫)

মধুর পরশে তব, খুকু,
সে মধুর চাহনি হেরিয়া,
খল খল হাসিরব শুনে
স্বর্গসুখে থেকেছি ডুবিয়া ।

(১৬)

সে সুখ স্বপন এবে, খুকু,
শূন্য কোলে কাঁদি, মা, এখন,
শূন্য কোল, শূন্য বুক মম,
শূন্য গৃহ, শূন্য ত্রিভুবন ।

(১৭)

একদা দুখের দিনে, খুকু,
স্বামী যবে রোগেতে বিকল
"কেন গো, মা"—পুছে ছিনু তোমা,
"তুমি এসে এত অমঙ্গল ?"

(১৮)

"রোগ শোক ছাড়েনা, মা খুকু,
লোকে কেন দোষে, মা, তোমায় ?"
কেঁদে ছিলে সে কথা শুনিয়া,
কাঁদিয়া কাঁদায়ে ছিলে মায় ।

(১৯)

সেইদিন অভিমানে, খুকু,
শুইলে যে রোগের শয্যায়,
আর না উঠিলে তাহা ছাড়ি,
বুকে না আসিলে পুনরায় ।

(২০)

যাঁর বুকে গিয়েছে, মা খুকু,
সুখে থাক তাঁহার (ই) আদরে ;
পায়ে ধরি কহিও তাঁহায়
আমাকেও ডাকেন সত্বরে।

মানব জীবনে দর্শনের উপযোগিতা।

["নবপ্রভার" পাঠক মহাশয়গণের সহিত অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে বিষয়ের "গুরুত্ব ও সাধারণ পাঠকের মানসিক আবেগের খরস্রোতের বিরুদ্ধে আমার দুর্ব্বল লেখনী যে অনেকদূর বাহিয়া যাইতে পারিবে সে আশা দুরাশা মাত্র"। সেইজন্য ও অন্যান্য নানাকারণে আমার মূক লেখনী একবার মুখরায়িত হইয়াই মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিঃশব্দ হইয়াছিল। এত দীর্ঘকাল বিলম্বের পর এরূপ নীরস বিষয়ের রসাস্বাদন করা অনেকেরই কষ্টকর হইবে। তবে পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে যদি কাহারও ভাল লাগিয়া থাকে তবে তাঁহার বিজ্ঞাপনার্থ লিখিতেছি যে "নবপ্রভার" প্রথম বর্ষের পঞ্চম ও দ্বাদশ সংখ্যায় "মানবজীবনে দর্শনের উপযোগিতা" নামে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই উপসংহার]।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনা ও বস্তুর মূলতত্ত্ব ও কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিজ্ঞান উপাদান কারণে সীমাবদ্ধ হইলেন। দর্শন বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া কি প্রণালীতে (Method) নিমিত্ত কারণের দিকে ধাবমান হইলেন এক্ষণে তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয় হইতেছে। উপাদান (Materials) দুয়েরই এক—উভয়েই নানাজাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাপন্ন ঘটনা পরম্পরা যাহা আমাদিগের মন ও ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে তাহারই কারণ অনুসন্ধানে রত। কিন্তু অনুসন্ধান প্রণালী একের অপরের হইতে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান, ঘটনা সমূহ যেরূপ ভাবে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহাই যথাযথ স্বীকার

করিয়া লইয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সমবায়িত্বাদি (coexistence) সম্বন্ধ আছে তাহার নিরাকরণে ব্যাপৃত থাকে। দর্শন কিন্তু এইখানেই নিশ্চিন্ত নয়।' দর্শন প্রত্যেক ঘটনা ও বস্তুকে তন্ন তন্ন ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বে উপনীত হইবার জন্য ব্যস্ত এবং প্রতি ঘটনাকে উল্লিখিত মূলতত্ত্বের সহিত সুসম্বদ্ধ করিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ধারাবাহিক করিবার জন্য সতত উদ্যত। তজ্জন্যই দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের সান্তত্ব স্বতন্ত্রত্ব ও অনিশ্চয়ত্ব পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক তদন্তর্নিহিত অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপি সৎ পদার্থের সত্তা উপলব্ধি করে। বস্তুতঃ দর্শন নিখিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সান্ত পদার্থ সমূহকে অন্তর্নিহিত অমূল্য হীরকময় মালা দ্বারা গ্রথিত করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য সুশৃঙ্খল সুসম্বদ্ধ জ্ঞান লাভ করে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন "যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে"—যে অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের জ্ঞানলাভ করিলে ইহ জগতে আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না।—ময়ি "সর্ব্ব মিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব"।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দর্শন বিজ্ঞানের ন্যায় "ব্যবচ্ছেদন" ও "একীকরণ" মূলে সমগ্র বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞানলাভ করে। এবং ইহাও বলিয়াছি যে বিষয়ের বিশেষত্বে দার্শনিক প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অপেক্ষা "একীকরণ" ক্রিয়ার সমধিক প্রাধান্য দেখা যায়। এক্ষণে উক্ত প্রাধান্যের কারণ নির্দ্দেশ ও দার্শনিক প্রণালীর বিশেষত্ব প্রতিপাদন করা প্রয়োজন হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে দর্শনের বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত মূলসূত্রের অনুসন্ধান ও উক্ত মূলসূত্র কিরূপে যাবতীয় ঘটনা পরম্পরার সহিত নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ তাহা প্রদর্শন করাই দর্শনের কার্য্য হইতেছে। তাহা হইলে "একীকরণ" প্রণালীর সমধিক প্রাধান্য দর্শনে পরিদৃষ্ট হওয়াই উচিত। তজ্জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" এবং উপনিষৎ বলেন "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"। বস্তুতঃ জ্ঞানের মূলসূত্রই "একীকরণ," "ব্যবচ্ছেদন" উক্ত "একীকরণ" ক্রিয়ার সাধন মাত্র। তবে "একীকরণ" করিতে গিয়া বস্তুগত পার্থক্যকে একবারে নিরসন করিলে চলিতে পারে না; যে দর্শন তাহা করে তাহা একদেশদর্শী—অতএব অসম্পূর্ণ। দর্শনকে ইহাও দেখাইতে হইবে যে ঐ অন্তর্নিহিত মূলসূত্র কিরূপে স্বীয় অনাদিঅনন্তত্ব ও স্বসাপেক্ষত্ব পরিত্যাগ করিয়া আদ্যন্তবন্ত অপরাপেক্ষী বিশেষ ২ পদার্থের

সৃষ্টির নিমিত্তকারণ হইলেন—অর্থাৎ দেখাইতে হইবে যে অনন্তের অনন্তত্বে এমন একটি অবশ্যম্ভাবী গুণ আছে যে তাহা হইতে সান্ত পদার্থ সৃষ্ট না হইয়াই পারে না। যে "একীকরণ" বস্তুগত পার্থক্যকে নির্দ্দিষ্ট স্থান না দেয় ও তাহার অস্তিত্বের কারণ নির্দ্দেশ না করে, পক্ষান্তরে তাহাকে ধ্বংশ করিয়া সর্ব্বভুক্ অনন্তের প্রাধান্য মাত্র প্রদর্শন করে, সে একীকরণ প্রকৃত একীকরণ হইতে পারে না। দার্শনিক প্রণালীর বিশেষত্বের বিষয় পূর্ব্বেই অবান্তর ভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহের ব্যবচ্ছেদন ও একীকরণ দ্বারা বস্তুগত গুণের বিশ্লেষণমূলে জাতিগত গুণের জ্ঞান, অধস্তন জাতিগত গুণ জ্ঞান হইতে উপরিতন জাতিগত গুণজ্ঞান, সেইরূপে ক্রমশঃ উপর্য্যুপরিতন জাতিগত গুণজ্ঞানে উপনীত হয় (Scientific induction)—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরম্পরার যাথার্থ্য আমূল স্বীকার করিয়া যায়। উক্ত বিষয় সমূহের বাস্তব সত্তা আছে কি না? থাকিলে তাহা কি? কোথা হইতে কি প্রকারে উদ্ভূত হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের আদৌ অবতারণা করে না। দর্শন কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যাপৃত—বিষয় পরম্পরার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করাই দর্শনের কার্য্য। তৎকার্য্য সাধনার্থ প্রতিপদে দর্শনকে "ব্যবচ্ছেদন" ও "একীকরণ" নামক মানসিক ক্রিয়া দ্বয়ের সাহায্য লইতে হয় বটে, কিন্তু দর্শন ঐ দুই ক্রিয়া দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী (আত্মা) এই উভয় পদার্থের বাস্তব সত্তা ও সাধারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার প্রয়াস পায়—। দার্শনিক কবি যখন "কস্য ত্বম্বা কুত আয়াতঃ" গাহিলেন, তখনই প্রায় সমস্ত দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। জ্ঞানী পাশ্চাত্য মুনি ইমারসন যখন বলিলেন "আমরা জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এইটী সূর্য্য, এইটী চন্দ্র, এইটী জন্তু, এইটী বৃক্ষ বলিয়া দেখি; কিন্তু এ সমস্তই যে সমগ্র পদার্থের অভিব্যক্ত অংশ মাত্র সেই আত্মা" "এ জগতে কোথাও আবরণ, প্রাচীর বা ব্যবধান নাই। কিন্তু একই রক্ত অবিরত ধারে সমগ্র মানব জাতির ধমনীতে ও শিরায় প্রধাবিত হইতেছে, ঠিক যেমন একই সমুদ্র পৃথিবীর নানাস্থানের জলরূপে পরিদৃশ্যমান্ এবং বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে ঐ একই স্রোতঃ সর্ব্বত্র প্রবহমান্" (১) তখনই দর্শনের মূলতত্ত্বের উপদেশ করিলেন।

"We see the world peice by peice, as the Sun, the moon, the animal the tree; but the whole of which they are the shining parts is the Soul."

এজগতে মানব প্রকৃতি অতি অদ্ভুত পদার্থ—চিৎ ও জড়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে উৎপন্ন পরমেশের এক অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা ইতস্ততঃ যে কোনও সৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাই তন্মধ্যে মানব প্রকৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। জড় প্রকৃতির বিচিত্র কারুকার্য্য নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে মন বিস্ময় ও আনন্দে পরিপ্লুত হয়। দেখ ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ নিরন্তর আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিতেছে—উহার পক্ষের উপর নানাবর্ণরাগে রঞ্জিত যে চিত্রকার্য্য রহিয়াছে তাহা, তুমি বিদ্যা বুদ্ধির অভিমানী গর্ব্বিত মানব, তোমার সকল বিদ্যা সকল বুদ্ধিকে পরাজিত করিয়া, নিজের অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইংরাজিতে একটী চলিত কথা আছে যে সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে দ্রব্যের উপর ঘৃণা জন্মে। আমরা এখন পরিণত বয়সে অশ্ব, যান, জনস্রোতের কোলাহলের মধ্যে অগণিত ইষ্টক প্রস্তরময় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার অলিন্দে পাদচারণ করিতে করিতে ঐ ক্ষুদ্র পতঙ্গের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অক্ষম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, পৃথিবীতে আসিয়া যখন আমাদের দর্শন শক্তির প্রথম উদ্ভাসন হয় তখন নিশ্চয়ই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, ঐ পতঙ্গের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ছিলাম। যেদিন বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত দূরস্থিত বস্তু সমূহ দর্শন করিতে শিখিলাম, সেই সময় এক দিন মাতৃদেবীর সুখময় ক্রোড়ে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যখন আমার দৃষ্টি সহসা ঐ অগণিত গ্রহ নক্ষত্রাদি' পরিপূর্ণ অনাদি অনন্ত নীলাকাশের উপর পতিত হইল, তখন না জানি কত আনন্দই উপভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজি আকাশ সেই আকাশই রহিয়াছে, চন্দ্রের কিরণ তেমনই স্নিগ্ধ অবিরল সুধা ক্ষরণ করিতেছে, আমি কিন্তু আর সে আমি নাই। আমি এখন কঠিন জীবনসংগ্রামে নিষ্পেষিত বিধূনিত হইয়া আত্মহারা হইয়া অগ্নিসমাকুল গৃহমধ্যস্থিত সুপ্তোত্থিত জীবের ন্যায়, এদিকে যাইতেছি ওদিকে যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে অনেক বিস্ময় ও আনন্দের পবিত্র উৎস হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বাসিত হয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকও এই চক্ষেই জগৎকে

"Not a valve, not a wall, not an intersect on is there anywhere in nature, but one blood rolls uninterruptedly an endless circulation through all men, as the water of the globe is all one sea, and, truly seen, its tide is one"—Emerson's "Over soul".

দেখিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের বিজ্ঞানজগতের উজ্জ্বল রত্ন মহামতি ফারাডে বলিয়াছেন "আমরা ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় শিক্ষালাভ ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, কিন্তু সেই জগতের সমস্ত ঘটনা কিরূপে ঘটিতেছে তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিস্ময় এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগরিত হয় না। আমাদিগের বিস্ময় এত অল্প যে আমরা এ জীবনে কখনও আশ্চর্য্যাভিভূত হই না"* কিন্তু সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির এই ভাব একবারে ভুলিয়া যান—জগতে অম্লজান উদজান প্রভৃতি কয়েকটী বাষ্প, ও তাম্র লৌহাদি কয়েকটী ধাতু দ্রব্য, এবং তাহারা যে কয়েকটী অন্ধ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না—বিজ্ঞানালোচনা করিতে করিতে মানব আপনাকে ঐ অনাদি অনন্ত বিষয় পরম্পরার অন্তর্ভূত একটী ক্ষুদ্র জীব বলিয়া বিবেচনা করে—জড় পদার্থ সমূহ যেমন অন্ধ নিয়মের অধীন হইয়া পরিচালিত হইতেছে নিজেকেও তেমনি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তলি বিবেচনা করে। বাস্তবিক জড়ের হিসাবে দেখিতে গেলে আমি কত ক্ষুদ্র কত অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতি তাহার অনন্ত বক্ষে অযুত অযুত সৌরজগত স্থান দিয়াছেন, তাহার মধ্যে জানিনা কতটুকু একটী সৌর জগতের মধ্যে আমি একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য পদার্থ মাত্র। তজ্জন্যই মানব প্রকৃতির বিশেষ আলোচনা স্বসত্তাববোধের জন্য মানবের প্রয়োজন। মানব প্রকৃতি অতি অদ্ভুত পদার্থ। মানব তাহার স্থূল দেহ নিবন্ধন ইষ্টক প্রস্তরাদির ন্যায় জড় প্রকৃতির অন্তর্ভূত,যে সমস্ত মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রাকৃতিক যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট, মানব দেহও সেই সমস্ত উপাদানে গঠিত। অতএব ঐ সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রন বিমিশ্রণ জড় প্রকৃতিতে যে সমস্ত নিয়মে সংঘটিত হইতেছে, মানব দেহ হইতেও ঐ নিয়ম সমূহের জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। এতদ্ভিন্ন চেতন পদার্থ মাত্রের যে সমস্ত সাধারণ ধর্ম্ম আছে মানব প্রকৃতিতে তৎ সমস্তই বর্ত্তমান আছে—এ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান লাভ অতি সহজসাধ্য। অধিকন্তু চিৎ (consciousness) শক্তির সুপরিস্ফুট কার্য্য সমূহ একমাত্র মানব প্রকৃতিতেই দেখা যায়, অতএব মানব প্রকৃতির এইটী একটী বিশেষত্ব। অপরাপর জন্তু সাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি (Intelligence) আছে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন, তবে যাবতীয় মানসিক ক্রিয়ার জ্ঞান পরিণামে স্বমানসিক

---

* Here it is that we are born, bred, and live, and yet we view these things with an almost entire absence of wonder to ourselves respecting the way in which all this happens. So small, indeed, is our wonder that we are never taken by surprise.—Faraday's "Forces of matter" p. 2.

ক্রিয়ার জ্ঞান সাপেক্ষ (১) বলিয়া প্রত্যেক মানবেরই স্ব স্ব মানসিক ক্রিয়া কলাপের পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। এবং ইহাও প্রায় স্থির সিদ্ধান্ত যে মনুষ্যেতর জন্তুবর্গের পক্ষে অন্য যাবতীয় মানসিক ক্রিয়া সম্ভবপর হইলেও অহং মমেত্যাকার আত্মার ব্যষ্টি সমষ্টি জ্ঞান (Self-consciousness) থাকা সম্ভব নয়। অপরন্তু মানব আত্মার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় অনন্যসাধারণ যে একটী গুণ আছে তাহাতেই আত্মার গৌরব, তাহাতেই আত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষস্থানীয়। আত্মার সেই গুণ সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যেও পরিলক্ষিত, তবে মনুষ্যের নৈতিক জীবনেই সে গুণের বিকাশ দেখা যায়। মনুষ্যের যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে তাহার উপর তাহার সমগ্র মহত্ত্ব সংস্থাপিত। এই গুণ আছে বলিয়াই মনুষ্য স্বীয় কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী, এবং ইহার ফলেই সে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের তাড়নাকে তুচ্ছ করিয়া নিজ শক্তি ও মহত্ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক এ অশান্তির সংসারে দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক। এই জন্যই মহামতি কাণ্ট বলিয়াছেন।ঃ—

"মস্তকোপরি ঐ যে তারকা পরিপূর্ণ আকাশ রহিয়াছে এবং আমার হৃদয়াভ্যন্তরে যে নৈতিক নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে এই দুই বিষয় আমরা যতবার এবং যতকাল ধরিয়াই চিন্তা করি, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন ও নিয়ত বর্দ্ধমান আনন্দ ও ভক্তিতে আমাদিগের হৃদয় আপ্লুত হইতে থাকে"। * এবম্বিধ নানাজাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাপন্ন উপাদানের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে উৎপন্ন যে মানব, যাহাকে পুরাতন গ্রীকেরা এইজন্যই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড (Microcosm) নামধেয় করিয়াছিলেন, তাহাকে জানিবার জন্য অন্ততঃ চেষ্টা করাও কি বাঞ্ছনীয় নয়?

আরিস্টটল বলিয়াছেন "বিস্ময়ই দর্শনের প্রধান সাধন" † আমি জিজ্ঞাসা করি যে পূর্ব্বোল্লিখিত যে একটী অপূর্ব্ব পদার্থ তৎ সম্বন্ধে আমাদিগের বিস্ময় কি প্রতিপদে জাগরিত হওয়া উচিত নয়? কার্লাইল একস্থানে বলিয়াছেন "যদিও আমরা যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই সমস্তই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি

---

(১) All knowledge of mental laws depends ultimately on introspection.

* Two things there are, which, the oftener and the more steadfastly we consider them, fill the mind with an ever new, and ever rising admiration and reverence :—The starry heaven above the moral law within"
Kant's Kritik of Poetical Reason.

† "Wonder is the first cause of Philosophy"—Metaphysics. 1,2,9,

মাত্র, মানব তাহাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি", (১) হিন্দুদর্শনও বলিয়া থাকেন "সোঽহং"। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি স্বরূপ, এই মানব প্রকৃতি যে সকলেরই প্রকৃষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাতে আর কি কোনও সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষ মানব যখন পরমেশের কৃপায় জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়াছে তখন কি সে একবার নিজসত্তাবধারণ করিবার জন্য চেষ্টা ও করিবে না। ইংলণ্ডের কবি পোপ বলিয়াছেন "মানব জাতির উপযুক্ত জ্ঞান চর্চ্চার বিষয় হইতেছে মানব"। (২) অতএব সমগ্র জগতের মূলতত্ত্বানুসন্ধান, বিশেষতঃ মানব প্রকৃতির পর্য্যালোচনা যদি দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, এবং মনুষ্যের যদি নিজসত্তাববোধের জন্য একটী অনন্যসাধারণ শক্তি থাকা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মানব জীবনে দর্শন শাস্ত্রানুলোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ মানব বুদ্ধি যদি নানাকারণে স্বীয় অধিকার বিচ্যুত না হইত তাহা হইলে এসম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ লেখাই নিষ্প্রয়োজন হইত।

শ্রীবারাণসীবাসী মুখোপাধ্যায়।

দ্বিজেন বাবুর

হাসির গান ও তাহার স্বরলিপি।

(১)

গান।

পারত, জন্মোনা কেউ বিষ্যুৎ বারের বারবেলা,
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবেনাক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎ বারের বার বেলায় আমার জন্ম হইল,
তাই, দিল মোরে, কালো করে', রোদে ধরে' মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

---

(১) If all things whatsoever we look upon are emblems to us of the Highest God, I add that more so than any of them is man such an emblem."

(২) "The proper study of mankind is man."—Pope's Essay on Man.

দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিল নাক মায়ের দুধ,
কোরে দিল, শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ ;
পরে, মিলে আমার আটটা মামায়, বাবার সেই আট শালায়,
হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।
দেখ মোর গুরু মশায় (যেন কশাই) বিদ্যেয় খাটো শর্ম্মারে।
কোরে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটেয়ে পিটেয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উচুঁ দিকেই বাড়ছি দেখে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোর, চাকরি কোরে, তারাও মোরে
দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল।

দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুন্ন, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, কণের দরও চড়ে গেল।
হায়! গো বিধি তুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,—
সে কেবল ফেললাম বোলে, জন্মে ভুলে
বিষ্যুৎ বারের বারবেলা।

[অনেকেই "দ্বিজেন বাবুর" হাসির গান পড়িতে ব্যাকুল। আবার অনেকে এই গান গুলি সুরের সহিত শিখিয়া গাহিতে বা হারমনীয়ম বাজাইতে লালায়িত। এক্ষণ হইতে দ্বিজেন বাবুর হাঁসির গান ও তাঁহার স্বরলিপি নবপ্রভাতে প্রকাশিত হইবে। তাহাতে অনেক পাঠকই উক্ত গান শিখিয়া রঙ্গরসপূর্ণ সঙ্গীত দ্বারা নিজের এবং বন্ধুবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিবেন।]

(২)

স্বরলিপি।

উদারা—স র গ ম প ধ ন
মুদারা—সা রা গা মা পা ধা না
তারা—সো রো গো মো পো ধো নো।

বিষ্যুৎবারের বার বেলা—

রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ন্ম না কেউ — বি — ষ্যুৎ বা রের —

ধ সা সা সা সা সা : — — সা গা গা গা।
বা র বে লা — — পা র ত —
রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ম্ম না কেউ — বি — দ্যুৎ বা রের —
ধ সা সা সা সা সা ; — — সা সা সা সা।
বা র বে লা — — জ ম্মাও ত —
মা মা মা মা মা মা, মা মা মা মা গা গা।
সা — ম লা তে — পা র্ বে না ক —
রা গা গা গা গা গা ; গা গা গা গা গা গা।
তা র ঠে লা — — — — — — — —
রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ম্ম না কেউ — বি — দ্যুৎ বা রের —
ধ সা সা সা সা সা ; — — সা গা গা গা।
বা র বে লা — — পা র ত —
রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ম্ম না কেউ — বি দ্যুৎ বা রে র —
ধ সা সা সা সা সা : — — — — পা পা।
বা র বে লা — — শো ন
সো সো সো সো সো সো, সো সো সো সো সো সো ;
বি — দ্যুৎ বা রে র্ বা র্ বে লা তে —
রো রো রো সো সো সো : ধা সো সো সো সো সো।
আ মা র জ — ম্ম হৈ — ল — — —
সো সো সো সো সো সো, সো সো সো সো সো সো ;
বি — দ্যুৎ বা রে র বা র বে লা তে —
রো রো রো সো সো হো ; ধা সো সো মা মা মা।
আ মা র জ — ম্ম হৈ — ল তাই দি ল
পা পা পা পা পা পা, ধা ধা ধা পা পা পা ;
কা লো — ক রে’ — রো দে — ধ রে —
মা মা মা গা গা গা : রা গা গা গা গা গা।
মা খি য়ে মা খি য়ে তৈ — ল — — —

রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ন্ম না কেউ — বি — দ্যুৎ বা রের —
ধা সা সা সা সা সা ঃ — — সা গা গা গা।
বা র বে লা — — পা র ত —
রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ন্ম না কেউ — বি — দ্যুৎ বা রের —
ধ সা সা সা সা সা ঃ — — [সা সা সা সা।
বা র বে লা — — ব লে’ মা —
মা মা মা মা মা মা, পা পা পা মা মা মা
কা লো — ছে লে — দি লে — ঠে লে —
মা মা মা মা মা মা ঃ রা গা গা গা গা গা।
— — দি লে না ক মা য়ের দুধ — করে দিলে
মা মা মা মা মা মা, গা গা গা গা গা গা ;
শ রী র স রু — বু — দ্ধি গ রু —
রা রা রা রা রা রা ঃ সা সা সা পা পা।
খা ই য়ে খা ই য়ে গাই য়ের দুধ প রে
সো সো সো সো সো সো, সো সো সো সো সো সো ;
মি লে — আ মা য় আ ট টা মা মা য়
সো সো রো রো সো সো ঃ ধা সো সো সো মা মা।
— — বা বার সেই — আ ট শা লায় হোতে না
পা পা পা পা পা পা, ধা ধা ধা পা পা পা ;
হ তে — ব ড় — দি য়ে — চ ড় —
মা মা মা মা গা গা ঃ বা গা গা গা গা গা।
পা ঠি য়ে দি লে — পা ঠ শা লা য় —
রা রা রা রা রা রা, সা সা সা সা সা সা ;
জ — ন্ম না কেউ — বি — দ্যুৎ বা রের —
ধ সা সা সা সা সা ঃ — — সা গা গা গা।]
বা র বে লা — — পা র ত —

বাকি চরণগুলি [ ] স্বরলিপি অনুসারে বোর।

মায়া।

একোনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কানন ভবনে।

চন্দ্রালোকে।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রবোধ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী লীলা তাঁহাদিগের পল্লী-গ্রামের উদ্যানভবনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে সরোবর, মৃদু মন্দ সমীরণ চুম্বিত হইয়া, ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গে যেন হাসিতেছে। সরোবরতটে উচ্চ ঝাউ বৃক্ষশ্রেণী পবনহিল্লোলে দুলিয়া সোঁ সোঁ করিতেছে। গৃহের নিকটে একটী ঝাউগাছের উপর মধুমালতী লতা জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে। অশোক বৃক্ষের ঘন পল্লবরাজি চন্দ্রমার রজতকিরণে উজ্জ্বল হইয়াছে।

লীলা তাঁহার স্বামীর দিকে স্নেহভরে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কি আজি বাহিরে যাইবে?

প্রবোধ বাবু উত্তর দিলেন—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

লীলা। আমি বলি, আজগে আর বাহিরে যাইও না।

প্রবোধ। কেন?

লীলা। এখানে এসেছ বিশ্রাম করিতে। এখানেও যদি দিন রাত্রি খাটিবে, তা হলে দেহটা রবে কি রকমে। জানত স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।

প্রবোধ। কিন্তু তাই বলিয়া উমা তপস্যা করিতে ছাড়েন নাই।

লীলা। উমাত তপস্যা করিয়াছিলেন কিছু কাল। তোমার তপস্যার যে অন্ত নাই।

প্রবোধ। জীবনটাই ত তপস্যা ও আরাধনা। কেহ বা ঈশ্বরের আরাধ-না করিতেছে, কেহ বা যশের আরাধনা করিতেছে, কেহ বা ধনের আরাধনা করিতেছে, কেহ বা প্রেয়সীর কৃপা আরাধনা করিতেছে। আরাধনা চতুর্দ্দিকে —তবে কোনটী উত্তম, কোনটী অধম।

লীলা। আমি তোমাকে যে আরাধনা করি সেটী উত্তম না অধম?

প্রবোধ। তুমি আমাকে আরাধনা কর, না আমি তোমাকে আরাধনা করি?

লীলা। বটেইত। যখন তুমি পুস্তক রাশিতে ডুবিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হও, পূর্ব্বদিকের নক্ষত্র পশ্চিমে অস্ত যাইলেও তোমার তাহা খবরে আসে না, তখন তুমি আমার আরাধনা কর বটে। যখন জমিদারির রাশীকৃত কাগজ পড়িয়া তাহার উপর কত কি লিখিতে থাক তখন তুমি আমারই আরাধনা করই বটে। যখন তুমি পুস্তকাগারে বসিয়া পুস্তক লিখিতে থাক তখন তুমি আমারই আরাধনা কর, না? যখন তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সঙ্গে বসিয়া নির্জ্জনে গোপনে কত কি মন্ত্রণা কর, তখন তুমি তোমার প্রেয়সীর আরাধনা করই বটে। যখন তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রজাবিদ্রোহের কথা বলিতে যাও তখন তুমি তোমার পত্নীর আরাধনা কর। যখন তুমি নরেশ বাবুর সঙ্গে বসিয়া গল্প কর, আর যে ব্যক্তি তোমার পরামর্শ শুনিবে না তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য ব্যস্ত হও, তখন তুমি আমারই আরাধনা কর বটে।

প্রবোধ বাবু। (হাসিয়া) বাগ্মীবরা স্ত্রী, চুপ কর। আমাকে একটু কথা বলিতে দেও।

লীলা। বলনা, বলনা। তোমার কথা শুনিবার জন্যই ত কথা বলি। স্ত্রী তৃষিত চাতক, স্বামী নবীন নীরদ। স্বামীর কথা তৃষ্ণার জল। তৃষিত চাতক নবীন নীল নীরদের দিকে চাহিয়া থাকে না কি?—বারিবিন্দুর জন্য?

প্রবোধ। বারিবিন্দু কেন? শ্রাবণের ধারার ন্যায় অদ্য আমি তোমার উপর আমার বাক্যপরম্পরা বর্ষণ করিতে প্রস্তুত আছি।

লীলা। না। আজগে আমার সাধ, তোমার গান শুনিব। এই বিজন উদ্যান ভবনে, এই মৃদুমন্দসমীরণচুম্বিত জ্যোৎস্না রাত্রিতে— তোমার সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিব। আমি হার্মোনিয়ম বাজাই—তুমি গান কর। আমি গান করিতে বলিলে, অনেক সময় তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দাও; কখন বল সময় নাই, কখন বল "তুমি পড় আমি শুনি"।

প্রবোধ। তোমার পাঠই আমার নিকট গান। তুমি যখন আমার প্রিয় পুস্তকগুলি পড়, তখন তোমার মধুর স্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, আমার হৃদয়ে যেন সঙ্গীতের ঢেউ তুলিয়া দেয়।

লীলা। (একটু লজ্জিত হইয়া) তুমি আমাকে অত প্রশংসা করিও না, আমার অহঙ্কার হইতে পারে। তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ, তাই একটু শিখেছি।—বল, তুমি কি গান করিবে না?

প্রবোধ। (হাসিয়া) গান করিব না কেন? তুমি হার্মোনিয়ম বাজাও কোন গানটী করিব?

লীলা। "তোমারে লইয়া, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, পর্ণকুটীরও ভাল" এই কথা বলিয়া সুন্দরী তাঁহার সুন্দর হার্মোনিয়মটীর নিকট বসিলেন—বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই বাদ্যের তালে তালে প্রবোধবাবুর মস্তক ঈষৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

প্রবোধ বাবু গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কলকণ্ঠের সুস্বর উচ্চ হইতেও উচ্চে উঠিতে লাগিল—সেই মূর্চ্ছনাপ্রকম্পিত স্বরলহরীতে গৃহ পূর্ণ হইল, কানন পূর্ণ হইল, ক্রমে তাহা যেন তারকাখচিত নীলাম্বরে উঠিয়া সুধাধারা বর্ষণ করিয়া জগৎকে সুখাপ্লাবিত করিল। রমণীর দুই হস্তের কনক চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলি হার্মোনিয়মের পরদার উপর যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হার্মোনিয়মের সুর কণ্ঠধ্বনির সহিত মিশিয়া কখন বা তীক্ষ্ণ মধুর ভাবে হৃদয়কে আকুল করিতে লাগিল, কখনবা মৃদুগম্ভীর জলদনির্ঘোষের ন্যায় এক অনির্দ্দিষ্ট সুখ তরঙ্গের সঞ্চার করিতে লাগিল। প্রবোধ বাবু প্রথমে পত্নীর দিকে প্রীতিভরে চাহিয়া গান করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি বিভুপ্রেমে বিভোর হইলেন। চক্ষু মুদিয়া প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিভু গুণ গান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অল্প দুলিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। লীলার দেহ ভক্তিপুলকে শিহরিয়া উঠিল। লীলার হস্ত যেন অবসন্ন হইল, বাজনা থামিল, কেবল দুইটা পর্দ্দা টিপিয়া থাকিলেন। তাহাতে কেবল সুর দেওয়া যাইতে লাগিল। লীলাও নিমীলিত-নেত্রা দরবিগলিত অশ্রু। দুই জনেই পরমেশপ্রেমে ডুবিয়া গেলেন, গান শেষ হইল। দুই জনে চক্ষু খুলিলেন।

লীলা। আমরা স্বর্গে গিয়াছিলাম, স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। যেন দেবকন্যাগণ দলে দলে আসিয়া অন্তরীক্ষে থাকিয়া তোমার গান শুনিতেছিলেন। তুমি যখন গান কর, আমি চোখ বুজিলে, দেবকন্যাগণ দেখিতে পাই। এটী কি কল্পনা?

প্রবোধ। কল্পনা না হইলেও হইতে পারে। থিয়সফিষ্টরা বলেন, পবিত্র চিন্তা করিলে, ও ভক্তিভরে ভজন গান গাহিলে দেবতারা আকৃষ্ট হন, এবং অলক্ষ্যে আমাদের পার্শ্বে বিচরণ করেন। বড় গরম।

লীলা। ঝি নীচে বেহারাকে জোরে পাখা টানিতে বল। (ঝি নীচে গেল)।

প্রবোধ। চল, ছাদের উপর যাই।

ছাদের উপর দুই খানা আরাম চৌকী ছিল। তাহাতে দুইজনে বসিলেন।

দুই জনে নীরব। হৃদয় ভাবে পূর্ণ। আকাশে মনোহর শশধর হাসিতেছে। সব নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র সরোবর তটে ঝাউ গাছের শ্রেণী দুলিয়া দুলিয়া সোঁ সোঁ করিতেছে। আর কেবল মাত্র দূরে, আকাশ প্রান্তে, চন্দ্রিকার আনন্দোৎসবে মাতিয়া পাপিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

দুই জনেই নীরব। দুই জনেরই চক্ষু নির্ম্মেঘ অনন্ত নীল আকাশের দিকে। দুইজনেই যেন অনন্ত ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন। কতক্ষণ পরে লীলা বলিলেন, "এত সুখের মধ্যে আবার দুঃখ কেন? মঙ্গলময় বিধাতা ইচ্ছা করিলেত সবই সুখময় করিতে পারিতেন। তবে তিনি সংসারে এত দুঃখ দিলেন কেন? তুমি আমি এত সুখে। আমাদের সহরে একটা বাড়ী, গ্রামে একটা বাড়ী। জমিদারীতে যেখানে কাছারী আছে সেখানেই আমাদের একটা একটা বাড়ী আছে। আর কত জনের একটাও বাড়ী নাই। তাহারা তাল পাতা দিয়া দোচালা ছাইয়া কোন প্রকারে বাস করে। বর্ষায় তাহার মধ্যে জলে ভেজে, শীতকালে শীতে কাঁপে। তোমার আমার খাওয়ার অভাব নাই। ননী, ক্ষীর, মাখন, ছানা, মাছ, মাংস, সন্দেশ যা ইচ্ছা, যে পরিমাণে ইচ্ছা, তাহাই খাইতে পাই। পাতে কত নষ্ট হয়। আর কত লোক এক মুঠা মোটা ভাতও দুবেলা পায় না। তোমার আমার বিশ প্রস্থ কাপড আছে, আর কত দুর্ভাগ্য ব্যক্তির একখানি ছেঁড়া কাপড়ও শীতের সময় জুটে না। আর বৈশাখের রৌদ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া, গরীব কৃষাণেরা সমুদায় শস্য উৎপাদন করে, অথচ তাহারা দুবেলা সবাই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। আর তোমরা জমিদার তাদের কত সময়ই কত লাঞ্ছনাই কর।

প্রবোধ। হাঁ, লীলা, আমরা অতি অপদার্থ, অতি স্বার্থপর। তা না হইলে কি প্রজারা এত কষ্ট পাইত?

লীলা। জমিদাররা সকলে যদি তোমার মত হইত, তাহা হইলে প্রজাদের আর কষ্ট থাকিত না। অন্য জমিদারদের কথা বলিতেছি।

প্রবোধ। না, লীলা। আমি যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে দেশের লোকের যখন এত কষ্ট, তখন কি আমি এত সুখে থাকিতে পারিতাম? আমি যদি মানুষ হইতাম, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুক্ত হইতাম। যে সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই, তাহা আমি ত্যাগ করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া আমরা দুইজনে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইতাম। কিন্তু ভিক্ষা

করিয়া খাইতাম না। উভয়ে নিজে পরিশ্রম করিয়া যেমন গরীব লোকেরা খাটিয়া খায়, তেমনি খাটিয়া খাইতাম।

লীলা। পিতৃধনে তোমার অধিকার নাই, তাহার অর্থ কি?

প্রবোধ। লীলা, তোমাকে কত বার বলিয়াছি, এ সংসারে যে যাহা শ্রম দ্বারা সদুপায়ে অর্জ্জন করে তাহাতেই তাহার অধিকার আছে।

লীলা। সে যা হোক, প্রাণেশ তুমি সন্ন্যাসী হইবার কথা বলিলে, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠে। বুঝি তুমি আমাকেও ছাড়িয়া যাইবে।

প্রবোধ। জীবন থাকিতে তোমাকে ছাড়িব? এ আশঙ্কা করিও না। যে পথেই যাই, তুমি আমার সঙ্গিনী, সহায়, প্রীতিদায়িনী। সন্ন্যাসী হইব না, ভয় নাই। তুমি আর আমি গৃহে থাকিয়াই সমাজের সেবা করিব, আমাদের নায়েব লাহিড়ী মহাশয় পত্র লিখিয়াছেন যে মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী তাহার বাসাতে আশ্রয় লইয়াছে, মহেশের ভগিনী মায়া পিতৃশোকে জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

লীলা। মায়ার বয়স?

প্রবোধ। আট বৎসরের কম নহে দশের অধিক নহে।

লীলা। পিতৃশোকে জলে ঝাঁপ দিয়েছে?

প্রবোধ। হাঁ। লোকে বলে সে মানুষ নয়, বুঝি বা সে দেবতা।

লীলা। কৃষকের ঘরে দেবীর আবির্ভাব?

প্রবোধ। হবে না কেন? ধনী যখন মূঢ় ও পাষণ্ড হয়, তখন মহামায়া দরিদ্রের ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন।

লীলা। মেয়েটী বড়ই দেখতে ইচ্ছা হয়। ভগবান তাহার জীবন রক্ষা করুন। আজগে ঝী বল্‌ছিল, ঝীর দাদা চিঠি লিখেছে যে নরেশ বাবুর জমিদারীতে ভারি দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে। প্রজারা অন্নাভাবে নাকি ক্ষেপে উঠেছে। জমিদার বাবু প্রজা শাসন করবার জন্য নায়েবকে যা খুসী তাই করবার হুকুম দিয়াছেন। নায়েব ভীষণ নিষ্ঠুর কাজ করিতেছে। প্রজার বাড়ী লুঠ, ঘর জ্বালিয়া দেওয়া, বউ ঝিকে অপমান করা, প্রজাকে কয়েদ করিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া তাহার গলা হাড়িকাঠের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখা—এই রকম অত্যাচার করছে—শুন্‌লে গা কাটা দিয়ে উঠে।

প্রবোধবাবু। আমাদের নায়েবের কাছে আমিও ঐ রকম পত্র পেয়েছি। যাতে এই সব গোলমাল থামিয়া যায় তজ্জন্য আমি নরেশ বাবুকে অনেক বুঝাইতেছি।

লীলা। তিনি বলেন কি ?

প্রবোধ। আমলারা তাঁকে যা বোঝায় তাই শুনেন। বিশেষত তার কাছারি বাড়ী পুড়িয়ে দিয়াছে, তাঁহার নায়েবের গলায় দড়ি দিয়া রাস্তায় রাস্তায় প্রজারা ফিরাইয়াছে, তাহাতে তিনি রাগিয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে সেপাই লইয়া গিয়াছেন, অজস্র লাঠিয়াল পাঠাইতেছেন আর নায়েবকে কেবল হুকুম দিতেছেন "যত টাকা লাগে দিব, প্রজা শাসন কর"।

লীলা। তোমাকে এত ভক্তি করেন তবু কথা শুনিতেছেন না ?

প্রবোধ। সম্প্রতি এ বিষয় বাদানুবাদ হইতে হইতে একটু মনান্তর হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তবে তাঁহাকে আর একবার বুঝাইব। আর কল্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি প্রজাদিগের উপকার করিতে পারি।

এমন সময় ঝী আসিয়া বলিল—"মা ঠাকুরণ বাহিরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন"।

গৌরাঙ্গ।

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। রয়েল সাইজ। ১৯২ পৃষ্ঠা। কাগজ বিলাতি রুক্ষ পেপার। মলাট কবি প্রণীত "গান" পুস্তকের অনুরূপ। আমরা গ্রন্থ খানি বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করিব।

গৌরাঙ্গ খানি কাব্য গ্রন্থ। স্যার এডুইন্ আর্ণল্ডের Asia or Light of the World এবং কবিবর শ্রীনবীন চন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' যে প্রকারের গ্রন্থ, 'গৌরাঙ্গ' খানি সেই ধরণের কাব্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রচারের জীবন-কাব্য।

বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন। আমাদের কবি যে তাহা মানেন না তাহা তিনি ভূমিকাতেই স্বীকার করিয়াছেন। কাব্য কাব্য ; কাব্য জীবন চরিত নহে। চৈতন্য দেবের জীবন বৃত্তান্ত যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা 'চৈতন্য চরিতামৃত' পড়িবেন, এবং সে পুস্তকে যতটুকু বিশ্বাস করিতে পারেন, বিশ্বাস করিবেন। কাব্য ইতিহাস বা জীবন চরিত নহে। দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র মৈত্রেয় এই ভ্রমে পতিত

হইয়া কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য পলাশী যুদ্ধকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে সমালোচকদলের হস্তে পড়িয়া বেচারি কবিগণ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতেছেন।

বলিয়াছি আমাদের সমালোচ্য 'গৌরাঙ্গ' জীবন চরিত নহে—উহা কাব্য। কাব্য ইতিহাস অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন। কবির নিজের ভাষায়—"আদর্শের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসাধন, এবং সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় জন্য, মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া, স্বীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর বেশে উপস্থিত করিতে,নিরঙ্কুশ কল্পনার রাজ পথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন-বিচরণের অধিকার কাব্য বা কাব্যকারের আছে। কিন্তু কবিকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে প্রোক্ত মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিতে গিয়া দেবতা গড়িতে গিয়া বানর গড়িলে তাঁহার মার্জ্জনা নাই। আমরা দেখি কবি গৌরাঙ্গের চরিত্রাঙ্কনে কত দূর কৃত কার্য্য হইয়াছেন।

গ্রন্থে প্রথমে চৈতন্যের জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ শুভলগ্ন জানিয়া একদা মিশ্রের ভবনে জন্ম গ্রহণ করিলেন। অতএব তাঁহার জন্ম স্বেচ্ছাকৃত। সামান্য নরের তাহা সম্ভবে না। তাহা একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। অথচ কবির জ্ঞানে চৈতন্যচন্দ্র শুদ্ধ অসামান্য মানুষী মহিমায় সমুজ্জ্বল। তবে যদি ইহা অলঙ্কার মাত্র রূপে কল্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা গম্ভীর রচনার সীমা অতিক্রম করিয়া হাস্য প্রধান রচনার রাজত্বে গিয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস গ্রন্থের প্রথমেই এরূপ হাস্যরসের অবতারণা করা কবির উদ্দেশ্য ছিলনা।

তার পরে শুনিলাম যে শিশু "অদ্ভুত", কিন্তু কেন যে তিনি অদ্ভুত তাহা কবি কিছু বলেন না। তিনি স্বেচ্ছায় তিথি লগ্ন দেখিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি অদ্ভুত?

যাহা হউক, শিশু "স্নেহের ফুৎকারে" বাড়িতে লাগিলেন। [ফুৎকারে যে কেহ বাড়ে তাহা এই নূতন শুনিলাম।] তাঁহার মাতা তাঁহাকে "লালনের রসে" সিক্ত করিতে লাগিলেন। কিরূপে? যেমন মালী চারা রোপণ করিয়া সতর্কে ত্রাসে, আবেগে, উল্লাসে সংশয়ে চাহিয়া থাকে, [মালীর যত্নের সহিত মায়ের যত্নের তুলনা না দিলেই ছিল ভাল।] মাতা শিশুর হাসি কান্না ইত্যাদি দেখিয়া তাহার "কাল্পনিক বিজ্ঞতার কত পরিচয় পাইতেন" এবং "এ সব কাহিনী শেষে পড়সী মহলে নানা অলঙ্কার সনে কবিতা রটনা করিতেন।

সংসারে কাহারো যেন হয়নি সন্তান, তারা যেন হাসে নাই, কাঁদে নাই কেহ।” অতি সুন্দর, মাতার মনে এই রূপই হইয়া থাকে। এ চিত্রটি এত স্বাভাবিক রূপে চিত্রিত করিয়া কবি যথার্থ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু “কবিতা” ইহা কি “কবিত”র স্ত্রী লিঙ্গ? তাহার পরে শিশুর অন্নপ্রাশনে পিতা জগন্নাথ শিশুর নাম রাখিলেন ‘বিশ্বম্ভর’। শচী কহিলেন “ওকি সৃষ্টি ছাড়া নাম”, কহিবারই কথা। একজন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে “উৎসাহে কহিল ওকি? আমিত বাছার নাম রাখিনু নিমাই”। প্রতিবেশী ও শচী দেবী স্পষ্টতঃ আধুনিক বঙ্গীয় কবি জাতীয় ছিলেন। তবে আধুনিক কবি হইলে বোধ হয় নামটি আরও একটু কোমল করিয়া লইতেন, যথা “রমণী মোহন”।

শিশু ক্রমে পঞ্চবর্ষ আসিয়া “অপোগণ্ডে অর্থাৎ” নিমাইকে তাদের প্রসাদ দিয়া গেল। আর “অপোগণ্ডের” “অপরূপ ধরা পড়ে গেল”। তাহার পরে “অপোগণ্ডের” শাস্ত্র সঙ্গত সংক্ষিপ্ত রূপবর্ণনা আছে।

“শুনিতেন মাতা,
পুত্রের রূপের খ্যাতি লুব্ধ কর্ণ পাতি’।
—নেত্রে উছলিত ধারা; অমঙ্গল ত্রাসে
কখন উঠিত কাঁপি মায়ের হৃদয়।”

ইত্যবসরে “নিমাইর” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। শুনিয়া হঠাৎ বিলাতের গল্পটি মনে পড়িয়া গেল। একজন কৃষকের পুত্র কন্যা ছিলনা। কোন ব্যক্তি সে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্নবাদ করিল, সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল in the family way sir. নিমাই “আদরে আব্দারে” বাড়িতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শৈশব কালে যে সব কীর্ত্তি করিতেন, নিমাইও ঠিক তাহাই করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবুর নিমাই চরিত্রেও নিমাইর এইরূপই ক্রিয়া কলাপ বর্ণিত আছে। ক্রমে সে দুষ্টামি সমস্ত নবদ্বীপে ছাড়াইয়া পড়িল। genius বোধ হয় দুষ্টামি ভিন্ন সম্ভবে না। যাহা হউক নিমায়ের দুষ্টামিতে কেহ কিছু বলে না।

“কি উপায় আছে?
অশান্ত দুর্দ্দান্ত শিশু নাহি মানে কারে,
পিতার ভ্রূকুটি আর মাতার তর্জ্জন,
পুষ্প বৃষ্টি সম গণে!

আমরা জানি এরূপ বালকের প্রায়ই কিছুই হয় না। তাহার পর নিমায়ের টোলে ভর্ত্তি। নিমাই কিন্তু দুষ্টামি ছাড়ে না এবং তার পাঠেও মন নাই। শেষে "অধ্যাপক শশব্যস্ত শিষ্যের জ্বালায়", এরূপ তুমি আমি শিক্ষক হইলে সহ্য করিতাম না, কিন্তু নিমায়ের অধ্যাপক তাহা সহ্য করিতেন। আর এরূপ ছাত্রও যে কিরূপ দাঁড়ায় তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। কিন্তু নিমায়ের এমন ধীশক্তি যে

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সতীর্থেরা
হটিতেছে ক্রমে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে"।

পাঠকগণ horse race দেখিয়াছেন?—তেজী ঘোড়া অনায়াসে আগাইয়া যায়, আর মড়াখেগো ঘোড়া হাজারই চেষ্টা করুক পিছাইয়া পড়িবেই, এও সেইরূপ। গতিক দেখিয়া মিশ্রকে অধ্যাপক বলিলেন—

"তনয় তোমার নহে সামান্য মানব"। মিশ্র সেই কথা শচীদেবীর কর্ণগোচর করিলেন। শচী শিহরিয়া উঠিলেন এবং স্বস্ত্যয়ন অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। তুমি আমি হইলে পুত্রের এরূপ অমানুষী প্রতিভা দেখিয়া সুখীই হইতাম। কিন্তু শচীদেবী অন্য ধাতুর মানুষ ছিলেন। তাহার পরে, বালক নিমায়ের আরো পরিচয় পাই যে তিনি—

"যে পথে রমণী হাঁটে, জানিত কিশোর,
তার চতুঃসীমানায় যাইত না কভু"

বিবাহের পূর্ব্বে এরূপ অভিজ্ঞতা বিরল। তদুপরি নিমাই আবার কবি। কারণ—

"বহু ভালবাসে গোরা স্বভাবের শোভা"

হায় সর্ব্বচিকিৎসার অতীত! ক্রমে নিমায়ের উপনয়ন।

"পুত্রের উপনয়ন কর্ণবেধ কাজে
মিশ্র করিল কিছু ঘটার ব্যবস্থা"!

—ইহা গদ্য কি পদ্য বোঝা গেলনা।

"তারি নির্ব্বাহের তরে অতিরিক্ত শ্রমে
গৃহকর্ত্তা পড়িলেন ভয়ঙ্কর জ্বরে"।

তাহাতেই মিশ্রের মৃত্যু। মরিবার পূর্ব্বে তিনি

"প্রাণপণে, অন্তিম উৎসাহে উচ্চারিল
সঁপিলাম বৎস, তোরে হরির চরণে!"

ক্রমে গৌরাঙ্গের

"চিন্তা আসি বাসা নিল উদাস হৃদয়ে।"

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"কোথা পরলোক ?

সেকি ওই নীলাভ্রের শতস্তর তলে ?

দুর্ভেদ্য এ লোক হতে ওই আচ্ছাদন ;

ও লোকের লোক চক্ষে স্বচ্ছ বুঝি ইহা

তিনিও হয়ত তবে দেখেছেন চেয়ে,

পুত্র তার আছে চেয়ে তারি ধ্যানে এবে ?

অথবা মর্ত্ত্যের এই সুখ-দুঃখ-ঘটা

এতই সামান্য, লঘু স্বর্গের নিকটে,

নাই স্পর্শে প্রেতাত্মারে ; কিম্বা তিনি ছাড়া

কেহ নহে অধিকারী ?"

—সুন্দর। কিন্তু "অধিকারী" অর্থ বুঝিলাম না। ক্রমে তাহার বিশ্বাস হইল

"বিশ্ব সৃষ্টি নহে কোন আকস্মিক ঘটা,

মঙ্গল আরম্ভ তার সত্যে পরিণতি।"

ঘটা অর্থ এখানে বুঝিতে হইবে ঘটনা। পরে

অচিরে হারা'ল

বিতণ্ডার কুণ্ডলীতে গাঢ় অধ্যয়নে

রসের তৃষায় আর যশের নেশায়,

সে চিন্তা-বুদ্বুদ! কিশোরী যেমন ভোলে

প্রথম প্রেমের স্বপ্ন নিদ্রা অবসানে!"

এ উপমাটি না দিলেই ভাল হইত। নিমাই সম্বন্ধে পরে গুটি কতক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম প্রতাড়িত কুক্কুরকে কোলে করা, দ্বিতীয় যবনকে আলিঙ্গন করা—উত্তম।

—তাহার পরে যৌবনে গৌরাঙ্গের পণ্ডিত কেশবের সহিত তর্ক, এবং সহাধ্যায়ী রঘুনাথের জন্য স্বরচিত ন্যায় ভাষ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি কার্য্য মিষ্ট হইলেও বালসুলভ চপলতা জনিত হইতেও পারে, কিন্তু শেষোক্ত দুইটি কার্য্য অমানুষী! সে দুইটি কার্য্যর গৌরাঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা করিতেছে। তাহা সহসা পাঠকের মনে একটি একটি প্রকাণ্ড ঢেউ তুলিয়া দিয়া গেল। বলিয়া গেল ঝড় আসিতেছে। কেশবের সহিত তর্কে জয়ের পরে, গৌরাঙ্গ যাহা কহিলেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নিমাই কহিলা ধীরে,—মিথ্যা মিথ্যা সব।
এই বক্র, সূচি সূক্ষ্ম তর্ক যুক্তি জাল,
ভাষার এ ইন্দ্রজাল, ভাষ্যের কৌশল;
বিদ্যার কৈতব ক্রীড়া কুটিলে কপটে!—
লাগিছে কিসের কাজে? ব্যর্থ বৃদ্ধ জ্ঞান
ছুটিছে কি কোন বৃহৎ সন্ধান তরে?
কর্ম্মশূন্য ধর্ম্ম ভাণ,—এদিকে আবার
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান ছলে, অন্তঃসারহীন
ক্রিয়াকাণ্ডে শোচনীয় ধর্ম্মের দুর্গতি,
—এই শুষ্ক জ্ঞান হ'তে! শুধু দম্ভ ল'য়ে
লক্ষ্যহারা বিতণ্ডার অসার চীৎকার,
পেচকের মত এই গাম্ভীর্য্যের ঘটা,—
বিশ্বেরে কি ঊর্দ্ধপানে পারে টানিবারে?
কূট মস্তিষ্কের পাকে পড়েনা জড়ায়ে
ঊর্ণনাভসম, জালে? - স্তাবকের মুখে
দিনক'য় থাকে জাগি, জয়গান তার;
অনন্ত তিমিরগর্ভে তার অবসান।
চেয়ে দেখ একবার ওই ঊর্দ্ধপানে,
কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে, লোকলোকান্তরে
কি শান্ত সুন্দর সত্য হতেছে রটিত!
—তার নাম, শুদ্ধাভক্তি, অহেতুকী প্রেম!
সোঽহং,—যে দৃপ্ত উক্তি, যে মত্ত খেয়াল,
ফুটিয়াছে সেবকের মুখে,—তারো মূলে
এই বন্ধ্যা বিদ্যা। আমরা কূপের কীট,
অমৃত-সাগরে যদি চাহি সন্তরিতে,
বিশ্বাসে বাঁধিয়া প্রাণ, নিঃশ্বাস রুধিয়া,
বিস্ময়ে, বিনয়ে, ভয়ে যেতে হবে তবে
সংসার সীমানা ছাড়ি অনন্তের দেশে।

অহা শুনিয়া কেশব বিহ্বল বিমুগ্ধ হইয়া কহিলেন—

নরোত্তম,

"হেন প্রাণস্নিগ্ধকরী অলৌকিক বাণী
শুনি নাই। কেহ, হেন সাহসে বিশ্বাসে,
অভয় আশায় স্ফীত অমোঘ-আশ্বাস
সহজ সরল করি, করে নি ঘোষণা।"

তাহার পরে গৌরাঙ্গের অধ্যাপনে ক্রমে ঔদাসীন্য ও অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ, এবং তৎপরে তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ। একদিন এক তর্কের মধ্যস্থরূপে নিমাই পণ্ডিত বসিয়া আছেন, তর্ক চলিতেছে। কিন্তু নিমায়ের—

"মন সেথা নাই; সংসারের কোথা নাই!
ঘুরিছে তা মেঘে মেঘে গগনে পবনে

বড়ই সুন্দর—

এইখানে প্রথম সর্গ শেষ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসমালোচক।

পঞ্চায়ৎ।

মনু সংহিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়:—

রাজা প্রত্যেক গ্রামের একজনকে অধিপতি করিবেন, দশ গ্রামের অধিপতি একজনকে করিবেন, বিংশতি গ্রামের অধিপতি ও শত গ্রামের অধিপতি ও সহস্র গ্রামের অধিপতি করিবেন। গ্রামে কোন চৌর্য্যাদি দোষ ঘটিলে, গ্রামাধিপতি তাহার প্রতিকার করিবেন, যদি তিনি অক্ষম হন, দশ গ্রামের অধিপতিকে উক্ত ব্যাপার অবগত করাইবেন। দশ গ্রামাধিপতি যদি অসমর্থ হন, বিংশতি গ্রামাধিপতিকে কহিবেন, এইরূপ উপর উপর জানাইবেন, ইহা হইলে রাজ্যে, উপদ্রব হইবে না" (৭ম অ। ১১৫, ১১৬, ১১৭ শ্লোক।)

"রাজা চারি দণ্ড পর দুইপ্রহর পর্যন্ত বিচার দর্শন করিবেন, (৭ অ। ১৪৫ শ্লোক) যখন স্বয়ং বিচার কার্য্যে অসমর্থ হইবেন তখন তিনি একজন অমাত্য শ্রেষ্ঠকে যিনি সৎকুল জাত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ও ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণের অর্থী প্রত্যর্থীর কার্য্য দর্শনের নিমিত্ত আসনে নিযুক্ত করিবেন।

প্রাড়্ বিবাক ও অক্ষদর্শক শব্দে ঋণ দায়াদি ব্যবহারের (নালিশের) দর্শক বুঝায় বর্ত্তমান সময়ে যেমন মুন্সেফ।

অর্থী ও প্রত্যর্থী ও সাক্ষীগণ সত্য বলিতেছে বা মিথ্যা বলিতেছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বিচারক[illegible] উপদেশ দিয়াছেন যথা, মনু—

গদ্গদাদি স্বর ও মুখের কৃষ্ণত্ব ও পাণ্ডুত্ব বর্ণ যাহা স্বাভাবিক নহে ও অধোনিরীক্ষণ ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর এবং রোমাঞ্চাদি বাহ্য চিহ্নদ্বারা অর্থী প্রত্যর্থীর অন্তর্গত ভাব নিশ্চয় করিবেন, (৮ অ ২৫, ২৬ শ্লোক। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে দণ্ড অর্থাৎ বিচার পূর্ব্বক বিধি ব্যবস্থামত শাসন করা রাজধর্ম্ম ইহাও লিখিত আছে।

ইহাতে আমরা বুঝি যে প্রাচীনকালে ফৌজদারী এবং দেওয়ানি মোকদ্দমায় অন্ততঃ কতক বিচার রাজা স্বয়ং করিতেন। এবং কতকটা বর্ত্তমান সময়ের মত রাজ-নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজে বিচার ও শাসন বিষয়ে আর একটি সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায়।

গ্রামের প্রকৃতিপুঞ্জ শাসনকার্য্য পরিচালনার্থে পঞ্চ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেন। এই পঞ্চায়তের প্রত্যেকে গ্রামের প্রজামণ্ডলী দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন। ইহারা সাধারণত গ্রামের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিতেন। কোথাও বা প্রয়োজন মতে দণ্ড দিতেন। পঞ্চায়তের উদ্ভব হেতু অনুমান করা কঠিন নহে। রাজা স্বয়ং মন্ত্রীগণ লইয়া বিচার করিতেন। এই মন্ত্রিগণ সমুদয় রাজ্যের প্রজাদিগের প্রতিনিধি। (মহাভারত) অ ৮৫ শ্লো ৬—১২) মন্ত্রীগণ যেমন সমুদয় রাজ্যের প্রজাকুলের প্রতিনিধি, পঞ্চায়ত তেমনি একটি গ্রামের প্রজাদিগের প্রতিনিধি। গ্রামাধিপতি রাজার প্রতিনিধি। পঞ্চায়ৎ প্রজার প্রতিনিধি। পঞ্চায়ত গ্রামবাসী। গ্রামাধিপতিও গ্রামবাসী, সুতরাং পঞ্চায়ত যাহাদিগের প্রতিনিধি গ্রামাধিপতি তাহাদিগের মধ্যে একজন। রাজা দূরে, গ্রামবাসীগণ নিকট। গ্রামবাসীগণের যাহা স্বার্থ, গ্রামবাসী গ্রামাধিপতির তাহাই স্বার্থ। সুতরাং গ্রামাধিপতি গ্রামের সমাজের অধীন; সেই নিমিত্ত গ্রামাধিপতি গ্রামের পঞ্চায়তের মধ্যে ক্রমে বিলীন হইয়াছিলেন বোধ হয়।

গ্রামের বিচার ও শাসন ভার পঞ্চায়ত বা মণ্ডলগণের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই মণ্ডলগণ যাহাতে গ্রামের রাস্তা ঘাটের সুব্যবস্থা হয়, যাহাতে জলাভাব না থাকে তাহারও বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেন, যখন শাসনের ভার তাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল বিবাদ হইলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি কেহ নীতিবিগর্হিত উৎকট কার্য্য করিত, তাহা হইলে পঞ্চায়তগণের বিধানানুসারে সে জাতিচ্যুত হইতে। দোষী ব্যক্তির সহিত কেহ একত্রে আহার করিত না, রজক ও ক্ষৌরকার নিষিদ্ধ হইত। সমাজে তাহার সহিত আদান প্রদান বন্ধ হইত। এইরূপ নানা উপায়

অবলম্বন করিয়া পঞ্চায়তগণ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে শাসন করিতেন। পঞ্চায়ত গণের শাসনে বিশেষ ফলোদয় হইত। অথচ অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়েরই আদালতের খরচা কিছুই লাগিত না। উপরে বলা হইয়াছে যে পঞ্চায়তগণ প্রায়ই গ্রামের, সুতরাং কে কি চরিত্রের, কি অবস্থার লোক, বা কি উপায়ে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সকলই ভালরূপ জানিতেন। এই জন্য তিনি তাঁহার গুরুতর ভার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা এখনকার বিচারক দিগের ন্যায় কৌন্সিলি বা উকিলের কূটতর্কে এবং তাড়নায়, সাগরে বায়ুঘূর্ণিত নৌবৎ, দিশিহারা হইয়া, নির্দ্দোষীকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেন না। অথবা রামের ধন শ্যামকে দিবার আদেশপত্র লিখিতেন না। সাক্ষী বেচারী গ্রামবাসী পঞ্চায়ৎগণের নিকটে অসঙ্কোচে সত্য কথা বলিতে পারিত। আর পঞ্চায়তগণও পল্লীস্থ সত্যবাদী সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে বিচার্য্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

পঞ্চায়তের শাসন ও বিচার প্রণালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতেছি না। কিন্তু ইহার দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ বেশী ছিল। আমাদিগের দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক যে দণ্ডবিধান হইত তাহাতে দোষীর দমন হইত অথচ তাহার সর্ব্বনাশ হইত না। বর্ত্তমান বিচার প্রণালীতে একজন আজীবন সচ্চরিত্র, কিন্তু কোন সময় সহসা সাময়িক উত্তেজনায় কেন আকস্মিক ঘটনা বশতঃ কোন গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিল। বিচারক তাহার চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং কিছুই অবগত নহেন। তিনি তাহাকে হয়ত ৫।৭ বৎসরের নিমিত্ত কারাগারের কঠিন ক্লেশ ভোগ করিবার আদেশ দিলেন। মণ্ডলের বিচারে তাহা সম্ভব হইত না। অপরাধী সামাজিক শাসনে পাপ হইতে ক্রমে নিবৃত্ত হইত। কারাগারে অভ্যস্ত পাপীদিগের সংসর্গে তাহার পাপপ্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইতনা।

দণ্ডের উদ্দেশ্য দুইটী হওয়া উচিত। একটি, নিবারক (preventive) অপরটী সংস্কারক (curative)। দণ্ডের ভয়ে অপরাধী পুনর্ব্বার, এবং অন্যলোকে, অপরাধ করিবে না ইহা দণ্ডের একটি উদ্দেশ্য। দণ্ড বিধানে দণ্ডিত ব্যক্তি এমন শিক্ষা পাইবে, তাহার নীতির এমন সংস্কার হইবে যে অপরাধীর মন আর মন্দ কার্য্যের দিকে যাইবে না—ইহারও প্রতি দণ্ডবিধান সময় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পঞ্চায়ত-বিচারে এই দুই উদ্দেশ্যই বিনা আড়ম্বরে সুসাধিত

হইত। পঞ্চায়তের বিচারে দয়া আপনি যেন আসিয়া দণ্ডের সহিত মিশিয়া যাইত। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে।

মণ্ডলগণ অপরাধীর গ্রামবাসী। অপরাধীর সহিত এক স্থানে আশৈশব বাস করিয়াছেন,হয়ত বাল্যকালে একত্র খেলা করিয়াছেন, পাঠশালে একত্র পাঠ করিয়াছেন, ভোজে একত্র আহার করিয়াছেন এবং নানা বিষয়েই একভাবে এক সঙ্গে সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছেন। আবার মণ্ডলগণের স্ত্রী ও কন্যাগণ, স্নানের ঘাটের দৈনিক সম্মিলনীতে হয়ত কতদিন অপরাধীর স্ত্রী বা কন্যার সহিত সখীর ন্যায় আলাপ করিয়াছেন। আজ সখীর স্বামী বা পিতা বিপন্ন, দণ্ডিত। সখীর বিপদে, বিলাপে, মণ্ডলের স্ত্রী কন্যাও দুঃখিত, সুতরাং মণ্ডলের নিকট অপরাধীর প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য কান্নার আবেদন আসিত। তজ্জন্য দণ্ড ও দয়া হরগৌরীর ন্যায় একাঙ্গ হইয়া বিরাজ করিত।

পঞ্চায়ত যে কেবল বিচার ও শাসন করিতেন তাহা নহে। অনেক স্থলে বিবাদের সূত্রপাত হইবামাত্র উভয় পক্ষকে নানাবিধ সদুপদেশ দ্বারা বিবাদ হইতে ক্ষান্ত করিতেন, অসদ্ভাবের স্থানে সদ্ভাব আনয়ন করিতেন। প্রকৃত পঞ্চায়ত একাধারে—মধ্যস্থ, জুরি, বিচারক।

গভর্ণমেণ্ট ক্রমে আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন দিতেছেন। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটও নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা যদি উপযুক্ত হই, এবং গবর্ণমেণ্ট যদি পঞ্চায়তের উপকারিতা যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট পুরাকালের পঞ্চায়ত আবার স্থাপিত করিতে পারেন। এ বিষয় আমাদিগেরও অনেকটা স্বাধীনতা আছে। আমরা সুবোধ হইলে, গ্রামের পাঁচ জন গণ্য মান্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া, অন্ততঃ ক্ষুদ্র বিবাদ গুলি তাহাদিগের সালীসী দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আলো দেখিয়া তাহাতে পড়িয়া নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হয়, আমরাও তেমনি আদালতের আলোক দেখিয়া তাহাতে নিজে নিপতিত হইয়া আপনারাই আপনাদিগের ধ্বংসের কারণ হই,—আর শেষে— আপনাদিগের মূঢ়তার বিষময় ফলের জন্য, হয় বিধাতাকে না হয় গবর্ণমেণ্টকে দোষী বিবেচনা করিয়া আবার আর একটি ভ্রমে পতিত হই।

শ্রীদেবেন্দ্র লাল রায়।

বিধবা বিবাহ।

[নবপ্রভার বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় বাল বিধবার একাদশ্যুপবাসে ফলমূল ভক্ষণ সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভক্ষণ সম্বন্ধে আমার মতত আছেই; অধিকন্তু আমি বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও সম্পূর্ণ অনুমোদন করি, নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাহার উপলব্ধি হইতে পারিবেক। পরন্তু যে সকল বিধবা ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইবেন, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস তাহাদের কর্ত্তব্য হইলেও যে স্থানে স্বাস্থ্য ও জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িবে সেইস্থানে ফলমূলাদি সেবন শাস্ত্রসম্মত, এবং ব্যবহারবিরুদ্ধও নহে।]

যে ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বহুবৎসর যাবৎ পণ্ডশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের পদার্পণ সর্ব্বথা নিষ্ফল ইহা আমি অনবগত নহি। কিন্তু যেমন "বিষ্ণায় নমঃ" প্রভৃতি বাক্যে বক্তার মুর্খতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভক্তিও প্রকটিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখকের তৎদুর হইলেই আশানুরূপ ফললাভ হইবেক। তদূর্দ্ধে যদি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমাজে একটী মাত্র হৃদয়ও বিচলিত হয়, তাহা হইলে প্রবন্ধলেখকের আনন্দের সীমা থাকিবেনা।

বিধবা বিবাহ লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। যে সকল পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের পক্ষে, তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র হইল পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটী বচন, যথা—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাম্ পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, ক্লীব কিংবা পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সম্মত।

যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিপক্ষে, তাঁহারা প্রারম্ভেই পরাশর বচনোক্ত 'পতি' শব্দের অর্থ করিলেন 'উপপতি'। কেহ কেহ আবার বলিলেন পতিরন্যো বিধীয়তে এই বাক্যের সন্ধি বিশ্লেষ করিলে পতিরন্যঃ+অবিধীয়তে এই প্রকারও হয়। তখন লুপ্ত অকার লইয়া মারামারি বাধিল। পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়ি হইতে লাগিল। এবং যখন শাস্ত্রে আর বেড় পাইল না, তখন উভয় পক্ষের

ব্যক্তিগত কুৎসা কীর্ত্তন হইয়া বঙ্গের মুখ কিছু দিনের জন্য উজ্জ্বল হইয়া রহিল। ফলতঃ যখন

কৃতে তু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥

এই বচন সর্ব্ববাদি সম্মত, তখন পরাশরোক্ত 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি বচন যে বৈধব্য প্রথার মরণাস্ত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না, তথাপি বিপক্ষগণ চির প্রচলিত রীতি অনুসারে শাস্ত্র হইতে কতিপয় আপত্তি উত্থাপিত করিলেন।

১ম আপত্তি।

পরাশর সংহিতা হইতে।

জারেণ জনয়েৎ গর্ভং গতে ত্যক্তে মৃতে পতৌ।
তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্॥

পতি অনুদ্দিষ্ট, প্রব্রজিত, কিংবা মৃত হইলে যে স্ত্রী জারের দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করে, সেই পাপকারিণী পতিতাকে অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়া আসা কর্ত্তব্য।

২য় আপত্তি।

মনুসংহিতা হইতে—

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ॥

কোন বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োগ ধর্ম্মের কথা নাই; বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহও উক্ত হয় নাই।

৩য় আপত্তি।

বেদ হইতে—

একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি,
নৈকস্যা বহব স্যুঃ পতয়ঃ।

এক পুরুষের বহুজায়া হয়, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি হইতে পারে না।

৪র্থ আপত্তি।

মনুসংহিতা হইতে—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥

অপত্যলোভাৎ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥

ভর্ত্তা মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, সে অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচারিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

অপত্য লোভে যে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করে, সে এই জগতে নিন্দিত, ও পতিলোক হইতে বিচ্যুত হয়।

অন্যের পত্নীতে অন্য পুরুষের উৎপাদিত সন্তান অভীপ্সিত নহে, যেহেতু কোন শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা বিহিত হয় নাই।

৫ম আপত্তি।

যাজ্ঞবল্ক্য হইতে—

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য লক্ষণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্য পূর্ব্বিকাং কান্তাম্ অসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥

দান কিম্বা উপভোগের দ্বারা যে স্ত্রী পুরুষান্তর কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই এ প্রকার বয়স্থা অসপিণ্ডা কান্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

৬ষ্ঠ আপত্তি।

পুরাণ হইতে—

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥

বিধবার পুনর্বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃজায়া, কমণ্ডলু এই সমস্ত কার্য্য কলিতে করিবে না।

ইহার মধ্যে প্রথম আপত্তি কিছুই নহে। 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি বচনে পরাশর পতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। আর শেষোক্ত শ্লোকে জার শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরাশরের বাক্যে কোন বিরোধ নাই। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে পঞ্চাপদগ্রস্ত নারীরা যদি শাস্ত্রানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করে তবে তাহারা অবশ্যই সৎপতি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি জারের দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দেশান্তরে পরিত্যাগ করা যাইবে।

২য় আপত্তি সর্ব্বথা অমূলক। বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্রে নিয়োগের কথা না থাকিলে তাহাতে বিধবা বিবাহ অপ্রতিপন্ন হয় কি সে? পতি মরিয়া গেলে স্ত্রীর পুনর্ব্বার পতি গ্রহণের নাম বিধবা বিবাহ। আর সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে আহ্বান করিয়া একবার মাত্র নিযুক্ত করাকে নিয়োগ বলে। যখন বিধবা বিবাহ আর নিয়োগ এক পদার্থ হইতেছে না, তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্রে নিয়োগের অনুল্লেখ হইলে, বিধবা বিবাহের নিরাস হইতে পারে না। অপিচ বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্বিবাহের কথা উক্ত হয় নাই ইহার অর্থ এই যে বিধবা বিবাহ সাধারণ কন্যা বিবাহের ন্যায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে; ইহার নিমিত্ত শাস্ত্রে অন্য বিধি দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রে 'অথ বিধবা বিবাহ পদ্ধতিঃ' ইত্যাকার কিছুই কথিত হয় নাই।

৩য় আপত্তি আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। এক স্ত্রীর বহু পতি হইতে পারে না। ইহার অর্থ এক সময়ে এক স্ত্রী একাধিক পতির পত্নী হইতে পারে না। সে যদি ভিন্ন সময়ে অর্থাৎ এক পতির মৃত্যুতে পত্যন্তর গ্রহণ না করিতে পারিত, তবে নিম্নোদ্ধৃত বেদ বচনের সার্থকতা কি?

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক
মিতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্ত গ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং
পত্যুর্জ্জনিত্বমভিসম্বভূব।

হে নারি! তুমি মৃত পতির নিকটে শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে এ স্থল হইতে জীবিত লোকের নিকটে গমন কর, আর যিনি তোমার হস্ত ধরিয়া তুলিতেছেন তিনি তোমার পুনর্বিবাহেচ্ছু পতি অধুনা তুমি তাহার জায়া হও।

বিপক্ষগণ উদ্ধৃত বেদবচন তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক দেখিয়া আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তামুত্থাপয়েৎ দেবরঃ পতিস্থানীয়োঽন্তেবাসী জরাদ্দাসঃ।

দেবর শিষ্য অথবা প্রাচীন ভৃত্য মৃতব্যক্তির পত্নীর হস্ত ধরিয়া তুলিবেন।

আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র বেদের তুলনায় অতি আধুনিক গ্রন্থ। বৈদিক সময়ে শ্মশানে যে ব্যক্তি বিধবার হস্ত ধরিয়া তুলিত, সেই বিধবাকে বিবাহ করিত। কালে বিবাহ রহিত হইলেও, শ্মশানে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলনের রীতি বহু কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তখন দেবর শিষ্য অথবা প্রাচীন দাস বিধবার হস্ত ধারণ করিয়া তুলিতেন; এবং ঐ স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে পতিস্থানীয় হইয়া

তাহার পুংসবনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু বিবাহ করিতেন না। ইহাতে কি মৌলিক বেদবাক্য পচিয়া গিয়াছে ?

৪র্থ আপত্তি কোন কার্য্যকারক নহে। ভর্ত্তা মরিলে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে সে স্বর্গে যায় ; মনুর এই বাক্যেই প্রতীত হইতেছে যে পতির মৃত্যুতে সকল স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে না ; সমাজে বিধবা-বিবাহ ও বৈধব্য উভয়ই প্রচলিত আছে। সংহিতাকার স্বর্গের লোভ দেখাইয়া সকলকেই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যে স্বর্গলাভ হয় একথা মনুর পূর্ব্বেও যেমন বলবতী ছিল পরেও সেইরূপ বলবতী আছে। যে ব্যক্তি পত্নীবিয়োগে দারান্তর গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে সেও বোধ হয় স্বর্গেই যাইয়া থাকে। যে সকল রমণী পতিবিয়োগে পত্যন্তর গ্রহণ করেন না তাঁহাদের প্রতি সমাজের ভক্তি চির দিন আছে ও থাকিবে। কিন্তু আপত্তি স্থলে বিপক্ষগণ এই শ্লোকের উদ্ধার করিয়া কেবল কলহ প্রিয়তারই পরিচয় দিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকের দ্বারা স্ব স্ব মূর্খতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

অপত্যলোভে যে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করে এ কথার সহিত বিধবা বিবাহের সম্পর্ক কি ? স্বামীকে অতিবর্ত্তন করে ইহার অর্থ কি স্বামী মরিয়া গেলে পুরুষান্তর গ্রহণ করে ? সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে স্ত্রী পতি সত্ত্বে সন্তানোৎপাদনের জন্য পুরুষান্তর গতা হয়, তাহাকেই মনু নিন্দা করিয়াছেন।———

সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা কোথায়ও বিহিত হয় নাই ইহার অর্থ এক পতি সত্ত্বে অন্য পতি বিহিত হয় নাই। এক পতির অবিদ্যমানতায় অন্য পতি বিহিত হয় নাই বলিলে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। আমরা কখনই সে প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না !

৫ম আপত্তিও নিরর্থক। কারণ অনন্যপূর্ব্বিকা এই ব্যাকের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সমাজে অন্যপূর্ব্বা রমণীর পাণি গ্রহণের রীতি ছিল, নচেৎ যাজ্ঞবল্ক্যের অনন্যপূর্ব্বিকা এইরূপ নির্দ্দেশ প্রয়োজন হইত না। সংহিতাকারের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে অন্যপূর্ব্বা ও অনন্যপূর্ব্বা উভয়েরই বিবাহ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে তিনি একতমের পক্ষপাতী বলিয়া অন্যতমের অবৈধতা প্রতিপন্ন হয় কিসে ?

৬ষ্ঠ বা শেষ আপত্তি দ্বারা বিপক্ষগণ দেখাইতেছেন, পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরুদ্বাহ প্রভৃতি পঞ্চ বিধ কার্য্য প্রচলিত ছিল, কিন্তু কলির

প্রবৃত্তি হইতে উহার নিষেধ হইয়াছে। আমরা এ কথা বলিয়া রাখিতেছি যে উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহম্ ইত্যাদি শ্লোক পুরাণ বিশেষ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংহিতা শাস্ত্রে ঐ প্রকার শ্লোক কদাচিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে প্রাধান্য কাহার তাহা সকলেই জানেন।

পুরাণে ঐ প্রকারের আরও বচন আছে,—

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌন চ কমণ্ডলুম্॥

এই শ্লোকে পঞ্চবিধ কার্য্যের উল্লেখ না হইয়া চতুর্ব্বিধ কার্য্যের উল্লেখ হইতেছে দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্লোকটীই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পূর্ব্বে এই চতুর্ব্বিষয়ের নিষেধ হইয়া কাল ক্রমে যখন আর একটি নিষেধ করিবার প্রয়োজন হইল, তখনই "উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহম্" ইত্যাদি শ্লোক প্রণীত হইয়া থাকিবেক।

এখন "দেবরাচ্চ সুতোৎ পত্তিঃ," এই শ্লোকটীর মূল্য কি? ব্যকরণানুসারে যে শ্লোকের অন্বয় হয়না, যাহা স্পষ্টতঃই কোন মূর্খের প্রণীত বলিয়া উপলব্ধি হয়, তাহাকে মহর্ষি বাক্য বলিয়া ধরিতে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই ইতস্ততঃ করা উচিত। অপিচ ঐ শ্লোকের বলেই যে হিন্দু সমাজ হইতে উল্লিখিত প্রথা চতুষ্টয় তিরোহিত হইয়াছিল, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; লোকের রুচি অনুসারে যখন ঐ সমস্ত ব্যাপার সমাজে বিচেয় ভাব ধারণ করিয়াছিল তখনই কোন গোমূর্খ কষ্টেসৃষ্টে একটী নিষেধাত্মক শ্লোক রচনা ও শাস্ত্র গ্রন্থ বিশেষে তাহার প্রক্ষেপ করিয়া ধন্য হইয়া থাকিবেন।

ফলতঃ ঐ সমস্ত বিষয়ের নিষেধ করিবার প্রয়োজন হইলে, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি যে সকল সংহিতাকার ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা বা তাঁহাদের অন্যতম কেহ অনায়াসে নিষেধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

এ জগতে সমাজ কখনই শাস্ত্রের অনুগমন করে নাই; শাস্ত্রই চিরদিন সমাজের অনুগমন করিতেছে। শাস্ত্র প্রচলিত প্রথার ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধের সময় হইতে ভারতের বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের লোপ হয়; ইহাতে যাঁহারা বুঝেন যে বুদ্ধই ক্রিয়া কর্ম্ম লোপের কর্ত্তা অথবা বুদ্ধ জন্মগ্রহণ না করিলে বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের লোপ হইত না, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত

হইতেছে না। কিন্তু যাঁহারা বুঝেন বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই সমাজের লোকেরা বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম তুলিয়া দিতেছিল বা তুলিয়া দিবার কথা ভাবিতেছিল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহারাই প্রকৃত চিন্তাশীল। বুদ্ধের মহত্ব এই যে তদীয় হৃদয়ে জাতীয় চিন্তা প্রতিফলিত হইয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম লোপ সমাজের লোকেই করিয়াছিল ; বুদ্ধ তাহার সাক্ষী ও পক্ষপাতী, বৌদ্ধ শাস্ত্র তাহার ইতিহাস।

কিন্তু শাস্ত্র সকল ইতিহাস অপেক্ষা কিছু বলবত্তর। ইতিহাসে কেবল সময় বিশেষের অবস্থা যথাযথ বর্ণিত থাকে। শাস্ত্রে সময় বিশেষের অবস্থা বর্ণিত হইবা মাত্র বিধির আকার ধারণ করে। পূর্ব্বে আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহের বহুল প্রচলন ছিল। কাল সহকারে রুচিভেদে যখন কতিপয় নারী পত্যন্তর গ্রহণে বিমুখ হইলেন তখন সেই ইতিহাস, শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া কাল ক্রমে বিধির আকার ধারণ করিল। পতি বিয়োগে পত্যন্তর গ্রহণ তখন বৈধ কি অবৈধ বলিয়া বিচারাধীন হইল। সমাজ সন্দিহান হইয়া পড়িল। তখনও যে সকল রমণী স্বামীর মৃত্যুতে পত্যন্তর গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন, কিংবা পরবর্ত্তী কালে যাঁহাদের তাদৃশ আবশ্যকতা বোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল, সকলেরই ভাগ্যে নিদারুণ কুঠারাঘাত হইয়া গেল। ছদ্মবেশী ইতিহাস ভারতের কিই না সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

মনুষ্য সমাজে অনেক প্রথা প্রচলিত থাকে, এবং কালে তাহার সঙ্কোচ বিস্তার, পরিবর্ত্তন, তিরোধান সমস্তই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রথা বিশেষের তিরোধান মাত্রই তদীয় অবৈধতার প্রতিপাদক হইতে পারে না বস্তুতঃ জগতে কোন প্রথারই সম্পূর্ণ তিরোধান সম্ভব হইত না, যদি শাস্ত্রকারগণ প্রথা বিশেষের সঙ্কোচ সময়ে বলপূর্ব্বক তাহার সম্পূর্ণ বিলোপের চেষ্টা না পাইতেন। আর তাঁহাদেরই বা অপরাধ কি ? জগতে এমন এক সময় অবশ্যই আসিয়া থাকে, যে সময়ে লোকের একীকরণ স্পৃহা বড়ই বলবতী হয়। তখন সমাজ ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বাধীনতার প্রতি আদৌ দৃষ্টি করে না, এবং এক ও অক্ষুন্ন নিয়মের দ্বারা ব্যক্তি মাত্রকে শাসন করিতে চেষ্টা পায়। মহর্ষিরা বোধ হয় সেই সময়কেই কলির প্রবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সময় অবলম্বন করিয়াই জগতে খ্রীষ্ট মহম্মদ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মগণ যাবতীয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এবং তাদৃশ শুভক্ষণের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় ভারতে বৈধব্য ধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হইয়া থাকিবেক।

বিধবা বিবাহে বাধা প্রদান করিয়া যিনি আপনাকে যত বড়ই পণ্ডিত বা যত বড়ই হিন্দু বলিয়া জাহির করুন না কেন, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে নিরপেক্ষ ন্যায়ের চক্ষে তিনি একজন মোল্লা বা পাদরীর সম ধর্ম্মাক্রান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পাদ্রীরা যেমন বলেন, হে জগতের লোক সকল, তোমাদের যীশু ভিন্ন আর কোন উপায়ে পরিত্রাণ হইবে না, মোল্লারা যেমন বলেন, এই কোরাণ ভিন্ন লোকের দ্বিতীয় পন্থা বিদ - মান নাই, তিনিও সেইরূপ বলিয়া থাকেন, হে হিন্দু বিধবা সকল! তোমা-দের ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই! এইরূপ সঙ্কীর্ণ বাদ সনাতন ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' বাক্যের সহিত 'বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত' প্রভৃতি বাক্য সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেই ধর্ম্মে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও বিধবার বিবাহ পাশা পাশি বিদ্যমান না থাকিলে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা কোথায়? যে ধর্ম্মে শাক্ত বৈষ্ণব, গৃহী সন্ন্যাসী, আস্তিক নাস্তিক, ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সকলকেই সমান অধিকার ও আশা দেওয়া হইয়াছে, সেই ধর্ম্মে বিধবাদিগকেও দুই পথ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, নচেৎ, সনাতন ধর্ম্মের নামে ঘোরতর কলঙ্ক হইবে। অন্যান্য সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম যেমন ব্যক্তিমাত্রকেই বলপূর্ব্বক এক দীক্ষায় দীক্ষিত করিতে চাহে, সনাতন ধর্ম্ম তাহা কদাচ করে না, বরং সাধকের শক্তি অনুসারে তাহাকে যথাযোগ্য মার্গ প্রদর্শন করেন। এমত স্থলে যাবতীয় বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষিত করায় কি সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে না? আর যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ এক বাক্যে তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন সামান্য লৌকিক আচারের অনুরোধে তাহাদিগকে সেই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কি যুগপৎ ভীরুতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় নহে?

কেহ কেহ বিধবাদিগকে অদৃষ্টবাদ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ দুরদৃষ্ট কি কেবল এই দেশের এক চেটিয়া? যদি বলেন যে সকল দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সেই সকল দেশেও কতিপয় কন্যাকে চিরকুমারী ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। সকল রমণীই পতিপুত্র লইয়া বাস করিবে ইহা যেন প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে। আমি একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে সকল কন্যা চিরকৌমার্য্য ব্রত অব-লম্বন করেন, তাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছা বা রুচির বশবর্ত্তিনী হইয়াই এরূপ করিয়া

থাকেন। তাঁহাদের নিরবলম্বিতা বা নিরপত্যতার জন্য সমাজ বা ধর্ম্ম ইহার কাহাকেও অভিশাপ গ্রস্ত হইতে হয় না।

অনেকে বলেন এ দেশে যে সংখ্যক বিধবা বিবাহিতা হইবেক, সেই সংখ্যক কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। আমরা এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা দেশে উৎপন্ন পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান কল্পনা করিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। আমরাও উভয় সংখ্যার তুল্যতা ধরিয়া উত্তর করিতেছি। সমাজ যদি একটী স্ত্রীর জন্য একাধিক পুরুষ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে তাহার একটী পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী ব্যয় করাও নীতি বিরুদ্ধ বলিতে হইবেক। কিন্তু এ দেশে বহুবিবাহ, ও মৃতদারের পুনঃ দার-পরিগ্রহের প্রথা প্রচলিত আছে। তাই জিজ্ঞাসা করি, পুরুষে একের অধিক যতগুলি দার পরিগ্রহ করে, সমাজে ততগুলি পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, এই ন্যায্য আশঙ্কা করিয়া পুরুষেরও একাধিক দার পরিগ্রহের নিষেধ হয় নাই কেন ? অপিচ যে দেশে মৃতভার্য্যের পুনরায় দার পরিগ্রহের রীতি আছে সে দেশে মৃতভর্তৃকার পুনর্ব্বিবাহ নিরতিশয় যুক্তি সঙ্গত বলিয়াই উপপন্ন হয়, নচেৎ কতকগুলি পুরুষকে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হয়, এবং তদ্দ্বারা দেশের বংশহীনতা বৃদ্ধি পায় মাত্র।

কেহ কেহ বলেন দেশে কতকগুলি স্ত্রীলোক বিধবা থাকায় জননক্রিয়ার আংশিক রোধবশতঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত লোক সংখ্যার অনুপাত কদাচ বৈষম্য প্রাপ্ত হয় না, এবং তদ্দ্বারা দেশের সুখশান্তি কতকটা অক্ষুণ্ণ ভাবে থকে। কথাটী কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও একথা বলা যাইতে পারে যাঁহারা হৃদয়ে ঐ প্রকার মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভাগ্যক্রমে হীনজন হইয়া পড়িলে তদ্দ্বারা দেশের সুখশান্তি কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইল বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দিতে পারেন ত ?

অনেকে বলিয়া থাকেন দেশে বৈধব্য ধর্ম্ম আছে বলিয়া দাম্পত্য ধর্ম্ম অনেকাংশে দৃঢ় আছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে পাতিব্রত্যের শিথিলতা ঘটিবেক। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সহমরণ প্রথা তুলিয়া দিয়া ত বড় অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। জগতে সহমরণ প্রথা যে পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি সেই পরাকাষ্ঠার পরিহার করিয়া হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব না করিয়াছেন? বর্ত্তমান বৈধব্যরূপিণী পরাকাষ্ঠা সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবেন।

ইনি ও সহমরণ অপেক্ষা অল্প যন্ত্রণাদায়িনী দেবতা নহেন। সহমরণের অগ্নি নয়ন গোচর হইত, ইহার অগ্নি অদৃশ্য এই মাত্র বিশেষ। কালে এমন সময় অবশ্যই আসিবে, এবং আমার বিবেচনায় সে সময় ইতি পূর্ব্বেই আসিয়াছে, যখন এই নিদারুণ প্রথার পরিহার জন্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় সমুৎসুক হইয়া উঠিবে।

শ্রীকেদার নাথ বিদ্যাবিনোদ।

বিক্রমোর্ব্বশী

বা

কালিদাসের প্রতিভা বিকাশ।

মালবিকাগ্নিমিত্রের পরেই সম্ভবতঃ কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী বিরচিত হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রণয়ন সময়ে বা প্রতিভার প্রথম বিকাশে অমর কবি কালিদাসও ভীতি-জড়িত-কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন;—

পুরাতন বলিয়াই সব ভাল নয়,
অথবা নূতন নয় মন্দ অতিশয়,
সুধী সেবে ভাল মন্দ করিয়া বিচার
পরের কথায় আস্থা, চিহ্ন মূর্খতার। (১)

উদীয়মান কবির এই ভয় ভাবনা অচিরেই সমালোচক দলের সাধুবাদ প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ নূতন কবির নূতন রচনায় পণ্ডিত সমাজের নাসিকা ঘৃণায় কুঞ্চিত হইল না। তাঁহারা কবিত্ব সৌরভে মুগ্ধ হইয়া কালিদাসের অভিনব কাব্যকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই শুভ সুযোগেই কালিদাসের মুকুলিত প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রতিভাবানের সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী হইলেও প্রাণপণ যত্ন বা কঠোর সাধনার প্রয়োজনীয়তা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ক্ষণজন্মা কালিদাস ও

---

(১) পুরাণ মিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ।
মালবিকাগ্নি মিত্র।

বিনাসাধনায় মহাকবির মহার্ঘ সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বহু সাধনা বা অবিরাম চেষ্টার পর তাঁহার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাস প্রতিভার মুকুলিত অবস্থা, অভিজ্ঞান শকুন্তলে তাহার পূর্ণ বিকাশ। তদানীন্তন সুধী সমাজ যদি কালিদাসের প্রতিভামূলে উৎসাহ বা প্রশংসার শীতল সলিল সেচন না করিয়া নিন্দা বা উপেক্ষার ঘৃণিত আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতেন, তবে তাঁহাদের ভ্রুকুটি তাড়নায় কালিদাসের ন্যায় মহাকবির ও যে প্রতিভা মুকুলে ঝরিয়া পড়িত না, কে বলিতে পারে? এখন ও যে অযথা ভাষী সমলোচক দলের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে শতসহস্র হতভাগ্যের প্রতিভা অঙ্কুরেই বিলুপ্ত হইতেছে না, তাহাই বা কে জানে? তাই বলিতেছিলাম, মালবিকাগ্নিমিত্রের রচনাকালে যিনি ভীত কম্পিত হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই আজ প্রতিভার ক্রমবিকাশে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সম্পূজিত। তদীয় বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলা পাঠ করিলেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি বা প্রতিভার ক্রমোন্নতি অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

আমরা দুই চারিটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলার আখ্যান বস্তু ও রচনাগত কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বিক্রমোর্ব্বশীর উপাখ্যান ভাগই নামান্তরিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া শকুন্তলায় পরিণত হইয়াছে।

বিক্রমোর্ব্বশীতে প্রস্তাবনার পরেই রাজা পুরূরবা রথারোহণে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, শাকুন্তলেও তদ্রূপ প্রস্তাবনার পর রথারূঢ় রাজা দুষ্মন্তের প্রবেশ পরিদৃষ্ট হয়। নাটকদ্বয়ের রথগতিতে ও কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না। গতি দেখিয়া রথ দুইখানি এক সারথি দ্বারা চালিত ও এক অশ্ববাহিত বলিয়া ভ্রম জন্মে।

বিক্রমোর্ব্বশীতে—

“রথগতিবশে চূর্ণ মেঘমালা
　　ধূলিসম ধায় রথের আগে
চক্রভ্রান্তি রচে অর মাঝে যেন
　　অর রাজি হেন মানসে লাগে।
ত্বরিত গমনে বাজি শিরোপরি
　　চামর নিশ্চল দীর্ঘতা লভে।

মধ্যস্থিত কেতু রথবেগে নাহি
বুঝাযায়, মধ্যে প্রান্তে কি হবে। (১)

শাকুন্তলে—

"হইলে বিমুক্ত বল্গা রথবাজিগণ
পূর্ব্ব দেহ দীর্ঘ করি
বেগে প্রসরণ কারী—
ধূলিরাশি অতিক্রমি করেছে গমন।
অতিবেগে শিরোভূষা চমের নিশ্চল
তেজে কর্ণচ্যুতি নাই
বুঝিতে পারিনা তাই,
শূন্যেতে সাঁতার দিছে, অথবা' ভূতল
আক্রমি দৌড়িছে দ্রুত ঘোটকের দল। (২)

এই শ্লোক দুইটীতে কোনরূপ প্রভেদ আছে কি? তবে বিক্রমোর্ব্বশী হইতে শকুন্তলার রথের গতি বর্ণনা অধিকতর পরিস্ফুট ও সরল।

যথা শাকুন্তলে—

রথগতি দ্রুতহেতু ভাতিছে নয়নে
বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন বস্তু মিলিত বন্ধনে।
ছোট হয় বড় আর বস্তুতঃ যে বাঁকা
দেখাযায় ঠিক যেন সমরেখে আঁকা।

---

(১) অগ্রে যান্তি রথস্য রেণুপদবীং চূর্ণী ভবন্তো ঘনা
শ্চক্রভ্রান্তি ররান্তরেষু বিতনোত্যন্যামিবারলীম্।
চিত্রারম্ভ বিনিশ্চলং হয়শিরস্যায়াম বচ্চামরঃ
যন্মধ্যে সমবস্থিতো ধ্বজপটঃ প্রান্তেচ বেগানিলাৎ
বিক্রমোর্ব্বশী।

(২) মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়ত পূর্ব্বকায়াঃ
স্বেষামপি প্রসরতাং রজসা মলঙ্ঘ্যাঃ
নিষ্কম্প চামরশিখাশ্চত কর্ণ ভঙ্গাঃ
ধাবন্তি বর্ত্মনি তরন্তি মৃগাজিনন্তে।
অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

অদ্ভুত রথের গতি, যাহা ছিল দূরে
নিমেষেতে কাছে এসে পাছে গেল সরে। (২)

কি সুন্দর স্বভাব বর্ণনা। শ্লোকটী পড়িলেই মনে হয় যেন কোন আধুনিক কবি দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের কথা বলিতেছেন। রথের গতি বর্ণনায় বিক্রমোর্ব্বশীতে এই চমৎকারিত্বটুকু পরিদৃষ্ট হয় না।

ইহার পরে উর্ব্বশীর সহিত রাজা পুরূরবার সাক্ষাৎ হয়, এবং দর্শন মাত্রেই উভয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হয় শাকুন্তলে তাহারই বিশুদ্ধ 'সংস্করণ' আমরা দেখিতে পাই। রাজা দুষ্মন্তের নিকট হইতে গমন কালে অতৃপ্ত-বাসনা শকুন্তলা "অয়ি অভিনব কুশাঙ্কুরৈঃ পরিক্ষতং মে চরণং, কুরুবক শাখায়াং পরিলগ্নঞ্চবল্কলং, তাবৎ প্রতিপালয় মাং যাবদেতৎ মোচয়িষ্যে" "ওলো নূতন কুশাঙ্কুরে আমার চরণ ক্ষত হইয়াছে, এবং কুরুবকশাখায় আমার বল্কল জড়াইয়া গিয়াছে, বল্কল খুলিয়া লওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর"। এই বলিয়া বল্কল মোচন-চ্ছলে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া প্রণয়িনী শকুন্তলা প্রণয়পাত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইল। উর্ব্বশীও বিদায় কালে ঠিক সেইরূপ "অয়ি লতা-বিটপে একাবলী বৈজয়িন্তিকা মে লগ্না, সখি বিলম্বয় মোচয়ামি যাবৎ" বলিয়া বৈজয়িন্তিকা মোচনচ্ছলে সহচরী চিত্রলেখার চোখে ধূলি দিয়া আরও দুই মুহূর্ত্ত প্রণয়ীকে দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। এই প্রণয় লীলা বা চাতুরী খেলায়ও শকুন্তলাই জয়লাভ করিয়াছে, প্রসূন-পেলবা শকুন্তলা কমল কোমল চরণ যুগলে সূচী-তীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুরে ক্ষত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস যোগ্য চাতুরী প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু উর্ব্বশী লতিকার কোমল পল্লবে বৈজয়িন্তিকা জড়াইয়া নিতান্ত বোকামীরই পরিচয় দিয়াছে। শকুন্তলার চাতুরী অনসূয়া কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু উর্ব্বশীর ছলনা চিত্রলেখা সহজেই ধরিয়া ফেলিল, তাই সে উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "অয়ি দৃঢ়ং খলু লগ্না ন শক্নোমি মোচয়িতুম্" (সখি বড় দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে কিছুতেই খুলিতে পারি-

---

(২) যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্‌বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধান মিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্‌বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ।

শকুন্তলা।

তেছি না) এই নিমিত্তই বলিয়াছিলাম, কালিদাসের কালিদাসত্ব প্রাপ্তিও এক দিনে ঘটে নাই। বিক্রমোর্ব্বশীর ভ্রম প্রমাদ শকুন্তলায় সংশোধিত হইয়াছে।

উর্ব্বশীর ন্যায় শকুন্তলাও যেমন প্রথম দর্শনেই প্রণয় ভাজনের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়াছিল, পুরূরবার ন্যায় দুষ্মন্ত ঠিক সেইরূপ একটী মাত্র কটাক্ষেই প্রেমিকার চরণতলে ষোল আনা মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। নাটক দ্বয়ের নায়ক যুগল এক উপাদানেই গঠিত, তাই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা কার্য্য কল্পনা অপৃথগ্‌ভূত। পুরূরবা ও দুষ্মন্ত এই দুইয়েরই বরাঙ্গণা-লাভ-সূচক দক্ষিণহস্ত স্পন্দিত এবং রমণীরত্নলাভে উভয়ের হৃদয় আশঙ্কায় ব্যাকুল ও আশায় আশ্বস্ত হইয়াছিল। এই আশা নিরাশা চিন্তা ভাবনাতেও পুরূরবা দুষ্মন্তের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই প্রকার ঘটনার সাদৃশ্য ও কবিপ্রতিভার ক্রমোন্নতি উক্ত নাটকদ্বয়ের প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উভয় গ্রন্থের নায়কই এক ভাষা ও এক ভাবেই বিদূষক বন্ধুর কাছে কামনীয়া কামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রেও কালিদাসের কবিত্বশক্তি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে—বলিতে পারা যায়।

উর্ব্বশীর লাবণ্যসরসীতে হাবুডুবু খাইয়া পুরূরবা বলিতেছেন,—

"ইহার নির্ম্মাণে—কিলো শশী কান্তি দাতা
অথবা মদন নিজে ? মাস পুষ্পাকর ?
নতুবা সে অতিবৃদ্ধ অরসিক ধাতা
কেমনে সৃজিলা এই রূপমনোহর ? (১)

আর শকুন্তলার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া দুষ্মন্ত কহিতেছেন ;—

"চিতে নিবেশিয়া সব সৃষ্ট উপাদান
সুষমার রাশি নিয়া
বিধাতা সে রূপ দিয়া
কৃশাঙ্গী রূপসী এই করিলা নির্ম্মাণ।

---

(১) অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতি রভূচ্চন্দ্রোনু কান্তি প্রদঃ ?
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নমুমদনো ? মাসোনু পুষ্পাকর ?
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথংনু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্ মনোহর মিদং রূপং পুরাণোমুনিঃ।
বিক্রমোর্ব্বশী।

এই বালা সুনিশ্চয়
(আমার মানসে লয়)
সৃষ্টনারীরত্নকুলে বিশেষ বিধান
তাহার শরীর, আর
শকতি সে বিধাতার
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই করি অনুমান। (১)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের প্রতিভার ন্যায় রুচি ও নীতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিক্রমোর্ব্বশীর বিরহসন্তপ্তা নায়িকা বিচ্ছেদ-বেদনা-দূরী-করণ মানসে স্বয়ংই অভিসারিকা বেশে রাজা পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু বিয়োগবিধুরা শকুন্তলা বিরহ-যাতনা-শান্তির জন্য স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জাহীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া অভিসারের কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। সেই ব্রীড়া-বিনতা বিরহিণী লজ্জাবতী লতিকাটির ন্যায় ভাল-বাসার তুষানলে আপনার মনে আপনি জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্ত তপোবনের নিভৃত নিবাসে কমল দলের কোমল শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুঃসহ বিচ্ছেদের উপসংহারে বা মিলনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উভয়ত্র নায়িকার প্রণয় পত্র বা আত্ম নিবেদন এক ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার পরে বিক্রমোর্ব্বশীর মিলন বিঘাতী দেবদূতের ন্যায় শাকুন্তলেও গৌতমীর প্রবেশ নয়ন গোচর হয়। বিচ্ছেদের পরিপাকে প্রণয়ের গাঢ়ত্ব-উৎপাদন-উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ এই আক-স্মিক অন্তরায়ের সৃষ্টি। এই স্থান সমূহেও আমরা শকুন্তলাতেই কবিত্বের সৌরভ অধিকতর অনুভব করিতে সমর্থ হই। তার পর এই দুইখানি নাট-কেই মিলনের পরে বিচ্ছেদের আবার একটা বিরাট ব্যবধান বর্ণিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ বিরহের অবসান ও পুনর্মিলনের কারণও উভয়ত্র প্রায় এক প্রকার।

উভয় নাটকেই প্রণয়িগত-হৃদয়া আত্মবিস্মৃতা নায়িকার বিরাট বিরহ-বিপদ ক্রুদ্ধ মুনির অভিসম্পাতে ঘটিয়াছে এবং তাহার প্রতীকার বা

---

(১) চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিত সর্ব্বযোগান্
রূপোচ্চয়েন বিধিনা বিহিতা কৃশাঙ্গী
স্ত্রীরত্নসৃষ্টি রপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতু র্বিভুত্ব মনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।

শকুন্তলা।

বিরহ নাশের উপায় একভাবেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, এই স্থানের কল্পনায় কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশীতে মহাকবি সমধিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

উর্ব্বশী স্বর্গের অপ্সরা—নৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা, সুষমা সম্পদেও ত্রিজগতে অতুলনীয়া; এই ললনা ললামভূতা চিরযৌবনা অপ্সরা প্রথম মিলন-দিবসে দেবদূতের আহ্বানে অশ্রুসিক্তলোচনে প্রণয়ী রাজার নিকট হইতে বিদায় অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। দেবনিবাসে সে দিন মহা ধূমধাম, দেবরাজের আলোকোদ্ভাসিত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রসিদ্ধ নাটককার ভরতমুনির উৎসাহউদ্যোগে "লক্ষ্মী স্বয়ম্বর" নাটক অভিনীত হইতেছিল। উর্ব্বশী সেই নাট্যব্যাপারে লক্ষ্মীর রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিল। মেনকা সাজিয়াছিল বারুণী, সে লক্ষ্মী বেশধারিণী উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিল "এই যে সমস্ত লোকপাল পুরুষেরা কেশবের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন"—কস্মিংস্তে হৃদয়াভিনিবেশঃ? (ইহাদের মধ্যে তোমার হৃদয় কাহাকে চায়?) ইহার উত্তরে আত্মবিস্মৃতা প্রেমিকার (পুরুষোত্তমে ইতি ভণিতব্যে পুরূরবসীতি নির্গতা বাণী") মুখ দিয়া পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে পুরূরবার নাম উচ্চারিত হইল। উর্ব্বশীর এই অশিষ্টতা দর্শনে ভরতমুনি কুপিত হইয়া "তোমার দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইবে" বলিয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। পরে পুত্রমুখ দর্শন পর্য্যন্ত অভিসম্পাতের কাল নির্ণয় করিয়া মহেন্দ্র লজ্জাবনতমুখী উর্ব্বশীকে আশ্বস্ত করেন। এই প্রণয়োন্মাদ-কাহিনী বিক্রমোর্ব্বশীতে বেশ সজীব ও স্বাভাবিক রূপে চিত্রিত হইয়াছে। প্রেম প্রভাবে অন্য-সংক্রান্ত-হৃদয়ার নাম বিস্মৃতি অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে, বরং তিলোত্তমার হিজি বিজি কথা লিখিতে লিখিতে জগৎসিংহ লেখার ন্যায় প্রণয়ীর নামোল্লেখ সময়ে পুরুষোত্তমের পরিবর্ত্তে হৃদয় নিহিত অবিরত ধ্যাত পুরূরবার নাম উচ্চারণ করাই প্রেমবিহ্বলা উর্ব্বশীর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছিল। এ স্থানে বেশ প্রেম বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু শকুন্তলার আত্ম-বিস্মৃতি অমার্জ্জনীয়। দুর্ব্বাসার ন্যায় কোপন স্বভাব মুনি—

"অয়মহং ভোঃ" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল তথাপি চিন্তামগ্না শকুন্তলার নিদ্রা ভাঙ্গিল না, এইটী যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়। ইহার পুরস্কার শকুন্তলাও লাভ করিয়া ছিল,—দুর্ব্বাসা ক্রোধভরে শাপ দিয়া গেলেন—

"এক মনে যাকে তুই করিয়া স্মরণ
সমাগত মুনিবরে
বুঝিতে পেলিনা মোরে ;
বলিলে ও স্মরিবেনা সে তোকে কখন,
প্রথম হইল যেন কথা উচ্চারণ। (১)

পরে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার শিষ্টাচার ও সবিনয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া অভিজ্ঞান বস্তু দর্শনে শাপের অবসান হইবে বলিয়া চলিয়া যান। ইহার ফলে রাজা শকুন্তলাকে পরে চিনিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করেন এবং অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দর্শনেই পুনর্মিলনের কারণ শকুন্তলার ন্যায় উর্ব্বশীর ভাগ্যচক্রও অভিশাপ প্রসাদে পরিবর্ত্তিত হইয়া ছিল। কৈলাশ শিখরে নৃপ সহ প্রমোদ প্রমত্তা উর্ব্বশী এক দিন অভিসম্পাত প্রভাবে "দিব্যজ্ঞান" হারাইয়া কুমারীজনের অপ্রবেশ্য 'কুমার' বনে প্রবেশ করিয়া লতাত্ব প্রাপ্ত হয় এবং লোহিত মণি বিশেষের স্পর্শে পূর্ব্ব রূপ ধারণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উভয়ত্রই অভিশাপ বিচ্ছেদের কারণ এবং বস্তু বিশেষ পুনর্মিলনের হেতু। এই রূপ শকুন্তলার সর্ব্বদমন ও উর্ব্বশীর আয়ু নামক পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি। পুত্রের পরিচয় প্রাপ্তির পরেই নাটকদ্বয়ের পূর্ণমিলন বা উপসংহার। দুই নাটকেই দুই রাজার প্রতি ইন্দ্রদেব এক জাতীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অসাধারণ সাদৃশ্যের সূচনা করিয়াছেন। কাজেই বলিয়াছি, কবির কবিত্ব শক্তির ক্রমবিকাশে নিরাভরণ উর্ব্বশীই বিদ্বজ্জন-মানসমোহিনী শকুন্তলা রূপে সাধারণ্যে পরিচিতা হইয়াছে। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের ন্যায় মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কালিদাসের ক্রমোন্নতির দুই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

নায়িকার রূপ বর্ণনার দুই শ্লোক ইতঃ পূর্ব্বেই বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন মেঘদূত হইতেও একটী শ্লোক এই স্থলে প্রদান করিতেছি ;

---

(১) বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্,
স্মরিষ্যতি ত্বাংন স বোধিতোঽপিসন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতা মিব।
শকুন্তলা।

(শেষে) কষিত কাঞ্চন কান্তি কৃশ কলেবরা
শিখরি দশন পাঁতি
কটিদেশ ক্ষীণ অতি
হরিণী লোচনা সেই সুবিম্ব অধরা
কুচভারে নতা, তার নাভি যে বিবরে
সে গো নিতম্বের ভারে
ত্বরিতে যাইতে নারে
বিধাতার আদি সৃষ্টি মুরতি মাঝারে। (১)

বিক্রমোর্ব্বশীর সম্পূর্ণ চতুর্থ অঙ্কটী উর্ব্বশী বিযুক্ত পুরূরবার অশ্রু জলে বা বিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এই সুদীর্ঘ বিলাপকাহিনীতে সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত ইন্দ্রিয় লালসায় অতৃপ্ত বাসনার সেবাদাস পুরূরবার অগণিত মদন বেদনার উষ্ণনিশ্বাস ও বালকের ন্যায় অর্থশূন্য ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদব্যাপী বিলাপ প্রলাপের স্থানে স্থানে কবিত্বের গন্ধ যে না আছে, তাহা নহে। কিন্তু এই সমগ্র একটী অধ্যায়ে হরিণ ময়ূর লতা প্রভৃতির প্রতি রাজার উক্তিতে যে কবিত্ব প্রকটিত হইয়াছে, মেঘদূতের একটী মাত্র শ্লোকেই তাহার সমস্ত ভাব নিবদ্ধ রহিয়াছে। মেঘদূতের শ্লোকটী যথা—

লতিকায় দেহ যষ্টি, হরিণী লোচনে
নিরখি নয়নলীলা, চাঁদে মুখ শোভা
শিখি পুচ্ছে কেশ গুচ্ছ, তরঙ্গভঙ্গীতে
নেহারি গো ভ্রূবিলাস তোমার সুন্দরি,
হায় প্রিয়ে কোথাও না একস্থানে হেরি
(সমুদয় শরীরের) সাদৃশ্য তোমার। (২)

---

(১) তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ।
মেঘদূত। ২১ শ্লোক

(২) শ্যামা স্বঙ্গং চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টি পাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্

তারপর পুরূরবার বিলাপে ইন্দ্রিয় সেবার কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই, কিন্তু রঘুবংশের অজ বিলাপে কবি যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী শ্লোক এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। যথাঃ—

"তুমি গো আমার একাধারে সতি,
সচিব গৃহিণী সখি ছিলে, আর
ললিত সঙ্গীত বিদ্যার শিক্ষায়
প্রিয় শিষ্যা ছিলে তুমিই আমার।
তোমায় হরিয়া অকরুণ বিধি,
বল মোর কোন্ হরে নাই নিধি; (১)

এইরূপ দাম্পত্যের শিক্ষণীয় পবিত্র কথা প্রাচীন কবিদের মুখে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ স্ত্রী যদি সম্পদে বিপদে মন্ত্রীরূপে পতির পার্শ্বে দাঁড়াইতে না পারে, গৃহকর্ত্রী যদি অতিথি আতুরের সেবা ও পুত্রকন্যার লালন পালনাদি গৃহকার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হয়, প্রণয়িনী যদি সখিত্বে মধুময় বন্ধনে স্বামীকে বাঁধিয়া সংসারের শোক দুঃখের মধ্যে একটু সান্ত্বনা দিতে না পারে,—তবে নারীজন্ম গ্রহণ বা বিবাহের প্রয়োজন কি? ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনই বিবাহের চরম লক্ষ্য নহে। তাই বলিতেছি কালিদাসের এই শ্লোকটী বড়ই মূল্যবান্। এই সকল সম্ভবতঃ কালিদাস পরিণত বয়সে রচনা করিয়াছিলেন। প্রাথমিক রচনা বা বিক্রমোর্ব্বশী শাকুন্তলা প্রভৃতি যে কবি কাব্যগুলিকে কামদেবের লীলাক্ষেত্র রূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন, সেই কবিই শেষে সেই প্রিয়তম কন্দর্প প্রভুকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি।
মেঘদূত। ৪৩ শ্লো।

(১) গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ—
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্।
রঘু ৮ম সর্গ ৬৭ শ্লোক।

তাহার কুমার সম্ভবে,—

অনুভবি ইন্দ্রিয়ের বিষম বিকৃতি,
ইন্দ্রিয় বিজয় গুণে
রোধিয়া ইন্দ্রিয় গণে—
খুঁজিতে বিকার হেতু হেরে পশুপতি,—(ক)
দক্ষিণ অপাঙ্গে দৃষ্টি করি আকর্ষণ—
বামপাদ আগুলিয়া
চারু রূপ বাঁকাইয়া—
প্রহারিতে সমুদ্যত কন্দর্প ভীষণ। (খ)

অতি সাহসিক কন্দর্পকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া জিতেন্দ্রিয় শঙ্কর সংহারকর সংহারকর বলিয়া ক্রোধে বিশ্বধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন তাঁহার তৃতীয় চক্ষু হইতে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল,—এবং—

"সম্বর সম্বর ক্রোধ ওহে মহেশ্বর,
এই মহা ধ্বনি যবে উঠে ব্যোম পথে,
তখনি ভবের নেত্রে লভিয়া জনম
করিল অনল কামে ভস্ম অবশেষ। (গ)

এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। এখন বিক্রমোর্ব্বশী সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে,——অনেকে বলেন, করমর্দ্দনের পাশ্চাত্য প্রথা এখন ক্রমে অভিবাদনের স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশী পাঠে জানা যায়, করমর্দ্দন রীতি বিদেশের আমদানী বা নিতান্ত আধুনিক নহে, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বরাজকে সমাগত দেখিয়া রাজা পুরূরবা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া (রথাৎ অবতীর্য্য) প্রিয় সুহৃদের মঙ্গল ত (স্বাগতং প্রিয় সুহৃদে) বলিয়াই "অন্যোহন্যং হস্তং স্পৃশতঃ অর্থাৎ পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিল। সুতরাং

(ক) অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাৎ বলবন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষু র্দিশা মুপান্তেষু সসর্জ্জ দৃষ্টিম্॥

(খ) স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপম্ প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥ ৩স। ৬৯,৭০।

(গ) ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎস বহ্নি র্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥
(৩য় সঃ ৭২ শ্লো)

কালিদাসের সময়েও এই রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল। কালিদাসের সময়ে ভারতবাসীর স্ত্রী শিক্ষার প্রতি নিশ্চয়ই বিশেষ অনুরাগ ছিল, নচেৎ তাঁহার নাটক গুলিতে স্ত্রীলোকদ্বারা চিঠি পত্রাদি লিখিত ও পঠিত হইত না। বিক্রমোর্ব্বশীতে উর্ব্বশী মায়া রচিত ভূর্জ্জ পত্রে মনোবেদনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে এবং তাহা রাজমহিষীর একটী সামান্যা পরিচারিকা পাঠ করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতীত দাসী বাঁদী পর্য্যন্তও কখনও শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। ভারতবাসীর স্ত্রীশিক্ষা-প্রিয়তার নিদর্শন উত্তরচরিত রত্নাবলী প্রভৃতি নাটকেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে চিত্র বিদ্যাদি সূক্ষ্ম শিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পুরাতন নাটকাদি পাঠে জানা যায়, প্রেমিক প্রেমিকা বিরহ যাতনা দূর করিতে অথবা চিত্ত বিনোদন কামনায় চিত্রফলকে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিত। ভবভূতির উত্তরচরিতে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট বলিতেছেন ;—"আর্য্য তেন চিত্রকরেণ অস্মদুপদিষ্টং অস্যাং বীথিকায়াং আর্য্যস্য চরিতং অভিলিখিতম্" এই প্রকাণ্ড আলেখ্য সীতাদেবীর চিত্ত বিনোদনার্থ চিত্রিত হইয়াছিল। রত্নাবলীতে ইহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রত্নাবলী (সাগরিকা) নিজে প্রণয়ী রাজার আলেক্ষ্য আঁকিয়াছিল। তাহা দেখিয়া সুসংগতা নাম্নী সহচরী জিজ্ঞাসা করিল "সখি কঃ এষঃ ত্বয়া আলিখিতঃ ? (কাহার চিত্র আঁকিয়াছ ?) উত্তরে লজ্জার সহিত সাগরিকা বলিল—"ভগবান্ অনঙ্গঃ" শুনিয়া রসিকা সখী একটু হাসিয়া বলিল, দেও রতির মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া ছবি খানির পূর্ণতা সম্পাদন করি, ইহা বলিয়াই—"বর্ত্তিকাং গৃহীত্বা নাট্যেন রতিব্যপদেশেন সাগরিকাং লিখতি"। এই টুকু পড়িলে বুঝা যায়, সুসঙ্গতা কিরূপ ক্ষিপ্রহস্তে চিত্রফলক খানি আঁকিয়া ফেলিয়াছিল, এবং সাগরিকাও কেমন রাজার অনুরূপ মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিল। শকুন্তলার আলেখ্য দেখিয়াও রাজা দুষ্মন্ত ও সানুমতী সখির শকুন্তলা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। বিক্রমোর্ব্বশীতেও বিদূষক চিত্রফলকে উর্ব্বশীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাজাকে শান্তি লাভ করিতে অনুরোধ করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন কবিগণের হস্তে এই প্রকার আলেখ্য দেখিয়া প্রাচীন ভারতে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষলাভ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এখন কালিদাসের সৌন্দর্য্যবোধ ও চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নৈসর্গিক-সৌন্দর্য্য-বিকাশনে বা চরিত্রচিত্রণে ভারতের কোন কবিই কালিদাসের পদরেণু স্পর্শ করিবার

যোগ্য নহে। কবি সুন্দরী শকুন্তলার অতুলনীয় রূপরাশি বসনভূষণের কৃত্রিম আবরণে আবৃত করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবল মাত্র বল্কল পরাইয়াই অধিক মনোজ্ঞা বলিয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন. এই স্থলে অনেকে হয় ত বলিবেন, তপোবনবৰ্দ্ধিতা তাপসপ্রতিপালিতা শকুন্তলা বল্কল ছাড়া মূল্যবান আভরণ কোথায় পাইবে? কবি যদি কোন রাজকন্যাকে বল্কল পরিধান করাইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতেন, তবে তখন এই কথা বলা যাইতে পারিত, এই ক্ষেত্রে নহে। উহার উত্তরে আমরা বলি, কালিদাসের ভূষণপ্রিয়তা থাকিলে তিনি অবশ্যই তপোবনবাসিনী নায়িকাকে বিবিধ বনফুলে সাজাইতে পারিতেন। তাহাতে কোন দোষ ঘটিত কি? আমরা বিক্রমোর্ব্বশীতেও উহার অনুকূল প্রমাণ পাইয়াছি। উর্ব্বশী স্বর্গের অপ্সরা তাহার ধনরত্নের বসন ভূষণের কিছুই অভাব নাই; তথাপি সে কেবল-মাত্র একগাছি—নীলমণি খচিত মুক্তা ভূষিত আভরণ পরিয়া অভিসারিকা বেশে প্রেমাস্পদের নিকট উপস্থিত হইল। উর্ব্বশী নিজে বলিতেছে,— "অয়ং মে রেবতে মুক্তাভূষিতো নীলমণি পরিগৃহীতঃ অভিসারিকাবেশঃ"। ইহাতে উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য এত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে সেই সৌন্দর্য্যের উপভোগ-তৃষা চিত্রলেখার নারীহৃদয়েও অলক্ষিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল,— "নাস্তি বাগ্‌বিভবঃ প্রশংসিতুং, ইদন্তু চিন্তয়ামি অহ মত্র পুরূরবা ভবেয় মিতি" (অর্থাৎ ইহার প্রশংসার উপযুক্ত বাক্য সম্পূর্ণ আমার নাই, কিন্তু সে চিন্তা করিতেছি, এই ক্ষেত্রে যদি আমিই পুরূরবা হইতে পারিতাম)।

কালিদাস প্রিয়ংবদা চিত্রলেখা প্রভৃতিকে সৃষ্ট করিয়া চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। চিত্রলেখা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দুইটী মাত্র কথা শুনিলেই তাহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

পুরূরবা মহিষীকে দেবী শব্দে সম্মানিত করিলেন, ইহা শুনিয়া ও রাজ-মহিষীর তেজোদীপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিয়া উর্ব্বশী কহিল, এই ওজস্বিনী রূপসী দেবী শব্দে অভিহিত হওয়ার উপযুক্তা পাত্রী। (স্থানে খলু ইয়ংহি দেবী শব্দেন উচ্চার্য্যতে ইত্যাদি) এই মিষ্ট কথায় তুষ্ট না হইয়া বুদ্ধিমতী চিত্রলেখা যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা বস্তুতই মৰ্ম্মস্পর্শী।

সে বলিল;—'অন্যাপরং মুখং মন্ত্রয়িতুং তে" ইহার তাৎপর্য্যই এই, তোমার নিমিত্তই ইহার দুর্গতির সীমা রহিবে না। তাহার প্রাণপ্রিয়, আরাধ্য রত্নটীকে তুমি অপহরণ করিতে বসিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে

অন্য একখানি মুখের প্রয়োজন, এই মুখে কিছু বলা শোভা পায় না। তার পর রাজা কঠিন ব্রতধারিণী পত্নীর চিত্ত প্রসাদনের অভিপ্রায়ে স্নেহসিক্ত স্বরে বলেন,—

"হে কল্যাণি অকারণ নিদারুণব্রতে
মলিন করিছ দেহ মৃণাল কোমল। ইত্যাদি।

ইহা শুনিয়া অন্তরালস্থিতা উর্ব্বশী সখীকে দুঃখিতভাবে কহিল. "মহান্ খলু অস্যাং বহুমানঃ। মুহূর্ত্তে চতুরা চিত্রলেখা অবস্থাটা বুঝিয়া লইল. তখন সে হাসিয়া বলিল, "ময়ি মুগ্ধে অন্যসংক্রান্তপ্রেমকা নাগরা অধিকং দক্ষিণা ভবন্তি (অন্যাসক্ত নাগরেরা একটু বেশী অনুগত হয়) কথাটা নির্ভাজ সত্য, ইহার যথার্থতা প্রায় সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সাধারণ উক্তিতে চিত্রলেখা বিশেষ বাগ্‌বৈচিত্র্য ও সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে। এই চিত্রলেখা অনসূয়া প্রভৃতি কালিদাসের 'অপূর্ব্ব বস্তু রচনা' নয় কি?

কালিদাসের প্রতিভার বা বিক্রমোর্ব্বশীর আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল। কালিদাস প্রণীত গ্রন্থাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না। তবে রচনার উৎকর্ষাবকর্ষ আলোচনা করিয়া মালবিকাগ্নিমত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, নলোদয় প্রভৃতিকে প্রাথমিক রচনা ও শকুন্তলা, কুমার, রঘুবংশ, মেঘদূত প্রভৃতিকে শেষের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

ভিক্টোরিয়া ও ভারতবর্ষ।

(৩)

এলাহাবাদ হইতে প্রচারিত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ঘোষণাপত্র কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এবং প্রত্যেক জিলার সদর ষ্টেশনে তথাকার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখ বৈকাল বেলা বিশেষ সমারোহে প্রকাশ্য ময়দানে পঠিত হয়*। ঐ দিবস উক্ত স্থান সমূহে খুব ধুমধামের সহিত

* প্রচারান্তে দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ঘোষণাপত্র সহস্র২ খণ্ড বিতরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তিগণের হস্তেও এক এক খানা দেখিতে পাওয়া

বৃটীশ পতাকা স্থাপনানন্তর সন্ধ্যাকালে নানা প্রকার আতশবাজীও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সেই দিন হইতে "কোম্পানির" নাম বিলুপ্ত হইয়া "মহারাণীর" নাম চলিতে আরম্ভ হইল; প্রকাশ্য ঘোষণাদিতে "দোহাই কোম্পানি" র পরিবর্ত্তে "দোহাই মহারাণী" ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এ প্রকার হওয়ার পরেও "কোম্পানির মুলুক" কথাটা একেবারে উঠিল না, এখন পর্য্যন্ত উহা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল থাকিল কোম্পানির টাকা, পয়সা।* ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম খাশ ভিক্টোরিয়ার মুদ্রা প্রচলিত হয়।

দিল্লীর বাদশাহের পত্তনীদার ও ইংলণ্ডাধিপতির ইজারাদার কোম্পানি বাহাদুরের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের বিপুল সাম্রাজ্য বৃটনেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অধীনে গেল; প্রকৃতিবর্গের মনে বড় আশা হইল, তাহাদের সুখবৃদ্ধি হইবে; যে হেতুক মুসলমানদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে কোম্পানির রাজপুরুষগণ ভাল হইলে ও তাঁহারা সওদাগরের কর্ম্মচারী, প্রকৃত নরপালের কার্য্য বণিক্ সম্প্রদায়ের সাজে না; সুতরাং খাশ মহারাণীর অধীনে কোম্পানির অপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা আশা করা অসঙ্গত নয়। ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী অনুযায়ী মহারাণীর অন্যান্য মন্ত্রীর ন্যায় একজন স্বতন্ত্র ভারত সচিব নিযুক্ত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার নিকট অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও বিশেষ সুবিচার পাওয়া গিয়াছিল।†

ভারতবর্ষ মহারাণীর খাশ হইল, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃটীশ পার্লামেণ্টর হস্তে গেল। আমাদের ভাগ্যে তাহার ফল কিরূপ ফলিল, দেখা যাউক।

গিয়াছিল। যাহাতে আপামর সাধারণের গোচর হয় তজ্জন্য সরকার বাহাদুর বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন। আমরা যেখানে ছিলাম তথায় কোন আমোদপ্রিয় লোক অনুসন্ধিৎসুদিগের প্রশ্নোত্তরে প্রচার করেন যে ঐ কাগজ ঘরে রাখিলে প্রত্যহ কিছু কিছু স্বর্ণ প্রসব করিবে, তাহাতে শেষকালে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোককে উহার জন্য কাড়াকাড়ি করিতে দেখা গিয়াছিল।

* কোম্পানির টাকা পয়সা আজ ও চলিতেছে; কিন্তু এই বার উহা লোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে:—সরকারী ধনাগারে উপস্থিত হইলেই টাকশালে প্রেরিত হইয়া গলাইয়া ফেলা হইবে, এই রূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

† আমরা জানি একজন ১২ টাকা বেতনের ডাকঘরের কেরানি কর্ম্মচ্যুত হইয়া আপীল করিতে করিতে প্রথম ভারত সচিব স্যার চালস্ উডের নিকট হইতে বকেয়া বেতন সহ চাকরী ফিরিয়া পান। এখন সেরূপ কোথায়?

হঠাৎ দুইটী পরিবর্ত্তন বিলক্ষণ অনুভূত হইল। প্রথম প্রথম কোম্পানির আমলে, তাঁহাদের যে সকল শ্বেতকায় কর্ম্মচারীকে "রাইটার" বলা হইত তাঁহারা ক্রমে"সিবিলিয়ান" নামে আখ্যাত হয়েন। ঐ সিবিলিয়ান গণ "হেলিবারি কালেজ" নামক বিলাতের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নানন্তর কোম্পানির লণ্ডনস্থ তত্ত্বাবধায়ক সভাদ্বয়ের বড় * কর্ত্তাদের সুপারিসে তিন হাজার পাউণ্ড জমা দিয়া ভারতে চাকরী পাইতেন; সুতরাং সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ভিন্ন অন্যের ভাগ্যে ঐ সকল দেবদুর্লভপদ ঘুটিত না। সাম্রাজ্য খাশ হইলে উক্ত কালেজ উঠিয়া গেল, এবং প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার জন্মিল। এই নবীন ব্যবস্থা দ্বারা ভারতবাসীর কি উপকার বা অপকার, লাভ বা ক্ষতি হইল তাহা প্রাচীন পাঠকবর্গ উভয় শ্রেণীর সিবিলিয়ানের তুলনা দ্বারা বিচার করিবেন। † মোট কথা হেলিবারি ওয়ালারা যেমন দেশের ছোট বড় সকলের সহিত মিশিতেন, নূতন সম্প্রদায়ের সিবিলিয়ানেরা সেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে জানেন নাই। সুতরাং ভারতবাসীর আচার ব্যবহারাদি তাঁহারা যে প্রকার বুঝিতেন ও মানিতেন ইঁহারা সে প্রকার পারেন নাই। ‡ সিবিলিয়ানগণ

---

* Board of Directors and Board of Conrtrol.

† তখনকার জনৈক কমিশনর লেখকের পিতাকে দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, বাবু! আর আমাদের মত লোক দেখিতে পাইবে না; এখন ডিপুটি বসাক বাবুর জাতীয় লোক আসিতে আরম্ভ হইল।

‡ গুড়ুক তামাক, সন্দেশ, খিচুড়ি ইত্যাদি ভারতীয় সামগ্রী পান ভোজন, দেশীয় ভদ্রলোকদের বাটীতে বিনা আহ্বানে গমনাগমন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রাচীন সিবিলিয়ানদের উদারতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ পাইত। এইরূপ মিশামিশির দরুণ তাঁহারা আমাদের অনেক কথা তলাইয়া বুঝিতেন। একটী উদাহরণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা পাইব, ভিতরকার ব্যাপার পর্য্যন্ত তাঁহারা কতদূর জানিতেন।—কোন সিবিলিয়ান মহোদয়ের সম্মুখে দুইজনে মথুরার চৌবে একটী বরকন্দাজী চাকরির জন্য উপস্থিত হন, একের নাম শালগ্রাম, অপরের নাম তুলসীরাম। সাহেব অনেক প্রকার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা জানিলেন সকল বিষয়ে উভয়ে সমান। কি করেন? কাহাকে বঞ্চিত করিয়া কাহার প্রর্থনা গ্রাহ্য করেন? বিষম মুস্কিলে পড়িলেন; অবশেষে একটু ভাবিয়া তুলসীরামকে কাজটী প্রদান করতঃ শালগ্রামকে বুঝাইলেন, "দেখ! তুলসী তোমার মস্তকে স্থান পাইয়া থাকে, সুতরাং তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এবম্প্রকার ঘটনা আজকাল কি আর দেখা যায়?

কোম্পানির সময়ে যেমন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেও তদ্রূপ অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সহিত বিরাজ করিতে থাকিলেন; অথচ আমাদের ভাব, প্রকৃতি, হৃদয়, আচার, ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হইত। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন এই দেখা গেল যে কোম্পানি বাহাদুর বৃটীশ পার্লামেণ্টের মুখাপেক্ষী ও অধীন থাকা হেতু অনেক সময় ভয়ে ভয়ে কাজ করিতেন, পাছে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার পার্লামেণ্ট মহাসভার গোচর হইয়া ইজারাচ্যুত হন। অনেকবার তাহাদিগকে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দিয়া মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল, বিশেষ মেয়াদান্তে নূতন চার্টার পাট্টা লইবার সময় প্রত্যেকবার বিশেষ তদন্ত না হইয়া যাইত না। খাশ হওয়ার পর ভারত সচিবের মন যোগাইয়া বড়লাট হইতে নব্য সিবিলিয়ান পর্য্যন্ত ন্যায়ান্যায় যাহা কিছু করুন না কেন, খোজখবর লইবার কেহ নাই;—নামে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী, কাজে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতসচিব ও বড়লাটের হস্তে অপোগণ্ড ভারতকে সমর্পণ করিয়া অজগর পার্লামেণ্ট নিশ্চিন্ত, কারণ স্বদেশীয় ব্যাপার সমূহে তাঁহারা সর্ব্বদা এতই ব্যস্ত যে সুদূরদেশস্থ অখৃষ্টান (হিদেন) ভারতবাসীর কথা ভাবিবার তাঁহাদের অবকাশ নাই, তত্ত্বাবধান ত দূরের কথা।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" একসময়ে যাঁহাদের রাজপূজার মন্ত্র ছিল তাঁহারা কোম্পানির আমলে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করিতে পাইয়াও নরপতির অভাব অনুভব করিতেন। বিদ্রোহান্তে সওদাগর কোম্পানির পরিবর্ত্তে মাতৃস্থানীয়া রাজলক্ষ্মী ভিক্টোরিয়াকে পাইয়া রাজভক্তভারতবাসীর আশা ও প্রীতির যে সীমা ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি অযোধ্যার শেষ অধিপতি ওয়াজেদ আলি শাহ সিংহাসনচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আনীত হওয়ার পরেও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি কোম্পানির অন্যায় অত্যাচার সমূহের বিরুদ্ধে আব্দার জানাইলে ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রতিকার পাইবেন;—কাজে কিন্তু তাহা ঘটে নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক ৺ কেশবচন্দ্র সেন বিলাত গমন করেন; ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহ-প্রবেশ দিবসে তিনি তথায় প্রথম ভিক্টোরিয়াকে দেখিয়া এইরূপ প্রকাশ করেন, —"Her majesty is a plain-looking woman in plain dress, simple yet dignified"—"মহারাণী সাধারণ পরিচ্ছদে সাধারণ ভাবের

স্ত্রীলোক, সাদাসিধা হইলেও রবাব আছে।" * প্রথমাংশের তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে প্রাচ্যরাজ্যে লালিত পালিত কেশব আশা করিয়াছিলেন, পোষাক পরিচ্ছদের আর কোন জাঁকজমক না থাকুক, অন্ততঃ রাজচিহ্ন ও শিরোভূষণ স্বরূপ একটা ছোট খাট মুকুট দেখিতে পাইবেন; কিন্তু তাহাও নাই।—অতঃপর ১৩ই আগষ্ট ভিক্টোরিয়ার সহিত কেশবের সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার দ্বারা প্রজাবর্গের নানাপ্রকার উন্নতিতে কুইন বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সহমরণ উঠিয়া যাওয়াতে তিনি বড় প্রীত, কিন্তু হিন্দু রমণীগণের দুরবস্থা ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ, একথাও বলিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ মানবসেবক সহৃদয় ব্যক্তিগণের উত্তম কার্য্যক্ষেত্র, এবং কেশব তদ্ধেতু বিলাতের অনেক ভদ্রমহিলাকে তথায় গমন করত স্ত্রীশিক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার কন্যা বড় সুখী হইলেন। এই ক্ষেত্রে কেশব তাঁহার স্ত্রীর দুইখানি প্রতিকৃতি উঁহাদিগকে উপহার প্রদান করেন। ভারতের পুলিস সম্বন্ধেও দুই এক কথা হইয়াছিল, তখনকার সংবাদপত্রাদিতে এরূপ প্রকাশিত হয়। ২৩ আগষ্ট এক পত্র দ্বারা মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারি কেশবকে জ্ঞাপন করেন যে তাঁহার সহিত সে দিনকার কথাবার্ত্তায় কুইন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। আর এক পত্র দ্বারা ভিক্টোরিয়া কেশবের ফটোগ্রাফ্ চাহেন। বিলাত পরিত্যাগের পূর্ব্বে মহারাণী কেশবকে তাঁহার নিজের একখানি বড় ছবি ও স্বকৃত দুইখানি গ্রন্থ উপহার দেন। পুস্তকদ্বয়ে স্বহস্তে নিজের ও

*ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিতে কেশব কোনরূপ বিশেষ ভাব দেখিতে পান নাই। আমরাও যখন ঐরূপ কোন স্থানে প্রথম তাঁহার দর্শন লাভ করি আমাদের চক্ষেও কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণাদি প্রতিভাত হয় নাই, দেখিতে পাইব বলিয়া আশাও করি নাই, কারণ স্ত্রীলোক;—স্ত্রীলোকে রাজলক্ষণ আমাদের মনে স্থান পায় না। যখন বর্ত্তমান সম্রাট যুবরাজরূপে এদেশে আগমন করেন, তৎকালে প্রথম যেদিন আমরা তাঁহার অতি নিকটে থাকিয়া তাঁহার সুঠাম সুদীর্ঘ বপু (তিনি দণ্ডায়মান, আমরা সম্মুখে উপবিষ্ট) ও কমনীয় মুখশ্রী প্রভৃতি সুন্দররূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম সে সময়ে তৎসম্বন্ধে যে একটা অপূর্ব্বভাব হইয়াছিল, এবং তাহাতে যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ নয়নগোচর হয়, বিধবা রমণী ভিক্টোরিয়াতে সে সকল কিপ্রকারে সম্ভবে? সে সময় অনেককে খুব সাহসের সহিত একথা প্রকাশ করিতে শুনাগিয়াছিল যে সহস্র সহস্র লোকের মধ্য হইতে যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে প্রিন্স অবওয়েল্সকে রাজলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ বলিয়া বাছিয়া বাহির করিতে পারিবে। বাস্তবিক ওরূপ সার্ব্বাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তিখানি তৎপূর্ব্বে বা পরে আমাদের চক্ষে আর ঘটে নাই।

কেশবের নাম লিপিবদ্ধ করেন *। কেশব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে নিজবাটীতে শিষ্যবর্গকে আহ্বান করতঃ বিলাত হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী যৎকালে প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে ঐ পুস্তক দুখানিও ছিল; যখন উহা দর্শক বৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, সকলেই ভিক্টোরিয়ার হস্তাক্ষরের উপর হাত দিয়া তাহা মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এতই রাজভক্তিতে বিভোর !!!

মধ্যে মধ্যে কেশব চন্দ্র সেনের খবর লইতে ভিক্টোরিয়া ত্রুটি করিতেন না।

---

*On 9th august 1870 Duke of Argyll Secretary of State for India at the time wrote to Keshub Chandra Sen the following message :—"Dear Mr. Sen,—Colonel Ponsonby, the Queen's Private Secretary, has written to me that if you go down to Osborne on Saturday next, the 13th, Her Majesty will see you * * * *" * * * * * On reaching the royal residence he was very kindly received by Col Ponsonby, * * * * He was then taken round the corridor to see the drawing-room and other elegant apartments ; and a vegetarian luncheon was kindly provided for him. At the appointed hour he was taken to the drawing-room in which he was to see the Queen, where Her Majesty and the Princess Louise soon came in. Her Majesty expressed much satisfaction at the progress of female education in india, and the improvements made in several respects by her Indian subjects in consequence of the spread of English education. She was glad that the *Suttee* had been abolished, and she showed great concern for the miserable condition of Hindu women. Both the Queen and the Princess were glad to hear that India is a great field for philanthropic labours, and that Mr Sen had requested many of his lady friends in England to go thither to undertake the work of female education. Mr. Sen had brought with him two likenesses of his wife. These portraits were graciously accepted by the Queen :—

On the 23rd Col Ponsonby wrote to Mr. Sen from Windsor, saying :—"I can assure you that the Queen was much pleased with her conversation with you, * * * *" A few days afterwards another letter came to Mr. Sen from Major General Sir T. M. Biddulph :—"I have been desired to intimate to you that it would be gratifying to the Queen and to Princess Louise to possess Photographs of you if you would not object to send some" :—Before Mr. Sen left England the Queen further showed her kindness by presenting him with a large engraving of herself and with her two books ("the Early Years of the Prince Consort" and her "Highland Journal"), the value of which was enhanced by the following inscription in each volume in her own handwriting. "To Babu Keshub Chandra Sen, from Victoria Rg. Sept. 1870".

— Miss. Collet.

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গভীর শোক ও কেশব পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বিশেষ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কেশবের দরুন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা কুচবিহারের মহারাণী ও মহারাজার সহিত ভিক্টোরিয়া কুটুম্বিতা স্থাপন করেন। উহারা বিলাতে গেলে তিনি যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিতেন না; এমন কি প্রথমবার যখন কেশবদুহিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ভিক্টোরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া আপ্যায়িত করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহাতে অনেক বিদ্বেষী এদেশস্থ ইংরাজের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

সাহিত্য দরবার।

বঙ্গ দর্শন, ভাদ্র ১৩১০।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্য দরবারে অল্প বয়সে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত "লক্ষ্মণ" এই সংখ্যার বঙ্গদর্শনের উজ্জ্বল অলঙ্কার। তাঁহার প্রবন্ধ, তাঁহার বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের ন্যায়, যেন "অনাবিল,—শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র"। তাহার উপসংহার অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ,—

"সৌভ্রাত্রের কথা মনে হইলে 'লক্ষ্মণ' অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। * * আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহ গুলিকে লক্ষ্মণ-শূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্ম্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কার পেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে—যাঁহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ একগৃহে স্থান পাইতেছেন না। হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব একথা কি বিশ্বাস্য?

আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য বনবাসের দুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক। লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহ-দেবতা-স্বরূপ তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস, আমাদের দক্ষিণ বাহু অভিনববলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ দুর্দ্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব।"

দীনেশবাবুর এই লেখা দূরাগতবীণানিক্কণবৎ মধুর, তারকার জ্যোতির ন্যায় বিশুদ্ধ, দেবচরণে নিক্ষিপ্ত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় পবিত্র। আমরা আশীর্ব্বাদ করি দীনেশচন্দ্র দীর্ঘায়ু হউন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীনেশবাবু ভাল উকীল হইতে পারিতেন, ভাল প্রাড়্‌বিবাক হইতে পারিতেন না। যখন তিনি পূর্ব্বে ভরতের "ব্রিফ" লইয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মণের কথা রুক্ষ ও দুর্ব্বিনীত, তখন ভরতই রামায়ণে একমাত্র আদর্শ চরিত্র। তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণের "ব্রিফ" লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে "ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্মণ রামায়ণের পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র"। এই প্রবন্ধে লক্ষ্মণের রূক্ষ ও দুর্ব্বিনীত ভাব তিনি উল্লেখ করিলেন না। বরঞ্চ সুনিপুণ উকীলের ন্যায়, তিনি লক্ষ্মণের চরিত্রে যে সকল দোষ আছে তাহাও বাক্‌কৌশলে গুণবৎ বর্ণনা করিয়া অসতর্ক পাঠকের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত অযোধ্যাপুরী নির্ব্বিশেষে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, ভরতকে বধ করায় তিনি কোন দোষ দেখিতে পান নাই (ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি,) এমন কি হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্ত মানসম্', বলিয়া বৃদ্ধপিতৃবধ-মহাপাতকও ক্ষণকালের নিমিত্ত হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। এ গুলিতেও দীনেশ বাবু কিছুই নিন্দার দেখিতে পান নাই, বরঞ্চ তাহাতে তিনি এই নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের "বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্ব্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।" দীনেশ বাবু যদি স্বকীয় ওকালতীর জালে জড়িত না হইতেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে তিনি যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ্মণের বুদ্ধিমত্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণের অযোধ্যাপুরী নাশ করা,

তাঁহার বাহুবলে রামের অভিষেক সম্পাদন করা, ভ্রাতৃবধ পিতৃবধ করা ইত্যাদির প্রস্তাব একজন নিতান্ত উদ্ধত চপল একদেশদর্শি বালকের উপযোগী, অথবা ক্ষণে-ক্ষণে-ক্ষিপ্ততা-প্রাপ্ত ব্যক্তির যোগ্য। লক্ষ্মণ যেমন একদেশদর্শী দীনেশ বাবু তেমনি একদেশদর্শী। লক্ষ্মণের বাক্যে যেমন অত্যুক্তি, দিনেশ বাবুর রচনাতেও সেই রূপ অত্যুক্তি। লক্ষ্মণের চরিত্রে এবংবিধ দোষ থাকা সত্ত্বেও তাহা যেমন মধুর ও সুন্দর, দীনেশ বাবুর প্রবন্ধও তেমনি ধর্ম্মাসনোচিত-ন্যায়-যুক্তি-বর্জ্জিত হইয়াও মনোহর ও সুন্দর। বাগ্মীব্রূম রাজ্ঞী কেরোলেইনের বিচার কালে, রাজ্ঞীর পক্ষ সমর্থনে, তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতাতে বলিয়া ছিলেন যে আমার মক্কেলের উপকারার্থে যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সমুদয় ইংলণ্ডকে অরাজক অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। দীনেশ বাবুও, তাঁহার মক্কেলের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ন্যায়-যুক্তিকে অরাজক অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিতে সঙ্কুচিত হন না। সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস ভয় কাহাকে বলে তাহা বস্তুতই জানিতেন না। লক্ষ্মণও ভয় কাহাকে বলে তাহা বস্তুতই জানিতেন না। কিন্তু তিনি পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র তাহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন "আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দ্বারা উদ্দাম দৈব-হস্তীকে আমি স্ববশে আনিব"। কিন্তু দীনেশ বাবু যে যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কোথায়ও লক্ষ্মণের পুরুষকারের অঙ্কুশ দেখা যাইতেছে না। বরঞ্চ দৈবহস্তী লক্ষ্মণকে অদম্যবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি রামকে বনবাসে যাইতে দিবেন না, রাম বনবাসী হইলেন। ভরতকে তিনি বধ করিবেন, ভরত রাজা হইলেন, ইত্যাদি। কিন্তু দীনেশ বাবু কৈফৎ দিতেছেন যে লক্ষ্মণ প্রখর-ব্যক্তিত্ব-শালী হইয়াও কেবল "ভ্রাতৃস্নেহে স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন"। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত কথা নহে তাহা দেখাইতে অধিক দূর যাইতে হয় না। মারীচ রাক্ষস যখন রামের স্বর অনুকরণ করিয়া "কোথারে লক্ষণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন সীতা ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমতঃ যাইতে অসম্মত হইলেন; পরে সীতা তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলে ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া দৈবহস্তীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দূরে নীত হইলেন। এই স্থলে ভ্রাতার আজ্ঞাতে তাঁহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রোধে ও অভিমানে ভ্রাতার আজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে বিলুপ্ত

হইল। দৈবহস্তীকে পুরুষকারের অঙ্কুশ দমন করা দূরে থাকুক, তিনি নারীর রসনা-অঙ্কুশে দৈবহস্তীর ন্যায় নিজে চালিত হইয়া ক্রোধে ছুটিলেন। মহাভারতে ভীমকে একমাত্র পুরুষকারের চিত্র বলিলে যে ভ্রম হয়, রামায়ণে লক্ষ্মণকে পুরুষকারের একমাত্র চিত্র বলিলে সেই ভুল হয়। এই প্রবন্ধটীর সমুদয় ভুল দেখাইতে হইলে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। যাহাই হউক দীনেশ বাবুর লিপিকৌশলের আমার ভূয়সী প্রশংসা করি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের লিখিত বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় পাঠ করিলে ইতিহাস যে অধিকাংশ স্থলে অনুমান-খণ্ড তাহা অনুভব করা যায়।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের **সার সত্য আলোচনা** পাঠ করিয়া এই অসার সংসারে সার-সত্যের দিকে সহজে যে পাঠকের মন আকৃষ্ট হইবে তাহা ভরসা হয় নাই।

ঘুষাঘুষি। পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের নবপ্রভাতে এবং New Indiaতে যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল তাহারই উত্তর। তবে ইহাতে লেখক নবপ্রভার নাম প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক প্রতিবাদস্থলে নবপ্রভাতে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা লেখক প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন; ইহাতে লেখকের উদারতা প্রকাশ হইয়াছে।

পন্থা, আষাঢ়।

"পন্থা" যথার্থ পন্থাই বটে কিন্তু অতি দুর্গম। সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

ব্রহ্মবিদ্যা—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। যাঁহারা এইবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন তাহাই হীরেন্দ্র বাবু এবারে দেখাইয়াছেন। সাধন চতুষ্টয় [অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি (সাম, দাম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান) এবং মুমুক্ষুত্ব সম্পন্ন না হইলে কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা ঋষি সম্প্রদায়েই নিবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মবিদ্যায় যে সকল অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচর। সে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মেষ আবশ্যক। যোগের সাহায্যে এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মেষ হয়। ঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ, তাহার ফলে তাহারা সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

পৌরাণিক কথা রাস পঞ্চাধ্যায়— [লেখক ব্রজলীলার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা তত ফলবতী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। "শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন" ইহাই এবারকার বিষয়। অনেক স্থলে আমরা পূর্ণেন্দু বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অবতারগণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে লেখক বলেন :—

"ঈশ্বর মায়া আশ্রয় না করিলে মায়ায় ভাসমান জীবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আবার ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইলে জীব মায়ার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এই জন্যই তিনি মানুষ হইয়া মানুষের কাছে গিয়া দাঁড়ান। এই জন্যই রামচন্দ্র মানুষ তিনি নিজ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। অবতারের প্রয়োজন এই যে যাহাতে জীব ক্ষেত্রস্থ শক্তি অতিক্রম করিতে পারে। যাহাতে তাহার মিশ্রভাব দূর হইতে পারে। যাহাতে সে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তি লাভ করিতে পারে।"

"সাক্ষাৎ সম্বন্ধের" অর্থ যেরূপ ভাবে লওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের মনোমত হয় নাই। আর অবতারের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও সমর্থন করিতে আমরা অক্ষম। এমন অনেক অবতার আছেন যাঁহারা নিজ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া যান নাই। এমন কি কোন কোন অবতারের চরিত্র মানবের অনুকরণীয় বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। "মহাপুরুষ"দিগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আধুনিক মত সকলকে লেখক আশ্রয় করিয়াছেন বটে কিন্তু মহাপুরুষ ও অবতার এক নহে এটা তাঁহার বুঝা উচিত। অবতারের আবশ্যকতা গীতা এক কথায় বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন :—

"রক্ষিতে সুকৃত নরে, নাশিতে দুষ্কৃত
"ধর্ম্ম সংস্থাপিতে (ভবে) জন্মি যুগে যুগে"

বৃন্দাবন সম্বন্ধে লেখক বলেন :—

"আমি নারায়ণ" বৃন্দাবনকে গোলকের ন্যায় শুদ্ধ সত্ব করিব। সেই শুদ্ধ সত্ব বৃন্দাবনে কেবল মাত্র আমার শুদ্ধ সত্ব প্রধান ভেদজ্ঞান রহিত ভক্ত গণ থাকিবে। তাহাদিগকে লইয়া আমি গোপনে লীলা করিব। আমি সখাদের সহিত বনরমণ করিব। সখীদের সহিত অতি নিভৃতে রমণ করিব। কেবল আমার একান্ত ভক্তগণ ইহার রহস্য চিরকাল জানিতে পারিবেন।"

পূর্ণেন্দু বাবু "রমণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। কিন্তু গোলোকে রমণ ত কেবল নিজ শক্তি লইয়া মায়ার জগতে মায়া রচিত শরীর লইয়া ভেদের জগতে ভিন্ন দেহ লইয়া বিরূপে সেই অমায়িক লীলা দেখাইত? অমায়িক প্রেম মায়ার ভাষায় ব্যভিচার।

আমাদের মিলনত কেবল আত্মায় আত্মায়। কিন্তু মায়ার জগতে মায়ারচিত শরীর ভিন্ন আত্মারও মিলন হইতে পারেনা। এই অপরিহার্য্য ভেদের কি ব্যবস্থা করিব?

জ্ঞানী যদি ভেদের মস্তকে পদাঘাত করে তবে সে মহাপুরুষ। ভক্ত যদি ভেদের ধর্ম্ম দূরে রাখিয়া ভগবানকে আলিঙ্গন করে তবে সে কলঙ্কিনী। বস্তুতঃ দুয়ের এক উদ্দেশ্য। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে। কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে আলিঙ্গন করে। কেহ সবিশেষ ভগবানকে আলিঙ্গন করে।"

"শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন। এ রমণে যে কিছু পার্থিবাংশ যে কিছু মায়ার ব্যবহার তাহা কেবল যোগ মায়া রচিত। সে অংশ, সে ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ জানেন না গোপীরাও জানেন না।"

রাসলীলা সম্বন্ধে নবপ্রভাতে প্রকাশিত স্বামী উত্তমানন্দের বক্তৃতা পাঠ্য।

বিচার সাগর—সাগরই বটে। অতলস্পর্শ। ডুবিলে মণি মাণিক্য মিলিতে পারে। কিন্তু এত গভীর জলে আমরা ডুবিতে অক্ষম।

শ্রীরামচন্দ্র—কৃত্তিবাসের রামায়ণটা ছাপাইলে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা ভাল হইত। ইচ্ছা করে সোণার পরিবর্ত্তে পিত্তল লইতে কে চায়?

ভগবদ্গীতা—গীতার বাঙ্গলা অনুবাদ।

নবনূর—আষাঢ়। সম্পাদক মহাশয় আরও একটু যত্ন ও চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

নবপ্রতিভা—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। "জড় পদার্থের সংবেদন" ও "গীতা সমালোচনা" উল্লেখ যোগ্য।

মহাজন বন্ধু—শ্রাবণ। শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানা বিষয়ক মাসিক পত্র। এরূপ মাসিক পত্রের যত অধিক প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল। এবারকার বিষয়ঃ—দেশী ও বিলাতী সবজী চাষ, গালার কারখানা, বায়স্কপ, জাহাজী কাজ, বিলাতী শনের চাষ, আধুনিক চিনির কণ্ট্রাক্ট ও স্বর্গীয় রামদুলাল সরকার। বেশ চলিতেছে।

কৃষক—ভাদ্র। কৃষি ও শিল্প বিষয়ক মাসিক পত্র। এবারকার বিষয়ঃ—বাগানের কার্য্য, কাসাড়া আলুর চাষ, বঙ্গদেশের জলতত্ত্ব, বীজ ক্ষেত্র, অভ্রের আকর, পশুর বংশোন্নতি, ও পশু চিকিৎসা উত্তম।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

শ্রাবণ, ১৩১০।

২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই। ইংরাজ ও ফরাসী উভয় জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন সন্ধি সম্পূর্ণ হয়।

৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই। পোপ ত্রয়োদশ লিওর মৃত্যু হয়। ...বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। .. সস্ত্রীক ইংরাজ রাজ আয়র্লণ্ড প্রদেশে গমন করেন।

৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই। ডিউক অব মার্লবরো অণ্ডার সেক্রেটারি অব কলোনীস বা ঔপনিবেশিকসহকারী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ...বঙ্গেশ্বর বোর্দ্দিলন বাঁকীপুরে আগমন করেন।

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই। মৃত পোপ ত্রয়োদশ লিওর অদ্য সমাধি হয়।... ভাবী বঙ্গেশ্বর এন এনগু ফ্রেজার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তার অব ল' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১০ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই। বঙ্গেশ্বর বোর্দ্দিলন মালদহে আগমন করেন।

১৩ই শ্রাবণ, ২৯শে জুলাই। মৃত ইতালীয় নরপতির স্মারকোসৎসব রোমনগরে সম্পন্ন হয়।... বঙ্গেশ্বর বহরমপুর পরিদর্শন করেন।

১৬ই শ্রাবণ, ১লা আগষ্ট। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।... রাজ প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন ভারতবর্ষের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যের ব্যয় কতকাংশ ন্যস্ত করিবার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন জানা যায়।... ধর্ম্মযাজকগণ(Cardinals) নব পোপ নির্ব্বাচনের নিমিত্ত গুপ্ত সভা (Conclave) আহ্বান করেন।... জনৈক সুন্নি ফকিরের অধীনস্থ সুন্নিদিগের সহিত সিয়া মুসলমান গণের তিরা পর্ব্বতের নিকট যুদ্ধ হয়। সুন্নি মুসলমান গণ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়।

১৯শে শ্রাবণ, ৪ঠা আগষ্ট। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে লর্ড কর্জ্জন প্রকাশ করেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল পূর্ণ হইবার পর তিনি আরও কিছু কাল ভারত শাসন করিবেন।... কার্ডিনাল সার্ডো নব পোপ নির্ব্বাচিত হন। ইনি আপনাকে পোপ দশম পাইয়স নামে আখ্যা প্রদান করেন।

২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট। বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর লর্ড নর্থকোট অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন সংবাদ আসে। ...বুলগেরিয়ানগণ তুরস্কদিগের প্রতি অত্যাচার করে শুনা যায়।

২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট। হঙ্গারী প্রদেশের মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হয়।..বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগষ্ট। রুসিয়া রাজ্যে কিছুদিন হইতে অশান্তি ও গোল যোগ আরম্ভ হইয়াছে। গত বুধবার (২০শে শ্রাবণ) হইতে কিফ প্রদেশে তিন দিন বেশ গোলযোগ হইয়াছিল।... জানিতে পারা যায় যে বিলাসপুরের রাজা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩ই আগষ্ট। কমন্স হাউসে লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ে বিবরণী পেশ করেন।...ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পীড়িত হইয়াছেন জানা যায়।... বরোদা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মহিষী মহালসা বাই-এর মৃত্যু হয়। ইনি বরোদার মৃত মহারাজা মহলার রাও গৈকবারের পত্নী।

২৯শে, ১৪ই আগষ্ট। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট। কার্ণাটিকের বেগম সাহেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্বামী কার্ণাটিকের নবাবের ১৮৬৫ সালে মৃত্যু হয়।

৩২শে শ্রাবণ, ১৭ই আগষ্ট। সংবাদ আসে যে কপরুলা যুদ্ধে মাসিদোনীয়া বাসীগণ জয়লাভ করে।

ভাদ্র। ১৩১০।

১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট। মাসিদোনিয়া বিদ্রোহ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। সোফিয়ার প্রকাশ বিদ্রোহিগণ তিন দল সৈন্য মনষ্টার প্রদেশে পরাজিত করে।... ইরিগেশন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট। কাশ্মীর প্রদেশে গত ২৪শে জুলাই ভীষণ জল প্লাবন হয় জানিতে পারা যায়।

৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট। সংবাদ আসে উত্তর নাইগেরিয়ার বন্দা প্রদেশে ইংরাজ ও স্বদেশীয় আমীর সৈন্যের সহিত ২৭শে জুলাই যুদ্ধ হয়। ইহাতে আমীর প্রভৃতি সাত শত শত্রু সৈনা নিহত হয়।... নিজাম সম্পত্তি বেরার প্রদেশ মধ্য ভারতের সহিত শাসন সূত্রে গ্রথিত হইল বিজ্ঞাপিত হয়।

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট। ইংলণ্ডের ভূত পূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলস্বরীর মৃত্যু হয়।... আদিয়া নোপলে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। বিদ্রোহিগণ ভাসিলিকো প্রভৃতি ১৩ খানি গ্রাম দখল করে।

৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট। সাউথ ওয়ার্ক নগরের বিশপ ফ্রান্সিস বোর্ণ ওয়েষ্টমিনিষ্টারে আর্চবিশপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট। কুইন্সল্যাণ্ডের ভূত পূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড লামিংটন (Lord Lamington) বোম্বের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

১১ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সরকারী কার্য্য গোপন আইন বা অফিসিয়াল সিক্রেটস বিল প্রভৃতি কয়েকটি নববিধির প্রস্তাব করা হয়।

১৪ই ভাদ্র ৩১শে আগষ্ট। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরে পৌঁছান।... হংকংএর বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা সর হেনেরী ব্লেক (Sir Henry Blake) সিংহলের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর। শান্তিপুর মিউনিসিপাল কমিশনার দিগের হস্ত হইতে মিউনিসিপাল কার্য্য ভার রাণাঘাট সব ডিভিশনাল অফিসারের হাতে এক বৎসরের জন্য অর্পিত হয়।...আসামের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হয়।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টম্বর। শুনিতে পাওয়া যায় তিন দল বুলগেরিয়ান ভেনিজিয়ানো মেলনিক ও ক্রিস্তরা স্থানে পরাজিত হয়।... ইংলণ্ডেশ্বর ভিয়ানা নগর পরিত্যাগ করেন।

২০শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টম্বর। বরগাওাগণ এক দল ফরাসী সৈনা আলজিরিয়ার নিকট আক্রমণ করে এবং তাহাতে ৩৭ জন ফরাসী সৈন্য নিহত হয়।... উজদা নগরে বার শত মুরাস সৈন্য আপনাদিগের রাজ সিংহাসনের মিথ্যাদাবী কারকের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

২২শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টম্বর। গোল্ডকোষ্টের শাসন কর্ত্তা মেজর সার ম্যাথিউ নাথান হংকঙ্গের, এবং মিঃ জন, এ, রজার গোল্ড কোষ্টের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩১০ সাল [৯ম সংখ্যা।

ধর্ম্মকথা।

"ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি।
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু॥"

প্রবন্ধের নাম পাঠ করিয়াই পাঠক নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতেছি এ সংসারের সার বস্তু "ধর্ম্ম"। ধর্ম্মালোচনা করিলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই মঙ্গল হইতে পারে। আর অর্থনীতি বল, সমাজনীতি বল, রাজনীতি বল, স্বদেশহিতৈষিতা বল, জাতীয় উন্নতি বল সকলই ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জগতে মনুষ্যের চেষ্টার যোগ্য যত কিছু মহৎ কার্য্য আছে সকলের মূলেই ধর্ম্ম। ধর্ম্মসাধনায় ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং সকলে ধর্ম্মানুসারে চলিতে শিখিলে সামাজিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। বলা আবশ্যক ধর্ম্মসাধনা বলিতে আমরা অরণ্যবাস বা গিরিগুহা আশ্রয় বুঝি না। আমাদের ধারণা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনাও ধর্ম্মালোচনার অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা এবং বেদব্যাসাদি পুরাণকর্ত্তারা জগতের কোন্ বিষয় আলোচনা না করিয়াছিলেন? আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশের উন্নতি-কল্পে নানাপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন—অনেক সভাসমিতি গঠন করিতেছেন—অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইতেছে না কেন? শিক্ষিতগণের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহাতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে সেই জাতীয় জীবন গঠিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। আমি বিগত

জ্যৈষ্ঠের "নবপ্রভায়" নিরতিশয় আনন্দের সহিত পাঠ করিলাম যে উক্ত পত্রিকার সুবিজ্ঞ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় আমাদের রাজনৈতিক মহাসম্মিলনী কংগ্রেসকে জাতীয় ধর্ম্মমন্দিরে পরিণত করিতে চাহেন। এইরূপ সকল প্রকার সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানই ভগবানের নামে উৎসৃষ্ট এবং ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ বোধ হয় একথা তত চিন্তা করেন না। শিক্ষিত সমাজে অটল ধর্ম্মবিশ্বাস নাই, এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের ক্ষীণতা হেতুই দেখিতে পাই, শিক্ষিতগণের মধ্যে উদ্দেশ্যের স্থিরতা এবং কার্য্যে আন্তরিকতার অভাব। একজন ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বাসী ভক্তের দ্বারা জগতের যে পরিমাণে উপকার হইতে পারে, শত শত অস্থিরমতি বক্তা বা লেখক দ্বারাও তাহা হইবার নহে। জীবনের দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ পরোপকার কেবল ঈশ্বরগতপ্রাণ ধার্ম্মিকগণের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত ধর্ম্মে লোককে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন করে না। যে ধর্ম্মে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম লইয়া আসে, উদারতার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, লোকহিতকর কর্ম্মের পরিবর্ত্তে আলস্য ও বিলাসিতা উৎপন্ন করে, তাহা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, প্রকৃত ধার্ম্মিক নিজের সুখ দুঃখাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবের দুঃখে কাতর হন, এবং জীবহিতার্থে মন প্রাণ উৎসর্গ করেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে শুধু ব্যক্তিগত সুখশান্তি লাভের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন লইয়া সংসার করিতে হইলে এবং ক্ষমতানুসারে সমাজের বা দেশের কোন হিতসাধন করিতে হইলে কোন প্রকার অকপট ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সংসারে যত মহৎলোক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, কিম্বা বাদ প্রতিবাদ, কিম্বা প্রবন্ধরচনা বা বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা উচিত একথা বলিতেছি না। ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাবেও প্রাগুক্ত বিষয় সমূহে সিদ্ধিপক্ষে কোন বাধা নাই। লোকে ধার্ম্মিক না হইয়াও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, ভক্ত বা বিশ্বাসী না হইয়াও তার্কিক লেখক বা বক্তা হইতে পারে। তবে একথা নিতান্তই সত্য যে, লোকে বাহিরে যতই কেন ভদ্র বা চরিত্রবান বলিয়া গণ্য হউক না, ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাবে তাহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন, সশংয়াকুলিত, এবং প্রকৃত প্রেম

ও মধুরতা বর্জ্জিত। ফলতঃ আমরা সকলে স্বীকার করি বা না করি, ধর্ম্ম ব্যতীত একদিনও সংসার চলে না। পণ্ডিতেরা বলেন যাহা সকলকে ধরিয়া রাখে বা যাহা সংসারের স্থিতির কারণ তাহাই "ধর্ম্ম"। কথা নিতান্ত সত্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি ধর্ম্ম সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের অভাবে একপদও চলিবার যো নাই। গৃহ, বিদ্যালয়, বিপণি, সভাস্থল সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে পুত্র পিতৃসেবা করে না, স্ত্রী স্বামীভক্তি করে না, ছাত্র গুরুকে সম্মান করে না, বিচারকর্ত্তা ন্যায় বিচার করে না, ক্রেতা বিক্রেতাকে বিশ্বাস করে না। মনুষ্য মনুষ্যের ইষ্টচিন্তা করে না। যদিচ অপরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিম্বা অপরের সেবা বা মঙ্গল চিন্তা করার মূলে অনেক সময়ে আমাদের স্বার্থজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে, তথাপি একথা সত্য যে, যেখানে অকপট শ্রদ্ধাভক্তি, যেখানে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, যেখানে প্রকৃত প্রেম সেই খানেই "ধর্ম্ম" বর্ত্তমান। প্রেম ভক্তি বা উপচিকীর্ষায় মানব যখনই আত্মহারা হয়, তখনই আমরা ধর্ম্মের জলন্ত ছবি সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই। আমরা মুখে ধর্ম্মস্বীকার না করিলেও শিক্ষা বা স্বভাববশে যখনই ঐ সকল স্বর্গীয় বৃত্তি সমূহ দ্বারা পরিচালিত হই তখনই কার্য্যতঃ ধর্ম্মপালন করিয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়, অনেক বাক্‌চতুর বা রচনাকুশল ধার্ম্মিক "ভণ্ডতপস্বী" মাত্র, এবং অনেক নির্ব্বাক, নগণ্য, নিরক্ষর মানবও প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্মজ্ঞান অনুশীলন দ্বারা পরিস্ফুট হয় সত্য, কিন্তু কোন অবস্থায় ইহা মনুষ্যের এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। যে সকল মনুষ্যের আদৌ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিকাশ হয় নাই তাহারা পশ্বাদি হইতে অধিক উন্নত নহে।

অনেকে বলেন—"আমরা ঈশ্বর স্বীকার নাই করিলাম, কিম্বা কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত নাই হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি? মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কি হইবে? আমরা সমাজনীতি পালন করিব, এবং জাগতিক ব্যাপারের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইব। ধর্ম্ম বা পরকাল লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া কি ফল? যে সকল ব্যাপার কেহ কখন প্রমাণ করিতে পারে নাই এবং পারিবে না, তাহা লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বাস্তব ব্যাপারের আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ফলতঃ "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া চীৎকার করা কতকগুলি অলস, ক্ষীণমস্তিষ্ক, বাতিক গ্রস্ত ব্যক্তির "ধর্ম্ম" মাত্র।

উত্তরে আমরা বলি, তোমার ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তুমি কি গৃহ, কি পরিবার, কি সমাজ, কি স্বদেশ কাহারও কোন প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না। তুমি যতই কেন বুদ্ধিমান হও না, ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তোমার সে বুদ্ধি অজ্ঞানতা মাত্র। তুমি যতই কেন নীতিবান্ হও না, তোমার সে নীতির মূলে ধর্ম্ম-বিশ্বাস না থাকিলে তাহা কেবল লোক ঠকাইবার কৌশল মাত্র। তুমি নিজে জ্ঞানতঃ প্রবঞ্চক না হইতে পার, কিন্তু তোমার গোড়ায় গলদ থাকায় তোমার মঙ্গলেচ্ছা লোকের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে অপারগ হইয়া লোকের অকল্যাণ সংঘটন করিবে।

ধর্ম্ম বিশ্বাসিগণের মধ্যেও যে ভ্রান্ত লোক নাই এমন নহে। ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া জগতে এ পর্য্যন্ত কত গণ্ডগোল হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। তথাপি ইহাও সত্য যে জগতে জ্ঞানাবস্থার সভ্যতা-বৃদ্ধি এবং সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে বলীয়ান মনস্বী পুরুষেরাই চিরকাল অগ্রণী ও প্রবর্ত্তক হইয়াছেন।

ফলতঃ অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস নিজের ও অপরের মঙ্গলের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক ইহা বোধ হয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে না। এক্ষণে কথা হইতেছে সংসার করিতে হইলে, জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, সুখ শান্তি লাভ করিতে হইলে, অপরের হিতচেষ্টা করিতে হইলে, ধর্ম্মবিশ্বাসের নিতান্ত আবশ্যকতা। এখন ধর্ম্মবিশ্বাস কাহাকে বলে? "ধর্ম্মবিশ্বাস" অর্থে কি, হরিহরাদি কোন দেবতার বিশ্বাস, না বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক চৈতন্যাদি মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত কোন সম্প্রদায় বিশেষে যোগদান? আমরা বলি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম লইয়া আমাদের কোন গোলযোগ নাই। যাহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে শুধু যুক্তি তর্কের সাহায্যে ঈশ্বর নির্ণয় করিয়া একটি "মন গড়া" ধর্ম্ম খাড়া করা অপেক্ষা বহু লোকের অবলম্বিত প্রচলিত ধর্ম্মমতের কোন একটি আশ্রয় করা মন্দ নহে। কিন্তু কিরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করা যায়? গোঁড়া ও অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণের দৌরাত্ম্যে সকল প্রকার ধর্ম্মমতই এবং প্রচলিত সকল প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই অল্পবিস্তর দূষিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেরই সম্প্রদায় বিশেষকে আশ্রয় করিতে সমূহ লজ্জা ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। আমরা বলি যাঁহারা প্রফুল্ল চিত্তে ও অসঙ্কুচিত হৃদয়ে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় আশ্রয় করিয়া আছেন বা করিতে ইচ্ছা

করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কথা হইতেছে সম্প্রদায়-বিদ্বেষিগণের জন্য। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা চেষ্টা করিলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সকলের সংস্কার করিতে পারেন। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। কাল স্রোতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত যে সকল জঞ্জাল জুটিয়াছে, শক্তিশালী পুরুষগণের আন্তরিক চেষ্টায় সে সকল সর্ব্বতোভাবে না হউক কিয়ৎপরিমাণেও দূরীভূত হইতে পারে। যত্ন ও অনুরাগের সহিত নিজ নিজ আশ্রিত সম্প্রদায় বিশেষের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই ধর্ম্মটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, এবং ভাল করিয়া বুঝা হইলে তাহাতে আন্তরিক আস্থা স্থাপন করিতে হয়। তাহার পর তাহার উন্নতি কল্পে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতে হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস বলিতে আমরা ইহাই বুঝি এবং এই ধর্ম্মবিশ্বাসের কথাই আমরা এতক্ষণ বলিতেছি। কিন্তু যাঁহারা কোনও সম্প্রদায়কে স্বীকার বা আদৌ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, তাঁহাদের বলি তাঁহারা সেই সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস হারাইতে বসেন কেন ?

আমাদের ধারণা নাস্তিক্য আর এ যুগে প্রকৃত ভাবে কোথাও নাই। অতি উচ্চ চিন্তাশীল দার্শনিকেরাও এখন আর নাস্তিক নহেন। কেহ কেহ এখনও সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রকারান্তরে মনুষ্য বুদ্ধির হীনতারই পরিচয় দিতেছেন।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে আর পূর্ব্ববৎ নাস্তিকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হয় না ইহা অতীব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু নাস্তিকতা মুখে না থাকিলেও কার্য্যে অনেক সময়ে আদৌ যায় নাই। ধর্ম্মচর্চ্চা বিষয়ে শিক্ষিত সমাজে তেমন আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয় না। দুই চারি জনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া জল্পনা ও কল্পনা করেন মাত্র। তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মের সাধনা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত সমাজে সংযম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের বড়ই অভাব। শিক্ষিত সমাজ অদ্যাপি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার মোহ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

শিক্ষিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান নহেন ইহা মানিয়া লইয়া, আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করি যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের সংশয় নাই থাকিল, ঈশ্বরের বিশ্বাস যখন ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের জন্যই তাঁহাদে প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তবে ঈশ্বরের

সহিত ভাল করিয়া যোগ স্থাপন করিতে, ভাল করিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণা করিতে, সংক্ষেপে ভগবানে ভক্তি লাভ করিতে আর তাঁহাদের আপত্তি কি? প্রাণ ভরিয়া পরমেশ্বরকে ডাকতে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ভগবানের সেবা ও পূজা করিতে তাঁহাদের লজ্জা কি?

যাঁহারা উচ্চজ্ঞানের ভাণ করিয়া কহিয়া থাকেন—"জগতের যিনি আদি কারণ, তিনি নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, সুতরাং তাঁহার আবার পূজা ও উপাসনা কি? তাঁহাদিগকে আমরা ধর্ম্মের একদেশদর্শী বা ভ্রান্ত মনে করিয়া থাকি। এক পক্ষে দেখিতে গেলে সেই জগত-নিয়ন্তা নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় বটেন, কিন্তু অপর পক্ষে তিনিই সগুণ, তিনিই কর্ম্মঠ তিনিই সর্ব্বদা জাগ্রত সর্ব্বব্যাপী পরমচৈতন্য। কবি কালিদাস বিষ্ণুস্তব করিতে যাইয়া ভগবানের যথার্থ স্বরূপই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

হৃদয়স্থমনাসন্নং অকামং ত্বাং তপস্বিনম্।
দয়ালু মনঘস্পৃষ্টং পুরাণ মজরং বিদুঃ॥
সর্ব্বজ্ঞ স্বমবিজ্ঞতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ॥
সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বং একস্ত্বং সর্ব্বরূপভাক্॥

* * * *

অজস্য গৃহ্নতো জন্ম বিরীহস্যাহতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব॥
শব্দাদীন বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ।
পর্য্যাপ্তোঽসি প্রজাঃ পাতুম ঔদাসীন্যেন বর্ত্তিতুম্॥

সুতরাং অকাম বা নির্ব্বাণমুক্তিকামী মহাপুরুষগণের পক্ষে উপাসনাদির প্রয়োজন না থাকিলেও—আমাদের ন্যায় ভয়বিপদব্যাকুলিত—শোকামোহাচ্ছন্ন জন্মমৃত্যুজরাগ্রস্ত সকাম সংসারিগণের পক্ষে ভগবানের পুজা উপাসনাদির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমাদের ন্যায় প্রবৃত্তিতাড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানী বা যোগী হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের একমাত্র পন্থা ভগবানে নির্ভর এবং বালকের ন্যায় সরল প্রাণে তাঁহাতে বিশ্বাস। আন্তরিক নির্ভর ও বিশ্বাস রাখিলে, ভগবান আশ্রিত জনের হৃদয়ে একটি শুভ আলোক প্রেরণ করেন। সেই ভগবদ্দত্ত আলোকানুযায়ী কর্ত্তব্য পথে চলিয়া যাওয়ায় বোধ হয় কোন বিপদ ও ভয়ের আশঙ্কা নাই।

শ্রীঃ—

ভীমরতি।

আমরা অদ্য যে প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ইহা জনসাধারণের নিকট উপহাসের কথা বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কিন্তু পাঠকগণ সর্ব্বদাই নীরস বিষয় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। কিঞ্চিৎ সুখপ্রদ হইলেই এবং কিঞ্চিৎ উপদেশ থাকিলে উপহাসের কথাও পাঠ করিতে লোকের অরুচি হয় না। তাই আমরা অদ্য ভীমরতির কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাঠক! শুনিয়াছেন আর্য্যেরা পঞ্চাশ বৎসর পরেই বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বন গমন পূর্ব্বক ঈশ্বর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। এক্ষণে গড়ে ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম সমাজের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ লোকেরই হয় না। ৪০ বৎসর পরমায়ু প্রায় সাধারণ। তবে নিশ্চিন্ত, ধার্ম্মিক, কুক্রিয়া-বিরহিত চিন্তা-শূন্য ব্যক্তির বয়ঃক্রম ৫০এর উর্দ্ধ হইয়া থাকে; তাহাও সহস্রের মধ্যে ৫।৭ অপেক্ষা উর্দ্ধ নহে বরং ন্যূন। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সপ্ততি বর্ষ অতি-ক্রম করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের অতি দীর্ঘ জীবন চির প্রসিদ্ধই আছে। কুলীনগণের অনেকেও দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং শরীরের সারতা ও স্বাস্থ্য নিবন্ধন পূর্ব্বে কুলীন মহাশয়গণের মধ্যে ২।৪ জনের ৩৬০টী বিবাহ শুনা যায়। তাঁহাদের বংশ পরম্পরা অদ্যাপিও ষেটে বিশ্বনাথের পৌত্র প্রপৌত্র বা অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহারা চতুর্থ শ্রেণীয়। যাঁহারা অষ্টোত্তর শত রামকৃষ্ণের ধারা বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা বহু বিবাহীর তৃতীয় শ্রেণী যাঁহারা এক দিন গতে এক দিন নূতন শ্বশুরালয়াশ্রয় এবং এক দিন পথিক অর্থাৎ সার্দ্ধশতাধিক দারপরিগ্রহী যাঁহাদের পথে আতিথ্য গ্রহণে এক দিন ও এক দিন শ্বশুরবাটী এইরূপে বৎসর কাটিয়া যাইত; তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীয় বহু বিবাহী। তাঁহাদের সন্তান মধ্যে অনেকেই ছমেসে রামভদ্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। যে সকল কুলীন মহাপুরুষের ৩৬০টী বিবাহ ছিল তাঁহারা প্রতি দিন পর্য্যায়ক্রমে নূতন শ্বশুর গৃহ এবং নূতন কলত্রের মুখচন্দ্র সন্দর্শন পূর্ব্বক এবং তাঁহাদের অমৃতময় বাক্যে পরমাপ্যায়িত হইতেন। এই সকল মহাপুরুষেরা অনেকেই চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এবং ষড রসাদি সুভোগ্য বস্তুর আস্বাদ পূর্ব্বক শ্বশুর গৃহের সুখভোগ করিতেন ইহাঁদিগের নাম করণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

কেহ কেহ ইহাদিগকে বলদেব পঞ্চানন অপভ্রংশে বলদ পঞ্চানন বলেন অন্য তিনটির নাম আমাদের কল্পিত। শ্বশুর গৃহে থাকা যে কি সুখ তাহা তাঁহারাই জানিতেন :—

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরং
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

ইহা প্রমাণ স্থলে পাঠ করিয়া থাকেন।

উপহাসের কথা যাহাই হউক। পূর্ব্বোক্ত কুলীন মহোদয়দিগের বয়ঃক্রম অশীতি নবতি ও শতাধিক বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে যে সুখস্বচ্ছন্দতা, নিশ্চিন্ততা, এবং ধর্ম্মানুরাগিতা শয়ন উপবেশন ভোজনাদির পারিপাট্য হেতুই মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয়। এখন এ সমুদয় বিষয়ের একান্ত অভাব। সুতরাং গড়ে চত্বারিংশৎ বৎসর অতিক্রম করা হিন্দু সমাজের পক্ষে সহজ নহে।

তাই ৫০ বা তাহার উর্দ্ধে বয়ঃক্রম হইলে আমরা বলি "যাওয়াই ভাল"। কারণ তখন পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতির সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্য পিতা পিতামহ প্রপিতামহের চিন্তা ও দায়িত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ সময়ে প্রপিতামহ হওয়ার কাল ৫০ বা তাহার ২।৪ বৎসর উপরেই ধরা যায়। সেই জন্যই বোধ হয় অতি সূক্ষ্মদর্শী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫৫ বৎসরের পরই তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীবর্গকে কার্য্য হইতে অবসর দেন এবং নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র চারি পুরুষ একত্রে দেখিয়াছেন তাঁহাদের কি আর উৎসাহ অধ্যবসায় কার্য্য ক্ষমতা থাকে? ইহাই গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস। তবে কদাচিৎ কোন ব্যক্তির পক্ষে ষষ্টী বৎসর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ দেখাইয়া থাকেন কিন্তু সাধারণত কর্ত্তৃপক্ষ ৫৫ বৎসরের পরই আর সে অনুগ্রহ দেখাইতে ইচ্ছা করেন না। অনুগ্রহপ্রার্থীর শরীরের সবলতা কার্য্যপটুতা অভিজ্ঞতা ও মান সম্ভ্রম এবং পরিবার প্রতি-পালনের প্রয়োজনীয়তা কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহাদিগকে অপদার্থই জ্ঞান করেন। কিন্তু কোন কোন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রবীণ বঙ্গবাসীদিগকে বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে তাঁহাদিগকে সরকারী কার্য্যে সপ্ততি অশীতি ও নবতি পর্যান্তও এমন কি তাঁহাদিগের জীবনকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংস্থাপিত রাখিতে অমনোযোগী হয়েন নাই। তাঁহারাও নব্যগণ অপেক্ষা সুচারুরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন।

আমাদের এ দেশে পূর্ব্বতন রাজগণ যত বেশী বয়ঃক্রমের লোক পাইতেন ততই তাঁহাদের প্রতি সমাদর দেখাইতেন। এক্ষণে কতকগুলি কার্য্যের সুখ্যাতি-বাক্য বিপরীত অর্থে ব্যঙ্গোক্তিতে ব্যবহৃত হওয়ায় অভিধেয় অর্থের ব্যাঘাত জন্মিয়া গিয়াছে। এই হেতু আর্য্যদিগের সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত পুরুষ ও স্ত্রীকে ভীমরতি যুক্ত বয়ঃক্রমের মানুষ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে কেহ কেহ বিদ্রূপ তাচ্ছল্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অভিধেয়ার্থ ধরিলে উহা এখনও প্রশংসার বিষয়। যেমন "রাম রাম" "মহাভারত" "সত্য সত্য" "নারায়ণ নারায়ণ" ইহা বিপরীত অর্থে মন্দভাবে লওয়া যায়। এবং প্রকৃতার্থে পবিত্রতা-বোধ হয়। তেমনি কোন ব্যক্তির ঊনপঞ্চাশ অতীত হইলেই পঞ্চাশে বনগমনের বিধান হেতু লোক ঐ সময়কে অকর্ম্মণ্যতা আরম্ভের সোপান মনে করেন। অর্থাৎ তাঁহারা সাত সাত্তে ঊনপঞ্চাশ বায়ুকেও ঊনপঞ্চাশ বৎসর আরোপ করিয়া ঐ কালকে বায়ু রোগের উপক্রম এবং ৭২ বৎসরে বায়াত্তুরে অর্থাৎ বায়ু রোগের অত্যাধিক্য জ্ঞান করিয়া লোককে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করেন। এরূপ অবস্থায় বায়াত্তুরে মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য মানব মধ্যেই পরিগণিত হয়েন না। বস্তুতঃ আর্য্যেরা তাহা বলেন না। তাঁহারা ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন অতিক্রান্ত পুরুষকে বিষ্ণুর অংশ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এরূপ বয়স অতিক্রম করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সেইরূপ পুরুষের যদৃচ্ছা ক্রমে গতি। বিষ্ণু প্রদক্ষিণের যে ফল তাঁহাকে প্রদক্ষিণেরও সেই ফল বলেন। এবং তাঁহার জল্পনা বিষ্ণুর মন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করেন। তাঁহার সাধারণ কথাও মন্ত্রণা মধ্যে গণ্য, তৎকৃত নিদ্রা বিষ্ণুর ধ্যান বলিয়া পরিগণিত এবং তৎকর্ত্তৃক পক্বান্ন বিষ্ণু আরাধনের সুধা বলিয়া খ্যাত। সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যার নামই "ভীমরতি" যাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর ৭ মাস ৭ দিন অতীত হইল তাঁহারই ভীমরতি হইয়াছে বলা উচিত। এরূপ পুরুষ বা স্ত্রী সচরাচর দেখা যায় না। দেখিতে পাইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট কত উপদেশ পাই। এবং তাঁহারা ভক্তির পাত্র বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বায়াত্তুরে ঊনপঞ্চাশে এবং সাতাত্তুরে অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন। স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রে যে প্রমাণ আছে তাহা এই—

"সপ্ত সপ্তত্যধিকে বর্ষে সপ্তমেমাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরতির্নাম নরাণাং অতি দুর্ল্লভা॥"

গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোঃ জল্পনং মন্ত্রভাষিতং।
ধ্যানংনিদ্রা সুখ্যাচান্নং ভীমরত্যাফলশ্রুতিঃ॥

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

বঙ্গের শেষবীর।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত (রায় সাহেব) প্রণীত।

[শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহিত তুলনায় সমালোচনা।]

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব মহাশয় অনেক দিন হইল "বঙ্গের শেষ বীর" নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থখানি সাহিত্য-সংসারে উত্তরোত্তর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে এবং অনেক গুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসাও বাহির হইয়াছে। হারাণ বাবুর এই প্রশংসনীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমতঃ এই গ্রন্থের ভাষায় ও ভাবে বঙ্কিম বাবুর অনুকরণ ও তাঁহার বিবিধ গ্রন্থের ছায়াবলম্বন পরিলক্ষিত হয়। প্রতাপাদিত্যের "পিতৃদ্রোহিতা" সীতারামের শ্রীর "প্রিয়প্রাণহন্ত্রিতা" হইতে গৃহীত। সীতারাম যেমন ভয়ে ভয়ে শ্রীকে দূরে রাখিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যও তেমনই কৌশলক্রমে আত্মজকে দিল্লী প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু শেষে বিধির বিধানে পিতৃহত্যা না হইয়া প্রতাপ কর্ত্তৃক পিতৃব্য হত্যা সংসাধিত হইল। শ্রীও ভ্রাতৃহত্যার কারণ হইয়াছিলেন। "সীতারাম" ও "বঙ্গের শেষবীর" এই দুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দুইটী বিষয় একইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ছায়াবলম্বন না করিয়া, উপন্যাস লেখক বসন্তরায়ের হত্যার পথ অন্যদিকে উন্মুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার কল্পনার স্বাধীন ভাবে প্রকাশিত হইত।

শঙ্করের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ, "সীতারামে" বর্ণিত সীতারাম প্রভৃতির মুক্তিলাভের বর্ণনার অনুরূপ। উড়িষ্যার পথে ফুলজানি ও বর্ষীয়সীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সহসা জয়ন্তী ও শ্রীর দৃশ্য আমাদের মানসপটে প্রতিফলিত

হয়। পুরুষোত্তমের পথে জয়ন্তী ও শ্রী এবং বর্ষীয়সী ও ফুলজানি ;—এই দুইটী পরিচ্ছেদ মিলাইয়া পাঠ করিলে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। তার প্রভেদ যথাক্রমে আলো ও ছায়া। যশোহরেশ্বরীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তির বাণী, "আনন্দমঠে"র চিকিৎসক ও "মৃণালিনী"র মাধবাচার্য্যের কথার ঠিক অনুরূপ। মৃণালিনী ১ম পৃষ্ঠা :—

"হেম। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে?—আর কাহা কর্ত্তৃক? মাধবা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে তখন যবন রাজ্য উৎসন্ন হইবেক।" ইত্যাদি।

আনন্দ মঠ ১৭৮ পৃঃ—

"চিকিৎসক কহিলেন 'সত্যানন্দ কাতর হইও না।—ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে।"

সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করিতে গেলে স্থান সংকুলান হয় না,

অতঃপর [উদ্ধৃত উভয় অংশের সহিত 'বঙ্গের শেষ বীর' হইতে] উদ্ধৃত অংশ পাঠ করুন।

বঙ্গের শেষবীর—২৮৪ পৃঃ—যশোহরেশ্বরীর বাণী :—

"বৎস! নিরাশ হইও না। তুমি রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে বটে, কিন্তু মুসলমানও এ রাজ্য অধিক কাল ভোগ করিতে পারিবে না। ভারতের হিন্দুশক্তি ও আর্য্যসভ্যতার পুনরুদ্দীপন করিতে, সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে শ্বেতকায় ও সুসভ্য একদল জীবিত জাতি শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন। তাঁহারা একহস্তে সত্য ও ন্যায় এবং অপর হস্তে করুণা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মিলাইয়া, দেবতার ন্যায়, প্রত্যেক ভারতবাসীর ভক্তি, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। হিন্দু তখন অধীন হইয়াও সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা সুখের আস্বাদ পাইবে। হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য—তখন আপন আপন পথ পাইবে। তুমি সমগ্র ভারত একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া (?) ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিয়াছিলে—কিন্তু সে সৌভাগ্য—শ্বেতদ্বীপ হইতে আগত সুদূর পশ্চিমবাসী সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জাতি ভিন্ন আর কাহারও হইবে না। তাঁহারাই ভারতের ভাবী সম্রাট। সেই ন্যায়বান রাজরাজেশ্বরকে গুরুপদে আসীন করিয়া তোমার বংশধরগণ সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবে।"

এক্ষণে আমরা দেখাইব যে এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাস্পদ সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থের আংশিক ব্যাখ্যা। স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষাও অবিকল গৃহীত হইয়াছে। দুই একস্থান উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পড়িলে, আমাদিগের উক্তির সম্পূর্ণতা উপলব্ধি হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলিলেন :—"একজন ব্রাহ্মণ মহা-

গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোঃ জল্পনং মন্ত্রভাষিতং।
ধ্যানংনিদ্রা সুধাচান্নং ভীমব্রত্যফলশ্রুতিঃ॥

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

বঙ্গের শেষবীর।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত (রায় সাহেব) প্রণীত।

[শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের
সহিত তুলনায় সমালোচনা।]

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব মহাশয় অনেক দিন হইল "বঙ্গের শেষ বীর" নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা মহারাজ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থখানি সাহিত্য-সংসারে উত্তরোত্তর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে এবং অনেক গুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসাও বাহির হইয়াছে। হারাণ বাবুর এই প্রশংসনীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমতঃ এই গ্রন্থের ভাষায় ও ভাবে বঙ্কিম বাবুর অনুকরণ ও তাঁহার বিবিধ গ্রন্থের ছায়াবলম্বন পরিলক্ষিত হয়। প্রতাপাদিত্যের "পিতৃদ্রোহিতা" সীতারামের শ্রীর "প্রিয়প্রাণহন্ত্রিতা" হইতে গৃহীত। সীতারাম যেমন ভয়ে ভয়ে শ্রীকে দূরে রাখিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যও তেমনই কৌশলক্রমে আত্মজকে দিল্লী প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু শেষে বিধির বিধানে পিতৃহত্যা না হইয়া প্রতাপ কর্ত্তৃক পিতৃব্য হত্যা সংসাধিত হইল। শ্রীও ভ্রাতৃহত্যার কারণ হইয়াছিলেন। "সীতারাম" ও "বঙ্গের শেষবীর" এই দুই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দুইটী বিষয় একইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ছায়াবলম্বন না করিয়া, উপন্যাস লেখক বসন্তরায়ের হত্যার পথ অন্যদিকে উন্মুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার কল্পনার স্বাধীন ভাবে প্রকাশিত হইত।

শঙ্করের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ, "সীতারামে" বর্ণিত সীতারাম প্রভৃতির মুক্তিলাভের বর্ণনার অনুরূপ। উড়িষ্যার পথে ফুলজানি ও বর্ষীয়সীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সহসা জয়ন্তী ও শ্রীর দৃশ্য আমাদের মানসপটে প্রতিফলিত

হয়। পুরুষোত্তমের পথে জয়ন্তী ও শ্রী এবং বর্ষীয়সী ও ফুলজানি ;—এই তুইটী পরিচ্ছেদ মিলাইয়া পাঠ করিলে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। তার প্রভেদ যথাক্রমে আলো ও ছায়া। যশোহরেশ্বরীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তির বাণী, "আনন্দমঠে"র চিকিৎসক ও "মৃণালিনী"র মাধবাচার্য্যের কথার ঠিক অনুরূপ। মৃণালিনী ১০ম পৃষ্ঠা :—

"হেম। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে?—আর কাহা কর্ত্তৃক?

মাধবা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যখন পশ্চিম দেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে তখন যবন রাজ্য উৎসন্ন হইবেক।" ইত্যাদি।

আনন্দ মঠ ১৭৮ পৃঃ—

"চিকিৎসক কহিলেন 'সত্যানন্দ কাতর হইও না।—ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে।"

সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করিতে গেলে স্থান সংকুলান হয় না,

অতঃপর [উদ্ধৃত উভয় অংশের সহিত 'বঙ্গের শেষ বীর' হইতে] উদ্ধৃত অংশ পাঠ করুন।

বঙ্গের শেষবীর—২৮৪ পৃঃ—যশোহরেশ্বরীর বাণী :—

"বৎস! নিরাশ হইও না। তুমি রাজ্য ভ্রষ্ট হইলে বটে, কিন্তু মুসলমানও এ রাজ্য অধিক কাল ভোগ করিতে পারিবে না। ভারতের হিন্দুশক্তি ও আর্য্যসভ্যতার পুনরুদ্দীপন করিতে, সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে শ্বেতকায় ও সুসভ্য একদল জীবিত জাতি শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন। তাঁহারা একহস্তে সত্য ও ন্যায় এবং অপর হস্তে করুণা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মিলাইয়া, দেবতার ন্যায়, প্রত্যেক ভারতবাসীর ভক্তি, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। হিন্দু তখন অধীন হইয়াও সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা সুখের আস্বাদ পাইবে। হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য—তখন আপন আপন পথ পাইবে। তুমি সমগ্র ভারত একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া (?) ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিয়াছিলে—কিন্তু সে সৌভাগ্য—শ্বেতদ্বীপ হইতে আগত সুদূর পশ্চিমবাসী সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জাতি ভিন্ন আর কাহারও হইবে না। তাঁহারাই ভারতের ভাবী সম্রাট। সেই ন্যায়বান রাজরাজেশ্বরকে গুরুপদে আসীন করিয়া তোমার বংশধরগণ সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবে।"

এক্ষণে আমরা দেখাইব যে এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাস্পদ সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থের আংশিক ব্যাখ্যা। স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষাও অবিকল গৃহীত হইয়াছে। তুই একস্থান উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পড়িলে, আমাদিগের উক্তির সম্পূর্ণতা উপলব্ধি হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় বলিলেন :—"একজন ব্রাহ্মণ মহা-

রাজের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্ঞীকে প্রার্থনা করেন।" ইত্যাদি। এ কথাটিত আছেই; ইহা ব্যতীত এই ৮। ৯ লাইন অবলম্বন করিয়া একটা পরিচ্ছেদের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। ১৬৭। ১৬৮ পৃষ্ঠা অবলম্বনে যে ১২শ পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে, তাহার ঘটনা ও বর্ণনীয় বিষয় উভয়গ্রন্থে এক। উপন্যাস লেখক কোন নূতন কথার উল্লেখ করেন নাই; কেবল শাস্ত্রীর উক্ত কথার কথোপকথনচ্ছলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে কোন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা হয় নাই। "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থের ৩৯ পৃঃ ২য় অণুচ্ছেদ ও ৪৩—৪৬ পৃষ্ঠার কতকাংশের ব্যাখ্যা, বঙ্গের শেষবীরের দ্বিতীয়খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ। ইহাতে স্থানে স্থানে উভয় গ্রন্থের ভাষাও মিলিয়া যায়। গঙ্গার দৃশ্য, গৌড়ের বর্ণনা, দিল্লির কর্ম্মচারিগণের সহিত প্রতাপের সম্মিলন ও সমস্যাপূরণ প্রভৃতি বর্ণনায় ভাষার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ফলতঃ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, অল্পবিস্তর ভাব ও ভাষা গ্রহণ করার প্রলোভন হারাণ বাবু কোনক্রমেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আর একস্থান দেখুন :—

"মহারাজ প্রতাপাদিত্য" ৮২ পৃঃ—

"মহাবীর বলবন্ত ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন 'দেব! মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেইরূপ সত্যবাদী। আমি মনন করিয়াছি যে, একাকী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কিছু গোপনীয় বক্তব্য আছে বলিয়া তাঁহাকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যাইব এবং সুযোগক্রমে তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমন করিয়া আমার অধীনস্থ করিব, সেই সময় তিনি যদি আমার কোনরূপ অপকার না করিয়া কচুরায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব, অন্যথা তাঁহাকে সংহার করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই নশ্বর দেহ স্বামীকার্য্যে অর্পণ করিব।"

"বঙ্গের শেষবীর" ৩য় খণ্ড—৩য় পরিচ্ছেদ—১৭৫ পৃঃ—

"বলবন্ত বলিল 'জাঁহাপনা! প্রতাপাদিত্যের অন্য সহস্র দোষ থাকিলেও, শুনিয়াছি তিনি বড় সত্যবাদী। সত্যরক্ষার জন্য তিনি নাকি সকলই করিয়া থাকেন। তাই আমি মানস করিয়াছি 'কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে' বলিয়া, আমি নিভৃতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এবং সেই অবসরে হঠাৎ তাঁহাকে এমনিভাবে আক্রমণ করিব যে সে সময় তাঁহার জীবন মরণ সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিবে।" ইত্যাদি

বলবন্তসম্পর্কীয় ঘটনা অবিকল শাস্ত্রীর কথায় বর্ণনা করা হইয়াছে। সব সাদা, কোথায়ও নৈপুণ্য নাই। যেমন ইতিহাসে তেমনই ঐতিহাসিক উপন্যাসে। শাস্ত্রী মহাশয় যে যে অংশগুলির মীমাংসায় উপনীত হন নাই, হারান বাবুও সেই সেই অংশগুলি সম্বন্ধে প্রথমতঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া,

অবশেষে "মহাজন যেন গতঃ সঃপন্থা" এই স্থির করিয়া যথাযথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় অমীমাংসিত রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রীর ইতিহাসের ৩২। ৩৩ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গের শেষ বীরের ২৪। ২৫ পৃষ্ঠায় শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তের প্রতাপাদিত্যের সহিত সম্মিলন অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

শাস্ত্রীঃ—৩৩ পৃঃ—

"এই সময় আর একটি বালক ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হন, তাঁহার নাম সূর্যকান্ত গুহ।"

রক্ষিতঃ—২৫ পৃঃ—

"দেখিতে দেখিতে, কোথাহইতে, আর একটী তেজস্বী বালক আসিয়াও জুটিল। প্রতাপ তাহাকেও কোল দিলেন—তাহার সহিত আত্মহৃদয় বিনিময় করিলেন। এই সৌভাগ্যবান বালকের নাম সূর্যাকান্ত গুহ।"

"সিরাজদ্দৌলার" গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক ক্ষালনার্থ বিপুলা গবেষণা দ্বারা প্রমাণ পরম্পরা সংগ্রহ করিয়া স্বকীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছেন। হারাণ বাবুও তাঁহায় পথানুসরণে, বলবতী স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রতাপ চরিত্র সমর্থন করিতে গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কেবল কতকগুলি মহৎ চরিত্র কলুষিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাহারই দুই একটীর নমুনা দেখাইব।

প্রতাপাদিত্য যখন তাঁহার খুড়ীমার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন, তখন যেন তাঁহাকে একটি দুর্ব্বিনীত সাধারণ বাঙ্গালী বালক বলিয়া অনুমান হয়। বঙ্গের শেষবীর বাল্যাবস্থায় পাকশালায় উনুনের ধারে বসিয়া, আগুণ পোহাইতে পোহাইতে বর্ষীয়সী পিতামহীর নিকট আপনার বাহাদুরী দেখাইতেছেন। কখন আবার হাবা খুড়ীমার কাছে গিয়া, ইংরেজী শিক্ষিত অভদ্র যুবকের ন্যায়, তিনি পিতা-পিতৃব্যের কার্য্যে উপহাস প্রদর্শন করিতেছেন। খুড়ীমা তালুক মুলুকের লোভ দেখাইতেছেন, প্রতাপ হাস্য করিতেছেন। পিতা তালুকদার, ইহা তাহার হাস্যের বিষয়ীভূত। শিবজীও এইরূপ পিতার পুত্র ছিলেন।

ইহার পর খুড়া বসন্ত রায় আসিলেন। প্রতাপের সহিত অনেক কথোপকথন হইল। পরে প্রতাপ বলিলেন "বলিলে কিছু রূঢ় হইবে, আমার মনোগত অভিপ্রায় আপনারা ধারণা করিতেই পারিবেন না। ৪৭ পৃঃ। কথাটা ঠিক বিবাহ বিভ্রাটের মত হইল;—"তুমি সেকেলে Junior, Senior—তুমি Science এর কি বুঝিবে?" অথচ শাস্ত্রী বলিলেন—"বসন্ত রায় একজন

রাজকার্য্যে নিপুণ প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন।" প্রতাপের মনোগত অভিপ্রায় তিনি না জানিতে পারেন, কিন্তু জানিতে পারিলে কি তাহা বুঝিতেই পারিবেন না? বসন্তরায় এত নির্ব্বোধ!! তৎপর প্রতাপ যখন ইঙ্গিতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তখন বসন্তরায় বুঝিতে পারিলেন এবং "দুর্গানাম জপ করিয়া চারিদিক চাহিয়া (?) ভয়ে ভয়ে কহিলেন 'তবে কি তুমি দেশকে স্বাধীন করিয়া, স্বাধীনরাজ নাম লইতে চাও?'" প্রতাপ বলিলেন "সে কথা আপনাকে আজ বলিব না, আর একদিন বলিব।" কিন্তু হায়, আর বলা হইল না। উপন্যাসে বঙ্গের শেষবীরের বাল্যজীবন এরূপ শোচনীয় ভাবে বর্ণিত হওয়ায়, কেবল কাব্য-সৌন্দর্য্য লঘু হয় নাই, বীরচরিত্রও হাস্যজনক হইয়াছে।

বসন্তরায় লোকটা একটা বেকুব পত্তনের চিত্রিত হইয়াছেন। যে বসন্তরায় সম্বন্ধে ঘটককারিকা গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন :—

"গুণানন্দঃ পুণ্যবাংশ্চ শান্তচেতা দ্বিজার্চ্চকঃ।
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভ স্মৃতঃ॥
বভূব খালিশাধীপঃ গৌড়কোষাধিপস্তথা।
দিল্লীশ্বর প্রসাদেন প্রচণ্ড বলবিক্রমঃ॥
বসন্তরায় সজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ।
প্রাপ্নুয়াৎ সমরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥
* * * * * *
তৎপিতৃব্য মহাজ্ঞানী বসন্তরায় ভূপতিঃ।
মহাতেজা মহামানী সর্ব্বধর্ম্ম ভৃতাংবরঃ॥
সরস্বতী সমো বাগ্মী বুদ্ধৌ সাক্ষাৎ বৃহস্পতিঃ।
মহাশাক্তঃ ইষ্টভক্তঃ সর্ব্ব গুণৈস্তু সংযুতঃ॥
অধ্যাত্ম জ্ঞানবিৎ সোপি ব্রাহ্মণস্য প্রিয়ঃ সদা।
সর্ব্বশাস্ত্রবিদাম্‌শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥

এ হেন বসন্তরায় একটি নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছেন। যে বসন্তরায়, প্রতাপ দিল্লী গমন করিলে, তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভীত; যে বসন্তরায় স্নেহবশতঃ প্রতাপের সহিত বহুদূর গমন করিয়া, তাঁহাকে দিল্লীর পথে রাখিয়া আসিয়াছিলেন; যে বসন্তরায়, প্রতাপের বিপদ আশঙ্কা করিয়া, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে দিবার পক্ষপাতী

নহেন,—সেই বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধাচারী!! শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ৭৯।৮০ পৃষ্ঠায় বসন্তরায়ের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করুন। সে চরিত্রে হিংসা কখনই থাকিতে পারে না। তবে তিনি দিল্লীশ্বর-ভয়ে ভীত। কিন্তু তাই বলিয়া, জ্ঞাতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কখন প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করেন নাই বা প্রতাপের বিপক্ষ পক্ষকে লোক-জনদ্বারা সাহায্যও করেন নাই। জ্ঞাতিহিংসার বীজ সর্ব্বপ্রথমে প্রতাপ হৃদয়ে উপ্ত হয়। প্রতাপ, পিতা কর্ত্তৃক (পিতৃদ্রোহিতা-ভয়ে) দিল্লী প্রেরিত হইয়া স্থির করিলেন, ইহা পিতৃব্যের পরামর্শক্রমে সংসাধিত হইল। "প্রতাপ এই হইতে বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ ভ্রমধারণাহৃদয় মধ্যে পোষণ করিতে লাগিলেন।" শাস্ত্রী ৩৯ পৃষ্ঠা। চাকৃসিরি পরগণা না পাইয়া প্রতাপের রোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রামচন্দ্রের পলায়নে সে বহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। "তিনি (প্রতাপ) প্রত্যেক ঘটনাতে খুল্লতাতের কুটিলতা দেখিতে লাগিলেন। তিনিই (বসন্তরায়) পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উৎপন্নের মূলকারণ স্থির করি-লেন; তিনিই চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পিতৃস্নেহবঞ্চিত এবং দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যস্থ উত্তম স্থান সকল গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।" শাস্ত্রী ৭৬ পৃঃ। এই সকল অপরাধে বসন্ত-রায় কতদূর অপরাধী, তাহা শাস্ত্রীর গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানা যায়। বিক্রমাদিত্য যখন তনয়কে দিল্লী প্রেরণ করেন, তখন বসন্তরায় বাধা দেন। রাজ্য বিভাগ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক হয়। প্রতাপাদিত্য যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী এবং চাকৃসিরি পরগণা লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া বসন্তরায়ের-হত্যাসাধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে যত-গুলি ধারণা, সকল গুলিই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং নিজ অন্তরে গঠিত। ধারণা-গুলির কোন মূল নাই। বসন্তরায় এবং তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য যে কলঙ্ক রাশি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা দূরপনেয় নহে। বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয় বীর বলিয়া তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করিতে পারি, কিন্তু নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং অক্রোধী বলিয়া কখনই তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না।

হারাণবাবুর প্রতাপকে অনেক স্থানে দেখা যায়, তিনি কেবল কাঁদিতেছেন। শঙ্কর, সূর্য্যকান্তও তদ্রূপ। কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর এবং ভক্তিবীর তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া কেবল কাঁদিতেই আছেন। তাঁহাদের চক্ষু যেন পার্ব্বতীয় নির্ঝরিণী।

'বাগ্মীপ্রবর' শঙ্কর 'বঙ্গের শেষবীর' গ্রন্থে একজন গায়ক মাত্র। এই জ্ঞানবীরের জ্ঞানের বিকাশ উক্ত গ্রন্থে কোথায়ও দেখি না। কেবল গান গাহিয়া থাকেন এবং দরবিগলিত অশ্রুত্যাগ করেন। শাস্ত্রীর শঙ্কর ও রক্ষিতের শঙ্কর দুইটি বিভিন্ন জীব। শাস্ত্রীর শঙ্কর বাগ্মী, লোকরঞ্জন পটু, বীর ;—রক্ষিতের শঙ্কর-চরিত্র সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। রক্ষিতের সকল চরিত্রেই স্ফূর্ত্তির অভাব। সকলেই যোদ্ধা, কিন্তু সমর-কৌশল-বর্জ্জিত।

ফুলজানি লেখকের অদ্ভুত সৃষ্টি। সাতের মিশ্রণে এক রং প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফুলজানিকে প্রথম যখন আমরা তোরাবের গৃহে সূর্য্যকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখি, তখন "নবীনা জননী" উপন্যাসের মলিনার কথা মনে হয়। তদ্‌পর ফুলজানি 'শান্তি' রূপে অধিষ্ঠিতা ; কিন্তু শান্তির স্ফূর্ত্তি তাহাতে বিদ্যমান নাই। সর্ব্বশেষে ফুলজানি "মৃণালিণীর" মনোরমা। প্রভেদ এইটুকু যে মনোরমা পরিণীতা ছিলেন, ফুলজানি তাহা নহে। সংসারে সে সূর্য্যকান্তকে চিনিয়াছিল। সে বিশ্বজনীন প্রেম শিখে নাই ; তাহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ। অভাগিনীর মর্ম্ম-কাতরতা অসহনীয়রূপে বিস্তৃত, কিন্তু তাহা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে না। তবু, এই ফুলজানিকে বাদ দিলে "বঙ্গের শেষবীর," অবিকল পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" বলিয়া অনুমিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় যেমন তাঁহার গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় প্রতাপ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের প্রতি অত্যাচারের কারণ সমূহের সত্য নিরূপণ করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত বিবৃত করিয়াছেন, হারাণবাবুও তদ্রূপ তাঁহার উপন্যাসের ২২শ পৃষ্ঠায় প্রতাপ চরিত্র সমর্থনের জন্য কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কটাক্ষ করিয়াছেন।*

শ্রীঅভয়া কিশোর ভট্টাচার্য্য।

---

* এই সমালোচনায় লেখক রায় সাহেবের গ্রন্থের গুণের কথা কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার মত হারাণবাবুর গুণ গান অতিমাত্রায় হইয়া গিয়াছে। একণে অন্যদিক আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিক আলোচনার ভার তিনি লইয়াছেন। যাহা হউক যদি কেহ প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধে রায় সাহেবের পক্ষ সমর্থন করেন আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহা ছাপাইব। নঃ সঃ

একখানি উইল নামা।

পূজ্যপাদ নবপ্রভা সম্পাদক মহাশয়,

কিয়দ্দিন হইল আমি একজন কাগজীর দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে কয়েক খণ্ড গোটা কাগজ পাইয়া দুই তিন জনে টানাটানি করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া কাগজ কয়েকখানি আমার হাতে দিয়া পড়িতে অনুরোধ করিল, তাহারা শুনিয়া কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না, আমাকে কাগজ গুলি দিয়া বলিল—"আপনি যাহা ভাল বোঝেন করিবেন।" আমি উহার একখণ্ড নকল রাখিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকে উইল কর্ত্তা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট মূল উইল খানি পাঠাইয়া দিলাম আর নকল খানি আপনার নিকট পাঠাইতেছি, ইহা দ্বারা যদি কাহার বিন্দুমাত্র উপকারদর্শে বোধ করেন তাহা হইলে আপনার সর্ব্বজন প্রিয় "নবপ্রভায়" প্রকাশ করিবেন।

শ্রী অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

উইল নামা।

লিখিতং শ্রী * * * পিতা ৺ * * * জাতি * * পেশা * সাং * থানা সবরেজিষ্ট্রী ও চৌকি * * * জেলা ও রেজিষ্ট্রী * * কস্য উইল নামা পত্র মিদং সন * * * সালের * * তারিখে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে। একেই তো মনুষ্য জীবন প্রাতঃ-কুন্দ-প্রভব-শিথিলঃ অর্থাৎ প্রভাত কালীন কুন্দ কুসুমের বৃন্তের ন্যায় আলগা। মৃদুমারুৎ সঞ্চারের সম্ভাবনা হইতে না হইতেই খসিয়া পড়ে—অতএব এ জীবন কখন্ আছে, কখন্ নাই বলা যায় না। বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলের পক্ষেই এইরূপ—একবার ভেদ, একবার বমন, অথবা এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী বা অতি মাত্রায় শারীরিক অন্য যে কোন প্রকার স্রাব দ্বারা বসিয়া থাকিতে থাকিতে বা পথে চলিতে চলিতে হোঁচট খাইয়া, না হয়, ঘুমাইতে ঘুমাইতে কোন আকস্মিক কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবরোধ মাত্রেই ইহজীবনের অবসান

হইতে পারে। তাহাতে আবার আমার বয়স হইয়াছে, জরা আসিয়া দেহ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। শারীর যন্ত্র স্বভাবতঃ বিকৃতি যাইতেছে, এ অবস্থায় আর কাল বিলম্ব চলে না, এক খানি উইল নামা লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়াছে।

২। আমার পুত্রকন্যায় পাঁচটী—দুইটী পুত্র, তিনটী কন্যা। পুত্র দুইটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠটী বয়ঃপ্রাপ্ত, কনিষ্ঠটী এখনও অপ্রাপ্তব্যবহার। কন্যা তিনটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠটী পুত্রবতী, অপর দুইটী অবিবাহিতা। নিম্নের তপশীল লিখিত বিষয় বৈভবের মধ্যে "মানস ক্ষেত্র" নামে যে একটী ভূসম্পত্তি, তাহারই মধ্যে "মনোমন্দির" নামে একটী অট্টালিকা, আর "শান্তি সরোবর" নামে সরোবর তাহার তীরে একটী উদ্যান, এবং পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকা ও সরোবরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া শস্য ক্ষেত্র আছে। তাহাতে শালি শুনা হরেক রকমের জমি আছে, ঐসকল জমিতে ধান্য, যব, গম, বিরি, বরবটি, বুট, মুগ, আক, আলু ইত্যাদি ফসল জন্মে। সমগ্র মানস ক্ষেত্রের সীমা সরহদ্দ মাপা জোখা নাই—যতদূর ইচ্ছা বাড়াইয়া লইতে পারা যায়। মালিকের সহিত এইরূপ সর্ত্তেই বন্দোবস্ত করা আছে।

৩। শান্তি সরোবরটী সুবিস্তৃত, ও সুগভীর, অনাবৃষ্টিতে উহার জল শুকায় না, সলিল স্বচ্ছ সুস্নিগ্ধ ও স্বাদু—পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, শরীর ও মন জুড়াইয়া যায়, উষ্ণ ক্ষেত্রে সিঞ্চিত হইলে তাহাতে উর্ব্বরতা জন্মে। উহাতে জলজন্তুর ভয় নাই, স্নান করিতে নামিয়া, ডুব দিয়া তলাইয়া যাইলেও প্রাণের ভয় থাকে না, মৎস্য সুপ্রচুর—নানা জাতীয়। বার মাসই কমল কুমুদ কহ্লারাদি জলজ কুসুমে শান্তিসরোবর শোভার ভাণ্ডার, সলিল সৌরভময়, হংস কুহরকাদি নানা রকমের জলচর পক্ষীর মধুর কণ্ঠস্বরে, ভ্রমরকুলের মধুরগুঞ্জনে স্নাতকের মন অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপ্লুত হয়। শান্তি সরোবর যে সকল সুখের আকর তাহা বলাই বাহুল্য—তীরস্থ উদ্যানভূমির কথা কি বলিব, বৃক্ষবল্লীর শোভা নয়নমনোমাদিনী, কাহার কিসলয়, কাহার কুসুম, কাহার মুকুল, কাহার ফলে বার মাসই চক্ষু জুড়ায়, কোন ফল কাঁচা, কোন ফল ডাঁসান, কোন ফল পাকিয়া রহিয়াছে, সেই সকল ফলে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ করে, মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে, শরীরে বল সঞ্চার করে। মনোহারিণী নানাবিধ লতাগুল্মের কন্দ ফলাদিও তদ্রূপ। শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা ভেদ নাই, গাছের ডালে ডালে কোকিল কুহরিতেছে, পাপিয়া ফুকারিতেছে, বৌ-কথা-কও মধুরে আলাপ করিতেছে;

শ্যামায় শিশ টানিতেছে; কলকণ্ঠ কত বিহঙ্গের নাম করিব। আপনার সম্পত্তি বেশী করিয়া বলিতে লজ্জা করে, বিষয় কর্ম্মের কথা সমস্তই লেখায় পড়ায় থাকা চাই, তাই না লিখিলে চলে না, বাধ্য হইয়া লিখিতে হইল।

৪। অতঃপর হৃদয় মন্দিরটীর কথা উপরে যে সকল সম্পত্তির কথা বলিলাম, এবং যেটীর কথা বলিতেছি সকলগুলিই আমার পৈতৃক, উত্তরাধিকার সূত্রে যখন চিহ্নিত বাটোয়ারা করিয়া পাই তখন উহারা অনেক ছোট ছিল, পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তানুসারে তলস্থ ভূমি খুব বাড়াইয়া লইয়াছি, এবং অট্টালিকাটীরও সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছি। এই অট্টালিকাতে ছোট বড় অনেকগুলি কুঠরি আছে। যেটী সর্ব্বাংশে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেইটীতে আমি নিজে বাস করি, তাহার ঠিক উপরের ঘরেই একটী বিগ্রহ আছেন, তাহার সেবাবন্দোবস্ত উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে বলিব। অন্যান্য প্রকোষ্ঠ গুলিতে বিবেক, উৎসাহ, সাহস, স্বাবলম্বন, সত্য, সংযম, মিতাচার প্রভৃতি কতকগুলি পরমাত্মীয় এবং বুদ্ধি বাসনা আশা, অহিংসা, দয়া, সুমতি সুচিন্তা প্রভৃতি পরমাত্মীয়াগণকে স্থান দিতে হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই আমার শুভার্থী— সর্ব্বদাই আমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। আপদে বিপদে, সুখে সম্পদে তাঁহারাই আমার প্রধান সহায়। তাঁহাদিগকে লইয়া আমি সুখে স্বচ্ছন্দতায় বসবাস করি, কিন্তু এহেন সুখের সৌধও বিপদসঙ্কুল, সর্ব্বদা সতর্ক না থাকিলে পদে পদে বিপদ—শ্বাপদ জন্তুগণ, সর্পবৃশ্চিকাদি সরীসৃপ ও পিশাচেরা তাহাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে বিপন্ন করিবার জন্য সদা সুযোগ সন্ধান করে। মূষিক ঘরের দেওয়ালে গর্ত্ত খোলে, সর্প তাহাতে আশ্রয় লয়; পিশাচেরা বায়ুভরে গৃহ প্রবেশের চেষ্টায় থাকে।

৫। বাড়ী বাগান বেড় বাগিচা পুষ্করিণীর কথা বলা হইল। অতঃপর তাহাতে ফল শস্যাদির উৎপাদন ও ভোগ দখলের কথা একে একে বলিতেছি— জমি ও বাগান কদাপি ভাগ জোতে বা খাজনায় বিলি করা হইবে না, নিজ জোতে আবাদ করিতেই হইবে। আবাদ তিন প্রকারে হইতে পারে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ উপায়। আবাদের অবস্থা সম্বন্ধে অগ্রে কিছু বলা উচিত। মানবমনক্ষেত্র অতি উর্ব্বরা, ইহাতে যে কোন বীজ বপন কর, বপন মাত্রেই অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ-লতা-গুল্মৌষধি উৎপাদন করে, ফসলও ষোল আনা জন্মে, কিন্তু কৃষকের কৃষিজ্ঞান থাকা চাই, আর সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, তাপও আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু কখন তাহার অভাব নাই—এক প্রকার নয় ত্রিবিধ

তাপে ভূমি প্রায়ই সরস থাকিতে পায় না—সুজন্মার জন্য বারিপাতেরই সর্ব্বদা আবশ্যক, কেন না, সূর্য্যের তাপ কেবল দিনমানেই থাকে—প্রাতঃ ও সায়াহ্নে মৃদু এবং রাত্রিতে একবারেই থাকে না; কেবল মধ্যাহ্নেই খরতর হয়, ঋতু বিশেষে আবার তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু উপরি উক্ত ত্রিবিধ তাপ শীত গ্রীষ্ম, প্রাতঃ সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ও নিশীথ সকল সময়েই সমভাবে সকলেরই পীড়াদায়ক। সত্য বটে শান্তি সরোবরের বাগানের মাটী সহজে তপ্ত হইতে পায় না বলিয়া বৃক্ষলতাদি সহজে শুকায় না, কিন্তু কোমল প্রাণ ঔষধিগুলি অল্পেই ঝল্‌সাইয়া যায়, তাই প্রীতিরূপ সুবৃষ্টির সর্ব্বদা প্রয়োজন, আমরা হিন্দু, আমাদের দেশ ও ভূমি দেবমাতৃক, দেবতা প্রসন্ন না হইলে বৃষ্টি হয় না, প্রীতির সঞ্চারেও দেবপ্রাধান্য আছে, সেই দেবপ্রাধান্য পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি বই আর কিছুই নহে। তাহাই কি সকলের ভাগ্যে ঘটে—যাহাদের ভাগ্যে না ঘটে, তাহাদিগকে চেষ্টা ও যত্ন সহকারে শান্তি সরোবরের সলিল সেচন করিতে হয় তাহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাহাতেও যে প্রত্যবায় আছে পশ্চাৎ তাহার কথা বলিব।

৬। পূর্ব্বে বলিয়াছি ত্রিবিধ উপায়ে আবাদ হয়, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—ফসলও ত্রিবিধ—শস্য, কন্দ, এবং কন্দ জাতীয়। আমার এই উইলে আমি বলিতে চাই যে কর্ম্মের দ্বারা শস্য, জ্ঞান দ্বারা কন্দ ও ভক্তি দ্বারা ফল উৎপাদন হয়। সত্য বটে ত্রিবিধ আবাদের উৎপন্ন দ্রব্যকে ফল বা ফসল বলা যায়। তথাপি আবাদের বোধসৌকর্য্যার্থ আমি উহাই স্থির রাখিলাম। আমরা গৃহী,—আমাদের প্রথমোক্তবিধ ফসলউৎপাদনের অনুষ্ঠানই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন, কিন্তু কেবলমাত্র শস্যে পোষণ-সাধন হইলেও বিনা ব্যঞ্জনে কে কোথায় অন্ন প্রস্তুত করে, এজন্যই আমার বোধ হয়, কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির আবশ্যকতা হয়। নতুবা কেবলই চাউল চিবাইতে কি প্রবৃত্তি জন্মে। ফসল আবাদজন্য "অধ্যবসায়কে" কৃষাণ এবং "বিবেককে" মালীর কাজে নিযুক্ত করিলেই ভাল হয়। কৃষাণের শ্রম এবং মালীর বিবেচনা ইহাতেই আবাদের কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহারা পতিত জমিতেও পুরা ফসল জন্মাইতে সক্ষম। আর নিজের চেষ্টা যত্ন ও শ্রমতো চাই চাই। না থাকিলে, তাহারা খাটিবে কেন।

৭। বহুকষ্টে আবাদ হইলেও ঈতি ভয় আছে। তাহাতে সুজন্মা হইলেও ফসল থাকিতে পায় না, নষ্ট হইয়া যায়। এই ঈতি কামক্রোধাদি

রিপুকুল, ইহারা ফসলের ঘোর শত্রু—অঙ্কুর খাইয়া ফেলে, মূল কাটিয়া দেয়, আর বহুবিধ ক্ষতি করে। বিবেক ও অধ্যবসায় উভয়েই ইহাদের প্রতীকারে সমর্থ।

৮। আর একটী অভ্যপাতের কথা বলিব—সেটী চাষের জমিতে আগাছার উদ্ভব, আগাছাও নানা জাতীয়—তাহাদের অনেকেরই দৃশ্য বড়ই নয়ন মনোরঞ্জন—পত্র পুষ্প ফল দেখিলে শস্যজননী ওষধি অপেক্ষা আদর যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, আগ্রহ জন্মে, মনে হয় উহাদের ফলে অমরত্বই বা আছে। বাহ্য সৌন্দর্য্য এতই মনোমদ—কিন্তু তাহারা যে জাতীয় ফসলের সঙ্গে জন্মিবে, অধিকন্তু শস্য জাতীয়েরই সহিত জন্মিয়া থাকে, জন্মিলে মৃত্তিকার সমস্ত রস আপনারাই শোষণ করিয়া তাহাদিগকে শুষ্ক শীর্ণ ও বিবর্ণ করিয়া তুলে, বাড়িতে দেয় না, শেষে একবারেই শুকাইয়া ফেলে। পূর্ব্বে যে মালীর কথা বলিয়াছি সে তাহাদিগকে অঙ্কুরেই চিনিয়া লইয়া অঙ্কুরেই উৎপাটিত করিয়া দেয়। ঐ সকল আগাছা পানদোষ, কুমতি, কপটতা, বারবিলাসিতা প্রভৃতি।

৯। উৎপন্ন ফসল ভোগদখল করিবার পক্ষে কামনাশূন্য হইতে হইবে। অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে যে আমার পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছি; তিনি রত্নালঙ্কার ভূষিত হিরণ্ময় বপু, রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, মস্তকে কিরীট, করচতুষ্টয়ে হীরকবলয়, গলে বনমালা, পরিধানে পীতাম্বর, বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ, কর্ণে কুণ্ডল, শ্রীপাদপদ্মমূলে মণিময় সুবর্ণনূপুর। জগদ্ব্রহ্মাণ্ডেও তাঁহার বিশ্বরূপের বিস্তৃতির কুলান হয় না, এই অনন্ত বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট। কিন্তু আমাদের মানস মন্দিরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে তাঁহার সেই বিশ্বময়ী মূর্ত্তির স্থান সংকুলান ক্ষমতাও সম্ভবাতীত বলিয়া সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। যে হিসাবে পাঁচ ছয় ফিট উচ্চ মানবমূর্ত্তির বা তাহার শত গুণ উচ্চ মনুমেণ্ট বা পাহাড় পর্ব্বতের ছায়াচিত্র অর্দ্ধহস্ত পরিমিত কাচখণ্ডে লইতে পারা যায়, তাহাতে সেই নরদেহের চক্ষু কর্ণ নাসা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ ও চিহ্নাদি বিদ্যমান থাকে—মনুমেণ্টের দ্বার, উপরের রেলিং সমস্তই থাকে, পাহাড় ও পর্ব্বত গাত্রের বন্ধুর স্থানে গুহা ছিদ্র সমস্তই প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত থাকে, প্রয়োজনমত সেই সকল চিত্রকে তাহাদের প্রকৃত আকারে বাড়াইয়া লইতে পারা যায় বা বৃহদ্দর্শী (Magnifying) কাচখণ্ড দ্বারা দেখিলে তাহাদের সমস্তই সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়, ঐ বিগ্রহ মূর্ত্তিও সেই রূপ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন শুদ্ধান্তঃকরণে সংযত মনে তদ্গত

চিত্তে মানস ক্ষেত্রের যাবতীয় উৎপন্ন ফসলে নৈবেদ্য রচনা করিয়া তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়, চাষের ফসলে কোনমতেই আপনার ফলভোগ কামনা করা হইবে না। এইরূপে উৎসর্গ করিয়া দিবার সময় একাগ্র চিত্তে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তাঁহাতে মন বুদ্ধি স্থিরতর করিয়া বলিবে "হে জগন্নিবসে! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ মনের মন—তুমি আমার মনোমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আসীন থাকিয়া আমাকে যেরূপে নিযুক্ত কর যাহা করাও আমি তাহাই করিয়া থাকি, তুমি আমার সর্ব্বে সর্ব্বা--তোমার তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট—তুমি আমার যাহা কর তাহাই হয়, যাহা না কর তাহা হয় না, যাহা কর তাহা ভালর জন্যই কর—ভাল বই মন্দ কখন কর না, যদি কখন আমি তাহার রহস্যভেদ করিতে না পারি, আমাকে মার্জ্জনা করিবে। আমি সর্ব্বদাই মোহাচ্ছন্ন, আমায় মোহজাল-মুক্ত কর। তুমি আমার জীবন, মরণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই, ইহ সং ারে আমি উপলক্ষ মাত্র—তুমিই কর্ত্তা"। এইরূপে স্তব করিতে করিতে শান্তি সরোবরের মোহানা ছুটিয়া আপনা হইতে শান্তি-বারিতে মানস-ক্ষেত্র ভাসিয়া যায়, শান্তিজল সেচন করিবার প্রয়োজন হয় না। ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি হয়। এইরূপে উপাসনা করিতে করিতে মনোমন্দিরের প্রকোষ্ঠটী ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে থাকে। যতই উহা প্রসার প্রাপ্ত হয়, ততই বিগ্রহ মূর্ত্তিও বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন আর সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি মনে স্থান পায় না চিন্তা করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এখন বুঝিয়া লও যে মানস ক্ষেত্র নিষ্কর নহে, মৌরস মোকররী স্বত্ববিশিষ্ট—হিন্দুরাজাদের আমলে উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশ, মুসলমানদিগের আমলে চতুর্থাংশ রাজস্ব ছিল, কিন্তু এই মোকররী বন্দোবস্ত উৎপন্ন ফসলের সমস্তই রাজার, চাষীর অংশ কিছুই নাই। তবে ফলাইতে পারিলে লাভ চতুর্ব্বর্গ। আর কি চাই। ফসল পূরা যত দিন না হয় ততদিন কিছুই তাহার নহে। উপরে দেবসেবার ও ফসল ভোগের যেরূপ ব্যবস্থা করিলাম আমার পুত্রেরা তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না।

১০। ধনী কেন আজি কালি অনেক গৃহস্থ লোকেও কোম্পানীর কাগজ রেলওয়ে শেয়ার, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার ও অন্যান্যবিধ পলিশি কিনিয়া থাকেন, আমার সে সকলের কিছুই নাই যে পুত্র দুইটিকে দিয়া যাই, পলিশির মধ্যে আছে সততা—তাহাই ভোগ করিতে পাইলে ভাবনা থাকিবে না, সকল কষ্ট দূর হইবে।

১১। উইলে আর অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির কি উল্লেখ করিব, সকলই তাহারা অবগত আছে, তবে পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে চিলের উঠিবার বাম দিকের ঘরে লোহার সিন্দুক মধ্যে নিম্নোক্ত নয়টী বহুমূল্য রত্ন অতি যত্ন সহকারে মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি; কতক গুলি ব্যবহার করিতে পারি নাই বা ব্যবহার করিবার সুবিধা পাই নাই, বহু কষ্টে সংগ্রহ মাত্র করিয়াছি। তাহাদের সকল গুলিতেই আমার পুত্র দুইটীর তুল্য স্বত্ব রহিল। তাহারা পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি জ্ঞানে আদর যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে আমি সার্থক হইব।

ক। সুযোগ পাইলেই পরোপকার করিবে, কিন্তু কখন কোন মতে প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা রাখিবে না।

খ। কদাচ শত্রু সৃষ্টি করিবে না, সত্য বটে কখন কখন শত্রু স্বতঃ সম্ভব হয়, সেরূপ স্থলে আত্মরক্ষায় সতর্ক হইবে, কিন্তু তাহাকে তাহা জানিতে দেওয়া হইবে না।

গ। অভাবে স্বভাব নষ্ট হইতে না পায়। পরধনে লোষ্ট্র জ্ঞান থাকিবে।

ঘ। কদাচ স্বার্থের সহিত সত্যের বিনিময় করিবে না। প্রাণপণে সত্যের সম্মান ও সমাদর রক্ষা করিবে।

ঙ। উপার্জ্জন যত অল্প হউক তাহাকে তদপেক্ষা অল্প মনে করিয়া সঞ্চয় করিবে, কদাচ সঙ্গতিহীন হইবে না।

চ। ভ্রাতার তুল্য বন্ধু নাই, ভ্রাতৃভাবের মূল্য নাই—ইহা অতি মহৎ বলিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবেরই আশ্রিত, মনুষ্য হইয়া ইহাতে যাহার অনাস্থা জন্মে তাহাকে মনুষ্যেতর জ্ঞানে আপন মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবে, ভাইকে আপনা হইতে অভিন্ন বোধ করিবে।

ছ। যেমন কুলাইবে তেমনি খরচ করিবে। কখন ধার করিবে না, বা ধার দিবেনা।

জ। অপরকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে যাহাতে আপনাকে বিশ্বাস করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। আত্মবিশ্বাস না জন্মিলে পরকে বিশ্বাস করিবে না। সকলের মন আপনার মনের মত এরূপ বিশ্বাস করিবে না, এজন্য অপরকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবে।

ঝ। সদা সত্যকে আশ্রয় করিবে—সত্য মিথ্যা বুঝিতে না পারিলে বিবেকের আশ্রয় লইবে।

১২। এখনও আমার আসবাব পত্র বা বিলাসদ্রব্য সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, অতঃপর তাহাই করিতেছি। স্ত্রীলোকের সীমন্তে সিন্দূর এবং হস্তে লৌহকঙ্কন যেমন সাধব্য সূচক, আজি কালি ঘড়ী ও চেন তদ্রূপ পুরুষের অবস্থাজ্ঞাপক। আমার এসকলের কিছুই নাই, তবে কাজ আটকায় না—আমার সময় জানিবার জন্য দিনে সূর্য্য ও রাত্রিকালে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তাহাতে আমি যেমন ঠিক সময় জানিতে পারি রাদারহামেও তাহা জানাইতে হারি মানে। ঘড়ী আটকাইয়া রাখিবার জন্যই চেন, আমি যে ঘড়ীর কথা বলিলাম তাহা ঈশ্বরের নিয়মরূপ শৃঙ্খলে ঝুলান আছে।

১৩। অস্‌লারের ঝাড লণ্ঠন আমি কখন ব্যবহার করি নাই, পূজা পার্ব্বণেই আলোকোৎসবের প্রয়োজন হয়, আর বিদেশে বড় মানুষদের চক্ষে বাতির আলোক ভিন্ন অন্য আলোক ঠাণ্ডা লাগে না, তাই তাঁহারা তাহা ব্যবহার করেন। আমরা হিন্দু পৌর্ণমাসীকে প্রধান জ্ঞান করি, সেইদিন রাত্রিতে আকাশে চন্দ্রমা সমস্ত রাত্রি সুস্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তার করিয়া অমৃত ধারা সিঞ্চন করে। বড়মানুষের মজলিশের আলোক আমাদের উহা অপেক্ষা কখন ভাল লাগে নাই বলিয়া—আমি ঐ রোসনাইই ভালবাসি। আমার পুত্রেরাও যেন আলোকোৎসবের জন্য বৃথা অর্থব্যয় না করে, চাঁদনি রাত্রি দেখিয়াই যেন পুত্রকন্যার বিবাহের দিন স্থির করে।

১৪। তুরস্ক দেশজ কার্পেট পাতিয়া আমি প্রায় বসি নাই—কখন বাড়ীর বাহিরে বসিতে হইলে আমি শস্পাবৃত ভূখণ্ডে বসিতেই বড় ভাল বাসি। কার্পেটের সৌন্দর্য্য মলিন হয়, কার্পেট পোকায় কাটে, আমার আসন কখন মলিন হয় না, কাদা লাগিলে ঝাড়িয়া ফেলিলেই চলে, যদি পশুতে খায় এক রাত্রিতেই গজাইয়া ঠিক হয়। আমার পুত্রেরা উহাকেই যেন সখের আসন গণ্য করিয়া সময়ে সময়ে তাহাতে বসিয়া তৃপ্তি লাভ করে, আর তাহাদের জামাতৃগণ বাড়ীতে আসিলে অন্ততঃ একদিনও আদর করিয়া তাহাতে বসায়।

১৫। টানাপাখার হাওয়া খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। গ্রীষ্ম প্রশমনার্থেই উহার প্রয়োজন, কিন্তু যখনই গ্রীষ্মের দুঃসহতাতিশয্য অনুভূত হয়, তখনই সুখস্পর্শ সমীরণ আমার শরীর শীতল করে, তাহাতে আমার গ্রীষ্মাতিশয্য যেমন নিবারণ হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না।

১৬। বড় মানুষরা পয়সা খরচ করিয়া কুস্তিগীরের কুস্তি দেখেন, মনে আনন্দ লাভ করেন, আমার যখনই কুস্তি দেখিয়া চিত্ত বিনোদন করিবার

প্রয়োজন হয় আমি তখনই বাড়ীর বাহির হইয়া দেখি শাখামৃগগণ যে কুস্তি করিতে থাকে তাহার মত কুস্তি কেহ কখন দেখে নাই। তাহারা যেমন বৃক্ষের সূক্ষ্ম-শাখায় খেলা করিতে পারে মানুষে তেমন পারে না।

১৭। রাফেলের ছবি কখন দেখি নাই, রবি বর্ম্মার ছবি টাকা দিয়া কিনিতে ইচ্ছা হয় না, বহুক্ষণ একদৃশ্য দেখিয়া নয়নের ক্লান্তি জন্মিলে আমি মাঠে, নদীতীরে বা বনের ভিতর গিয়া প্রকৃতির পটে বিশ্বশিল্পীর অঙ্কিত যে চিত্র দেখি তাহার কাছে রাফেল বা রবি-বর্ম্মার চিত্র কৌশল কি করিবে। আর মনুষ্য-চিত্র দেখিয়া চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন হইলে অন্তঃপুর ও গৃহস্থলী মধ্যে যে সকল বিকচকমলের ন্যায় প্রফুল্লতাময় পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র-পুত্রীগণের ছবি নিরন্তর দেখি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রীতিকর চিত্র আর কি হইতে পারে!

১৮। টাকা দিয়া কখন ফ্লুট হারমোনিয়ম ক্রয় করি নাই, অথচ তাহাদের অপেক্ষা সুস্বর লহরীতে চিরদিন শ্রুতি রঞ্জন করিয়া আসিয়াছি—অরুণোদয় ও অরুণাস্ত কালে যখন প্রকৃতির প্রসন্নতাময়ী মূর্ত্তি মনকে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরিপ্লুত করে সেই সেই সময়ে এবং কৌমুদীময়ী শুক্ল যামিনীর মধ্য ভাগে নানা জাতীয় বিহঙ্গমরবে যে শ্রুতি সুখের সঞ্চার হয় তাহা কি সংসারের আর কোন সুমিষ্ট স্বরের সহিত তুলনার যোগ্য। এই সকল প্রাকৃতিক বৈভবে মানব পুরুষানুক্রমে বৈভবান্বিত, পৈতৃক বিভব সুখে যাহার মন সুখী হয় না, তাহার মনুষ্য জন্মই বিফল।

১৯। আমি এই উইলে আমার যে সকল সম্পত্তির উল্লেখ করিলাম তাহা আমার পুত্র দুইটিকে তুল্যাংশে ভোগ দখল করিবার অধিকার দেওয়া হইলেও বিভাজ্যতা দোষে দূষিত নহে। শতধা বিভক্ত হইলেও উহা সমষ্টির তুল্য। আমি যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লাভ করি তখন উহা চতুর্থ বিভক্ত হইয়াও বিভাগান্তে দেখি ষোল আনায় পূর্ণ।

২০। উইলের লিখিত সম্পত্তি উইল কর্ত্তার পরলোকান্তে উইল গৃহীতা-গণের দখলে আসিয়া থাকে, এবং উইল ও প্রোবেটের পর বলবৎ হয়, কিন্তু আমার এই অপূর্ব্ব উইলের অপূর্ব্ব সম্পত্তির প্রায় সকল গুলিই আমার পুত্রগণের ভোগাধিকারে আসিয়াছে, আমার কর্তৃত্বাধীনে তাহারা বিষয় কার্য্য দেখিতেছে, শিখিতেছে, তবে যে উইলনামা লিখিত করা তাহা কেবল তাহাদিগকে যদৃচ্ছাচারী হইতে না দিবার জন্য।

২১। আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্ঞানানন্দকে এই উইলের এগজীকিউটার নিযুক্ত করিলাম। আমার পুত্র দুইটি উপরিউক্ত সমস্ত সর্ত্ত অবগত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকটী পালন করিবার পক্ষে ত্রুটি না করে—এবং দৈবের কথা বলা যায় না, আমার কনিষ্ঠ পুত্রের নাবালকবস্থায় যদি আমার দেহান্তর ঘটে তাহা হইলে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার প্রতি জ্যেষ্ঠের যাবতীয় কর্ত্তব্যতা পালন করিয়া সে সাবালক হইলে তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দেয়, এবং কন্যা দুইটীর বিবাহ যদি আমি দিয়া যাইতে পারি ভালই নতুবা সে পক্ষে পুত্র দুইটীতেই আপনাপন কর্ত্তব্যতা সম্পাদন করিবে। আরও আমার ইচ্ছা যে আমার অন্যান্য বংশধরগণও ইহার কোন সর্ত্ত লঙ্ঘন না করে।

২২। এই উইলের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া যদি কেহ তাহার ফলভাগী হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহ কখন তাহাতে কোন প্রকারে দাবি দাওয়া করিতে পারিবে না, করিলে তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে।

আমি সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিনা অনুরোধে এই উইল করিলাম। ইহাই আমার শেষ উইল।

(সাঃ) শ্রীজীবানন্দ চক্রবর্ত্তী।

মায়া।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিদারের অন্তঃপুর।

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হত-পাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন॥

কেহ সেই মহাত্মার পা টিপিয়াছিলেন, আর নিষ্পাপ আর এক জন তাঁহাকে পাখা দ্বারা আস্তে আস্তে বাতাস করিয়াছিলেন।

নরেশ বাবুর স্ত্রীর নাম হীরামণি। হীরামণি পরম সুন্দরী, কথঞ্চিৎ কৃশা, গৌরাঙ্গী, আয়তলোচনা, রসরসিতাধরা। কিন্তু কুসুমে কীট। তিনি নিত্যই

অসুস্থ, অন্ততঃ তিনি নিজে এই কথা প্রচার করেন। সুতরাং সেই বরাঙ্গনার আলস্ত-জড়িত কুসুম-কোমল দেহ দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় দিবারাত্র লুণ্ঠিত হইত। অদ্য এক জন দাসী তাঁহার পদসেবা করিতেছে, আর এক জন ব্যজন সঞ্চালন করিতেছে, আর এক জন দুনিয়ার লোকের কুৎসা কীর্ত্তন করিতেছে। পরের কুৎসা শুনিতে হীরামণির বড় সাধ। এমন কি, যখন তিনি কুৎসারূপ সরস উপাদেয় খাদ্য কর্ণদ্বয় দ্বারা গ্রাস করেন, তাহার মনে এক অপূর্ব্ব হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার জীবন্মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়, এবং নিজের অসুস্থতার কথা ভুলিয়া গিয়া প্রাণ ভরিয়া হাস্য করেন। যে দিনকার কথা বলিতেছি, সে দিন অনেকের সুনামের শ্রাদ্ধ করিয়া কুৎসাকীর্ত্তনী দাসী হীরামণিকে বলিল "মা শুনেছ, একটা ভারী মজার কথা ?"

হীরামণি। কি ?

দাসী। তোমার কাছে শীঘ্র একটী সতী সাধ্বী বৌ আসিবে।

হীরামণি। কেন ?

দাসী। সে নিজেই বলিবে।

হীরামণি। ওলো, লোকটা কে ?

দাসী। কে জানে। তার নামটী ভাল—মনে হচ্ছে না—সৌদামিনী না কুমুদিনী।

হীরামণি। কার বৌ ?

দাসী। ময়েশ, না পায়েস, তারই বৌ।

হীরামণি। (হাসিয়া) যদি পায়সের বৌ হয়, তা হইলে সেও মিষ্টি ?

দাসী। কেমন মিষ্টি, তা না কি তোমাদের নায়েব নটবর বেশ জানে। কিন্তু,

নাকি খেতে খেতে মিষ্টি।
তার পিটে পড়েছিল যষ্টি॥

হীরামণি। (হাস্য) বেশ, বেশ। কিন্তু সব কথা ভেঙ্গে ভাল করিয়া বল্।

দাসী। তুমি ত সব শুনেছ।

হীরামণি। আমি ত শুনেছি ঐ মাগীর স্বামী ভারি বজ্জাত। সেই ড্যাকরা প্রজাবিদ্রোহের গোড়া। তাহাকে শাসন করিবার জন্য নটবর নায়েব তার বৌকে গুমি করিয়াছিল, প্রজারা বৌটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

দাসী। ভিতরের কথা বুঝি শুননি ?

হীরামণি। বল্ না লো।

দাসী। গোড়া থেকে ?

হীরামণি। যেখান থেকে মিষ্টি সেখান থেকে সুরু কর্।

দাসী। এক দিন সেই গ্রামে পদ্মা নদীর ধারে তোমার নটবর—

হীরামণি। মর্। আমার নটবর কেন ?

দাসী। তোমার নায়েব নটবর—

হীরামণি। তাই বল্।

দাসী। তাই ত বল্‌ছি। —নটবর পদ্মা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছিল।

হীরামণি। নটবর ত যমুনার তীরে বাঁশী বাজাইতেন। পদ্মার তীরে কেন ?

দাসী। যমুনা, পদ্মা, গঙ্গা—সকল নদীর ধারেই আমাদের সেই পুরাতন রসিকশেখর কৃষ্ণ ঠাকুরকে পাওয়া যায়। আর সকল গ্রামেই ব্রজগোপী পাওয়া যায়। আহা ব্রজগোপীর সাধনা কেমন মিষ্টি। মা ঠাকুরণ্! না ?

হীরামণি। তার পর কি হইল বল্। ধান ভান্‌তে শিবের গীত—

দাসী। অত ব্যস্ত হয়ো না। বল্‌ছি—তার পর, হাঁ, মোহন বাঁশী বাজাচ্ছে। এমন সময়ে বৌটা কলসী কাঁকে,—হাত দোলাতে দোলাতে, উঠ্‌তি বয়সের রূপ ছড়াতে ছড়াতে, ঘাটে নামিল। এদিকে নটবর বাঁশী খুব সুর তুলে বাজাতে লাগ্‌লো—" ও বৌ—ও বৌ—বৌ—ফোঁ ফোঁ—" (হীরামণির হাস্য) যেমন এক দিন কালিন্দী-কুলে, কৃষ্ণঠাকুর মোহন বাঁশী বাজিয়েছিলেন—"রাধা—রাধা—ধা—ধা—ধা—"

হীরামণি। সাবাস লো, সাবাস, তারপর ?

দাসী। নিপট্টে, চাসার মেয়ে, ব্রজগোপী ত নয়—রাধার মত অত সেয়ানাও নয়। বাঁশীর ইসারা বুঝ্‌লো না। তখন নায়েব মহাশয় বাঁশী ছেড়ে একটা গান ধরে দিলেন।

হীরামণি। একটা গান ধরে দিল ? গানটা বল্ না।

দাসী। আমি কি নিজে সে গানটা শুনেছিলাম তাই বল্‌ব ?

হীরামণি। এত কথা শুন্‌লি, আর গানটা শুনিস্ নি ?

দাসী। তবে বলি—

" এখন ও এল না সই—

হীরামণি। গান করে বল্ না লো।

দাসী। তবে কি নটবর সাজ্‌তে হবে নাকি?

হীরামণি। ভালই ত, এক বার ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে, খোপাটা চুড়া করে বেঁধে, বাঁশী হাতে করে, দাঁড়া দেখি।

রসময়ী। না, না, ছি!

রামী ও শ্যামী ঝী খুব হাসিয়া বলিল, "রসময়ী! এক বার দাঁড়া না।"

রসময়ী। আমি থিয়েটারের মেয়ে নাকি?

হীরামণি। তা না হলি, এক বার নকল কর্ না, তুই দিব্যি নকল কর্‌তে পারিস্।

রসময়ী ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া এক খানি পাখা বাঁশীর মত ধরিয়া, অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া বলিল—হয়েছ ত এখন?

হীরামণি। বাহবা! বাহবা! এখন গানটা গা।

দাসী। না না বাবু এসে পড়্‌বেন।

হীরামণি। মিহি সুরে গা—শ্যামী তুই একটু বাহিরের দিকে গিয়ে দাঁড়া। বাবু আসেন যদি সাড়া দিস্ (শ্যামী চলিল) এখন গান কর।

রসময়ী নটবর সাজিয়া, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, ভ্রমর গুঞ্জনে গান করিতে লাগিল।

গান।

এখনও এলো না সে, সই লো সই।
ধৈরয ধরিতে নারি সই লো সই॥
সেই কাল শশী, বড় ভাল বাসি,
প্রাণে প্রাণে মিশি', সই লো সই॥
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
বাজাইয়া বাঁশী, সই লো সই,
হরিল পরাণ—গেল কুল মান,
তারে ত্বরা আন, সই লো সই,
মধু নিধুবনে, তাঁহার চরণে,
ঢালিব পরাণে, সই লো সই॥

রসময়ী খুব ভাল গান করিতে পারিত, তার গলা বড় মিষ্ট। সে অঙ্গ অঙ্গ হুলিয়া হুলিয়া, চোখ ঢুলু ঢুলু করিয়া, মৃদু মন্দ ইন্দ্রিয়াসক্তির ঢেউ তুলিয়া

কলকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল। হীরামণি ও তাহার দুই স্ত্রী "রাধাভাবে"র বিশুদ্ধতা বিস্মৃত হইয়া (পশু ভাবেই) মদালসা হইল।

হীরামণি। বেশ, বেশ, "সই লো সই—মধু নিধুবনে, তাহার চরণে, ঢালিব পরাণে সই লো সই" ঐ খানটা বড় ভাল।

খামী। কিন্তু গানটা রাধার—কৃষ্ণ বা নটবরের মুখে ভাল লাগে না।

রসময়ী। তুই ত ভারি বুজিস্।

হীরামণি। গানটা শুনে বৌ কি করিল ?

রসময়ী। কি আর কর্ব্বে। গানটা শুনে, তার মনটা একবারে গলে গিয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিসে গেল। তার পর চারি চক্ষু এক—যেই চোখোচোখি হলো, বৌটা ভেব্বুড়ে কেঁদে উঠিল।

হীরামণি। কাঁদিল কেন ?

দাসী। ওটা কাচ—অর্থাৎ আমি খুব ভাল—আমাকে ও রকম ইসারা করায় আমার বড় অপমান হয়েছে।

হীরামণি। বিটি ত খুব চাতুরী জানে। (পাঠক দেখিতেছেন—মন্দ লোকের কল্পনা কি রূপে ভাল লোকের কুৎসা সৃজন করে—আর আবিল চিত্ত সেই কুৎসা কি আগ্রহের সহিত পান করে)।

দাসী। তার পর, সেই গাঁয়ে একটা নামজাদা পুরাণ পাপী, বিসি নামে একটা ঘট্‌কী আছে। তাকে ঐ বৌটার কাছে নায়েব পাঠিয়ে দিল। কিন্তু বৌটা নাকি প্রথমে রেগে কাঁই হলো।

[পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, পাপিষ্ঠা বিসি—সতী কুমুদিনীর নিকট পাপ-প্রস্তাব করিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু কুমুদিনীর পবিত্রতাতে পাপিষ্ঠার মন এমনি পরাভূত হইয়াছিল যে, সে নায়েবের ঘৃণ্য কথা প্রস্তাব করিতে আদৌ সাহস করে নাই।]

হীরামণি। কেন ?

দাসী। বুঝ্‌ছো না ? গহনা ও টাকা নেবার ফিকির। নায়েব মশায় খুব বুঝমান্ লোক কিনা। চট ক'রে বুঝে ফেল্‌লো। নায়েব মশাত টাকার কাঁড়ি। তখনই একখানি ডায়মন কাটা চক্‌চকে সোণার চিক পাঠিয়ে দিল, আর নগদ ৪০৲ টাকা। গরিবের বৌ গহনা আর টাকা পেলে কতক্ষণ ঠিক থাক্‌তে পারে ? (বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিয়াছেন যে এই কথা গুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রসময়ীর সৃষ্টি)।

হীরামণি। তা বটেইত, তার পর ?

দাসী। তার পর বিসি আসে যায়—বৌকে লুকিয়ে লুকিয়ে নটবরের কুঞ্জে নিয়ে যায়। (পাঠকের বোধ করি মনে আছে, যে কুমুদিনী নিজে যায় নাই, নায়েবের লাঠিয়ালগণ বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া গিয়াছিল)।

হীরামণি। তখন তাহার পোড়ামুখো স্বামীটা কোথায় ?

দাসী। জেলে! তাতেইত নায়েব মশায়ের খুব সুবিধা হইছিল।

হীরামণি। তার পর ?

দাসী। তারপর, মাঠাকুরুণ. একরাত্রি নটবরের বাগান বাড়ীতে যখন দুই জনেই মত্ত—(পাঠকের মনে আছে বোধ করি যে কুমুদিনী বীরাঙ্গনার ন্যায় আপনার সতীত্ব রক্ষা করিতেছিল, এবং নায়েবের উদরে সজোরে পদাঘাত করিয়াছিল)—তখন প্রজারা মুগুড় দিয়া ধমাস করে দুয়োর ভেঙ্গে ফেলিল—নায়েব লাফিয়ে দুয়ারে দাঁড়াল—অমনি মিন্সেরা ধপাধপ লাঠি—নায়েবের পিঠের উপর।

হীরামণি। কি রে? আমাদের নায়েব, তার পিঠে লাঠি! প্রজাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা ? আজগেই বাবুকে বলিব, সব প্রজাদের ঘর জালিয়ে দেং, ভিটেতে লাঙ্গল চস্‌বে। বাবু তাদের মুণ্ড নিয়ে ভেঁটা খেলা করবে, তা তারা জানেনা বুঝি ?

দাসী। তাত সত্যিই, প্রজারা কি আর কেউ প্রাণে বেঁচে থাক্‌বে? কথায় বলে—

পিপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাক চিল আর ফিংয়ে ধরে খায় তারে॥

হীরামণি। তার পর ?

দাসী। তার পর, যখন নায়েবকে ঐ রকম লাঠি চড় কিল দিতে লাগ্‌লো—ছুঁড়ীটে বলে কি না,—"নায়েব মশায় আমার প্রাণ, বরঞ্চ আমাকে খুন করো, তবু ওঁকো মেরো না"। চাসার মরদ তাকি আর শুনে। তারা নায়েবের গলায় দড়ি বেঁধে হাস্তাং নাস্তাং কর্ত্তে কর্ত্তে নিয়ে গেল।

হীরামণি। বৌটা তখন কি করিল ?

দাসী। বৌটা পিছে পিছে যেতে লাগল আর চেঁচিয়ে বলতে লাগ্‌লো—"ওগো আমি নায়েব মশায়কে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্ব না—ও—মা—গো—মা—ওগো আমার কি হলো গো—মা"।

হীরামণি। বলিস্ কি ? বিটিত ভারি বেহায়া !

দাসী। বেহায়া নয় ? কলিকালের মেয়ে, বয়সকাল, গরিবের বৌ। টাকা পেলেই অজ্ঞান। জানইত।

হীরামণি। সব চাসার বৌ—সব গরিবের বৌ কি টাকা পেলেই বশ হয় ?

দাসী। নয় ? ধর্ম্ম বল, সতীত্বল, সবই বড় মানুষদের সাজে। সতীত্বটা বড় মানুষদের একচেটে। গরিবের কি আর ধর্ম্ম আছে, না ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে ?

হীরামণি। তুই ত গরিব। তবে তোরও ধর্ম্ম নাই ? তুইও টাকার বশ ?

দাসী—টাকারত বশ। রূপ যে নেই। টাকা দেবে কে ?

হীরামণি। ওলো আর চালাকি করিস নে। তার পর।

দাসী। তার পর, বৌটা "নায়েব মহাশয়, নায়েব মহাশয়" বলে বেজায় কান্‌তে লাগলো। এক জন চাসা, তা দেখে রেগে গেল, বলিল—"চাষার ঘরের বৌ, এত বেহায়া" এই বলেই তার মাথার এক লাঠি। লাঠিতে মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়্‌ছে লাগ্‌লো, বিটি মুখ থুবড়ে মাটীতে পলো।

হীরামণি। আচ্ছা হয়েছে। বিটীর স্বামী আবার জমিদারের সঙ্গে লড়্‌তে গিইছিল, তার পর ?

দাসী। তার পর, বিটি ত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো। চাষারা নায়েবকে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে গেল। এমন সময় এক বাবাজি প্রিং প্রিং কর্ত্তে কর্ত্তে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হীরামণি। নারদ মুনি নাকি ?

দাসী। নারদ নয়—বিশ্বমিত্তির।

হীরামণি। বিশ্বামিত্র কেন ?

দাসী। সম্মুখে ম্যান্‌কা (মেনকা) বিদ্যাধরী।

হীরামণি। তার পর কি হ'ল ?

দাসী। বাবাজিরা নিরিবিলিতে মেয়ে মানুষ দেখ্‌লেই অজ্ঞান। তার সাক্ষী বুড়ো পরাশর, একটু মেছুনী নিয়ে কি ঢলানিই ঢলিয়েছিল ! তাঁরা হলেন গেয়ানী। আর আমরা অবলা, মূর্খ যদি এক পা ভুল করে ফেলি, অমনি সর্ব্বনাশ, আর রক্ষা নাই, অমনি বিস্তর শাস্তরের কথা উঠে, অমনি আমাদের পোড়াবার জন্য নরকের আগুন ধু ধু করে জ্বলে উঠে, নরকে কড়ার তপ্ত ঘিতে কলঙ্কিনী ভাজা হয় তাও শুনতে পাই—

হীরামণি। ওলো ও সব কথা থাক্। রসের কথা বল্।

দাসী। বাবাজি বৌটাকে দেখেই এলে মেলো—(এ সব কথা মিথ্যা। ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীরাই কুমুদিনীকে উদ্ধার করিয়া কামুক-কালসর্প দংশন হইতে কৃষকবধূকে রক্ষা করিয়াছিলেন)

হীরামণি। আবল্ তাবল্ বক্‌তে লাগিল ?

দাসী। তা কেন ? সন্ন্যাসী ঠাকুর—একতারা না ফেলে—মহাদেব যে ভাবে মরা সতী দেহ কাঁধে ফেলিয়াছিলেন—সেই রকম একটা ঢং করে বৌটাকে কাঁধে ফেলে সটান দৌড়্—দৌড়্—দৌড়্—দৌড়্। এক লম্বা দৌড়ে এক খানি দিব্বি বজরায় বৌটাকে নিয়ে উঠলো। দিন কতক তাকে নিয়ে বজরায় ঘুরিল*। ইতি মধ্যে এক দিন ফিস্ ফিস্ করে বৌটার কাণে কাণে মন্ত্র দিয়ে তাকে শিষ্যি ক'রে ফেলিল। কি রকম শিষ্যি তাহা ভগবান জানেন। তখন বৌটা বলে "তুমি সন্ন্যাসী আমি তোমার সন্ন্যাসিনী হব। তুমি যখন ভিক্ষে করতে যাও, তখন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব"—বাবাজি পলেন মহাফাঁদে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেয়ে মানুষ দেখ্‌লে কি লোকে ভিক্ষে দেয় ?

হীরামণি। বাবাজী সন্ন্যাসিনীকে বুঝিয়ে, এক কুঁড়েতে লুকিয়ে রেখে দিলেন ?

দাসী। না, তা নয়, সন্ন্যাসী ঠাকুর এক ফিকির করিলেন। ফকিরের ফিকির কে বুঝিতে পারে ? কাছে প্রবোধ বাবুর নায়েবের কাছারী, সেখানে তাকে রেখে এল।

হীরামণি। কি বলিয়া ?

দাসী। এই স্ত্রীলোকটী বড়ই বিপদে পড়েছিল, নামজাদা বদমায়েস নায়েব নটবর ইহার উপর অত্যাচার কর্ত্তে গিইছিল। আমরা সন্ন্যাসী তা জান্‌তে পেরে এর ধর্ম্ম রক্ষা করেছি। এর স্বামী বিদ্রোহী প্রজাদের দলপতি, তাই নায়েবের এর উপর বিশেষ রাগ। আপনার কাছে একে দিয়ে গেলাম যাহা ভাল বুঝেন কর্বেন।

হীরামণি। ঐ নায়েবের নাম কি ?

দাসী। শিবনাথ।

হীরামণি। লোক কেমন ?

---

* সত্য কথা এই যে কুমুদিনীকে একটা সন্ন্যাসিনীর হস্তে দিয়া এক খানি নৌকা করিয়া এক জন সন্ন্যাসী তাহাকে প্রবোধ বাবুর নায়েবের পরিবারের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

দাসী। ভক্ত বিটেল—ঠিক প্রবোধ বাবুর মত। (মিথ্যা)

হীরামণি। শিবনাথ কি করিল ?

দাসী। দিন কতক গোপন রোলো। তার পর গিন্নি রকম সকম বুঝ্‌তে পেরে গাঁ মাথায় ক'রে দিল। তখন শিবনাথ নায়েব বাবু বেগতিক দেখে প্রবোধ বাবুর নিকট পাঠিয়ে দিল।

হীরামণি। কি বলিয়া পাঠাইয়া দিল ?

দাসী। সে সব বাজে কথা। কি এক খানি পত্তর লিখে দিইছিল। অত শত আমি জানি না।

হীরামণি। প্রবোধ বাবুও তাকে দেখে ভুলিলেন বুঝি ?

দাসী। ভুল্‌লেন ? একবারে গোল্লায় গেলেন। তুমি ত জান, ওটা একটা মস্ত ভণ্ড। প্রবোধ বাবু তার নিজের স্ত্রীকে একেবারেই ভুলে গেলেন, বাগানেই থাকেন বাড়ী আর যান না। দিন কতক পরে তার স্ত্রী অবশ্যই সব টের পেলো। তখন প্রবোধ বাবু বৌটাকে বল্লেন—"তোমাকে আমি আর রাখ্‌তে পারি না। তোমাকে কিছু নগদ টাকা দিচ্ছি তুমি আমার জমিদারিতে গিয়ে বাস কর"। সে কি তায় যায়! ভারি জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। সে বলে "তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে, সব ভদ্র লোকের কাছে, বেবাক কথা বলে দেব। তখন তোমার মুখ খানা কোথায় থাকবে" ? (এ সব মিথ্যা এবং রসময়ীর সৃষ্টি।)

হীরামণি। প্রবোধ বাবুর স্ত্রীর এবার কেমন দর্প চূর্ণ হয়েছে। মাগীর কতই ঠেকার! একটুত লেখা পড়া জানেন। আমাদের মত বড় জমিদার হ'লে না জানি কি কর্ত্তেন!

দাসী। ও ছুঁড়ির কেচ্ছা এক দিন বল্‌ব।

হীরামণি। বল্‌, বল্‌, কিছু শুনিছিস্‌ নাকি ?

পরের নিন্দা, বিশেষতঃ যাহাদের সুখ্যাতি আছে তাহা শুনিলেই হীরামণির মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

দাসী। সেত অনেক দিনই শুনা। কেন ? তুমি কি তা জান না ? সে কথা আর এক দিন হবে।

হীরামণি। ভাল।

দাসী। পতিব্রতা লীলা ঠাকুরাণী প্রবোধ বাবুকে ও বৌটাকে এমন ঝাঁটা পিটে কর্‌লো, যে প্রবোধ বাবু সেই দিনই বৌটাকে একটা বাড়ী ভাড়া করে

দিল। আর মাসহারার বন্দবস্তো করে দিল। লীলাঠাকুরাণীর শাসনে প্রবোধ বাবুর আর সেই বৌটার সঙ্গে দেখা শুনো হবার যো নেই। প্রবোধ বাবু লোকটা খুব চালাক। এক্ষণ মাসহারাটা কোন রকমে আমাদের বাবুর উপর চাপাতে পারেন, তারই চেষ্টা কর্চ্ছেন। আমাদের বাবু যে সুপুরুষ ছুঁড়ি তাকে দেখলেই খেপে উঠ্‌বে—আর, বাবু যদিও খুব ভাল,—রাগ করো না—তবে পুরুষের মন, কি জানি—আর রাজা রাজরার পক্ষে দোষই বা কি।

হীরামণি। বটে? হারামজাদি! তোর মুখে মার্‌ব ঝাঁটা।

দাসী। মা ঠাকুরুণ! গরিব লোক ত ঝাঁটা খেতেই আছে। তবে তুমি রঙ্গ রস বুঝ না এই ত দুঃখ। রঙ্গ রসের সময় দাসীর মত ভয়ে ভয়ে কথা ক'লে তাতে কি পুরো আমোদ হয়। অভয়ও দেও, আবার রাগও করো। না, আর কোন কথায় কাজ নেই। আমি চুপ করে থাক্‌ব।

হীরামণি। না। বল্ বল্। রাগ করিস্ নে। আমিও তামাসা ক'রে বল্‌ছিলাম।

দাসী। আমরা কি সকলেই জানি না যে, আমাদের বাবু সাক্ষাৎ মহাদেব, মহাদেবেরও অধিক।

হীরামণি। রঙ্গ তামাসা?

দাসী। রঙ্গ তামাসা কেন? মহাদেবের মনও এক দিন টলেছিল। মন টল্‌লো নিজের, রাগ হলো পরের উপর। গরিব কন্দর্পঠাকুরকে রাগে নিপট্ট পুড়িয়ে ফেল্‌লেন। আর রতি বেচারা আপ্‌সে আপ্‌সে কেঁদে কেঁদে মলো। আমি দেখ্‌ছি, কি ঠাকুর, কি মানুষ, বড় যাঁরা তাঁরা পোড়েন না; পোড়েন আশ পাশের গরিব লোক।

হীরামণি। সে কথা যাউক। তুই বল্‌ছিলি সতী সাধ্বী বৌটা আমার কাছে আস্‌বে। আবার বল্‌ছিস বাবুর কাছে আসবে।

দাসী। বুঝলে না, ঠাকুরুণ! তোমার কাছে আনা গোনা কর্ত্তে কর্ত্তে, বাবুর নজরে এক দিন পড়ে যাবে—এই প্রবোধ বাবুর মতলব।

হীরামণি। এতক্ষণে বুঝলাম—সে কালামুখী আমার কাছে এলে, এমন ঝাঁটা দেব যে সে আর কখনও এ মুখো হবে না।

এমন সময় এক জন ঝি বলিল—"বাবু আস্‌ছেন"। হীরামণি এতক্ষণ বসিয়াছিল। সে এই কথা শুনিয়া অমনি শুইল, আর বলিতে লাগিল—"ওরে,

পাখা কর, তুই মাথা টেপ্—ওমা মাথার বেদনায় যে গেলাম—আর যে পারিনে—কেউ খবর নেয় না গো—মলেই বাঁচি।"

মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী প্রকৃতই সতী সাধ্বী, তাহা পাঠককে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দাসী যাহা বলিল, তাহাতে যাহা মিথ্যা রটনা হইয়াছিল তাহাও আছে, আর কতক রসিকা দাসীর নিজের কল্পনা প্রসূত।

হীরামণি পরের কুৎসা শুনিতে খুব ভাল বাসিত। তাই তাহার কাছে কুৎসা-কীর্ত্তনী রসিকা পরিচারিকা আপনি আসিয়া জুটিয়াছিল। প্রবোধ বাবুর স্ত্রী লীলার নিকট এরূপ ঝী অথবা এরূপ কুৎসা স্থান পায় না। যাহাদের নিজের মন খারাপ তাহারা ভাল লোককেও প্রায়ই ভণ্ড বিশ্বাস করে। তাই রসময়ী দাসী ও তাহার কর্ত্রী হীরামণি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, কুমুদিনী ও লীলা ও প্রবোধ বাবু সব খারাপ। কুমুদিনী, প্রবোধ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী লীলা এত বিশুদ্ধ যে, হীরামণি ও রসময়ী তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না।

রসময়ীর কথাতে হীরামণি সিদ্ধান্ত করিল, মহেশের স্ত্রী নরেশ বাবুর সম্মুখে পড়িলে বিপদ হইতে পারে, সুতরাং তাহা যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইবে। আর বিদ্রোহী প্রজাদিগের ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য; তদ্বিষয় তাহার স্বামীকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

Next where the *sirens* dwell you plow the seas
Their song is death and make destruction please.—Pope.

নরেশ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কি হইয়াছে?"

হীরামণি। কি আর হয়েছে? মলেই বাঁচি। তুমি কি আমার পানে তাকাবার সময় পাও? কেবল উকিল, আর আমলা, আর মামলা, আর হাঙ্গামা, আর ফেসাদ, আর গান, আর বাজনা। আমি যে বেয়ারামে মরছি—তার খোজ করে কে?

নরেশ। আমি ত ভাল ডাক্তার দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাইতেছি।

হীরামণি। তোমার ডাক্তার কি আমায় ভাল করে দেখে?

বস্তুতঃ হীরামণির বেয়ারামের ১৫ আনা যে কাচ তাহা ডাক্তারের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, নিয়মমত আহারাদি করিলে আরোগ্য লাভ হইবে। তবে বাবু ছাড়েন না; এলেই দর্শনীর টাকা পাওয়া যায়; ভাল মন্দ কথায় থাকা তার দরকার কি? সুতরাং তিনি আসিতেন, হাত দেখিতেন, হীরামণির নাকিসুরে দুটো কথা শুনিতেন, রোগের লক্ষণগুলি শুনিয়া, নাড়ী টিপিয়া "নাড়ী ভাল, বাহিরে গিয়া বিবেচনা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি" এই বলিয়া চলিয়া যাইতেন। সুতরাং হীরামণি ঐ ডাক্তার-টার উপর ক্রমে ক্রমে চটিয়া গিয়াছিল, তাই সে বলিল "তোমার ডাক্তার কি আমাকে ভাল করে দেখে—আর ও ভেড়া ডাক্তারের কাজ নাই—আমি তোমাকে বলি সাহেব ডাক্তার আন—তা ষোল টাকা ভিজিট দিতে হবে, আন্‌বে কেন?

হীরামণি বুঝিয়াছিল মাঝে মাঝে সাহেব ডাক্তার না আনিলে পূরা বড়মান্‌সি হয় না। আর সাহেব ডাক্তার এলেই একটা নল দিয়ে বুকটা দেখে, জিহ্বা দেখিবার জন্য মুখটা দেখে, লাল মুখে হেঁসে হেঁসে "অপনি অজ কিমন আছে'ন, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে, তাও হীরামণির একটা মজা বোধ হয়। নরেশ বাবু বলিলেন "তোমাকে দেখ্‌তে মাঝে মাঝে সাহেব ত আসেই" আজ ঔষধ খেয়েছ কি?

স্ত্রী। ঔষধ খাই না ফেলে দেই? যার কষ্ট সেই বুঝে, অন্যে কি বুঝ্‌বে? কি বলে, মাথা নাই ত মাথা ব্যথা—উঃ মাথা ব্যথায় গেলাম। সমুদায় দিনটা বিছানায় পড়ে ছট ফট কর্‌ছি—একবার কি কেউ উঁকি মারে না গো।

নরেশ। আমি তোমার জন্য এক জোড়া নূতন ফ্যাসনের জড়য়া বালা এনেছি দেখ্‌বে?

স্ত্রী—অমনি হর্ষোৎফুল্লা। অমনি উঠিয়া বসিল। নিজের পীড়ার কথা ভুলিয়া গেল, নাকিসুর ভুলিয়া গেল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বালা? দেখি দেখি। বেশ, নেব। কিন্তু আমার হীরার মুকুট কই?

নরেশ। হবে, হবে।

স্ত্রী। কবে? মরে গেলে?

নরেশ। গহনা দিচ্ছিই ত। হীরার চিক্, হীরার চুরি, হীরার তাবিজ, হীরার অনন্ত, মুক্তার সাতনর—কোন্ গহনা তুমি পাও নাই? কেবল বাকী হীরার মুকুট? হীরার মুকুট মুকুট করে যে আমায় খেয়ে ফেল্‌লে!

স্ত্রী। (নরেশ বাবুর মুখের কাছে দুই হাত তুলিয়া) তোমার যে নাম খানা এত বড়। আমার আর কি? আমি ত গরিবের মেয়ে। তোমার নামের জন্যই বলি। মল্লিকদের বাড়ী সে দিন নিমন্ত্রণে গিইছিলাম। শীলেদের বৌ এমন হীরার মুকুট পরে এসেছিল, যে সব হকচকিয়ে গেল। তোমার এত বড় নাম তা কোথায় থাকল? আমি তখন মাথা হেট করে সুর সুর করে চলে এলাম। সমুদায় রাত্রিটা কেঁদে কেঁদে আমার বালিশ ভিজে গিয়েছিল। তুমি তা টের পাবে কেমন করে? তোমার প'লেই নাক ডাকিয়ে ঘুম। (পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে দাসীর দল গাঁটা দিয়ে সব শুনিতেছিল। রসময়ী দাসী বামী ঝির কাণে কাণে বলিল—"বাছারে এত দুঃখ!" বামী মুখ টিপিয়া হাসিল)।

নরেশ। প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছে, তা জান। এক পয়সা আদায় নাই। তার উপর মোকদ্দমায়—মোকদ্দমায় দিন এক হাজার করে মফঃস্বলে খরচ হচ্ছে। আমার লাঠিয়ালরা একটা খুনী মোকদ্দমায় পড়েছে। তাতে বিশ হাজার টাকা ত খরচ হবেই। হাইকোর্টে আর একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা আছে তাতে বিপক্ষেরা ব্রাঙ্গন কৌন্সলিকে নিযুক্ত করেছে, আমাকেও—

স্ত্রী। আমি ব্রাঙ্গন ফ্রাঙ্গন বুঝি না। আমি হীরার মুকুট চাহি, আমি বল্‌ছি আমি হীরার মুকুট চাই। অবাক করেছ, যখনই আমি হীরার মুকুট চাই, তখনই তুমি মোকদ্দমা খরচ এ খরচ ও খরচ বলে কেবল আমার মেজাজ খারাপ করে দেও, আরও মাথা ধরিয়ে দেও। তোমার মতলব আমি বুঝি না? কোন প্রকারে আমার কথাটা চাপা দেওয়া।

নরেশ। প্রিয়ে তোমার মুকুটই কি এত বড় হ'ল। আমার এত বিপদ, তার জন্য কি তুমি একটুও ভাবিতেছ না।

স্ত্রী। তোমার বিপদ তুমি জান, তোমার দেওয়ান জানে আর উকিল জানে, আর আদালত জানে। আমি অবলা, তার কি জানি?

নরেশ। বল কি? আমার বিপদ তুমি তার কি জান?

স্ত্রী। সত্যই ত। আমি গরিবের মেয়ে, যদি হীরার মুকুট না পরতে পাব, তা হলে বাবা তোমার সঙ্গে বে দিয়েছিল কেন?—ওরে ঝীরা কে আছিস? বাতাস কর—উঃ মাথা ফেটে গেল—আমি মলেই তুমি বাঁচ।

নরেশ। দেখ, আমার ভারী বিপদ। যে খুনি মোকদ্দমার কথা বলছিলাম তাতে নাকি আমাকেও আসামী করবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার

উপর ভারী খাপা। আমাকে যদি আদালতে কাটরায় দাঁড়াতে হয় তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে মরিব। তা হলে তুমি কি করে মুকুট পর্‌বে?

স্ত্রী। সে যাহা হউক হীরার মুকুট শীঘ্র এনে দেও।

নরেশ স্তম্ভিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন "মানবী না পিশাচী"।

হীরামণি অধমা হইলেও চতুরা। নরেশের মুখ দেখিয়া ভাবিল আকাশে মেঘ উঠিতেছে। তখন মায়াবিনী সজল নয়নে তাহার মৃণাল-কোমল বাহু-লতাতে নরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "প্রাণেশ্বর! তোমাকে কি আমি ভাল বাসি না?" এই কথা বলিয়া নরেশকে চুম্বন করিল এবং অপনার উরসে নরেশকে টানিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল--পরে নরেশের কাঁধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। "গরিবের মেয়ে বলিয়া আমাকে হেনস্থা করিও না। তুমি আমার প্রাণ, তবে মেয়ে মানুষ গহনা ভাল বাসি, গহনার জন্য পাগল—তাই বলিয়া কি তোমাকে ভাল বাসি না? মেয়ে প্রথমে বাপের কাছে আবদার করে, তার পর স্বামীর নিকট। হৃদয়েশ্বর! আমি তোমার দাসী, তুমি আমার প্রাণ সর্ব্বস্ব"। হীরামণির বড় বড় চোখের বড় বড় ফোটা টপ টপ করিয়া নরেশের স্কন্ধ দেশে পড়িতে লাগিল। নরেশ বিমোহিত হইল, একটু পরে বলিল, কালই হীরার মুকুটের ফরমায়েস দিব। যত টাকা লাগে, প্রিয়ে তোমাকে হীরার মুকুট পরাইয়া ইহ জীবন সার্থক করিব।"

অপর কক্ষে ঝীরা নিঃশব্দে সমুদয় কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল। একটা ঝি দুয়ারের চাবির ছিদ্র দিয়া সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিল। এখন তিন জনে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে ও ঘর হইতে অন্য ঘরে গিয়া চুপি চুপি তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

রামী বলিল "বাবু কি নিটান বোকা"!

বামী বলিল বাবুকে "গুণ করেছে।"

রসময়ী বলিল "কামরূপে গেলে মানুষ ভেড়া হয়ে যায়।"

রামী। কামরূপ কোথায়?

রসময়ী। "রূপ" বাবুর স্ত্রীতে। "কাম" বাবুতে। "কাম" আর "রূপ" যখন এক হয়ে যায়, তখন হয়ে যায় "কাম রূপ"। তখন কামরূপে পুরুষ ভেড়া।

বামী। স্ত্রী?

রসময়ী। মেদী ভেড়া অর্থাৎ ভেড়ী।

বামী। ইহার অর্থ?

রসময়ী। ইহার অর্থ; তখন মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ। তখন উভয়ে জানোয়ার। জানোয়ারের মত।

রামী। ওলো বামী, রসীকে (রসময়ীকে) বিদ্যালঙ্কারের টোলে বসিয়ে দিলেই হয়।

রসময়ী। আমি ভাবি, এই রকম ভেড়া ভেড়ীকে চিড়িয়েখানাতে রাখে না কেন।

বামী। আস্তেঃ শুন্‌তে পাবে।

ছবি।

(মা)

"আয় চাঁদ আরে
চিক্ দিয়ে যারে"
নূতন মেয়ে কোলে
মাতা, মধুর বোলে,
কত না আহ্লাদে,
ডাক্‌ছে পূর্ণ চাঁদে—
"আয় চাঁদ আরে
চিক্ দিয়ে যারে।"

সুনীল সন্ধ্যাকাশে
শরচ্চন্দ্র ভাসে,
পূর্ব্বাঙ্গণে ধীরে,
সুমন্দ সমীরে,
পুষ্পগন্ধ মধুর
ভেসে আসছে, অদুর
ফুলের বাগান হতে,
অন্তঃপুরে! পথে
বালকবৃন্দ চলে,
উচ্চ কোলাহলে,
উজ্জ্বল হাসামুখে,
চিন্তাশূন্য সুখে!
গাছের উপর থেকে
উঠ্‌ছে ডেকে ডেকে
পাপিয়া এক। দূরে
প্রবল মিঠে সুরে,
বোসে কোন চাষী,
বাজায় মেঠো বাঁশী।
বাঁশীর ধ্বনি ধেয়ে,
সুনীল আকাশ ছেয়ে,
পড়্‌ছে গিয়ে শেষে,
ধরার উপর এসে,
ছড়িয়ে ইতস্তত—
তারাবাজির মত।

এমন সময় বোসে,
বাড়ীর মধ্যে, ও সে
নূতন মাতা,—কোলে
একটি পুষ্প দোলে—

ডাক্‌ছে মধুর ডাকে,
পূর্ণ চন্দ্রমাকে—
"আয় চাঁদ আ'রে
চিক দিয়ে যারে।"

চাঁদের কিরণ এসে,
অনাবৃত কেশে,
কোমল মুখে, দেহে,
পড়েছে সে, ছেয়ে।
চাঁদের কিরণ এসে
ঢলে'পড়েছে সে
মেয়ের কচি মুখে
মেয়ের কচি বুকে।

ডাকছে মাতা চাঁদে,
বড় মনের সাধে,
বড় আদর ভরে,
বড় মধুর স্বরে।
"আয় চাঁদ আ'রে
চিক দিয়ে যারে।"

চাঁদটি বোসে হাসে
শান্ত নীলাকাশে—
জানি না কোন্ প্রাণে
রয়েছে সেখানে

এ ডাক শুনেও বসি
কঠিন শরৎ শশী।
ডাকে মা "চাঁদ আ'রে
চিক দিয়ে যারে"
এক বার তাকায় সাধে
আকাশের ঐ চাঁদে,
আবার তাকায় সুখে
কোলের চাঁদের মুখে।
হাসে মেয়ে! ডাকে
শরচ্চন্দ্রমাকে
সঙ্গে সঙ্গে—"আ'রে
চিক দিয়ে যারে"
হাসে মেয়ে। হাসে
চন্দ্র নীল আকাশে।
হাসে মা।—এ ধরায়,
তিনের হাসি গড়ায়।

লুকিয়ে লুকিয়ে আমি
মেয়ের মায়ের স্বামী
লুকিয়ে আমি কবি
তুলে নিলাম ছবি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

সমালোচনা।

"ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত"।

(বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১০।)

"ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত" প্রবন্ধে, লেখক এই কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যথা,—(১) ইংরেজ বা ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের

নিকট শিক্ষালাভে আমাদের আত্মসম্মানের অবমাননা হয়; কারণ তাঁহারা আমাদিগকে মনে মনে ঘৃণা করিয়া থাকেন; সুতরাং উপনিষদের বাক্যানুসারে "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম", যাহা শ্রদ্ধার সহিত দেওয়া হয় তাহাতে ফল আছে, আর যেটি অশ্রদ্ধার সহিত দেওয়া হয় সেটি নিষ্ফল হয়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও আমরা কেবল মাত্র বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণের খাতিরে ইংরেজের স্কুলে পাঠাইতে লালায়িত; (২) সাহেবদের তথা কথিত সাহস ও নির্ভীকতা আন্তরিক নহে, অর্থাৎ সে কেবল বাহাদুরী বা বাহবা লাভের জন্য, আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য নহে; (৩) ইংরেজরা নিষ্ঠুর ও অনুকম্পা বিহীন; (৪) ইউরোপীয়েরা যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের সর্ব্বস্ব জ্বালাইয়া দেয় এবং রাজনীতিতে সত্যের সর্ব্বদা অপলাপ হইয়া থাকে; (৫) ভারতবর্ষে পূর্ব্বে (সকলেই) মাংসাশী ছিল এখন একেবারে নিরামিষাশী অর্থাৎ ঘোরতর রক্তারক্তি শাক্ত হইতে একেবারে গেরুয়াবসনধারী বৈষ্ণব; লেখকের মতে, এ প্রকার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই; (৬) এবং এই উদ্ভিদ্ আহারের ফলে আমাদিগের ভিতর আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নাই, সাজের মা গঙ্গালাভেরও আর বিঘ্ন নাই, এক কথায়, লেখকের মতে, পুঁই শাক ও কলায়ের ডা'ল খাইয়া আমাদের জাতিটা সজোরে একটানা উন্নতির দিকে চলিতেছে; (৭) "আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া থাকি,—সেই জন্যই ঐ শত্রুর কাছে আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি, আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্ম্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরব লাভ করিয়াছি, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না, একদিন দিন আসিবে"।

ইউরোপীয়গণের তথাকথিত নৈতিক অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে"; আমরা নীতি বিষয়ে যে পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার কারণ "আমাদের দেশে ধর্ম্মের যে আদর্শ আছে, তাহা অন্তরের সামগ্রী তাহা বাহিরের গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে"।—লেখা বাহুল্য যে "ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত" সুচিন্তিত ও সুলিখিত নহে।

(১) আমরা অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছি; তাঁহাদিগের অধিকাংশই ছাত্রদিগের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন দেখিয়াছি।

তাঁহারা যাহাতে ছাত্রবর্গ ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে প্রকৃতরূপ সুশিক্ষিত হয় তাহার জন্য বিশিষ্ট প্রয়াসী দেখিয়াছি। কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসন্, অধ্যাপক কাওয়েল, ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতির নাম শিক্ষা-বিভাগে প্রাতঃস্মরণীয়। অধ্যাপক ইলিয়ট, ম্যান, লেথব্রিজ্ প্রভৃতির নামও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান দেশীয়গণ পরিচালিত ইংরেজি স্কুলের তথাকথিত নিরামিষভোজী দেশীয় শিক্ষকগণ যে মাংসাশী পাশ্চাত্য শিক্ষকগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বা অধিকতর স্নেহবান্ তাহাত দেখি নাই। অভিভাবকেরা বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণের খাতিরে ছেলেদের ইংরেজের-স্কুলে পাঠান না, যেখানে অল্প খরচে পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাস হইতে পারে এবং পাস হইয়া দুপয়সা রোজগার করিতে পারে, সেই খানেই পাঠাইয়া থাকেন।

(২) লেখক, সাহেবেরা যে আমাদের অপেক্ষা সাহসী ও নির্ভীক তাহা স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু একটি উজুরদারা দিতেছেন যে, সে সাহস আন্তরিক নহে, বাহ্যিক, অন্তর্মুখী নহে, বহির্মুখী। এই মন্তব্যটি পরনিন্দা-প্রিয়তার কথা বোধ হয়। যাহারা চিরকাল স্বাধীন এবং বলসম্পন্ন তাহারা যে আত্মসম্মান রক্ষার্থে চিরপদদলিত দুর্ব্বল জাতি অপেক্ষা খর্ব্ব হইবে ইহা সম্ভবপর নহে। নিষ্কামভাবে সাহেবদের জুতো ও গুঁতো খাওয়াটা, যদি আত্মসম্মান রক্ষার আভ্যন্তরিক নিদর্শন হয়, তাহা হইলে আমাদের জাতি আত্মসম্মানসম্পন্ন। যশোলিপ্সা একটি সাধারণ প্রবৃত্তি এবং অনেক সময়ে নিন্দনীয় নহে। সহিষ্ণু বাঙ্গালী বাহবা লাভের জন্যও যদি পাশ্চাত্য পদাঘাত হইতে নিজের পৈত্রিক প্রাণটাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কোমর বাঁধিতে পারিত, তাহা হইলে তথাকথিত প্রবুদ্ধ-প্রাচ্যধর্ম্মবোধ, বোধ হয়, লাঞ্ছিত হইত না। গীতার আংশিক শিক্ষার উপর ঝোঁক দিয়া আমাদের ভীরু ও দুর্ব্বল জাতিকে আরও নিষ্কর্ম্মা, নির্জ্জীব, ও নিস্তেজ করিবার প্রয়াস, দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

(৩) ও (৪) যুদ্ধে জয়লাভে, আমরা বাঙ্গালী কি করিতাম, বিরুদ্ধ পক্ষের ঘর জ্বালাইয়া দিতাম কিনা তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কারণ বঙ্গীয় ইতিহাস, বাঙ্গালীর যুদ্ধের দুরাকাঙ্ক্ষায় কলঙ্কিত হয় নাই। তবে ভাই ভাই-এ লাঠালাঠি, প্রতিবেশীর ঘর জ্বালানর জন্য আদালতে হাজরীর অভাব নাই।

(৫) ও (৬) লেখক বলিতেছেন "ভারতবর্ষ এক সময়ে মাংসাশী ছিল,

মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাশী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে. জগতে বোধ হয়, ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই।" আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরা দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত ডা'ল খাইতে পায় না, সুতরাং মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে এখন মাংস আহারের দারিদ্র্যমূলক অপ্রচলন, গীতোক্ত নিষ্কাম নিবৃত্তির ফল নহে।

(৭) ভারতের নিস্বার্থ ধর্ম্মের গৌরবময় আদর্শ চিরপদদলনে, চিরকাল অক্ষুন্ন ও উজ্জ্বল থাকিবে, লেখকের এই বিশ্বাস নিতান্ত শৈশবসুলভ ও সরল হইলেও, সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, অনশনে, হিন্দুর নাম ও হিন্দুত্ব লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয় হইলেও, তাহার একটা সীমা আছে। নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি ধরিত্রীও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া, মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়া উঠেন। মানবচরিত্রে সহিষ্ণুতা যেমন একটী আবশ্যকীয় উপাদান, তেমনই বীর্য্য শৌর্য্যও অন্য একটী আবশ্যকীয় উপাদান। সহিষ্ণুতা যখন বিনাশের পথকে সোজা ও সরল করিয়া দেয় তখন উহা প্রশংসনীয় নহে।

কোন এক ইউরোপীয় পর্য্যটকের নিষ্ঠুরাচরণের জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা নিন্দিত হইতে পারে না; কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের উক্তি বা কোন একটী সংবাদ পত্রের অভিমত লইয়া সমস্ত ইউরোপীয়দিগকে গালি দেওয়া চলে না। যদি কেবল মাত্র তান্ত্রিকদের ব্যভিচার, হরিবংশ নিবদ্ধ কৃষ্ণের সমুদ্র বিহার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা বিচার করিয়া, হিন্দুদিগের হিন্দুত্বের আদর্শ নির্ণীত হইত, তাহা হইলে আমাদের বেদান্ত উপনিষদের গর্ব্ব কোথায় চলিয়া যাইত। কোন জাতিকে অন্য জাতির সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, উভয় জাতির আদর্শচরিত্রকে (type) বিচারকের সম্মুখে আনিতে হয়। এবিষয় জন্ মরলি তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ কমপ্রোমাইসে (Compromise) যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য।

ক্রাইষ্টের আদিষ্ট ধর্ম্মই পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম কঠোরনীতি সংযুক্ত। এই ধর্ম্মের আদর ও অনুশীলন পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তবে আজকাল, সকল দেশেই ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থ অধিকতর সম্মান লাভ করিতেছে. ইহা সত্য। অধুনা ভারতের শিক্ষিত সভ্য সমাজও, টাকা টাকা করিয়া প্রাণপাত করিতেছেন। টলস্টই, হক্সলি, কার্লাইল,

রসকিন্, রুসো প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এই অর্থলোলুপ প্রতিযোগিতার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন। জারমান্ দার্শনিক সপেনহার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সংসার অধঃপাতে যাইতেছে ও যাইবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সহৃদয় ফরাসী লেখক জোলা ধনীকুলের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া ধর্ম্মে আস্থা বিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। হারবার্ট স্পেনসার বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাকে পুনরাবৃত্ত পাশবপ্রবৃত্তির প্রসার (Re-barbarization) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে) এই পাশব প্রবৃত্তির প্রসার, প্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শের হীনতার জন্য নহে, ধর্ম্ম বিচ্যুতি সঞ্জাত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও, নীতিগত পার্থক্য বড়ই কম। সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই অনুজ্ঞা করে যে সত্যকথা কও, পরদার করিও না, মানুষের প্রতি নির্ব্বিশেষে প্রীতিপরায়ণ হও। আমাদের উপনিষদের ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইলেও ভারতের বর্ত্তমান নৈতিক অবনতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই। উপনিষদের ধর্ম্ম ক্রমেই আগাছা পরগাছায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, নানা প্রকার উপধর্ম্মে কলঙ্কিত করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন উক্ত হইলেও ফলে আমাদের দেশ, আভ্যন্তরিক কলহবিবাদ, বিদ্বেষ হিংসায় শ্রীভ্রষ্ট। বঙ্গীয় মিছা আত্মস্তুতিবাদে ফল বড়ই কম; স্নেহ পরবশ হইয়া ব্যাধিকে লুকাইয়া রাখা, রুগ্নকে সবল প্রতিপন্ন করা, প্রকৃত হিতার্থীর কার্য্য নহে। "ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত" প্রবন্ধে, পাশ্চাত্যজাতির যথেষ্ট কুৎসা আছে; কিন্তু উহার ভাষা, ঢং ও ভঙ্গিমা, একেবারে প্রতীচ্য অর্থাৎ বিলাতী, ইংরেজি-অনভিজ্ঞের পক্ষে একেবারে অগম্য।

শ্রী—

সাহিত্য দরবার।

বান্ধব আষাঢ় ১৩১০

কিশোর গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস :—

গৌরাঙ্গ গঙ্গাদাসের ছাত্র। তিনি সর্ব্বকর্ম্মাচার্য্য প্রণীত কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন বোপদেবের মুগ্ধবোধ বঙ্গদেশে চলন হয় নাই। চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং অতি প্রবীণ বৈয়াকরণ ছিলেন * * গৌরাঙ্গ ব্যাকরণ ও বাদার্থের কূটকথা

লইয়া কোনরূপ একটা বিচার মল্লতা পাইলেই মত্ত হইতেন। ষোলবৎসর বয়সে তিনি গঙ্গাদাসের টোলের ছাত্রগণের পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনে সাহায্য করিবার অর্থাৎ "পুঁথি চিন্তার" ভার পান। ইহাতে মুরারি গুপ্তের ঈর্ষা হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই কায়স্থ মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে গৌরাঙ্গ টোল খুলিলেন।পিতৃহীন গৌরাঙ্গ ষোল বৎসর বয়সের সময়ই অধ্যাপক হইয়া শত শত ছাত্রের মধ্যে সম্মানের উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন।

অল্প বয়সে জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার পিতার নিকট পাঠ করিতেন ও তাঁহার ভ্রাতাগণকে পাঠ দিতেন। এবং মিল যে সকল পুস্তক বিবিধ ভাষায় পাঠ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় গৌরাঙ্গ যাহা অধ্যায়ন করিয়াছিলেন তাহা নগণ্য। তবে মিল ষোল বৎসর বয়সে অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। গৌরাঙ্গের অধ্যাপনার মূলে জগতের অধ্যাপনার আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। ইহা বালিকার নকল ঘর কন্না। কেশবচন্দ্র ভারতকে তাহার শিষ্যস্থানীয় করিবার জন্য যে মানস করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্থাপিত বক্তৃতা-বিদ্যালয়েই বুঝা যায়। যে সয়ম্প্রতিষ্ঠিত প্রভু, যে ঈশ্বর প্রেরিত দুত, যে নিসর্গের নিয়োজিত শিক্ষক তাহার দিকে চৌম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় লোকে স্বতঃই অকৃষ্ট হয়, অন্ধকারে শৈলশিখরস্থিত প্রদীপ্ত শিখার ন্যায় সেই ব্যক্তি লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল কথা লেখক তাঁহার বঙ্গদেশবিশ্রুত বাগ্‌বৈভবের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। যতদুর কিশোর গৌরাঙ্গ পাঠ করা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় লেখকের পাণ্ডিত্যের ও লিপি কৌশলের অভাব নাই; যাহা কিছু অভাব, তাহা আগ্রহের। তাঁহার লেখায় ভক্তের আবেশ বা দার্শনিকের অন্তদৃষ্টি, বা প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভাবনা শক্তি দেখি নাই। তাঁহার গৌরাঙ্গ গ্রন্থরাশি হইতে সংগৃহীত একটা সঙ্কলন মাত্র। তাঁহার নিকট ইহার অপেক্ষা ভাল বস্তু আশা করি।

পাচো জাতির বিবরণ। সুসঙ্গ মহরাজা শ্রীকুমুদচন্দ্র শর্ম্মা বি এ লিখিত। রাজা মহারাজা বঙ্গ ভাষার সেবক হইলে আমরা আহ্লাদিত হই। কিন্তু আমাদিগের দেশের রাজা মহারাজাগণ কবে প্রিন্স ক্রোপটকিন বা ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর লেখক হইবেন? মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর বাঙ্গালা মাসিকীতে প্রবন্ধ লেখেন তাহাও আমরা বঙ্গ সাহিত্যের সৌভাগ্য বিবেচনা করি।

ছায়াদর্শন। ভুতের গল্প। বাল্যকাল হইতে তাহা পাঠ করিয়া ও শুনিয়া আশিতেছি। কিন্তু এত অধিক পাতা কি ভুতের গল্প লিখিয়া পুরণ করা ভাল।

পন্থা। ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১০।

পৌরাণিক কথা। "রাস অভিসার" এবারকার বিষয়। পূর্ণেন্দু বাবু বলেন —

"পতি ভাবে ব্রজগোপীরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনুরাগ এত গাঢ় এত তীব্র হইত না। পতিভাব সহজ, আয়াস-শূন্য। উপপতি ভাব দারুণ কষ্টকপূর্ণ, ত্যাগাপেক্ষী। পতিভাবে বিধি আছে, বন্ধন আছে। উপপতি ভাব অবৈধ, বেদ ধর্ম্মের বন্ধন দ্বারা অসংকীর্ণ। পতিভাব সাপেক্ষ। উপপতি ভাব নিরপেক্ষ। পতিভাবে ভেদের ছায়া আছে। মিলনের পরিচ্ছেদ আছে। বাহ্যের অনুরোধ আছে। উপপতি ভাব বাহ্য শূন্য, কেবল বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ।"

চমৎকার। তবে লেখক নিজেই নিজের তর্কে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার প্রমাণ ঃ—

"এ উপপতি ভাব ভেদের জগতে আদর্শ নহে। যাহা শ্রীকৃষ্ণে শোভা পায়, তাহা ভেদের জগতে শোভা পায় না। যাহা পশুর ধর্ম্ম, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্ম নয়। আমাদের ধর্ম্ম লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম বলা অত্যন্ত ধৃষ্টতা মাত্র।"

এই এক কথা বলিলেই ত সমস্ত মিটিয়া যাইত। এত তর্কের আবশ্যক ছিল না। ব্যবহারজীবী পূর্ণেন্দুবাবুর "উপপতি ভাবের" "বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ"— মহিমা ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী অসাধারণ বাগ্মী লর্ড আরস্কাইনের কথা মনে পড়িল। একটী মোকদ্দমায় তিনি পারদারিক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তাহাতে তাঁহার বক্তৃতাগুণে প্রতিবাদীর গুরুতর দণ্ড হইল। আর একটী মোকদ্দমায় তিনি ব্যভিচারী প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থনার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যভিচার প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বক্তৃতা গুণে প্রতিবাদীর নামমাত্র দণ্ড হইয়াছিল। আদালতে "রূপক ব্যাখ্যা"খাটে না। ঐ মোকদ্দমায় ব্যভিচারের প্রমাণও অকাট্য। সুতরাং আরস্কাইন অসাধারণ বাগ্মিতার মোহজাল বিস্তার করিয়া অদ্ভুত মত স্থাপন করিলেন যে তাঁহার মক্কেলের ব্যভিচার বিধিবিরুদ্ধ হইলেও তাহা স্বাভাবিক, তাহা মার্জ্জনীয়, তাহা নির্দ্দোষ পবিত্র-প্রণয়-পূত। সুতরাং তাঁহার মক্কেল উপপতি হইয়াও দণ্ডনীয় নহেন বরঞ্চ পতিবৎ শ্রদ্ধেয়; এবং বাদীর সহিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রণয় না থাকায় তাহাদিগের দাম্পত্য সম্বন্ধ অপ্রতিপাল্য অশ্রদ্ধেয় সুতরাং পতি উপপতিবৎ অশ্রদ্ধেয়। এখানে অর্থোপার্জ্জনের পন্থায় ব্যবহারজীবী আরস্কাইন পাপের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবুর ন্যায় সাধুব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারের "পন্থা"য় কিরূপে উপপতি ভাবের "বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ" বাক্‌চাতুরীময় অসার যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

আশ্বিন, ১৩১০।

২৪শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর। রিসনাতে বুলগেরিয়ান ও তুরস্কীয় বিদ্রোহী গণের যুদ্ধ হয়; ইহাতে ১০৩ জন বুলগেরিয়ান হত হয়।—বেরুটে ভালি পদচ্যুত হন এবং তাঁহার স্থানে দামস্কসের ভালি নিযুক্ত হন।

২৫শে ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডে ভীষণ ঝটিকা হয় তাহাতে অনেক ক্ষতি হয়।—জুবার মধ্যপ্রদেশের কমিশনারের শাসনাধীনে আসে জানা যায়।

২৯শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর। পঞ্জাব এবং কাশ্মীরে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়।

১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী সভার ঔপনিবেশিক সচিব চাম্বার্লেন, ভারতসচিব জর্জ্জ হামিল্টন এবং রিচি আপনাদিগের স্ব স্ব পদত্যাগ করেন। ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী বালফোর অবাধ বানিজ্যনীতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহাদিগের পদত্যাগের কারণ।—কর্পূরতলার মহারাজ জাপান যাত্রা করেন।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর। পার্লেপ প্রেস্বা, পিরাইন হন্টকান প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে ৯৪ জন বুলগেরিয়ান ও ১০ জন তুরস্ক নিহত হয়।—লর্ড বালফোর অব বার্লো এবং আর্থর ইলিয়ট মন্ত্রী সভার সভ্য পদ ত্যাগ করেন।

৭ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর। মরক্কোয় বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের জীবন নিরাপদ নহে বলিয়া, ইংরেজ ও ফরাসীগণ ফেজ পরিত্যাগে আদিষ্ট হইয়াছেন শুনা যায়।

৮ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লাইবেরিয়ার কলিকাতাস্থ কনসল নিযুক্ত হইয়াছেন জানা যায়।

১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর। স্যর জেমস থমসম রিচি লণ্ডন নগরের লর্ডমেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৫ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর। তুরস্ক ও বুলগেরিয়ানগণ রজলগ, মেলনেক্, ডেমিরহি এবং নেভ্রোকোটা প্রদেশে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে জানা যায়।—স্যর স্ সুব্রাহ্মনিয়া আয়ার স্যর আর্নল্ড হোয়াইটের স্থানে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারক নিযুক্ত হইলেন।

১৮ই আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর। নূতন সার্ভিয়ান মন্ত্রী সভা গঠিত হয় এবং জেনারেল গিস (General Guich) ইহার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।—মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই এর ইয়াদগিরির সন্নিকটস্থ স্থানে জল প্লাবনের সংবাদ আসে।—ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী সভায় (Cabinet) নিম্নলিখিত সভ্য সমূহ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—মিঃ ব্রডরিক ভারতসচিব, অষ্টিন চেম্বার্লেন অর্থ সচিব, অনরেবল আলফ্রেড লিটলটন ঔপনিবেশিক সচিব আরনল্ড ফর্ষ্টার সমর সচিব, গ্রেহাম মরে স্কটল্যাণ্ডের মন্ত্রী এবং লর্ড ষ্টানলি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। ডিউক অব ডিভনশায়ার পদত্যাগ করেন।

২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর। আগ্রা নগরে ভীষণ ঝটীকা ও বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যায়।

২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর। ইংলণ্ডের অনেক স্থানে অধিক বৃষ্টি ও জলপ্লাবন হইয়াছে সংবাদ আসে।—কেপ কলনীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে জানিতে পারা যায়।

নবপ্রভা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল [১০ম সংখ্যা।

ঋগ্বেদ ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

মহান্ ঋগ্বেদ শাস্ত্র দশ "মণ্ডলে" বিভক্ত। প্রত্যেক মণ্ডলে কতগুলি করিয়া "সূক্ত," ও প্রত্যেক সূক্তে কতগুলি করিয়া "ঋক্" আছে। এক একটী ঋক্ এক একটী বচন বা কবিতা স্বরূপ। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তের অনেক ঋষি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডল, এক এক জন ঋষি বা ঋষিবংশের বিরচিত। মহর্ষি গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল রচনা করেন, বিশ্বামিত্র তৃতীয়, বামদেব চতুর্থ, অত্রি পঞ্চম, ভরদ্বাজ ষষ্ঠ, বসিষ্ঠ সপ্তম, কণ্ব অষ্টম ও অঙ্গিরা নবম মণ্ডল প্রণয়ন করেন।

এই সমস্ত ঋষি বা ঋষিবংশের কতিপয় সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়; কেন না ইহাঁদের উপাসনা, ভাষা ও বাক্যরচনাপ্রণালীতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, আবার কুত্রাপি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বতারও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রবংশীয়দিগের পরস্পর বৈরিতা প্রবাদ স্বরূপ। "হে ইন্দ্র! বিশ্বামিত্রগণ বসিষ্ঠগণের সহিত পার্থক্যই জানে, একতা জানে না, তাহারা পরস্পর অশ্ব প্রেরণ করে, ও ধনুর্ধারণ করে।"

বসিষ্ঠগণের হস্তে বিশ্বামিত্র অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তথাপি বসিষ্ঠেরা বিশ্বামিত্রের সমকক্ষ হইতে পারেন না। বিশ্বামিত্র জ্ঞানে সমধিক

উন্নত, জিতক্রোধ, এবং মৌনাবলম্বী ঋষি ছিলেন। যখন বসিষ্ঠেরা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া যান, তখন তিনি মৃদুমন্দস্বরে বলিয়াছিলেন, "হে জনগণ! তোমরা বিশ্বামিত্রকে জান না! দেখ আমি তপঃক্ষয়ের ভয়ে শাপদানে নিবৃত্ত, তাই আমাকে পশুবৎ লইয়া যাইতেছ। বিদ্বান্ ব্যক্তি মূর্খের সহিত বিবাদ করে না, আমারও ইহাদিগের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে।"

পঞ্চ জনপদের (পাঞ্জাব) রাজা সুদাস বসিষ্ঠের স্থায় বিশ্বামিত্রকেও পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র রাজযজ্ঞ সমাপন করিয়া যে রথে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা খদির ও শিশম্পা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল, বলীবর্দ্দে উহা আকর্ষণ করিত। শিল্প কার্য্যের অসম্পূর্ণতা বশতঃই হউক, বা পথের বন্ধুরতা বশতঃই হউক, তাঁহার সময়ে রথে গমনাগমন বড় নিরাপদ ছিল এরূপ বোধ হয় না।

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন :—

"বনস্পতি আমাদিগকে ফেলিয়া দিও না, আঘাতও করিও না। আমাদের গৃহগমন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক; রথবেগের অবসান ও পশুর বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক।"

"কীকট সমূহের মধ্যে যে সকল গাভী আছে, তাহারা তোমার কি উপকারে আসিবে? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না; বরং হে মঘবন্! আমাদের নিকট প্রমগন্দের ধন আনয়ন কর, নীচ বংশীয় দিগের ধন আমাদের হউক।" প্রাচীন কালে মগধ দেশবাসীরা কীকট নামে অভিহিত হইত, এবং প্রমগন্দ উহাদিগের রাজা ছিলেন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই প্রদেশে অনার্য্যদর্প বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত খর্ব্বীকৃত হয় নাই; পরন্ত, ইহারা বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীন করিয়া এক দিন আর্য্য-তেজঃকেও মলিনীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্র ফলমূলাহারী বনবাসী ঋষি ছিলেন না। বোধ হয়, তখন ঋষি-দিগের বনবাস প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি পুত্রকলত্রগণের সহিত সংসারাশ্রমে বাস করিতেন। যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিতা থাকাতে তিনি প্রথমে রাজা হয়েন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই পরমার্থ চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া তপস্যাচরণ ও অশেষবিধ যজ্ঞ সমাপন করেন। তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহার বোধ হয় এই কারণ।

বসিষ্ঠ।

মহর্ষি বসিষ্ঠ যে সকল সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতিপয় উদ্ধৃত হইল।

"বিদ্বান্‌গণের বিদিত হউক যে সত্য এবং অসত্য বাক্য পরস্পর স্পর্দ্ধা করে; যাহা সত্য এবং ঋজু, সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন।

"দেবতারা পাপকারীকে প্রবর্ত্তিত করেন না; বলবান্ মিথ্যাবাদী পুরুষ-কেও প্রবর্ত্তিত করেন না; তাঁহারা কেবল সত্যকেই রক্ষা করেন।

"পুত্র যেমন পিতাকে আহ্বান করে, আমিও সেইরূপ ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, সে অনেক প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।"

বসিষ্ঠের সময়ে নৌকাযোগে সমুদ্র গমনের রীতি ছিল। একদা তিনি স্বয়ং সমুদ্র গমন করিয়া, সিন্ধু-তরঙ্গে দোলায়মান তরণীতে, দোলারোহণের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

যৎকালে বসিষ্ঠগণ সুদাসের যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়তের পুত্র পাশদ্যুম্ন নামক রাজাও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। কথিত আছে, বসিষ্ঠেরা মন্ত্র বলে ইন্দ্রকে শেষোক্ত যজ্ঞ পরিত্যাগ করাইয়া সুদাসের যজ্ঞে আনয়ন করেন, ইহাঁরা যে বিশুদ্ধ মন্ত্রবান্ ও যজ্ঞ সম্পাদনে সুনিপুণ ছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত ঋকেও তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

"হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদিগের স্তোম সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদিগের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর।"

বসিষ্ঠবংশীয়েরা শ্বেতকায়, দেখিতে অতি সুন্দর, কর্ম্মিষ্ঠ ও সর্ব্বজনপ্রিয় পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা মস্তকের দক্ষিণভাগে চূড়া ধারণ করিতেন।

গৃৎসমদ।

যাঁহারা স্থির ভাবে মানব প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে মনুষ্যেরা চিরকাল এক বিষয়ে এক ভাবে লিপ্ত থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তন ও নবীনতার জন্য মনুষ্য সততই ব্যগ্র। ধর্ম্মের ইতিবৃত্তেও,

মনুষ্যেরা চির দিন এক ভাবে উপাসনা করে নাই, বা আরাধ্য বস্তুকে একভাবে ভাবনা করে নাই ; শীঘ্র বা বিলম্বে অবশ্যই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

এই ভাবান্তর কখনও সহজে সংসাধিত হয় ; কখনও বা ইহার প্রাক্‌কালে লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমিতিকে বিব্রত করিয়া ফেলে। যে সকল মহাপুরুষেরা এই সন্দেহের নিরাকরণ পূর্ব্বক ভাবান্তর সংস্থাপন করিয়া দেন, তাঁহাদিগকেই আমরা ভক্ত, এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হইলে অবতার, বলিয়া পূজা করি। মহর্ষি গৃৎসমদ এইরূপ এক জন ভক্ত ছিলেন।

বৈদিক সময়ের কোন ভাগে যখন লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা "ইন্দ্র কোথায়, কে তাহাকে দেখিয়াছে" ? এই প্রকার প্রশ্ন করিতেছিল, সেই সময়ে গৃৎসমদ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি অঙ্গিরা বংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র। অঙ্গিরাকুলে ইন্দ্রের উপাসনা ছিল না বলিয়া গৃৎসমদ ঐ বংশ ত্যাগ করিয়া ভৃগুবংশে যোগ দান করেন। নিম্নলিখিত ঋক্ সমূহ পাঠ করিলে, তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"হে মনুষ্যগণ! যে ভয়ঙ্কর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়, এবং যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই, তাঁহাতেই বিশ্বাস কর, তিনি ইন্দ্র।

"হে মনুষ্যগণ! দুই দল সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যে একজনকে আহ্বান করে, বিশ্বাস কর তিনিই ইন্দ্র।

"যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও অক্ষয়, তিনিই ইন্দ্র।

"যিনি অপূজকদিগকে বজ্রদ্বারা বিনাশ করেন, গর্ব্বিত মনুষ্য যাঁহার নিকট সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, হে মনুষ্যগণ! বিশ্বাস কর তিনিই ইন্দ্র।

"যিনি সূর্য্য ও উষাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পর্ব্বত সমূহকে নিয়মিত করিয়া পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ যাঁহার রচনা, দ্যুলোক যাঁহার ভয়ে স্তম্ভিত, হে মনুষ্যগণ! বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।"

এই সময়ে ধুনি ও চুমুরি নামক দুইজন ভয়ঙ্কর দস্যু আর্য্য সমাজে বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা নগর অবরোধ পূর্ব্বক অধিবাসীদিগকে অশেষবিধ কষ্টে নিপাতিত করিত। কথিত আছে, তাহারা গৃৎসমদের যজ্ঞশালায় উপনীত হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ

ঋষি যোগবলে নিস্তার লাভ করেন। ধুনি ও চুমুরি রাজর্ষি দভীতির পুরী লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গৃৎসমদ স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা, স্বর্ণালঙ্কার, ক্ষোণী ও কর্করি নামক বীণা ও বাদ্যযন্ত্রবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সময়ে আর্য্য-দিগের সামাজিক অবস্থা তাদৃশ হীন ছিল না।

অঙ্গিরা।

পুরাকালে ঋষিরা সোমরস পান করিতেন। সোম পর্ব্বতাদিতে উৎপন্ন লতা বিশেষ। উহা যজ্ঞস্থলে প্রস্তরে নিপীড়িত হইলে, রমণীরা অঙ্গুলিদ্বারা চট্‌কাইয়া উহার রস বাহির করিতেন। ঐ রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষ-লোম-নির্ম্মিত ছাকনি দ্বারা ছাকা হইত। পরে ঋষিরা তাহা দুগ্ধ বা ক্ষীর সহযোগে পান করিতেন।

সোম পানে বল, উৎসাহ, চিত্তসংযম ও মনের একাগ্রতা, সাধিত হইত বলিয়া, ঋষিরা পরমার্থসাধনের হেতুভূত সোমের পূজা করিতেন। অঙ্গিরা বংশোদ্ভব ঋষিরা সোমস্তুতির জন্যই বিখ্যাত।

কেহ কেহ মনে করেন,—ঋষিরা সোমপানে চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিমল ও পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতেন,—এই সৌসাদৃশ্য বশতঃ চন্দ্রও সোমনামে অভিহিত হইয়াছেন।

অঙ্গিরা বংশ, মনু ও ভৃগু বংশের ন্যায়, অতি প্রাচীন। অনুমান করা যাইতে পারে, যে সময়ে আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রথমে ভারত আশ্রয় করেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে ইহাঁরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা আগ্নেয় যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু অঙ্গিরাগণের সমধিক যত্ন ও অনুরাগ সত্ত্বেও, ভারতে সোমপান প্রথা চিরস্থায়িনী হইতে পারে নাই। সোম শীতপ্রধান দেশের সামগ্রী। ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে আর্য্যেরা ইহাতে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন। ইরাণীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও, হাওয়া নামে সোমের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আর্য্যগণ ভারতের শীত প্রধান ভাগে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যে সোমপানের বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। অঙ্গিরাগণও যথা তথা পরম সমাদরে পূজিত হইতেন, কাল সহকারে আর্য্যগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভূভাগে বিস্তৃত হইলে, নৈসর্গিক তাপের আধিক্যবশতঃ, সোম ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বামদেব।

যে সময়ে আর্য্যগণ সরযূ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন, আর্য্যরাজগণের মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়াছে, সরযূর পূর্ব্বপারে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক দুই জন পরাক্রান্ত আর্য্য-ভূপতি সমরে নিহত হইয়াছেন, সেই সময়ে মহর্ষি বামদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন।

বামদেব একস্থানে বলিয়াছেন, 'হে ইন্দ্র! তুমি দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র দস্যু বিনাশ করিয়াছিলে।' এখন দভীতি যে গৃৎসমদের সম-সাময়িক, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কেন না যে সকল দস্যু দভীতির পুরী লুণ্ঠন করে, তাহারা গৃৎসমদকেও বধ করিতে উদ্যুক্ত ছিল। অতএব বামদেব গৃৎসমদের পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বামদেব ত্রসদস্যু নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি পুরুকুৎসের পুত্র এবং অতীব বলবীর্য্য সম্পন্ন আর্য্যভূপতি। ইহাঁর শৈশবাবস্থায় যখন পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হয়েন, সাতজন ঋষি রাজ্যের অরাজকতা নিবারণ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু যৌবনে পদার্পণ করিয়া অনার্য্যজাতির ত্রাস স্বরূপ হইয়া উঠেন। তিনি অতি জ্ঞানবান্ যশস্বী ও দাতা ছিলেন। দুইশত দশটী ধেনু তদীয় বিস্তৃত রাজ পরিবারের জন্য দুগ্ধদান করিত।

মহর্ষি বামদেবের রচনা অতি সুন্দর ও গভীর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার রচিত একটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে সবিতৃদেব! আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ, প্রমাদ বা ধনজনগর্ব্ববশতঃ, দেব ও মনুষ্যের প্রতি যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি তাহা মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে পুনরায় নিষ্পাপ কর।"

বামদেব অনেক স্থলেই এই কথা বলিয়াছেন, "দ্রুতগামী শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া আমাদের জন্য অমৃত আনয়ন করেন"। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, 'বামদেব ঋষি যতদিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা অনুভব না করিয়াছিলেন, ততদিন আপনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। পরে আত্মাকে অনাবৃত জানিয়া তাহাকে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় উৎপাতিত করেন। শ্যেন স্বর্গে যাইয়া তাঁহার জন্য অমৃত আনয়ন করে।' আত্মার বুদ্ধমুক্ত অবস্থাতেই তাঁহার আনন্দামৃত লাভ হয়।

ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে কোন্ মহাত্মা কি করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যদি বাস্তবিক বামদেবই সর্ব্বপ্রথমে আত্মার বুদ্ধমুক্ত অবস্থা অনুভব ও জ্ঞাপন

করিয়া থাকেন, তবে তিনিই যে ধর্ম্ম জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, কে অস্বীকার করিবে ?

অত্রি ।

মহর্ষি অত্রি অধিক স্থক্তের প্রণেতা নহেন। তদীয় সূক্ত গুলিও উপাসনাত্মক। একটী স্থানে কেবল ত্র্যারুণ নামক রাজর্ষি ও ত্রসদস্যু রাজার উল্লেখ আছে। "সাধুগণের রক্ষক ধনবান্ ত্র্যারুণ আমাকে শত সুবর্ণ, বিংশতি গো, এবং শকটবহনক্ষম অশ্বযুগ প্রদান করিয়াছেন। ত্রসদস্যুও অগ্নির স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া, আমাকে দান করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন।" অত্রি বামদেবের পরবর্ত্তী নহেন।

তদ্বংশীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি রথবীতি নামক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন। "এই ঐশ্বর্য্যশালী রথবীতি গোমতী তীরে বাস করেন। পর্ব্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত আছে।" বোধ হয় অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী নদী যে স্থানে হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই স্থানেই রথবীতির রাজধানী ছিল।

শ্যাবাশ্ব আর একজন আর্য্য ভূপতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম তরন্ত। তদীয় মহিষী শশীয়সী, শ্যাবাশ্বের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অনেক পশু ও ধনদান করত, নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঋষি বলিতেছেন,—

"তদ্দত্ত দুইটী লোহিতবর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী ও বিজ্ঞ পুরুমীঢ়ের নিকট বহন করিয়াছিল। বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীঢ় আমাকে ধেনুশত, ও তরন্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করিয়াছিলেন।"

মহাত্মা অত্রি সূর্য্য সম্বন্ধে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদিগের অপেক্ষা অধিকতর চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সূর্য্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় সূক্তপাঠে প্রতীতি হয়, যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেন।

অনন্তর তদ্বংশীয় ঋষিরাও সেই চিন্তাশীলতার ভাগী হইলেন। তাঁহারা উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি, তাহাকে সবিতা, এবং উদয় হইতে অস্ত গমন পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, তাহাকেই সূর্য্য নামে অভিহিত করিলেন। সবিতৃদেবের উপাসনার্থে কতিপয় সূক্তও প্রণীত হইল।

শ্রুতবিদ কহিলেন, 'আমি সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়াছি, সেই স্থানে সহস্র সংখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে, দেব মূর্ত্তি সমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি আমার নয়নগোচর হইয়াছে।'

'ফলতঃ এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যদ্দ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য্য, দৈনিক গতির সাহায্যে, বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করিতেছেন।'

এইরূপ চিন্তা সকল উদিত হইতে লাগিল। দারুণ দেববুদ্ধি ও অসামান্য ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসার স্রোতঃ প্রবাহিত হইল; অন্তরে অন্তরে সৌর প্রকৃতির পর্য্যালোচনা হইতে লাগিল। অবশেষে অত্রি-কুল-তিলক প্রতিরথ যে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানও তদপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে সমর্থ নহেন।

"হে ঋত্বিক্‌গণ! এই সম্মুখস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অতিশয় স্তবার্হ; ইহা হইতেই নদী সকল প্রবাহিত হয়, এবং ইহাতেই বারি-রাশি অবস্থান করে। দিবা ও রাত্রি ইহা হইতেই উৎপন্ন, ইনিই ঋতুগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।"

ভরদ্বাজ।

আমরা যখন ঋষিদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন তাঁহারা কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য কতই উৎসুক হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা জানিবার অতি অল্পই উপায় বিদ্যমান্ আছে। প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রই উপাসনাত্মক; উহা ঋষিদিগের পবিত্রতা, সৎকর্ম্মনিষ্ঠা, এবং ঈশ্বর-পরায়ণতার যত পরিচায়ক, ঐতিহাসিক তৃষ্ণার তত নিবৃত্তি-কারক নহে।

বিশেষতঃ ভরদ্বাজ ইতর বিষয়ের অধিক উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে একটী মাত্র যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উপলব্ধি হওয়াও দুর্ঘট।

"হরিযুপীয়া নদীর পূর্ব্বকূল আশ্রয় করিয়া বৃচীবানের বংশধরেরা বাস করিত। অভ্যাবর্ত্তী নামক রাজা তিন সহস্র বর্ম্মধারীর সহিত উহাদিগের বিনাশ সাধন করেন। ইনি আমাকে অনেক ধন ও গবাদি পশু দান করিয়াছিলেন।"

এখন অভ্যাবর্ত্তী কে? বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র চয়মান, চয়মানের পুত্র অভ্যাবর্ত্তী। বসিষ্ঠ বা তাঁহার অপত্যগণ সুদাসের তুলনায় ইঁহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। অতএব ভরদ্বাজ বসিষ্ঠদিগের সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

মহর্ষি ভরদ্বাজের যে পৌরহিত্য একটী অতি মহৎ কর্ম্মের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইনিই সর্ব্ব প্রথমে গোবধ নিবারণের চেষ্টা পান। জীবকারুণ্যশালী মহর্ষি এই সম্বন্ধে যে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদিগকে পোষণ কর; তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। তোমরাই আমাদের গৃহের সমৃদ্ধি।

"ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়, তস্করগণ যেন তাহাদিগকে অপহরণ না করে। শত্রুর অস্ত্র যেন তাহাদের অঙ্গে নিপতিত না হয়। তাহারা যজ্ঞে বলিদানাদি সংস্কারও প্রাপ্ত না হউক। হে মনুষ্যগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, যাঁহাকে আমি মনঃ ও প্রাণের সহিত কামনা করি।"

কণ্ব।

মহাত্মা কণ্ব কতিপয় উপাসনা বাক্য ব্যতীত আমাদিগের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু যে সকল পুত্ররত্নে তাঁহার গৃহ অলঙ্কৃত ছিল, তন্মধ্যে সোভরি, মেধাতিথি ও প্রগাথ পৌরহিত্য ও কবিত্ব, উভয় গুণেই ভূষিত ছিলেন। প্রগাথ আর্জীকিয়া নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদী পরবর্ত্তী কালে বিপাশা নামে অভিহিত হয়, এক্ষণে ইহার নাম বেয়া। প্রগাথ ঐ প্রদেশে অত্যুগ্র সোমরস ব্যবহারের বিষয় অবগত ছিলেন।

মেধাতিথি পঞ্চজনের কথা বলিয়াছেন। সিন্ধুর পঞ্চশাখার তীরস্থিত পঞ্চ প্রদেশই ঐ নামে অভিহিত হইত। মেধাতিথি 'ঐ প্রদেশ ইন্দ্রের অনুপযুক্ত' বোধে যজ্ঞস্থলে প্রার্থনা করিতেছেন, "ইন্দ্র দূরদেশ হইতে পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন।"

মেধাতিথি বোধ হয় সরস্বতী তীরে বাস করিতেন। পঞ্জাব আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থান ছিল; তৎপরে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই আর্য্যনিবাসের প্রকৃষ্টতর স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। মেধাতিথির সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্রীবৃদ্ধি ও ধনজনবাহুল্য সংঘটিত হইয়াছিল।

কণ্বপুত্র সোভরি ত্রসদস্যু রাজার ভবনে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি অত্রির সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে, পুরুকুৎস তনয় ত্রসদস্যু তাঁহাকে আত্মরক্ষার্থ পঞ্চাশ জন বন্ধু প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সরস্বতী তীরে চিত্র নামক রাজা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। সোভরি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সেই যজ্ঞে সরস্বতী তীর বাসী যাবতীয় আর্য্যভূপতি নিমন্ত্রিত, ও ধনরত্ন সহকারে অর্চ্চিত হইয়াছিলেন।

যদিও আর্য্যবিজয় স্রোতঃ ইতিপূর্ব্বেই যমুনাতট অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাবর্ত্তই মহতী আর্য্যসমিতির কেন্দ্রভূত ছিল। পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী সমরাঙ্গনে দাসের যে ধনরত্ন লাভ করেন, তৎ সমস্তই অবিলম্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত নিবাসে বাহিত, ও তথাকার পরি-শোভার্থে কল্পিত হয়। সরস্বতী তীরে লোকারণ্য দেখিয়া দূরদর্শী ঋষিদিগের অন্তঃকরণে এক অভিনব চিন্তার উদয় হয়। তাঁহারা দেবনদীকে সম্ভাষণ করিয়া বলেন, "সরস্বতি! আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে যেন কোন অপকৃষ্ট স্থানে যাইতে না হয়!"

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ।

কাটোয়ার পথে।

(প্রথম প্রস্তাব)

অনেক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বসিয়া সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম, এমন সময়ে ডাকঘরের পিয়ন (পেয়াদা) আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিল; পত্র খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে—

"আমি দুশ্চিকিৎস্যরোগে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল শয্যাগত আছি। চিকিৎসকেরা আমার জীবন সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়াছেন; আমারও বিশ্বাস এই যে, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই কঠিন পীড়া হইতে রক্ষা পাইবার আশা খুব কম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি এই পত্র পাঠমাত্র বর্দ্ধমানে রওয়ানা হইবে, তথা হইতে অশ্বশকটে বা বলদশকটে কাটোয়া আসা যায়। বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেশনের এক ক্রোশ দূরে আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত—বাবুর বাটী, তুমি তাঁহার বাটীতে পৌঁছিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তোমার কাটোয়া

আগমনের সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। তাঁহার সহিত তোমার অবশ্য পরিচয় আছে, তাঁহাকেও আমি কল্য পত্র লিখিয়াছি।”

শ্রী——

কাটোয়া।

এই পত্র পাঠ করিয়া আমি সেই রাত্রির রেলগাড়ীতে বর্দ্ধমানে রওয়ানা হইলাম; রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দোকানে নিশি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পীড়িত ব্যক্তির আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন “আমিও কাটোয়া যাইব, আমরা উভয়ে বলদ শকটে একসঙ্গে রওয়ানা হইব। কাটোয়া নগরী অনেক দূরে অবস্থিত এবং পথ নিরাপদ নহে; সে পথে অত্যন্ত দস্যু ভয় আছে; একজন বলবান ও সাহসী লোক সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।” এই কথা বলিয়া তিনি সেই গ্রামের পরাণ বাগ্দী নামে এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরাণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, বাবু কহিলেন “পরাণ! তোমাকে আমাদের সঙ্গে কাটোয়া যাইতে হইবে; শীঘ্র প্রস্তুত হও, স্নান করিয়া আমার বাটীতে আহার কর। আমরা আহারাদির পরেই রওয়ানা হইব।” আমরা ভোজনাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে পরাণ বাগ্দী আসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল, আমি নিকটে দাঁড়াইয়া পরাণের চেহারা ও আহারের প্রণালী দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে শ্রীমান পরাণচন্দ্র বাগ্দী এক সের চাউলের অন্ন, তদুপযুক্ত ডাউল এবং তৎসঙ্গে পঞ্চ প্রকার তরকারী ও অর্দ্ধসের দধি অনায়াসে গলাধঃকরণ করিয়া বসিল। পরাণের বয়স তখন ২৮ বৎসরের অধিক হয় নাই; মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর রূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং সবল ও সুঠাম। তাহার বাঁশের লাঠি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাহা হউক, আমরা অপরাহ্ণে বলদশকটে আরোহণ করিয়া কাটোয়া রওয়ানা হইলাম। বাবু, আমি এবং গাড়োয়ান গাড়ীর উপরে রহিলাম; পরাণ পদব্রজে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে সূর্য্যদেব অস্ত হইলেন, আমরা সেই গ্রামে রাত্রি যাপন করিলাম।

দ্বিতীয় দিবস প্রভাতে আমরা আবার বলদ শকটে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকাল; মধ্যাহ্ন সময়; বিশেষতঃ অনেক মাস বৃষ্টি হয় নাই; এ জন্য বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত পৃথিবী অগ্নিতাপে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পথের মাটি এমন গরম হইয়াছিল যে,

জুতা পায়ে দিয়া চলিয়া গেলেও জুতা গরম হইয়া যায়। কাটোয়ার পথ তখন খুব বিপদ জনক এবং ভয়পূর্ণ ছিল। ডাকাইতি, রাহাজানী, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতির জন্য এই পথ তখন প্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরে সে অঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় দস্যুতা ও রাহাজানীর বিশেষ ভয় ছিল। মধ্যাহ্ন সময়ে আমি গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, চারিদিকে কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ বিস্তৃত, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণমালায় সমস্ত পৃথিবী যেন ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও লোক বা লোকালয় নাই, একটি পথিককেও আসিতে বা যাইতে দেখিলাম না। বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহা কোথাকার মাঠ?" বাবু বলিলেন "তুমি এই সামান্য মাঠ দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইয়াছ!! এখনও আমরা কর্জ্জনার মাঠে আসিনাই, বোধ হয় একটু পরেই কর্জ্জনার মাঠে আসিয়া পৌঁছিব। তথাকার মাঠ দেখিলে, তবে মাঠের প্রকৃত জ্ঞান তোমার জন্মিতে পারে।" অনেকক্ষণ পরে আমরা কর্জ্জনার মাঠে আসিয়া পৌঁছিলে, বাবু কহিলেন "ঐ দেখ, ঐ দেখ, আমরা কর্জ্জনার মাঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এত বড় মাঠ এতদঞ্চলে আর নাই, ইহা অতীব ভয়ঙ্কর স্থান।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভয়ঙ্কর কেন?" তিনি কহিলেন—"দস্যুরা এই পথে পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয় এবং তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। পুলীশে তাহাদের কিছুই করিতে পারে না। নিকটে লোকালয় বা গ্রাম নাই; দূরে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের অধিবাসীরা ডাকাইতী, রাহাজানী, নরহত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এদেশে যাহারা পথিকদিগকে আক্রমণ করে তাহাদিগকে লোকে লেঠেড়া বলে।" আমি বলিলাম "কর্জ্জনা গ্রাম কোথায়?" বাবু কহিলেন "আরও অনেক দূরে গেলে, এই প্রকাণ্ড মাঠেরই এক দূরবর্ত্তী স্থানে ক্ষুদ্র কর্জ্জনা গ্রাম দেখিতে পাইবে। সেই গ্রামের অধিকাংশই দস্যু। কর্জ্জনার মাঠে আসিলে শতকরা ৯৮ জন পথিক আর ঘরে ফিরিয়া আইসে না, দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। এই জন্য এদেশে একটা প্রবাদ আছে—

যদি যাবি কর্জ্জনা
লেয়ে ধুয়ে ঘর যা না॥

অর্থাৎ, যদি কেহ কর্জ্জনা যাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (লেয়ে ধুয়ে) স্নান করিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে হইতেই নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিয়া

রাখা উচিত, অথবা তাহার আত্মীয়েরা তাহার শ্রাদ্ধ করিবে, কারণ কর্জ্জনা গেলে আর ঘরে ফিরিয়া আসিবার আশা অতি অল্প।”

বাবুর কথা শেষ হইলে আমার মুখম্লান হইল, আমি ভীত হইলাম। আমার বয়স তখন খুব কম, বালক বলিলেই হয়। আমাকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া বাবু আমার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন “তোমার অনুমাত্র ভয়েরও কারণ নাই; পরাণ বাগ্দী আমাদের সঙ্গে আছে এবং বিশেষতঃ গাড়োয়ানও একজন খুব বলবান মানুষ, তদ্ভিন্ন আমি নিজে লাঠি ধরিলে ছয় সাত জনের মাথা ফাটাইয়া দিতে পারি। পরাণ একাকী বিশজন দস্যুর সমতুল্য।” বাস্তবিক ইহারা কয়জনেই খুব বলবান ও সাহসী ছিল।

কিছুক্ষণ পরে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম “আপনি পুনঃ পুনঃ পরাণ বাগ্দীর প্রশংসা করিয়াছেন। পরাণ বাগ্দীর কিছু পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।” বাবু কহিলেন “পরাণ বাগ্দীর পিতা একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইত ছিল, তাহার ভয়ে এদেশে বাঘে ছাগে একঘাটে জল খাইত। সরকার বাহাদুর ঠগীর হাঙ্গামার সময় এক মোকর্দ্দমায় পরাণের পিতাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসি দিয়াছিলেন। পরাণের বয়স অধিক নহে, কিন্তু বলে ও সাহসে এ অঞ্চলে এ ব্যক্তি অদ্বিতীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার এক জমিদারের বাটীতে পরাণ চাকুরী করিত; জমিদার বাবু ইহার হস্তে অনেক টাকা সমর্পণ করিয়া কালেক্টরীর খাজানা দিতে পাঠাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে এক খালের ধারে তিনজন বলবান দস্যু পরাণকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরাণ তাহাদের দুই জনকে নিহত করিয়া প্রভুর জমিদারীর খাজনা যথাসময়ে খাজনা-খানায় পৌঁছাইয়া দেয়। এই অদ্ভুত কথা তুমি পরাণের নিজের মুখেই শুনিতে পার।” পরাণ বাগ্দী গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল; আমাদের অনুরোধে ঐ অদ্ভুত ঘটনা সংক্ষেপে বলিতে লাগিল।

পরাণ বলিল “জমিদার বাবু আমাকে যখন টাকা সমর্পণ করিয়া রওয়ানা হইতে হুকুম দিলেন, তখন বেলা তিনটা। পথে আসিতে আসিতে এক গ্রামে সূর্য্য অস্ত হইল, সেই গ্রাম আমাদের বাবুর জমিদারী, সুতরাং সেই গ্রামের কাছারীতে গিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, দিনের বেলায় প্রচণ্ড রৌদ্র। এইজন্য রজনী প্রভাত হইতে আড়াই ঘণ্টা যখন বাকি ছিল, তখন শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া গোমস্তার নিকট হইতে টাকা লইয়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আমি রওয়ানা হইলাম। পথে একটা খাল

পার হইতে হয়, কর্জ্জনার মাঠ যেমন ভয়ানক স্থান, সেই খাল ও তেমনি ভয়ঙ্কর। এই খালে বোধ হয় লক্ষ মানুষের মাথা আছে, দস্যুরা এই খালে পথিক দিগকে আক্রমণ করিয়া নিহত করে। আমি সে সময়ে গাঁজা খাইতাম, এখন তাহা খাই না। খালের এপারে একটা বড় বটবৃক্ষ ছিল, তাহারই তলে বসিয়া কল্‌কায় গাঁজা সাজিয়া, চকমকির পাথরে লোহা ঠুকিয়া, "সোলা"র আগুণ প্রস্তত করিলাম। চক্‌মকি ঠুকিতে ঠুকিতে আমি জানিতে পারিলাম রাত্রিতে কাছারী হইতে উঠিয়া আসিবার সময় আমার লাঠি আমি ভুলিয়া আসিয়াছি। কাছারীতে আমি গাঁজা খাইয়াছিলাম, ঘুমের ঘোরে এবং গাঁজার নেশায় এরূপ ভুল হইয়াছিল। কিন্তু অনেক দুরে আসিয়া পড়িয়াছি, এতদুর হইতে আর ফিরিয়া যাওয়া কঠিন, এই জন্য লাঠির কথা আর মনে ভাবিলাম না। গাঁজা খাইয়া, উর্দ্ধে এক বিরাট ও বিকট লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক, বট বৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড ডালে হাত দিয়া, সেই ডালটাকে নিমেষ মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, এবং তাহাই লাঠি স্বরূপে স্কন্ধে লইয়া খালের দিকে চলিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকালবশতঃ খালের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সামান্য জল এবং প্রচুর বালি ছিল। বিপদ উপস্থিত হইলে,বালির উপর দৌড়িয়া যাওয়া বড়ই কষ্টকর হয়। আমি অতি সাবধানে যাইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তিনজন দস্যু তিন দিক হইতে আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল; তাহাদের হাতে মোটা মোটা বাঁশের লাঠি এবং এক এক বোঝা "ফাপড়া" * ছিল। তাহারা প্রথমে ফাপড়া ছুড়িতে লাগিল, আমি বট বৃক্ষের সেই প্রকাণ্ড শাখা অনবরতঃ ঘুরাইতে লাগিলাম, ফাপড়া গুলা পাতায় ঠেকিয়া ভুমিতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। ফাপ্‌ড়ার লড়াইয়ে তাহারা হতাশ্বাস হইয়া, লাঠি হাতে আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে চালাকী করিয়া বলিলাম "ভাই! আমার সঙ্গে আর লোক নাই এবং এক গাছি লাঠিও নাই, আমি এমতাবস্থায় তোমাদের সহিত কতক্ষণ পর্য্যন্ত যুঝিয়া উঠিতে পারি? আমার সঙ্গে যে টাকা ও নোট আছে তাহা তোমাদিগকে আমি অকাতরে দিতেছি, তোমরা টাকা লইয়া চলিয়া যাও এবং আমাকে ছাড়িয়া দাও। অকারণে নিরপরাধীর প্রাণ হত্যা করা ভাল নহে। উপরে ভগবান আছেন,

---

* স্কুলের ছাত্রেরা অথবা আফিসের কেরাণীরা যে রুল ব্যবহার করেন, দস্যুদের ফাপড়া প্রায় সেইরূপ। ইহা ছুড়িয়া মারিলে ইহার আঘাতে পথিক একেবারেই কাবু হইয়া যায়।—লেখক।

নীচে রাজা আছেন, এবং হৃদয়ে মা কালী আছেন—দোহাই তোমাদের!! নরহত্যা করিওনা।" কথা শুনিয়া দস্যুরা বলিল "আচ্ছা, তবে তুমি টাকার পুঁটুলি খোল এবং টাকা দাও।" আমি কোমর হইতে গামোছা খুলিয়া টাকা ও নোট সমেত সেই গামোছাখানি বালুকার উপরে রাখিয়া বলিলাম "এই স্থান হইতে টাকা উঠাইয়া লও; আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াই করিবার ইচ্ছা করি না। এই দেখ, বটগাছের ডালটাকে আমি ফেলিয়া দিতেছি। এই বলিয়া নিকটে ঐ ডালটাকে ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু আমি মনে মনে নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছিলাম, ইহারা কেবল টাকা লইয়াই ক্ষান্ত হইবে না, নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, ইতাবসরে দক্ষিণ দিকের দস্যু বামদিকের দস্যুর পাশাপাশি ভাবে দাঁড়াইল। আমি সুবিধা বুঝিয়া নিমেষকাল মধ্যে অতি দ্রুত তীরের ন্যায় অথবা মেঘের বিজলীর ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া এই দুইটা দস্যুর মধ্যে একটার গলায় হাত দিয়া গলা টিপিয়া ধরিলাম, এবং আর একটার গলা চাপিয়া ধরিলাম, তাহার পর দ্বিতীয় মুহূর্ত্তেই উভয়ের মাথা এমন জোরে ঠুকাঠুকি করিলাম যে, উভয়কে প্রায় বে-দম্ করিয়া ফেলিলাম এবং কথাটি কহিবার অথবা হাত নাড়িবার অবকাশ দিলাম না। তাহার পরে দুই জনকে বালিতে ফেলিয়া, একজনের পেটে পা দিয়া কলুর ঘাণির মত তাহাকে ঘুরাইতে লাগিলাম, তাহার মুখ দিয়া ও গুহ্যদেশ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। আমি বলিলাম "থাক্ বেটা থাক্, এই খানেই মরণ পর্য্যন্ত থাক্, এই খাল ছাড়িয়া তোকে আর একটি পাও অগ্রসর হইতে হইবে না।" দ্বিতীয় দস্যুটা অর্দ্ধমৃতাবস্থায় চাহিয়া চাহিয়া এই ব্যাপার দেখিতে ছিল, এবারে তাহার পেটে পা দেওয়ায় সে অনেক কাতরোক্তি করিল, কিন্তু আমি তাহাকে ছাড়িলাম না, প্রথম দস্যুর ন্যায় তাহারও মুখদিয়া রক্ত বাহির করিলাম। তাহার পরে তৃতীয় দস্যুর দিকে চাহিয়া দেখি, সে ব্যক্তি তথায় নাই। মাঠের দিকে তাকাইয়া জানিলাম, অতীব ঊর্দ্ধশ্বাসে সে দৌড়িয়া পলাইতেছে। আমি আর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম না; টাকা ও নোট লইয়া আমি গন্তব্যস্থানাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।" ইত্যাদি। পরাণের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মেঘদূত।

খ। কাব্যে ভৌগলিক বিবরণ।

(৩) দশার্ণ বা পূর্ব্বমালবের অধিত্যকা।

বৈশাখ মাসের "নবপ্রভায়", দশার্ণরাজ্য তার রাজধানী বিদিশা, ও তৎ-সন্নিকটবর্ত্তী "নীচ" পাহাড়ের বর্ণনা করা গিয়াছে। বিদিশার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কাদম্বরীতে বাণভট্ট যথেষ্ট লিখিয়াছেন যথা—

"তস্য রাজ্ঞঃ······বিস্তীর্ণা মজ্জন্মালববিলাসিনীকুচতটাস্ফালনজর্জরিতোর্মি-মালয়া···বেত্রবত্যা পরিগতা বিদিশাভিধানা নগরী রাজধান্যাসীৎ।" পূর্ব্ব-ভাগ পৃ-১১২।

সেই রাজা শূদ্রকের বিস্তীর্ণা ও বেত্রবতী নদীকর্ত্তৃক যুক্তা বিদিশা নামধেয়া নগরী রাজধানী ছিল। ("মজ্জন" ইত্যাদি বেত্রবতীর বিশেষণ)।

(iv) "বননদী" (২৭ শ্লোক)।

টীকাকারগণের মধ্যে ইহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে; মল্লিনাথ মতে "বনে হরণ্যে যা নদ্যস্তাসাং", সারোদ্ধারিণী মতে, "অথবা মালবদেশে···বননদীনাম্নী সরিদস্তীতি"। শাস্ত্রী মহাশয় মল্লিনাথ মতানুযায়ী "ছোট নদীটি" এই অর্থ করিয়াছেন (পৃ-২৯)। আমার মতে ইহাকে বিশেষ নদীর নাম (একবচন) স্বীকার করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে বনস্ নদীর শাখা পার্ব্বতীর সহিত ইহাকে চিহ্নৎ করিব। পার্ব্বতী বেতওয়ার পশ্চিমে প্রবাহিত, ২২০ মাইল যাইয়া চম্বলে মিশিয়াছে।

(৪) অবন্তী বা পশ্চিম মালবের অধিত্যকা।

(i) "উজ্জয়িন্যাঃ" "বক্রঃপন্থা" (২৮ শ্লোক)।

কবি এতক্ষণ মেঘকে উত্তর বা উত্তরপশ্চিমাভিমুখে লইতেছিলেন; এখন তিনি বলেন যে যদিও তোমার পথ বক্র হইবে, অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখী হইবে, তবু তোমার একবার উজ্জয়িণীটা দেখা উচিত। ২৮ হইতে ৪১ শ্লোক, উজ্জয়িণীর পর বর্ণনা, উজ্জয়িণীর প্রশংসা, ও উজ্জয়িণীর উত্তরে অবন্তীরাজ্যের অন্যান্য অংশের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

অবন্তীদেশ ও তাহার রাজধানী উজ্জয়িণীর প্রতি কবির এত আগ্রহ কেন? ইহা কি তাঁহার স্বদেশ ছিল; তাই কি এত খুঁটি নাটি আঁকিয়াছেন?

(ii) "নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ" (২৯ শ্লোক)।

বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী যাইতে গেলে নিম্নলিখিত স্রোতস্বতীগুলি পথে পড়ে:—

১ম—পার্ব্বতী
২য়—নিভাজ
৩য়—অনাসিক সরিৎ
৪র্থ—কালিসিন্ধু
৫ম—অনাসিক সরিৎ
৬ষ্ঠ—শিপ্রা

পার্ব্বতীকে আমি "বননদীর" সহিত চিহ্নিৎ করিয়াছি, সুতরাং নির্ব্বিন্ধ্যাকে নিভাজের সহিত চিহ্নিৎ করা শ্রেয়ঃ। নিভাজ চম্বলের শাখা নদী। এই সকল সরিৎ বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার সর্ব্বপশ্চিমাংশ মাণ্ডু range হইতে উদ্ভব ও অনেক ঘুরিয়া, বেঁকিয়া চম্বলতে পড়িয়াছে। মাণ্ডু পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বদিকে ঢালু হইয়া আস্তে আস্তে নামিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণে নর্ম্মদার দিকে অত্যন্ত খাড়া। তাই তদুদ্ভবা নদীগুলির গতি উত্তরাভিমুখে। অধিত্যকার সাধারণ উচ্চতা ১৫০০ ফুট।

নির্ব্বিন্ধ্যা পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী। ভাগবতে, বায়ুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে; চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে চৈতন্যদেব তীর্থযাত্রা উপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন।

(iii) "সিন্ধুঃ" (৩০ শ্লোক)

মল্লিনাথ অন্য টীকাকারগণ হইতে পৃথক্ মত দিয়াছেন। তিনি 'অসাবতী-তন্ত' পাঠ করিয়া "অসৌ পূর্ব্বোক্তা সিন্ধুনদী নির্ব্বিন্ধ্যা" এই রকম অর্থ করেন। কিন্তু পার্শ্বাভ্যুদয় ও অন্যান্য টীকাকারেরা "তামতীতস্য" পড়িয়া সিন্ধুনাম্নী অপর একটি নদীর উল্লেখ করেন। শেষোক্ত অর্থ যথার্থ, কেন না উজ্জয়িনীর পথে কালিসিন্ধুনামে এক শাখা নদী পাওয়া যায়। ইহা বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উদ্ভব হইয়া ২২৫ মাইল গমনের পর চম্বলে পতিত হয়।

(iv.) "শিপ্রা" (৩২ শ্লোক)।

উজ্জয়িনী শিপ্রা নদী তটে থাকায়, ইহার নাম সুপ্রসিদ্ধ। ২২°-৩৭' অক্ষাংশ, ৭৬°-১২' দ্রাঘিমাংশে, বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ভাগে ইহার উৎপত্তি। প্রায় ৫০ মাইল গতির পর উজ্জয়িনীর পদধৌত করিয়া অনেক আঁকিয়া বাঁকিয়া ১২০ মাইলে চম্বলে পড়িয়াছে।

(৮) "অবন্তীন্" "শ্রীবিশালাং" (৩১ শ্লোক)।

এতক্ষণে অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী, অপর নাম বিশালায় আসা গেল।

অবন্তী ('আবন্ত্য')র নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। পাণিনী, অথর্ব-পরিশিষ্ট বৌধায়নধর্ম্মসূত্র, মহাভারত, হরিবংশ, মৃচ্ছকটিক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার নাম পাওয়া যায়। কালিদাস নিজেই রঘুবংশে (৬৩১-৫) ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন কালে ইহা এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল সন্দেহ নাই।

অবন্তীর রাজধানী বিশালার নাম দশকুমার চরিত, বরাহপুরাণ, কথাসরিৎ-সাগর প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে উজ্জয়িনী বা উজ্জয়িনীর নাম কি সংস্কৃত সাহিত্যে, কি ভারত ইতিহাসে উভয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ। অশোকের শিলালিপিতে, নাসিকের গুহালিপিতে, ভারাহৎ ও সাঞ্চির বৌদ্ধ দান লিপিতে, খৃঃ পূঃ প্রাচীন মুদ্রা সমূহে, পাশ্চাত্য পেরিপ্লস ও টলেমীর ভৌগলিক বর্ণনায় ইহার নাম জাজ্বল্যমান; পাণিনীয় গণাদিতে, বৌদ্ধ ত্রিপিতকায় জৈন প্রাচীন শাস্ত্রে (ভগবতীসূত্র, নন্দীসূত্র প্রভৃতি) উজ্জয়িনীর ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে; হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে উজ্জয়িনী দ্রাঘিমাংশের আরম্ভ স্থানরূপে গণিত হয়।

উজ্জয়িনী সম্বন্ধে কবি দুইটী বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন:—

প্রথম,—৩১ ও ৩৪ শ্লোকে বৎসরাজ উদয়ন ও তৎকর্ত্তৃক অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের কন্যা হরণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ বৃহৎ কথা হইতে উদ্ধৃত। বৃহৎকথা গ্রন্থ এখনও আবিষ্কার হয় নাই। তবে কথা সরিৎসাগর তাহার এক রকম পাঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথাসরিৎসাগরে ২য় লম্বক ৪-৬ তরঙ্গে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তবে তথায় অবন্তীরাজের নাম চণ্ড মহাসেন (প্রদ্যোত নয়)।

দ্বিতীয়,—৩৩ শ্লোকে কবি বলিতেছেন:—

"উজ্জয়িনীর বিপণীশ্রেণীতে কোটী কোটী শুদ্ধ বৃহৎ তরল গুটিকা (মহারত্ন) শঙ্খশুক্তি (মুক্তা), বালতৃণের ন্যায় শ্যামল মরকতমণি, ও প্রবালখণ্ড সমূহ বিস্তৃত দেখিয়া মনে হয় যে সমুদ্রে কি কেবল জলমাত্র অবশিষ্ট রহিল।"

এই বর্ণনা হইতে অনুভূত হয় যে উজ্জয়িনী, মণি, মুক্তা প্রবাল প্রভৃতির বিপুল ক্রয় বিক্রয় স্থান ছিল, ও সেই ধারণা মৃচ্ছকটিক ও কাদম্বরী দ্বারা দৃঢ়ী-কৃত হয়। পেরিপ্লস্ (১ম খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন:—

In the same region eastward is a city called Ozene, formerly the

capital wherein the king resided. From it there is brought down to Barugaza every commodity for the supply of the country and for export to our own markets—Onyx stones, porcelain, fine muslins, mallow-coloured muslins and no small quantity of ordinary cottons. At the same time there is brought down to it from the upper country by way of Proklais, for transmission to the coast, Kattybourine, Patropapigic, and Kabalitic spikenard, and another kind which reaches it by the way of the adjacent province of Skythia; also, kastus and ledellium." Mc. Crindle, Indian Antiquary, Vol VIII, p. 143.

৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ শ্লোককে মল্লিনাথ প্রক্ষিপ্ত বলেন; সম্ভবতঃ সেই কারণে শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু এই তিন শ্লোক পার্শ্বাভ্যুদয়ে পাওয়া যায়, এবং বল্লভ, সারোদ্ধারিণী প্রভৃতি টীকাকারেরা অপ্রক্ষিপ্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে ৩৫ শ্লোকটি পার্শ্বাভ্যুদয় ও অধিকাংশ টীকাকার মতে উত্তর মেঘে। আধুনিক উজ্জয়িনী শিপ্রার দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

অক্ষাংশ ২৩°-১১´, দ্রাঘিমাংশ, ৭৫°-৫২´। ইহার আয়তাকার, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত, ঘের প্রায় ছয় মাইল। ইহার এক মাইল উত্তরে প্রাচীন উজ্জয়িনীর বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ।

(vi) "গন্ধবত্যাঃ" (৩৭ শ্লোক)। } মল্লিনাথ ৩৪ শ্লোক।
"মহাকালম্" (৩৮ শ্লোক)। } ঐ ৩৫ শ্লোক।

এখন মেঘের গতি আবার উত্তরাভিমুখী হইল। আধুনিক উজ্জয়িনীর তিন ক্রোশ উত্তরে গন্ধবতী নাম্নী ক্ষুদ্রা নদী তটে মহাকাল নামক প্রসিদ্ধ শিবস্থান। দ্বাদশ বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে মহাকালেশ্বর একটি বিখ্যাত শিবলিঙ্গ। শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতাস্থ ৪৬ অধ্যায়ে (ও পদ্মপুরাণে) মহাকালের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে দূষণ নামক দৈত্য অবন্তীদেশীয় একটি ধার্ম্মিককে উৎপীড়ন করে, তাহাতে ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ শিবের স্তব করায় হঠাৎ মহাকাল লিঙ্গ আবির্ভূত হন ও দূষণকে সসৈন্য বধ করেন। মহাকালের কথা কালিদাস রঘুবংশেও উল্লেখ করিয়াছেন।

(vii) "গম্ভীরায়াঃ" (৪৪ শ্লোক)। মল্লিনাথ ৪১ শ্লোক।

মহাকাল পীঠস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে চম্বল নদী পার হইতে গেলে মধ্যে গম্ভীরা পার হইতে হয়। প্রাচীন টীকাকারেরা বা আধুনিক লেখকেরা কেহ এখনও ইহাকে চিহ্নিত করিতে পারেন নাই; আমিও এ পর্য্যন্ত পারি নাই। গম্ভীরা নদীর নাম জিনসেন কৃত আদি পুরাণে (২৯ অধ্যায়ে) পাওয়া যায়।

(viii) "দেব পূর্ব্বং গিরিং" (৪৬ শ্লোক)।

দেবগিরি, স্কন্দের পীঠস্থান, উডুম্বর কানন ময়। ইহার সন্তোষ জনক চিহ্নই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। উইলসন্ সাহেবের মতে ইহা চম্বলের দক্ষিণে মালবের দেবগড় নামক স্থান হইতে পারে। অন্য প্রমাণাভাবে কিন্তু ইহাতে সন্দেহ আছে।

(ix) "স্রোতোমূর্ত্ত্যাভুবি পরিণতাং
রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্" (৪৯ শ্লোক)।

রন্তিদেবের কীর্ত্তি যাহা পৃথিবীতে মূর্ত্তিমান স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছিল—তাহা চর্ম্মণ্বতী বা চম্বল নদী। ইহা মার্ত্তনগরের ৮।৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিন্ধ্য গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া, প্রায় ৫৭০ মাইল বাঁকা চোরা গিয়া যমুনাতে পড়িয়াছে। ইহা দ্বারা ও ইহার শাখা নদী গুলি দ্বারা মালব অধিত্যকার অধিকাংশ জল নিঃসারিত হয়। রন্তিদেব ও চর্ম্মণ্বতী সম্বন্ধে, মহাভারতের বনপর্ব্ব প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

(x) "দশপুর" (৫১ শ্লোক)। (৪৬)

চম্বল নদী পার হইলে দশপুর। ইহাকে ডাক্তর ফ্লীন সাহেব সন্তোষ জনক রূপে আধুনিক মান্দাসোরের সহিত চিহ্নিত করিয়াছেন [Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. iii, p. 79]. মান্দাসোর উজ্জয়িনী হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে, ও চম্বলের এক শাখা নদীর উপরে স্থিত।

দশপুর প্রাচীন স্থান। বৃহৎ সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে; কয়েক প্রাচীন খোদিত লিপিতেও ইহার নাম পাওয়া যায়। দশপুর সচরাচর অবন্তি দেশের মধ্যে যায়।

পাঠক দেখিবেন যে মালব দেশের বর্ণনা অন্য দেশের তুলনায় মেঘদূতে কত বেশী ও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামে পরিপূর্ণ। ইহা হইতে কি অনুমান করা যাইতে পারে না যে কবি এই দেশ ভাল রকম জানিতেন, সম্ভবতঃ স্বদেশ বলিয়া ?

চম্বলের ড্রেনেজ বেসিনে মালব অন্তর্গত, সুতরাং তাহার পৃথক্ বর্ণনা করিলাম না।

শ্রীমন্মোহন চক্রবর্ত্তী।

অধম।

ঢেলে দিতে নাহি পার স্নিগ্ধ পরিমল,
নিত্য তিক্ত বিষাদিত, জীবনের মূলে,
স্বর্ণ রৌপ্য মণিমালা চিন্তার সম্বল,
রেখেছ স্বার্থের বোঝা শিরোপরি তুলে।
অস্থি বদ্ধ কুটীরেতে, অন্ধ 'আমি' বসি
সুখ সুখ সুখ বলি উঠিছে গর্জ্জিয়া—
চুরি করে ফাকি দিয়া উঠিছ বিহসি
শান্তি বলি উঠ ফুলি অশান্তি কিনিয়া।

পিশাচের যত কিছু ঘৃণিত বিভব
করেছ আপন শৌর্য্যে সব অধিকার,
অবয়বে পরিচ্ছদে দেখায় মানব,
ভদ্র নামে অভিহিত সমাজ মাঝার,
একধারে নর পশু, পিশাচ, তস্কর
পিশুন, দুর্ম্মতি কূট, খল ভয়ঙ্কর।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

(স্বরলিপি।)

নতুন কিছু করো।

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাক গুলো কাটো, কাণ গুলো ছাটো,
পা গুলো সব উঁচু করো মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো,
কিম্বা চিৎপাত হয়ে পা গুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন উটের ওপর চড়ো;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।—

ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতি চাদর নিবারিণী সভা ;
প্যাণ্ট পরো, কোট পর, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ্ ধরো ;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও, কিম্বা খুব খানিক লেখো।
Bain Mill ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের খোরে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো।
একেবারে নিভে যাচ্চে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো ;
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব ;
মর্ব্বে না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো ;—
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

উদারা—স র গ ম প ধ ন
মুদারা—সা রা গা মা পা ধা না—
তারা—সো রো সো সো য়ো ধো নো
কড়ি—ঃ ; কোমল—় ।

১

সা সা রা গা, রা রা সা সা ; সা ধ সা রা: সা সা — — ।
ন তুন কি ছু ক র এক টা ন তুন কি ছু ক র — — ।

২

সো সো সো সো, না না না না ; ধা ধা ধা ধা : পা পা — — ।
না ক্ গু লো কা টো — — কা ণ্ গু লো ছা টো — —
পা পা* পা পা, পা ধা পা পা গা মা গা রা : মা গা — — ।
পা গু লো সব উঁ চু ক রে মা থা দি য়ে হাঁ টো — —
ধ সা সা সা, সা সা ৲সা সা ; সা ধ সা রা ; রা রা — — ।
হা মা গু ড়ি দা ও লা ফাও ডিগ্ বা জি খাও : ও ড়ো — —
গা গা* গা গা, গা গা গা গা ; রা- রা মাঃ মাঃ : পা পা — — ।
কি ম্বা চিৎ — পা ত্ হ য়ে পা গু লো সব ছো ড়ো — —
রা রা* গা মা, গা গা গা গা ; সা- ধ সা রা সা সা — — ।
পা গু লো সব ছো ড়ো — — পা গু লো সব ছো ড়ো — —
পা পা পা পা, পা পা গা গা ; গা গা সো সো সো সো — — ।
ঘো ড়া গা ড়ি ছে ড়ে এ খন উ টের ও পর চ ড় — —
রা রা গা মা, গা গা রা রা ; সা ধ সা রা: সা সা — — ।
ন তুন কি ছু ক র এক টা ন তুন কি ছু ক র — —
সা সা রা গা রা রা সা সা ; সা ধ সা রা : সা সা — — ।
ন তুন কি ছু ক র এক টা- ন তুন কি ছু ক র — —

অন্য চারি চরণ উপরি প্রদর্শিত ২ নং স্বরলিপি অনুসারে গেয়।

* "পা পা" "গা গা" "রা রা" এখানে প্রত্যেক স্বরের মাত্রার সংখ্যা এক দর্শিত হইয়াছে। সেরূপ গাহিলে চলে। অথবা (ঠিক যেরূপ গীতটির রচয়িতা গাহিয়া থাকেন) এখানে "পা পা" "গা গা" ও "রা রা" র যথাক্রমে প্রথম "পা," "গা" ও "রা" র মাত্রা ১½ এবং দ্বিতীয় "পা" "গা" ও "রা" রমাত্রা ½ ধরিতে হইবে। তাহার স্বরলিপি যথাক্রমে "পা পা-পা," "গা গা-গা," এবং "রা রা-রা" এইরূপ লিখিত হইবে ; হাইফেন (-) দিলে তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্বরের মাত্রা "অর্দ্ধ মাত্রা" বুঝিতে হইবে !

গৌরাঙ্গ।

(সমালোচনা)।

গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় সর্গের নাম "সন্ন্যাসী" এই সর্গ খুলিয়াই আমরা দেখি যে গৌরাঙ্গের চপল স্বভাব দূরীভূত হইয়াছে। তাঁহার মাতা তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিলেন।

"সোণার শৃঙ্খল, বেড়ী নির্ম্মাইল শচী
কল্পনায়,—গড়াইয়া মায়ার পিঞ্জর
ধরিতে নিমাই-পাখী সংসার বন্ধনে"
"গোরা ধরা দিল দুটি ভুজবল্লী পাশে
দুর্জ্জয় সৈনিক যেন শেষতক যুঝি
করিল সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ।"

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গৌরাঙ্গের বিবাহ একবার হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সে পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ক্রমে গোরা মাতৃ আজ্ঞায় গয়ায় পিতার পিণ্ড দিতে গেলেন। "পোষাপাখী নেহারিল আকাশ অসীম"। [এ উপমাটী ঠিক হয় নাই। পোষা পাখী আকাশ দেখিয়াই উড়িয়া যায় না। যে পাখী উড়িয়া যায় সে নিশ্চয়ই পোষ মানে নাই। "পোষাপাখীর" স্থলে "পিঞ্জরের পাখী" বলিলে ঠিক হইত] গয়ার পাদপদ্ম দেখিয়া গোরা ভাবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা পাইয়া হরি বোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। পরে "বিকল" হইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। প্রিয়ার "অযত্নসম্ভূত শান্ত কান্ত রূপরাশি" দেখিয়া "গোরা তার ভারে" "পড়িয়া বন্ধনে ছটফট করে গোরা বিহঙ্গের মত।" এখানে দেখা যায় যে গৌরাঙ্গের সংসার ছাড়িবার ইচ্ছা মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে "ছুটিতে শকতি নাই পুরাইতে সাধ।" অবশেষে এক দিন এক মানসিক ঝঞ্ঝা আসিল—

নহে তাহা সকলে, সকল কালের।
নিমেষের তাহা; কিন্তু করে সে সূচিত
সে প্রাণের সে যুগের মহাপরিণাম"
—অতি চমৎকার বর্ণনা।

তার পরে চৈতন্যের সন্ন্যাস বর্ণনা। ইহা যেরূপ গম্ভীর, তদ্রূপ মধুর। একটি উচ্চ অঙ্গের চিত্র।

"কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি উদিল সে দিন
নবদ্বীপে;

* * *

গোরা জাগিলা চমকি,
ভ্রমিতে লাগিল কক্ষে চঞ্চল চরণে।"

তাহার পর গৌরাঙ্গ যাহা যাহা দেখিলেন, যাহা যাহা ভাবিলেন, যাহা যাহা বলিলেন তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা। ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করা চলে না। মূলে পড়িতে হয়।

গৌরাঙ্গ চলিয়া গেলেন। জননী "একি স্থান শতবার করি" খুঁজিতে লাগিলেন। কি স্বাভাবিক! বিষ্ণুপ্রিয়া স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ কেশবকে ডাকিয়া বৈরাগ্যে দীক্ষিত হইয়া মুণ্ডিত মস্তক সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

জনৈক সমালোচক কোন পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া একটী গূঢ় তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে গৌরাঙ্গ শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া যা'ন! কবি "কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী" কোথায় পাইলেন? ইহা না আছে চৈতন্যচরিতামৃতে, না আছে চৈতন্য ভাগবতে, না আছে Stewartএর ইতিহাসে।—সর্ব্বনাশ! "হে কবি! আপনি এ কথা না জানিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন, কি সাহসে! এখন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গৌরাঙ্গ পুস্তক খানি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিউন। ধ্রুব প্রমাণ হইয়া গেল যে উহা কাব্যই নহে।

তৃতীয় সর্গে গৌরাঙ্গ "সাধক,"

"কোন অখণ্ডিত সত্য গুহ্য তত্ত্ব বীজ
উপ্ত হয়ে গেল ধর্ম্মে; অঙ্কুরিত হল;
দেখিতে দেখিতে ফল ফুল বিকাশিত
প্রকট হইল শেষে হৃদয়ের পটে ভক্তি
যার ভর ভক্তি প্রেম যার প্রাণ"

গৌরাঙ্গ ডাকিয়া উঠিলেন "পাইয়াছি"! পাইয়াছি"! এস্থলে কুতুহলী পাঠক অমনি বলিয়া উঠিবেন কি? "কি? কি পাইয়াছেন?" কিন্তু তাহার উত্তর শ্রীচৈতন্য দেব দেন নাই। তিনি "সাধনার ধন" পাইয়াছেন। কিন্তু সে

ধন তত্ত্বজ্ঞান না ঈশ্বর? পূর্ব্বে উদ্ধৃত পংক্তি হইতে বোধ হয় যে কোন সত্য "ভক্তি যার ভরভিত্তি প্রেম যার প্রাণ" তাহাই তিনি পাইয়াছেন। একটু অস্পষ্ট রহিয়া গেল।

গৌরাঙ্গ একদিন বাসন্তী পূর্ণিমায় [ইহার বর্ণনাটি অতি সংক্ষিপ্ত মধুর] চন্দ্রমাকে দেখিয়া কহিলেন তুমি ধন্য এত সুধা তুমি "অকুণ্ঠিত মনে জলে স্থলে চরাচরে আঁধারে পাথারে" বিলাইয়া দিতেছ। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যে আমার বিভব আমি এইরূপ বিলাইতে পারি"।

তাহার পরে তিনি সেই ভাবতত্ত্ব প্রচার করিয়া ঘরে ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। সে ভাবতত্ত্ব কি?

উঠিতেছে মহাবাণী গম্ভীর নির্ঘোষে
"ভক্তিছাড়া প্রেমহারা তপস্যা মলিন।"
গৃহীর গার্হস্থ্য পণ্ড; বীরের বিক্রম,
ধনীর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব, গুণীর প্রতিভা,
স্বদেশ বাৎসল্য ব্যর্থ!

পরে একদিন "নিতাই মিলিল আসি নিমায়ের সাথে" "আলোকে অনলে যেন হল সম্মিলন"। [উপমাটি বোধগম্য হইল না। আলোক কি অনল বহির্ভূত? অনল অর্থে বোধ হয় এখানে "উত্তাপ"] নিমাই নিতাইকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। শেষে একদিন নিতাই ভক্তবৃন্দসহ লক্ষ্মীপূজার দিনে নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলেন। এইদিনে নবদ্বীপ বর্ণন কবির একটী নূতন সৃষ্টি। সংযত রসিকতার চেষ্টা আছে। তাহা একেবারে নিস্ফল হয় নাই।

তাহার পরে মাতার সহিত নিমায়ের সাক্ষাৎ। এইস্থলে কবি তাঁহার কল্পনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন। এই চিত্রটি এই গ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র; ইহাতে তেজস্বিতা ও কোমলতা, একদিকে মাতার অভিমান, ও স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, অপর দিকে পুত্রের দৃঢ়তা সুন্দর ভাবে বিমিশ্রিত হইয়াছে।

এইরূপ দৃশ্য কল্পনা করা এবং এরূপ দৃশ্য চিত্রিত করা শুদ্ধ কবির সাধ্য, আর কেহ তাহা পারে? প্রমথ বাবুর নিন্দাবাদীদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন একবার গৌরাঙ্গের তৃতীয় সর্গটি ৮৫ পৃষ্ঠা হইতে হইতে ৯৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়ুন। তাঁহাদের নিন্দা স্তুতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে।

মাতা নিষ্ফল অভিমানের পরে ঘরে আসিয়া দরোজা বন্ধ করিলেন। তখন

বারেক কি স্নেহমোহে ভাবেন নি মাতা
পুত্র তাঁর কোনক্ষণে রুদ্ধ দ্বার ঠেলি'
দাঁড়াবে সহসা, কাঁদিয়া সাধিবে তাঁরে
মা জননী, ডেকে লও দুলালে তোমার।"
বারেক কি দ্বার পানে চান নি কুহকে
উৎসুক নয়নে, মাতা উন্মুখ শ্রবণে
গুরু গুরু বহে শ্বাস দুরু দুরু বুক।

একেবারে জাজ্বল্যমান প্রকৃতির ছবি পড়িতে পড়িতে সংসার ভুলিয়া যাই, মগ্ন হইয়া যাই, চক্ষে জল আসে। কবি যদি আর কিছু না লিখিয়া শুদ্ধ গৌরাঙ্গের তৃতীয় সর্গ লিখিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান করিতাম।

চতুর্থ সর্গের নাম "শিক্ষক"। উপেক্ষিতা মাতার সহিত উপেক্ষিতা বধুর সম্মিলন। উভয়ের সমবেদনায় ও সহবেদনায় ক্রন্দন; পরিশেষে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা ব্রত অবলম্বন; এ সমস্ত ব্যাপার অতীব স্বাভাবিক। বিষ্ণুপ্রিয়ার একটী উক্তি বড়ই করুণ, বড়ই তেজস্বী

"জান না কি দেবী
সুখ সুষুপ্তির স্বপ্ন; দুঃখ জাগরণ;
দুঃখ নহে দুঃখ শুধু, দুঃখ বড় সুখ"

তাহার পরে শচীর সহিত নিত্যানন্দের দেখা ও শচীর নিত্যানন্দকে আশীর্ব্বাদ।

"যে অবধি নিত্যানন্দ সংসারীর মত
রহিলা স্নেহের কাছে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে"

এই সর্গে একটী বারাঙ্গনার গৌরাঙ্গের প্রতি আসক্তি ব্যাপার বর্ণিত আছে, এটী আমাদের মতে অস্বাভাবিক হইয়াছে. বারাঙ্গনার "প্রতিশোধ" অদ্ভুত। পরে শিষ্যদিগের নিকট গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা হয়ত তাহা খুব শাস্ত্রীয় এবং বৈজ্ঞানিক। কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহা নীরস ও বর্জ্জনীয়। এক খানি দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে কাব্যরস পিপাসুর দম আটকাইয়া যায়। এই সর্গের শেষ ঘটনা গৌরাঙ্গ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে বিচারকের সহিত তর্ক করিয়া মুক্ত করিলেন। তাঁহার যুক্তি—

"কে করে বিচার কার ?
অতুল অমূল্য হেন মানব জীবন
সর্ব্ব শক্তিমান যিনি তাঁরো শ্রেষ্ঠ দান
নহে বিচারের বধ্য ক্ষুদ্র মানবের"
চাহিয়া রহিল স্তব্ধ যবন ক্ষণেক
কহিল গদগদ কণ্ঠে কে তুমি শিক্ষক
কি কথা শিখালে—কে করে বিচার ;
বন্দী—মুক্ত তুমি।"

যবন বিচারক এই যুক্তি শুনিয়া কেন যে "গদগদ কণ্ঠ" হইলেন, তাহা বিচারকই জানে। প্রথমতঃ এ যুক্তি ভ্রমাত্মক। ইহা ঠিক হইলে হত্যাকারীও বেকসুর খালাস পায়। সমাজ আত্মরক্ষার্থে আইন করিয়াছে, বিচারের নিয়ম করিয়াছে, বিচারক নিযুক্ত করিয়াছে। সমাজের বিপক্ষে অপরাধের বিচার সমাজে করিতেছে। "কে করে বিচাব কার" ইহা সত্য নহে। দ্বিতীয়তঃ এ যুক্তিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে হৃদয় আলোড়িত হয়, চক্ষে জল আসে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। যাহা হউক—

এরূপে আর্ত্তের হিতে দীনের সেবায়
রত রহিলেন গোরা ভক্তবৃন্দ সনে
এদিকে গোরার নাম শতরূপ ধরি
দূর হতে দূরান্তরে লাগিল ছড়াতে"

ক্রমশঃ

শ্রীসমালোচক।

মায়া।

(গল্প)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

May be true what I had heard—
Earth's a howling wilderness
Truculent with fraud and force.
—*Emerson*

নরেশ বাবুর স্ত্রী হীরামণি তাহার পরিচারিকা রসময়ীর নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক কথা রসময়ীর রচনা ও কবিত্ব তাহা পাঠক অবগত আছেন। হীরামণি সেই রচনার উপর আরও রং চড়াইয়া নরেশ বাবুকে কুমুদিনীর কথা বলিল। তাহাতে নরেশ বাবু বুঝিলেন, মহেশের স্ত্রী কুমুদিনী একটা ধড়িবাজ কুলটা স্ত্রী; ফাঁদ পাতিয়া নটবর নায়েবকে, শিবনাথ নায়েবকে, ও প্রবোধ বাবুকে মজাইয়াছে, এবং অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য একটা ফাঁদ পাতিয়াছে। নরেশ বাবু আরও স্থির করিলেন, নটবর নায়েবের কোন দোষ নাই, দোষ কুমুদিনীর। তাঁহার আদেশ মত সদর নায়েব পরগণার নূতন নায়েবকে পত্র লিখিলেন:—

"বিদ্রোহী প্রজাদিগের কঠিন ভাবে শাসন করিতে না পারিলে তোমার নায়েবি কাজ থাকিবে না। মহেশ যদি খালাশ হয় যাহারা মোকদ্দমা তদ্বির করিতেছে তাহারা এবং তুমি বরতরফ হইবে।" পরগণার নায়েব এই আদেশ পাইয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল; প্রজাদিগকে কাছারীতে ধরিয়া আনে, টাকা আদায় করে, নতুবা জুতা মারে। সে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া দুই পয়সা বেশ সংস্থান করিয়া লইল। জমিদার একথা কিছুই জানিতে পারিলেন না; প্রজারা এক্ষণে নিরুপায়। যদিও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কতকটা প্রজাদিগের পক্ষে—তথাপি তিনি শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য, এবং নরেশ বাবু একজন বড় সাহেব দ্বারা সরকার বাহাদুরকে বিশেষত চিফ্ সেক্রেটারিকে বুঝাইয়া ও অনুরোধ করিয়া কতকটা সরকার বাহাদুরের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার জন্য একটা

ইস্তাহার জারি করিলেন* এবং ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। ৩০২ জন কৃষক গ্রেপ্তার হইল। দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিত ৫৪ টা ফৌজদারি মোকদ্দমা হইল।† অনেকের জেল হইল।

এদিকে ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে বিদ্রোহী প্রজাদিগের মধ্যে তাহাই ঘটিল। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। মোকারিম সেখ যদিও লোক ভাল, তথাপি সে মধ্যে মধ্যে যদুর কাজে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "যদু ভীরু এবং স্বার্থপর।" যদু বলিল "মোকারিম গোঁয়ার এবং মুসলমানদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহে।" বস্তুতঃ মহেশের মত একজন নিঃস্বার্থ, সুবিবেচক, সমদর্শী ও দূরদর্শী, অসাধারণ বীরপুরুষের অভাব হইয়াছিল। ভীম ও ষড়ানন কয়েকটী লুঠ পাঠ করিয়া অনেক টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে প্রজাদিগের একমাত্র সহায় গুরুমহাশয় কালীকৃষ্ণ। সে উকীল মোক্তারের নিকট যায়, প্রজাদিগকে পরামর্শ দেয়। প্রজাদিগের প্রতি প্রবোধ বাবুর পূর্ব্বেও যেমন দয়া ছিল, এক্ষণেও তেমনি দয়া আছে।

---

* On the 4th. of Juiy 1873, the following proclamation was issued by the Government of Bengal to the cultivators in Pabna District.

"Whereas in the District of Pabna, owing to attempts of *Zaminders* to enhance rents and to combinations of *rayats* to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in riotous and tumultuous manner, and serious breaches of peace have occurred : this is very gravely to warn all concerned, that while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion and the Zamindors must assert any claims they may have by legal means only, on the other hand the Government will firmly repress all violent and illegal action on the part of the *rayats* and will strictly bring to justice all who offend against the law to whatever class they belong. The *rayats* and others who have assembled are herely required to disperse, and to prefer peaceably and quietly any grievances they may have, etc.

† "Under the Lieutenant Governor's instructions a party of Faridpore police, well armed was despatched from Goalando with the Pabna Magistrate. A body of one hundred armed police was also got together from the reserves of other Districts, and posted under an Assistant Superintendent at Kushtia to be at hand if required".

"Altogether there were 54 cases before the criminal courts in connection with these riots, and 302 persons were arrested, some of whom were concerned in several casses."— *The Bengal Administration Report for* 1872—73.

তিনি নরেশ বাবুর নায়েব যে বড় অত্যাচার করিতেছে, তাহা নরেশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, এবং এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরেশ বাবু অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বিদ্রোহী প্রজা শাসন করিতে হইলে যেরূপ কঠিন ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক তাহাই হইতেছে এই মনে করিলেন। প্রবোধ বাবু যখন দেখিলেন, নরেশ একান্তই তাঁহার কথা শুনিলেন না, তখন তিনি নরেশ বাবুর অনিষ্ট না হয়, অথচ প্রজাদিগের অত্যাচার নিবারণ হয় এইরূপ ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রবোধ বাবুর পরামর্শ মতে নরেশ বাবুর নূতন নায়েবকে একদিন খাস কামরায় তলব করিলেন, খুব ধমকাইলেন, যদি অত্যাচার ফের করে তাহাকে জেলে পাঠাইবেন বলিলেন, এবং তাহার মুচলেখা লইলেন। নূতন নায়েব জমিদারের নিকট লিখিলেন, "ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের পুণ্য বলে সমুদয় প্রজা শাসন করিয়াছিল, কিন্তু প্রবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হুজুরের এবং অধীনের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া যাহাতে অধীনের অবিলম্বে জেল হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। উকীল ও মোক্তারের পরামর্শে অধীন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাস কামরায় গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া হুজুরকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপ হইতে আপাততঃ রক্ষা করিয়াছে এবং অধীনও নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অধীনের মুচলেখা লইয়াছেন। এবং দারোগা বাবু অধীনকে গোপনে বলিলেন, কোন না কোন মোকর্দ্দমায় অধীনকে চালান দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বেই দারোগা বাবুর উপর হুকুম দিয়াছিলেন এবং সম্প্রতি কৃষ্ণপুর গ্রামের হানেফ মোল্লা তাহার ভাইকে অধীন গুমি করিয়াছে বলিয়া দারোগার নিকট মিথ্যা এজাহার করিয়াছে। এক্ষণও দারোগা বাবু ডায়েরি লেখেন নাই, ৫০০৲ শত পাইলেই তিনি এ সমুদয় মিটাইয়া দিতে পারেন। টাকা না দিলে যে মোকর্দ্দমা হইবে তাহাতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বিস্তর খরচ হইতে পারে। এ বিষয় কি করা কর্ত্তব্য বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। অধীনের কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী হইবে না। হুজুর মালিক।"

এই গুমির কথা নায়েবের রচনা—তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়। নায়েবের ৫০০৲ শত টাকা লাভ হইল। প্রজাদিগের এবং প্রবোধ বাবুর উপর নরেশ বাবুর ক্রোধ বাড়িল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে নরেশ বাবু একটী ভয়ানক নূতন বিপদ উপস্থিত। নরেশ বাবুর মাতার নাম দুর্গা। দুর্গার প্রথমে রামলাল নামক যুবার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। গাত্র হরিদ্রা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে। এই সময় নরেশের পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্য সুন্দরী বয়স্থা কন্যার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সন্ধান করিতে করিতে দুর্গার পিতার নিকট ভূপেশবাবুর ঘটক আসিল। দরিদ্রের গৃহে এই মনোমোহিনী কন্যারত্ন দেখিয়া সে দুর্গার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। দুর্গার পিতা বলিল, "গাত্র হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, এখন কেমন করিয়া হয়"? কিন্তু ঘটক বলিল, "২০ হাজার টাকা পাইবেন।" দুর্গার পিতা লোভে পড়িয়া তাহাতে সম্মত হইল। রামলাল গরিব, এই বিবাহে বাধা দিতে পারিল না। দুর্গার পিতা ২০ হাজার পাইল না, ১০ হাজার টাকা পাইল, বিবাহ হইল। কিন্তু পাপ অপাত রমণীয় হইলেও পরিণামে সুখজনক হয় না। এ পর্য্যন্ত ভূপেশের পুত্র হয় নাই। একটী মাত্র দৌহিত্র সন্তান ছিল, তাহার নাম শ্যামচাঁদ। তাহাকেই পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতে ছিলেন। নরেশের জন্ম হইল। শ্যামচাঁদের চক্রান্তে ভূপেশ তখন মাসে মাসে বেনামী চিঠি পাইতে লাগিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"দুর্গার বিবাহের পূর্ব্বে রাম লালের সহিত তাহার অসঙ্গত ঘনিষ্টতা ছিল তাহার প্রমাণ আছে"। এই কথাতে ভূপেশের মনে চঞ্চলতা হইত, কখন কখন সংশয় হইত। কিন্তু দুর্গার রূপ-রাশি যখনই দেখিতেন, তাঁহার সংশয়-তাপিত হৃদয় শীতল হইত। কাল ক্রমে দুর্গার রূপের ভাটা পড়িল। একদিন তিনি দুর্গাকে বলিলেন "দেখ বিবাহের পূর্ব্বে তোমার চরিত্র দোষের কথা শুনা যায়, প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহার পর রামলালের সহিত তেমার এক প্রকার বিবাহও হইয়া গিয়াছিল—এবং আমার সহিত যে বিবাহ হইয়াছে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, সুতরাং সিদ্ধ নহে ।আমি তজ্জন্য একখানি উইল করিয়াছি। তাহাতে আমার সমুদয় বিষয় আমার দৌহিত্রকে দিয়াছি। উইলে তোমাকে এবং নরেশকে মাসিক দুই শত টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" দুর্গা অবাক্। পরে সে কাঁদিল কাটিল, শপথ করিল, পায়ে ধরিল। ভূপেশ অটল। ভূপেশ বাহিরে গেলে, দুর্গা নিজের শয়ন ঘরের

দ্বার বন্ধ করিল, খাইল না, কেবল একলা কাঁদিল। অবশেষে তৃতীয় দিবস দ্বার খুলিল—বিষ খাইবে স্থির করিল। কিন্তু পুত্রের মায়াতে তাহা পারিল না নিজের দুঃখের কথা সমুদয় ললিতাকে বলিল। ললিতা শ্যামচাঁদের চর, শ্যাম -চাঁদকে তাহা বলিল।

এদিকে ভূপেশ বাবু প্রবোধ বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন। প্রবোধ বাবু যদিও ওকালতি ব্যবসায় করেন না, তথাপি তিনি B, L. খুব আইনজ্ঞ, অল্প বয়সে অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁহাকে ভূপেশ বাবু উইল দেখাইলেন প্রবোধকে নরেশ "দাদা" বলিত। প্রবোধ বাবুও নরেশ বাবুকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন। প্রবোধ ভূপেশ বাবুকে বলিলেন "আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিয়া আমার মত দিব। এমন গুরুতর ও কঠিন বিষয়ে সহসা একটা কাজ করা উচিত নহে।" কিছু কালের মধ্যে প্রবোধ বাবু, দুর্গা সম্বন্ধে যে সকল দোষারোপ করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। তখন একদিন ভূপেশ হাসিতে হাসিতে দুর্গার নিকট আসিয়া নিজের ভুল তাহা স্বীকার করিলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। দুর্গা আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপেশ বলিলেন আমি যে উইলের মুসবিদা করিয়াছিলাম, তোমার সাক্ষাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছি। দুর্গা তাহার হাত হইতে উইল খানা লইয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বর, আমি উহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

এই বলিয়া বালিশের নীচে তাহা রাখিয়া দিলেন। স্বামী ও স্ত্রী আবার নবীভূত প্রেমে রজনী যাপন করিলেন। পরদিন পোড়ামুখী ললিতা সুযোগ পাইয়া এই উইল চুরি করিল ও শ্যামচাঁদকে দিল। শ্যামচাঁদ যত্নে তাহা রাখিল। বহু বৎসর পরে নরেশ বাবু উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহার সদর কাছারীর জালিয়ত পেস্কার সেই উইল খানিতে ভূপেশ বাবুর এবং দুই একটি মৃত লোকের নাম জাল করিল এবং নিজে ও আর একজন আমলা, শ্যাম-চাঁদের টাকা ও আশ্বাস বাক্যে বাধ্য হইয়া, সেই জাল উইল সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিল। শ্যামচাঁদ ঐ জাল উইলের প্রোবেটের জন্য আদালতে দরখাস্ত করিল।

নরেশ বাবু এই উইলের মোকর্দ্দমার বিষয় জানিয়া বিপদের উপর মহাবিপদ অনুভব করিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় প্রবোধ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বড়লাট সম্বন্ধে গ্রন্থ।

THE FAILURE OF LORD CURZON.
An Open Letter to the Earl of Rosebery
A Study in Imperialism.

BY

Twenty-Eight years in India.

Rs 2—as 4.

"Give us men. A time like this demands
Great hearts, strong minds, true faith and willing hands ;"
—*Oliver Wendell Holmes*

"It should not be forgotten, however, that but for the protest of Lord Curzon, the starving peasantry of India would with the assent of the Unionist Cabinet have been saddled with half the cost of the garrison which the war has rendered it necessary to maintain in South Africa."

"লর্ড কর্জ্জনের বিফলতা" নামক পুস্তকে বিলাতে একটু আন্দোলন হইয়াছে লেখক অষ্টবিংশতি বৎসর ভারতে বাস করিয়াছিলেন তাই আপনার নামের পরিবর্ত্তে—"অষ্টবিংশতি বর্ষ" ব্যবহার করিয়াছেন। গ্রন্থকার সহৃদয় ব্যক্তি, ভারতবাসীর ব্যথার ব্যথী, ভারতের করুণ আর্ত্তনাদে দ্রবিত-হৃদয়। অনশন-মৃত-কৃষককঙ্কাল-বিকীর্ণ, দুর্ভিক্ষ-জর্জ্জরিত ভারত ক্রমেই সমৃদ্ধি সোপানে আরোহণ করিতেছে—এই যে মারাত্মক ভ্রম ব্রিটিশ রাজনীতিকে অন্ধ করিয়া, ভারতের ঘোর দুর্দ্দশা দিন দিন ঘোরতর করিতেছে, তাহা এই পুস্তকে প্রমাণ পুঞ্জে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিলাতের আধুনিক বাদশাহিয়ানা যে জাতীয় অধর্ম্মাচরণের নামান্তর মাত্র,—পরস্বহরণ-লিপ্সা, পামর-স্বদেশিকতা—তাহা গ্রন্থকার অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন অধীন জাতিগণের অর্থশোষণ করিবার জন্য, অথবা নিযুত নিযুত লোককে অনাহার-মৃত্যুর অশেষ যন্ত্রণা দিয়া, বিপলা চমূ রচনা করিবার জন্য জগদীশ্বর ইংলণ্ডকে সাম্রাজ্য দেন নাই। *

---

* "Imperialism has been defined, as the policy of doing unto others what you would die rather than have done to yourself or a kind of rogue patriotism, that regards the love of country, one of the noblest of human

ব্রিটিশশাসিত ভারতে যে কোন কোন স্থানে সুখ সমৃদ্ধি আছে, তাহা গ্রন্থকার স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা কেবল মাত্র রেলপথ বা মহারথ্যা পার্শ্বস্থিত নগরে বা গ্রামে। *

বেতনভোগী বা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যাহাদিগের আয় বার্ষিক এক সহস্র টাকার অধিক নহে, তাহাদিগের এক্ষণে আদৌ টেক্স দিতে হয় না। কিন্তু কৃষকের বার্ষিক আয় ১০০৲ বা ৫০৲ বা ১০৲ বা যতই কম হউক না কেন, তাহাকে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই শতকরা ৫৫৲ টাকা করিয়া বার্ষিক আয়ের উপর কর দিতে হয়। †

জিজ্ঞাসা করি এখানে শ্রীযুক্ত এডাম স্মিথের ও শ্রীযুক্ত মিলের কর-সূত্র (maxims of taxation) কোথায় রহিল ?‡

গ্রন্থকারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই ;—ভারতের কৃষিজীবিব্যক্তিগণ যদিও ঘোর দারিদ্র্যে নিমগ্ন তথাপি তাহারা অতিগুরুকরভারে নিষ্পেষিত,—

---

feelings only as a commercial asset and a cloak for international dishonesty. * * * When God gave empire to England, it was not in order to fleece subject races nor in order to buildup great armies at the cost of such a mass of human misery as the slow starvation of millions and millions of people in India involves (pp. 10-11.)

* "Civilisation and an appreciable degree of comfort mark the cities and hamlets along the rail roads and main high ways. The commercial activity of many markets, the sleek native trader and sleeker European merchant, the smartly dressed railway servants, the grainladen carts, and the general appearance of well-being, are noticeable on every side in such localities. The ordinary traveller, the three months-in-India-tripper, is naturally deceived. But out on the veldt, not only in remote villages, but in the suburbs of the towns, the huts of the peasantry are squalid and empty, oppressed by a dire poverty, which all the highest authorities on Indian administration feel to be the most anxious question of the future. Two thirds of the Indian population some 200, 000, 000 of human beings, are made up of ever hungry cultivators and day labourers (pp. 11-12)

† "And yet it is a fact that in prosperous India the annual taxation on land over nearly all its provinces is equivalent to at least a 55 per cent income tax" (p. 13)

‡ The subjects of every state ought to contribute to the support of the Government as nearly as possible in proportion to their respective abilities ; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state." (Mill)

ইহা সর্ব্বযুক্তি বহির্ভূত ব্যবস্থা,—আর বর্ত্তমান ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সর্ব্বনাশিনী নীতির পোষণ ও বর্দ্ধন করিতেছেন।*

যখন মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য ব্রিটিশ শাসনের অধীন হয়, অর্থাৎ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভূমির কর ৮০ লক্ষ মাত্র ছিল, তাহার পর লম্ফে লম্ফে এই কর বৃদ্ধি কিরূপ করা হইল দেখুন :—

ইং সাল	কর
১৮১৭	৮০ লক্ষ
১৮১৮	১১৫ লক্ষ
১৮২৩	১৫০ লক্ষ (ছয় বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ)
১৮৩৬-১৮৭২	২০৩ লক্ষ

১৮৬৬ হইতে আবার কর বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮২৩ সালের করবৃদ্ধি কিরূপ ভীষণ উপায়ে সংসাধিত হইয়াছিল তাহা ইংরাজ শাসনকর্ত্তার মুখে শুনুন—

"Every effort was made—lawful and unlawful—to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to torture in some instances cruel and revolting beyond description if they could not or would not yield what was demanded." (p. 21).

এই বর্ণনা বর্ক বা সেরিডনের অগ্নিময়ী বক্তৃতার অতিরঞ্জিত ভাষা, একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। ইহা দায়িত্ব-শূন্য ব্যবসায়ী আন্দোলকগণের অমূলক বাক্য নহে। ইহা দেশীয় সংবাদ পত্রের "দুষ্ট বিদ্বেষোদ্গার" নহে। ইহা বম্বে গবর্ণমেণ্টের ১৮৯২-৯৩ সালের শাসন বিবরণীর ৭৬ পৃষ্ঠে লিখিত আছে। হতভাগ্য দীনহীন প্রজাকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া যে কর বৃদ্ধি সম্পাদিত হয় তাহাই প্রজাদিগের সৌভাগ্য-বৃদ্ধির প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত ও ঘোষিত হয়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৩০ বৎসরে শতকরা ৩০ টাকা খাজনা বৃদ্ধি হওয়াতে দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে ২০ বৎসরে শতকরা ৩১৲ খাজনা বৃদ্ধি হওয়াতে দুর্ভিক্ষাদি ঘটিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ও আত্যন্তিক কর

* "My chief thesis in the following pages is that the agricultural classes, who are sunk in poverty are taxed beyond all reason, and that present Government of India is continuing and accentuating a desolating policy."

বৃদ্ধির মধ্যে যে কতকটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এ কথা ইংলিশম্যান সংবাদ পত্রও আলোচনা করিয়াছেন। *

গ্রন্থকার যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, যে করভারতন্ত্রে ভারতের দীন হীন প্রজাবৃন্দ অনশনে মরিতেছে, তাহা লর্ড কর্জ্জন ভারতে আসিবার অনেক পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং লর্ড কর্জ্জন ইচ্ছা করিলে যে ভারতের এই রুধির-স্রাব বন্ধ করিতে পারিতেন, তাহা বোধ হয় না। লর্ড রিপণ ১৮৮৩ সালে মান্দ্রাজের অনুচিত কর বৃদ্ধি কতকটা নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৈ, পারিলেন না? বিলাতে ভারত সচিব গয়ংগচ্ছ করিয়া কাল যাপন করিলেন এবং যখন লর্ড রিপণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব ভারত-সচিব কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল (p. 28)। লর্ড রিপণ আমাদের প্রতি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করাতে, তিনি বড়লাট হওয়া সত্ত্বেও, স্বদেশীয়ের নিকট তাঁহাকে কত অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল।

আমরা অতিশয় নির্ব্বোধ ও নিরুপায়, তাই যেখানে যাহা পাইবার কোনই প্রত্যাশা নাই, সেখানে সজলনয়নে কর-যোড়ে তাহাই প্রার্থনা করি। শিয়ালদহ ষ্টেশনে লর্ড রিপণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যখন ভারতবাসী কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে স্রোতের ন্যায় ধাবিত হইয়া ষ্টেশন-গৃহ প্রাঙ্গণ রাজপথ লোকাকীর্ণ করিয়াছিল—বাষ্পযান লর্ড রিপণকে বক্ষে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল—অমনি দাসজাতি বৃথা উল্লাসে ঐকতানিক বাদ্য

* "In that year, 1858-59, the land revenue of Madras was under 3¼ millions sterling, and its average during the previous five years, had been under 3½ millions. In 1876, the year before the late famine it was 4½ millions; and this may be taken as its lowest average at the present time, excluding seasons of dearth. Twenty years of British rule have, therefore increased the goveranment demand upon the agriculturists of Madras by over one million or one third of the whole land revenne paid by that Presidency to the Company in 1858. There are not wanting those who affirm that this increased taxation had much to do with the late calamity. The hnsbandmen were less able according to this view, to bear the strain of bad seasons, *in consequence of the enormous increase in the revenue taken from them*"—The Englishman, February 17, 1880)

বাজাইল—তাহা শুনিয়া আমাদের দৈন্য ও হীনতার গভীরতা অনুভব করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

ভারতের বড়লাট বিলাত হইতে যেরূপ আদেশ পান, সেইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সূক্ষ্মদর্শী প্রশান্ত লর্ড ডার্ব্বি (the late Lord Derby) ভারত-সচিব না থাকিলে, লর্ড ক্যানিংকে লাঞ্ছিত হইতে হইত। সার চার্লস উড (Sir Charles Wood পরে Viscount Halifax) গবর্ণর জেনারলকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার মন্ত্রণা উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতবাসীর প্রতি লর্ড নর্থব্রুক (Lord Northbrooke) অতিশয় সদয় ছিলেন। কিন্তু লর্ড সল্‌সবেরি (Lord Salisbury) এমন তীব্র ভাবে লর্ড নর্থব্রুকের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিয়াছিলেন যে মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সার হেনরি ফাউলার যখন ভারতসচিব হইয়াছিলেন তখন তিনি আমাদের বড় লাটকে তাঁহার হাতের পুত্তলিকা বিবেচনা করিতেন।

ভারত বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রাইট সাহেবকে একবার ভারত সচিব করিবার প্রস্তাব হয়। তাহাতে তিনি অস্বীকার হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন "আমি ভারত সচিব হইলে আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিব। আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিলে আমাদিগের এই লিবারেল মন্ত্রী-সভা অচিরাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

আমাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা বড়লাট নহেন, ভারত সচিবও নহেন, আমাদিগের কর্ত্তা সমুদয় ইংরাজ জাতি। তবে ভারতের কোন বিষয় যখন ইংরাজদিগের মধ্যে দুই দলের ভিন্ন ভিন্ন মত হয়, এবং তাহার মধ্যে একটী মত ভারতের হিতজনক, আর একটী মত অহিতজনক, তখন বড়লাট ভারতের হিতজনক মতের পোষকতা করিলে, তিনি ভারতের উপকার করিতে পারেন। যেমন লর্ড কর্জ্জন প্রতিবাদ না করিলে, দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যের ব্যয়ভারের অর্দ্ধেক ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কৃষকদিগকে বহন করিতে হইত। ইংরাজ জাতির গৌরব এই দেখিতে পাই, যেমন একদিকে স্বার্থের অন্ধ তমিস্রা তাহার রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি অন্যদিকে কোথা হইতে ন্যায়পরতা-দীপশিখা জ্বলিয়া সেই ঘোর তমিস্রাকে বিদূরিত করে। একদিকে স্বার্থসিদ্ধ ডিজরেলি (Lord Beaconsfield) আর একদিকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বরেণ্য ব্রাইট—একদিকে লর্ড জর্জ্জ হামিল্টন আর এক দিকে মহাত্মা উদারবর্ণ (W. Wedderburn)—এক দিকে ব্রোড্রেক (Brodrick) অন্য দিকে লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon)—

আবার এক দিকে কার্জ্জন (Lord Curzon) আর এক দিকে ওডনেল (C. J. O. Donnell)। অনেক ইংরাজকর্ম্মচারিগণ ভারতের মঙ্গলের জন্য সময় সময় নিজের পদোন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া যেরূপ উপরিতন কর্ম্মচারীর মতের বিরুদ্ধে স্বকীয় মত প্রকাশ করেন, তাহা বোধ করি বাঙ্গালীকর্ম্মচারীর মধ্যে অল্পই দেখা যায়। মহানুভব কটন সাহেব (Sir Henry Cotton) আসামকুলিদিগের মঙ্গলার্থে বঙ্গেশ্বরের উচ্চপদলাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ম্যাকেনজী সাহেবও অহিফেন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রণার প্রতিবাদ করায় যথা সময়ে ছোটলাট হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ভারতবন্ধু হিউম সাহেবও ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে গবর্ণমেণ্টের প্রতিবাদ না করিলে ছোট লাটের পদ পাইতে পারিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ইহা ইংরাজজাতির গৌরবের বিষয়।

Sir Walter Raleigh সম্বন্ধে Cecil বলিয়াছেন "He can toil terribly"। আমরাও বলি "লর্ড কর্জ্জন ভয়ানক পরিশ্রম করিতে পারেন"। তাঁহার প্রতিভাও সর্ব্বমুখী। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিভা ও পরিশ্রমের আধিক্যে ভারতবাসী ব্যথিত। ১। যে করভারে অযুত অযুত ভারতকৃষক দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরিতেছে, তিনি তাহাই সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডিগ্‌বি (Digby), মহাত্মা ওয়েডারবরণ (Wedderburn), সহৃদয় ওডনেল (C. J.O Donnell), সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র (R. C. Dutt Esq), সুধী গোখেল (Gokhale) প্রভৃতি মহোদয়গণ মারাত্মক করবৃদ্ধি উপশম করিবার জন্য যে মহতী চেষ্টা করিতেছেন, লর্ড কর্জ্জন তাহার সহিত যোগ না দিয়া, তাহা নিষ্ফল করা পক্ষে সহায়তা করিতেছেন।*

২। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার রোধ করিয়াছেন।

৩। তাঁহার নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইলে দেশীয় কলেজ গুলির ধ্বংস হইবে, দরিদ্র লোকের পক্ষে শিক্ষালাভ করা নিতান্ত কঠিন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বিল বা পাণ্ডুলিপি বাহির হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ নহে।

---

* See his famous Resolation of the 16th January 1902 on the land revenue policy of the Government of India.

৪। করভারশীর্ণ, অশ্রুসিক্ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, দীনকৃষকপুঞ্জ হইতে যে অর্থ কত কষ্টে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাই তিনি দিল্লীর দরবারে বৃথা আড়ম্বরের জন্য জলের মত ব্যয় করায় চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসী নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

৫। গত ২৫ বৎসর খাদ্যের মূল্য শত করা ৪৪ টাকা বাড়িয়াছে কিন্তু আসামে চা বাগিচার কুলীদিগের বেতন বাড়ে নাই। তথাপি আসামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর ন্যায়পরায়ণ শ্রীযুক্ত কটন সাহেব (Sir H. Cotton) কুলীদিগের যে সামান্য বেতন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও লর্ড কর্জ্জন বিফলীকৃত করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জ্জন আমাদিগের যে অপ্রিয় বা ব্যথাজনক কার্য্য করিতেছেন তাহা স্বজাতির স্বার্থের চাপে তাঁহাকে করিতে হইতেছে বোধ হয়। ইংলণ্ডে এক্ষণে বাদশাহিয়ানার বন্যা আসিয়াছে। লর্ড কর্জ্জন সেই বন্যার গতি রোধ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি গঙ্গাস্রোতে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেন। রাজনীতির কথা, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা। ধর্ম্মনীতির কথা, প্রজাদিগের কর্ম্মই নিজের হর্ত্তা কর্ত্তা। হিন্দুদিগের এই প্রাচীন "কর্ম্মফল" ইংরাজ কবিও গাহিয়াছেন—

"Man is his own star ; and the soul that can
Render an honest and a perfect man,
Commands all light, all influence all fate,
Nothing to him falls early or too late ;
Our acts our angels are or good or ill
Our fatal shadows that walk by us still."

Epilogue to Beaumont and Fletcher's Honest Man's Fortune.

সাহিত্য দরবার।*

সুধা, ভাদ্র ১৩১০

শক্তিবাদ—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র ইহাদিগের মধ্যে কোন্ শাস্ত্র শক্তিবাদের মূল তাহাই নিরূপণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধটিতে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রমাণ

* "সাহিত্য দরবারে পুস্তকের প্রবেশ নিষিদ্ধ" নহে। উপযুক্ত পুস্তকের আগমন হইলে সসম্মানে দরবারে স্থান পাইবেন। নঃ প্রঃ সঃ

পাওয়া যায়। লেখকের মতে পুরাণই শক্তিবাদের মূল। বেদ সংহিতায় এই শক্তিবাদ কোথাও পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ হয় নাই। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ও দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে (দেবীসূক্ত) শক্তিবাদের আভাস আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত শক্তিবাদ যাহা তাহা কোন স্থলে পরিস্ফুট ভাবে ধারণা করা হয় নাই। কোন কোন শাক্ত পণ্ডিত বলেন বেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র হইতেই এই স্ত্রীরূপে চিন্তনীয় আদি শক্তির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র যে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও সেই জন্য গৌণভাবে কেহ বিষ্ণুকে, কেহ শিবকে, কেহ গণেশকে, গায়ত্রী দেবতা বলিয়া কল্পনা করেন। সুতরাং গায়ত্রীকে শক্তিবাদের মূল বলিয়া স্পষ্ট ধরিতে পারা যায় না। অতএব প্রমাণ হইল যে বেদে শক্তিবাদের আভাস থাকিলেও শক্তিবাদের মূল বেদ নহে।

উপনিষদের মধ্যে দশ খানিই প্রধান ও মূল বলিয়া গণ্য। এই মূল উপনিষদ কয়খানির মধ্যে কোথাও শক্তিবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত উপনিষদ আছে। কিন্তু ইহারা আধুনিক, ও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইহাদিগের সৃষ্টি। কালী উপনিষদ, তারা উপনিষদ, ভুবনেশ্বরী উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তিবাদের তত্ত্ব লিখিত থাকিলেও যখন ইহারা শক্তিবাদ প্রচারিত হইবার পর লিখিত তখন তাহা-দিগকে শক্তিবাদের মূল বলা যাইতে পারে না।

মূল ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচারিত থাকে কোন না কোন দর্শন গ্রন্থে তাহা যুক্তিবলে সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করা হয়। যখন কোন দর্শন গ্রন্থেই শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন সম্ভব, বেদ কিম্বা উপনিষদ শক্তিবাদের মূল নহে।

স্মৃতি ব্যবস্থাপক ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহাতে শক্তিবাদের উল্লেখ থাকা অসম্ভব। শক্তিবাদ বুঝাইবার জন্য তন্ত্রের সৃষ্টি; সুতরাং তন্ত্র কখনও শক্তিবাদের মূল হইতে পারে না।

পুরাণই যে শক্তিবাদের মূল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে যে উপাখ্যান আছে তাহা হইতে জানা যায় সুরথ ও সমাধি প্রথমে চণ্ডীপূজা প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতেও এই কথা প্রতিপন্ন হয়।

'ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, পূর্ব্বে চণ্ডীপূজা প্রচারিত ছিল না। বেদে চণ্ডী কি

দুর্গা বলিয়া কোন দেবীর উপাসনার ব্যবস্থা নাই। বৈদিক কালের পরে কোন সময়ে এই চণ্ডী দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর সেই চণ্ডী দেবীর পূজা হইতে ক্রমে ক্রমে শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চণ্ডী গ্রন্থের প্রচারের পূর্ব্বে শক্তিবাদ কতদূর পরিণত হইয়াছিল অথবা আদৌ প্রচারিত ছিল কি না তাহা জানিবার আমাদের উপায় নাই।"

"এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে শক্তিবাদের মূল পুরাণ। আর পুরাণ মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণই শক্তিবাদের মূল গ্রন্থ। আর মার্কেণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল।"

অব্যবসায়ী ইংরাজীনবিশ সখের পণ্ডিতগণের শাস্ত্রব্যাখ্যা বিস্রব্ধ ভাবে গ্রহণ করা নিরাপদ নহে অনেকেরই এই সংস্কার আছে। ইংরাজ পণ্ডিত-গণও এই বাঙ্গালী লেখকের ন্যায় ভ্রান্ত মত প্রচার করেন। নবপ্রভায় এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তই লেখকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

বঙ্গের দারিদ্র্য ও তন্নিবারণোপায়। লেখক বলেন,—

"এখন, চাকুরি ছাড়া সেই অন্ন জীবিকা কি হইতে পারে? স্বাধীন কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ে ধনোৎপাদন, বানিজ্যে ধনাগম। ইহাতে আপনা হইতেই দারিদ্র্যের কারণ দূরীভূত হইবে।"

ব্যবহারিক বিষয় প্রবন্ধ দেখিলে আমরা আহ্লাদিত হই। "সান্ত অনন্ত" "ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড" প্রভৃতি প্রবন্ধ অপেক্ষা ব্যবহারিক প্রবন্ধ বর্ত্তমান কালে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে না আছে চিন্তাশীলতা, না আছে অনু-সন্ধানের পরিচয়। যখন ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের কথা হয়, তখন যে সকল দেশীয় মহানুভব ব্যক্তি ইহাতে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন প্রথমে তাঁহাদিগের পরামর্শ আলোচ্য। এ বিষয় শ্রীযুক্ত টাটা বা শ্রীযুক্ত ওয়াচা প্রভৃতি যাহা বলেন তাহা লেখক সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া দিলে পাঠক অধিকতর উপকৃত হইতেন; আর ৺রাণাদের ন্যায় বহুদর্শী গভীর চিন্তাশীল মহানুভব ব্যক্তি তাঁহার Indian Economics নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রবন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলে ভাল হইত। ওয়াচা বলেন (১) মূলধন সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করা আবশ্যক, (২) নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষারও নিতান্ত প্রয়োজন,* (৩) এ বিষয়টা যত সহজ অনুমিত হয় তত সহজ নহে।† অন্য

---

* "Where not even five per cent of the population is literate, could we expect that there could be any industrial development without education even assuming that capital was forthcoming?"—*Mr. Wacha.*

† "The subject is not so simple as it is light-heartedly imagined to be" —*Mr. Wacha.*

দিকে সুধী রাণাদে দেখাইতেছেন যে, ভারতে প্রতি বৎসর ৩ কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং ৯ কোটী টাকা মূল্যের রৌপ্যের আমদানী হয়। (১৮৯০) তাহার মধ্যে ৭ কোটী টাকার রৌপ্য মাত্র টাঁকশালে যায়, অবশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য দেশে সঞ্চিত ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ৮ কোটী টাকার দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি হইতে পারে। (২) যৌথ কারবার নিয়মানুসারে মূলধন বৃদ্ধি হইতে পারে। (৩) বিদেশীয় শিল্পী ও যন্ত্র আনিয়া এক্ষণে কার্য্য করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। কালীপ্রসন্ন বাবুর মতে "ভদ্র সন্তান অপেক্ষা বাঙ্গালী চাষার অবস্থা ভাল।" কিন্তু দেশের বার আনার অধিক লোক কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহা হইলে দেশের বার আনা লোকের অবস্থা ভাল অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের অবস্থা ভাল। যদি এই কথা সত্য হইত তাহা হইলে দেশের অবস্থা মোটের উপর ভাল বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। চাষা-দের অবস্থা ভাল নহে। তাহারা ঋণে আকণ্ঠ নিমগ্ন, এমন কি অনেকেই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। তাহার পরে কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন "বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজা ভূমিকরভারে ক্লান্ত নহে"। যদি "দরিদ্র প্রজা ভূমি-কর ভারে ক্লান্ত নহে" তবে বাকী খাজনার নালিশে আদালতে নিত্য বাকী পড়া জমী নিলাম হয় কেন? যদি কোন সনে অজন্মা হয় প্রজাদিগের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় কেন? লেখক যখন সুখে "সুধা" পান করেন তখন অন্ন না পাইয়া পল্লীগ্রামে প্রজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় কেন? "অন্যান্য নানাবিধ কর যাহা আছে তাহাও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকের স্কন্ধে। পথকর প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরাই দেন" তাহার অর্থ কি প্রজারা পথকর দেয় না? প্রজারা পথকর দেয় এই সামান্য কথা তাহাও কি লেখক জানেন না? লেখক ধনতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন "ইংরাজরাজ বঙ্গ হইতে বহু অর্থ স্বদেশে নিতেছেন" "কিন্তু * * টাকা কড়ি প্রভৃতি ধন নহে"—"দেশের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া গেলেও ইংরাজ আমাদিগকে কিছু অসুবিধায় ফেলিতে পারেন বটে......" অর্থাৎ লেখকের জ্ঞান আছে ইংরাজ ভারত হইতে স্বর্ণ রৌপ্য লইয়া যায়। বার তের কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য যে ভারতে আমদানি হয় এবং কম বেশী এক কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য রপ্তানি হয় তাহা কি লেখক

"This hoarding at least proves that nearly eight crores of Rupees may be each year turned to capital account, if we are only resloved to use it"—*Mr. Ranade.*

অন্তর্গত নহেন? ইংরাজ যে টাকা ভারত হইতে লয়েন তাহার পরিণাম ফলে ভারত হইতে টাকা স্বর্ণ বা রৌপ্য মোটের উপর কমিয়া যায় না, কারণ treasure যে পরিমাণে রপ্তানি হয় তাহার বার গুণ অধিক পরিমাণে আমদানী হয়। ইংরাজের অর্থশোষণে প্রায় ১৪ কোটি টাকার শস্য প্রতিবৎসর বাহির হইয়া যায়। শস্য আহার করিতে না পাইয়া পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারত কৃষক ঝাঁকে ঝাঁকে অনশনে মরিয়া যায়। এই প্রবন্ধটীর নাম দেখিয়া যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, পাঠ করিয়া তেমনি দুঃখিত হইলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম সম্পাদক কেন এমন অমার্জ্জনীয় ভ্রান্তি পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে দেখিলাম যে ইহা সম্পাদকের নিজের লেখা। আর কি লিখিব। পক্ষপাতশূন্য সমালোচকের কর্ত্তব্য কাজ করিতে গিয়া পাছে যাঁহারা আমাদের দয়া করেন তাঁহাদিগের দয়া হইতে বঞ্চিত হই এই আশঙ্কা। কিন্তু সমালোচক প্রকৃত কথা বলিতে বাধ্য।

নবনূর। ভাদ্র।

"কার দোষ" উল্লেখ যোগ্য। বলিয়াদীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত কে, এ, সিদ্দীকী ইহার লেখক। কার দোষ বিচার করিবার জন্য পাঠকগণের সম্মুখে মকদ্দমার নথি পেশ করিলাম।

আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?
তুমিই আপন হাতে চিঠির শেষের পাতে,
লিখিতে শিখালে মোরে 'হেমলতা বোস'।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

২

প্রতিদিন নিজ হাতে সিন্দুর মুছিয়া দিতে,
ঘোমটা খুলিয়া দিতে—সাধের মুখোস্।
এখনো পরিলে শাড়ী তুমি বল গেঁয়ে নারী,
গাউন্ বডী পরে তাই মিটাই আপশোস্।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

৩

প্রভাতে সন্ধ্যার বেলা—ঘর লেপা দীপ জ্বালা,
ছিল মেয়ের নিত্যকর্ম্ম পরম সন্তোষ,
তুমি ত শিখালে সখা কাদা ও গোবর মাখা
অতিশয় অসভ্যতা—জাতিগত দোষ!
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

৪

আমিত ভাবিনি কভু ওহে রমণীর প্রভু,
বাট্না বাটিতে যায় নখের খোলস্;
রাঁধিতে দাওনি মোরে গায়ে যদি কালি ভরে,
কাজেই রয়েছি যুড়ে এই তন্ পোষ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

৫

তুমিত শিখালে মোরে উঠিতে হবেনা ভোরে,
শুধু স্বাস্থ্য-হানি করে ব্রত ও উপোস্;
চিঠি লেখা, বই দেখা, শেলাই, বুনন শেখা,
আতর গোলাপ মাখা, আমোদ নির্দ্দোষ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ?

৬

সং মেজে সং সেজে   কভু ছাদে কভু মেজে,
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অবশ ;
প্রতিদিন সে সময়ে   গৃহস্থের বউ মেয়ে
পুকুরের ঘাটে যায় ভরিতে কলস।
আমি যে পারিনা তাহা, সে কাহার দোষ ?

৭

মিছে আমোদে, খেলায়—ভুলায়েছ দেবতায়,
প্রণয়ের ইতিহাসে করেছ বেহুদ্।
এখন এখন আর   কেন কর তিরস্কার,
মন্থনে উঠেছে বিষ পিয়ো আশুতোষ।
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

মকর্দ্দমাটি বড়ই সঙ্গিন। পাঠকদিগের মধ্যে এমন কি কেহ উকিল নাই যিনি অনুগ্রহ করিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন ?

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক) ১০ম ভাঃ, ১ম সঃ।

খনা—লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—বলেন ;—খনা নাম্নী কোন রমণী ছিলেন কিনা তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের জ্যোতিষী প্রজাপতি দাস ও ষষ্ঠীদাস খনার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রজাপতি দাস রঘুনন্দনের 'জ্যোতিস্তত্ত্বের' নাম করিয়াছেন, সুতরাং রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী—১৫৬৭ খৃঃ পরে ছিলেন। অতএব অন্ততঃ কতকগুলি খনার বচন ৩০০ বৎসরে পুরাতন। খনা বাক্য প্রধানতঃ কেরলী বলিয়া বোধ হয়। অক্ষর গণনা দ্বারা শুভাশুভের নির্দ্দেশ করা কেরলের প্রধান লক্ষণ। ষষ্ঠীদাস খনার ন্যায় বাঙ্গালায় কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বলেন বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত, তাহারা কাকমুখে জ্যোতিষের বার্ত্তা শুমিয়া কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় করিত। কিন্তু বৈদিককালে শাকুনশাস্ত্র এবং "বৌদ্ধকালে" কাকবার্ত্তা ছিল। বঙ্গীয় বীর নহে, ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে গণনা করাইতেন। ভীষ্ম উৎপাত দর্শনে চিন্তিত। দিগ্‌বিজয়ের পূর্ব্বে কালিদাসের রঘু বাজিগণের নীরাজনা করিয়াছিলেন। গর্গমুনি পল্লীপতন সরোটপ্ররোহণ ফল লিখিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গবীরের হাঁচি টিকটিকির ভর আর্য্য ঋষিগণ হইতে কুলক্রমাগত।

এ প্রবন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য ও বিবেচ্য কথা আছে।

জীববিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা—লেখক উক্ত যোগেশ বাবু—এইরূপ প্রবন্ধে ক্রমে ভাষার অনেক অভাব দূর হইবে আশা করা যায়—মহারাজ

নন্দকুমারের পত্র কৌতুহল জনক। ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত পত্রিকাতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ অগুণা ও হীন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম।

উদ্বোধন আশ্বিন।

ইহা সেবাব্রতধারী কর্ম্মীগণের পত্র। যেখানে কর্ম্ম বিদ্যমান সেখানে চিন্তা তেজস্বিনী, সেখানে সাহিত্যের সামগ্রীর অভাব নাই। কর্ম্ম চিন্তাতে পরিণত, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত। আবার কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েই ভক্তি কাণ্ডে বিকশিত। বিশুদ্ধ কর্ম্ম উপাসনা, জ্ঞান ও উপাসনা। উপাসনা ঈশ্বর সাম্মুখ্য। বিহিত কর্ম্ম যে পরিমাণে জাতীয় জীবনকে অধিকার করিবে সেই পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য উন্নতি লাভ করিবে।

৺বিবেকানন্দের উদ্দেশে লিখিত "তর্পণ" উদ্ধৃত হইল—

পর পর বলি নাই যে গো কেহ
সকলই আনন্দময়ের ছবি!
তাই পরসেবা, দিলে মহামন্ত্র
যাহে ফুটে উঠে প্রাণের রবি!
তাই সেবাশ্রম অনাথ আগার
তাই দুর্ভিক্ষের মোচনে আশ।
তাই অদ্বৈতের মহিমা ঘোষিতে
চারিদিকে আজি "অদ্বৈত বাস"।
তাই সিন্ধুতীরে, ভূধর শিখরে,
দ্বীপ দ্বীপান্তরে, নূতন কথা!
কুমার সন্ন্যাসী খায় উপবাসী,
দিতে জনে জনে নূতন গাথা।
তাই উদ্বোধনে উদ্বুদ্ধ জ্ঞান,
প্রবুদ্ধ ভারত জাগায় সবে,

তাই ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মের মহিমা
প্রচারে জগতে মহান্ রবে!
চিকাগোর সেই ধরম সভায়
হয়েছিল যেই শঙ্খের ধ্বনি,
আজো চারিদিকে বাজে মোর কাণে
সে অপূর্ব্ব শুভ শিবের বাণী!
বেদান্তের প্রথা হৃদে হৃদে গাঁথা,
বেদান্তের ত্রাণে প্রাণিত তুমি
বেদান্তের সেই পূর্ণ অবতার
"রামকৃষ্ণ" ছিল তোমার স্বামী!
"দাও দাও দাও ফিরে নাহি চাও"
এই মহামন্ত্র দিয়াছ জীবে,
চূর্ণ স্বার্থ মান হৃদয় শ্মশান,
তবে ত তাহাতে নাচিবে শিবে"।

The Dawn—এই মাসিক পত্রিকাতে ব্যবহারিক সময়োপযোগী ও অন্যান্য চিন্তাশীল প্রবন্ধ থাকে, দেশের উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি ইদানীন্তন যাহা লিখিতেছেন তাহা প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া সুপণ্ডিত সম্পাদক অনেক সময় নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেন। বাঙ্গালার মাসিক পত্রের যে সকল সম্পাদক

বা লেখক মূল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুবিধা বা সময় করিতে না পারেন তাঁহারা এই পত্রিকা খানি নিয়মমত পাঠ করিলে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে পারিবেন এবং তাহা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাঁহাদিগের পাঠকগণও শিক্ষা লাভ করিবেন।

The Indian Magazine—ক্ষুদ্র মাসিক পত্র। উত্তম।

দৈনিক ঘটনা-সংগ্রহ।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩১০।

আশ্বিন ২৭শে, ১৪ই অক্টোবর। লর্ড লণ্ডন ডারী মন্ত্রী সভার লর্ড প্রেসিডেন্ট এবং মিঃ আর্থর লি সিভিল লর্ড অব আডমিরাল্টি নিযুক্ত হন। ইতালীর রাজা ও রাণী প্যারী নগরে পৌছান। আর্ম্মেনিয়াস সীমান্ত প্রদেশে ধর্ম্মঘট দেখা দেয়।

২৯শে আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর দিল্লিতে দুই বার অত্যধিক ভূকম্প হয়।

৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর মাসিদোনীয়া বিদ্রোহে দলপতি বোরস আরা ফফের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর। চার্লস স্কট ডিক্সন লর্ড আড়ভোকেট, এবং ডেভিড ডণ্ডাস স্কটল্যাণ্ডের সলিসিটর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন।

৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর। টেলিগ্রাম মাশুলের হার হ্রাস সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। অর্জেন্ট বা অত্যাবশ্যকীয় টেলিগ্রাম দুই টাকায় এবং অর্ডিনারী বা সাধারণ টেলিগ্রাম এক টাকায় ঠিকানা সহ ষোল কথায় যাইবে। ডেফার্ড বা বিলম্বে প্রেরিত টেলিগ্রাফ চারি আনায় চারি কথা যাইবে, ছয়টি কথা সংযুক্ত ঠিকানা বিনা মূল্যে যাইবে।—ইতালীর মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হয়।

৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ লেকির (W. E H. Lecky) র মৃত্যু সংবাদ আসে। জন্ম ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কৃষি ব্যাঙ্কবিধি প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বিধির পাণ্ডুলিপি পেশ হয়।

৯ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর। রুসিয়ায় বহু স্থানে শস্য অদৌ হয় নাই এবং দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা দিয়াছে।—জনরব আর্ল অব মিণ্টু লর্ড কর্জ্জনের পর বড় লাট হইবেন।

১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর। স্পেনের বিলবাও সহরে ৪০ হাজার শ্রমজীবি ধর্ম্মঘট করিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতেছে জানা যায়।

১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর। প্যারী সহরে শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া ভয়ানক উৎপাত করিতেছে জানা যায়।—ইতালীর নূতন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। সিগনর জিয়লাইটি (Signior Ciolitti) প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন।—স্পেন বিদ্রোহের শান্তি হয়।

১৪ই কার্ত্তিক, ৩১শে অক্টোবর। মান্দ্রাজের কইম্বাটুর নগরে প্লেগ নিবারক বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হয়।

১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর। ইংলণ্ডে

অত্যধিক বারিপাত বশতঃ অত্যন্ত জলপ্লাবন হইয়াছে। ইউরোপে লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়ার জলপ্লাবনে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে জানা যায়।—বৈদ্যুতিক শক্তির গোলযোগ হওয়াতে ইউরোপে স্থানে স্থানে তাড়িত বার্ত্তা বন্ধ থাকে।—প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক থিয়ডার মোমসেনের মৃত্যু হয়।

১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর। পোপের প্রাসাদে ভয়ানক অগ্নি সংযোগে তিনটী ঘর ভস্মসাৎ হয়।—আমেরিকার ইণ্ডিয়ানাপলিসের নিকট রেলওয়েট্রেণ সংঘর্ষণে প্রায় ৮০ জন হত ও আহত হয়।—নিউইয়র্কের একটা বাটীতে অগ্নি লাগিয়া ২৫ জন লোকের মৃত্যু হয়।—স্যর এনড্রুফ্রেজার মিঃ বোর্ডিলনের হস্ত হইতে বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করেন। মিঃ বোর্ডিলন তাঁহার স্থায়ী পদ গ্রহণ বাসনায় বাঙ্গালোরে গমন করেন।

১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর। কলম্বিয় এবং আমেরিকায় পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত দেখা দিয়াছে জানা যায়। পানামাবাসীগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। আসাম খাসিয়া প্রদেশের মৌসিংরামের রাজা সিংবারাই (Raja Symbarai, the ruling Chief of Mansymram), তাঁহার ভ্রাতা এবং অন্যান্য কএক জন হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত থাকা সন্দেহে ধৃত ও বন্দী হয়েন।

১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নভেম্বর। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি (The Universities Bill) পেশ হয়।

১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর। আয়োনা-দ্বীপে আমেরিকাবাসীদিগের গোলাবারুদের ঘরে অগ্নিশালায় বিভ্রাট হয়। ইহাতে অনেক লোক হত ও আহত হয়।—আমাদের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী ছোটলাট বোর্ডিলন বাঙ্গালোরে পৌঁছান ও মহীশুরের রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করেন।

২০শে কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর। আমেরিকার পানামার নূতন শাসন প্রণালীতে সম্মত হইয়াছেন জানা গিয়াছে। ক্যাভার এডমণ্ড নক্স, ম্যাঞ্চেষ্টারের বিশপ নিযুক্ত হইয়াছেন।—ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রী সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর। রেঙ্গুনে অত্যন্ত ভূমিকম্প হয়। মান্দ্রাজে অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টি হয়।

২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর। পানামার নূতন শাসন তন্ত্র সেনর বিরৌভারিলাকে পানামা খাল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর। ফারসের শাসনকর্ত্তা বড়লাট লর্ড কর্জ্জনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বুসায়ারে প্রেরিত হইয়াছেন।—বড়লাট মস্তা নগরে গমন করেন।

২৪শে কার্ত্তিক, ১০ই নভেম্বর। আর্মেনিয়া প্রদেশে ধর্ম্মমন্দির বা চর্চ্চ সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ প্রচারিত হওয়া অশান্তি দেখা দিয়াছে জানা যায়।—মিঃ ফ, ই, চ, ইলিয়ট এথেন্সের মন্ত্রী এবং ই, চ, এলার্টন সোফিয়ার কনসল জেনারেল নিযুক্ত হন।—বড়লাট ঝিন্দে গমন করেন।

২৫শে কার্ত্তিক, ১১ই নভেম্বর। পনর শত হটেণ্টট বিদ্রোহী হইয়া আফ্রিকার কেপ সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়।—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হয়।

২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর। কাপ্তেন উইণ্টার তরবৎ হায়দারির কনসল এবং কর্ণেল মিক্লিন মেসিদের কনসল নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য এই দুই স্থান পারস্যের অন্তর্গত।—মান্দ্রাজে ভয়ানক বন্যা হইয়াছে জানা যায়।—বড়লাট ভাওয়ালপুরে পৌছান। তথায় ভাওয়ালপুরে নবাবকে তাঁহার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর। পিটার্স বরো এবং নিলষ্ট রুমের মধ্যে দুইজন দস্যু ট্রেণে উঠিয়া দশ সহস্র পাউণ্ড চুরি করে। অসম সাহস!—বড়লাট খানপুর হইয়া হায়দরাবাদ গমন করেন।

উহা কখন প্রীতিকর হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের কথা খাটিল না, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত প্রাচ্যভাবের-ভাবুক য়িহুদীবংশসম্ভূত প্রধানসচিব নানা-কলকৌশলে বহুবিধ বাগ্‌জাল বিস্তার সহকারে কতকগুলি অভিনব যুক্তির দ্বারা সকলকে পরাস্ত করতঃ পার্লামেণ্টে তৎসম্বন্ধীয় বিল পেশ করিলেন। তথায় বিস্তর তর্কবিতর্কের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বিল পাশ' হইয়া বিধিবদ্ধ হইল,—রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অশোক, আকবরের রাজমুকুট বিলাতে বসিয়া ভিক্টোরিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। যথাসময়ে ইণ্ডিয়া আপিসের দ্বারা তদ্বিষয়ক বিজ্ঞাপনী অস্মদ্দেশে প্রেরিত হইয়া প্রচারিত হইল। তৎকালের সরকারী গেজেটের সঙ্গে উহা যেরূপ প্রকাশ করা হয়, তাহার অবিকল অনুলিপি নিম্নে দেওয়া গেল, ভাষা ও বর্ণবিন্যাস ঠিক মূলের মতই রহিল:—

(বিক্টোরিয়া রাজত্বের অব্দ ৩৯।)

(অধ্যায় ১০)

সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত অভিধান ও উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে ক্ষমতা দিবার আইন।

এই আইন সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্ মহোদয়ের ১৮৭৬ খৃঃঅব্দের ২৯ শে জুন তারিখের ২৮ নং মোড়ক মধ্যে প্রেরিত।

যে হেতুক বিগত মহারাজ তৃতীয় জর্জের চত্বারিংশৎবৎসরে গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্ল্যাণ্ডের সংযোগার্থক বিধিবদ্ধ আইনের ৬৭ অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে উল্লিখিত সংযোগের পর সংযুক্ত রাজ্য ও তাহার অধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় উপাধি সকল এরূপ হইবে; যাহা মহারাজ সংযুক্ত রাজ্যের মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা স্থির করিবেন।

১৮০০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় জর্জের ২৯।৪০* বৎসর রাজত্বকালে

এবং যে হেতুক উক্ত আইন ও ১৮।১ + খৃঃঅব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে

---

*এটা বোধ হয় ছাপার ভুল, ৩৯।৪০ হইবে। এইরূপ হেলায়-শ্রদ্ধায় গুরুতর সরকারী দলীলাদিও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া থাকে। এই কাগজ পত্র গুলি তাহার বিশেষ প্রমাণ।

+ ১৮০১ অঙ্ক যে এভাবে লিখিত হইতে পারে, তাহা এই প্রথম দেখা যাইতেছে।

প্রধান মোহর অঙ্কিত একটী রাজকীয় ঘোষণায় প্রখ্যাত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বর্ত্তমান অভিধান ও উপাধি এই মাত্র আছে যথা "বিক্টোরিয়া পরমেশ্বর-প্রসাদাৎ গ্রেটব্রিটন ও আয়র্ল্যাণ্ডের সংযুক্ত রাজ্যের রাণী ধর্ম্মরক্ষিণী"।

এবং যে হেতুক মহারাণীর রাজত্বের ২১।২২ বৎসরে পার্লিমেণ্ট মহাসভায় ভারতরাজ্যের উৎকৃষ্টতর শাসনার্থক বিধিবদ্ধ আইনের ১০৬ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের রাজত্ব, যাহা তৎপূর্ব্বে মহারাণীর অধীন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত ছিল তাহা তদবধি মহারাণীর অধিকৃত হইবে এবং ভারতবর্ষ সেই সময় হইতে মহারাণীর নিজ নামে ও নিজ শাসনে থাকিবে। এবং যে হেতুক ঐ রাজত্ব এইরূপ হস্তান্তর করণের এক লক্ষণ বর্ত্তমান অভিধান ও উপাধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ২১ ও ২২ বৎসর অধ্যায় ১০৬

অতএব বর্ত্তমান পার্লিমেণ্ট সভায় সমাগত ধর্ম্ম ও সংসারসম্বন্ধীয় লর্ড ও সাধারণ সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে ও তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে মহামহিম মহারাণীর দ্বারা নিয়মিত হইল যে—

সংযুক্ত রাজ্যের প্রধান মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণাদ্বারা উপরোক্ত ভারতবর্ষের রাজত্ব হস্তান্তর করণের উল্লিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় বর্ত্তমান রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি মহারাণীর স্বেচ্ছামত গ্রহণ করা বিহিত হইবে।

নং ৭০ ইণ্ডিয়া আপীস লণ্ডন তাং ১৩ই জুলাই ১৮৭৬।

মহামান্য সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের নিকট হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে

আমি আপনকার গবর্ণমেণ্টের বিদিতার্থ মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করিতেছি যাহাতে তাঁহার "কৈসরে হিন্দ" এই উপাধি গ্রহণ প্রচারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রজাগণের প্রতি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চিরানুভূত বাৎসল্যভাব, তদীয় এই কার্য্য দ্বারা নিয়ম পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ব্যক্ত হইল, তজ্জন্য তাঁহার বিবেচনায় উপস্থিত সুযোগও সাতিশয় অনুকূল। অতএব আমার বাঞ্ছা এই আপনি মহারাণীর ভারতবর্ষের রাজ্যব্যাপিয়া তাঁহার রাজকীয়

অভিধান ও উপাধির যে অতিরিক্ত উপাধি গৃহীত হইয়াছে তাহার তদীয় সদভিপ্রায়োপযোগিনী ঘোষণা করিবেন।

'স্বাক্ষরিত' সালিসবরী।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সভা হইতে।

ঘোষণা পত্র।

বিক্টোরিয়া রাং

যে হেতুক পার্লিমেণ্ট মহাসভার বর্ত্তমান অধিবেসনে "সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে ক্ষমতা দিবার আইন" নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ আইনে উল্লিখিত আছে যে গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড সংযোগার্থক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে উক্ত সংযোগের পর সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধি এরূপ হইবে যাহা মহারাজ সংযুক্ত রাজ্যের মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা স্বেচ্ছামতে স্থির করিবেন। ঐ আইনে আরও উল্লিখিত আছে যে ঐ আইন প্রমাণ ১৮।১ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখের প্রধান মোহরাঙ্কিত একটী রাজকীয় ঘোষণানুসারে সম্প্রতি অস্মদীয় নিম্নলিখিত অভিধান ও উপাধিমাত্র বিহিত যথা "বিক্টোরিয়া পরমেশ্বর প্রসাদাৎ গ্রেটব্রিটন ও আয়র্ল্যাণ্ডের সংযুক্ত রাজ্যের রাণী ধর্ম্মরক্ষিণী" এবং ঐ আইনে আরও উল্লিখিত আছে যে ভারত রাজ্যের উৎকৃষ্টতর শাসনার্থক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষের রাজত্ব, যাহা তৎপূর্ব্বে অস্মদধীন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত ছিল, তাহা তদবধি অস্মদ অধিকৃত হইবে এবং ভারতবর্ষ সেই সময় হইতে অস্মৎ নামে ও অস্মৎ-শাসনে থাকিবে এবং যে হেতুক রাজত্ব ঐ রূপ হস্তান্তর করণের এক লক্ষণ, অস্মদীয় বর্ত্তমান অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। ঐ আইনে উক্ত উল্লেখের পর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে সংযুক্ত রাজ্যের প্রধান মোহর অঙ্কিত রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ভারতবর্ষের রাজত্ব হস্তান্তর করণের ঐরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় বর্ত্তমান রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি অস্মৎ স্বেচ্ছামতে গ্রহণ করা বিহিত হইবে। এ জন্য আমরা প্রিবি

কৌন্সেলের উপদেশ ক্রমে স্থির ও ব্যক্ত করা উচিত বিবেচনা করিয়াছি এবং ঐ উপদেশ ক্রমে অত্র স্থির ও ব্যক্ত করিতেছি যে অদ্যাবধি সকল সময়ে অস্মৎ অভিধান ও উপাধি সমন্বিত সকল দলিলে, কেবল সংযুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত সকল প্রকার সনন্দ, কমিসন, লেটার্‌সপাটেণ্ট, গ্রাণ্ট, রীট ও নিয়োগ পত্র প্রভৃতি দলিল সকল বর্জন পূর্ব্বক বর্ত্তমান কালীন সংযুক্ত রাজ্য ও তদধীনস্থ প্রদেশ-সকলের রাজপদ সম্পর্কীয় রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত নিম্নলিখিত উপাধি সংযোগ করা যাইবে। অর্থাৎ লাটীন ভাষায় "ইণ্ডিয়ি ইম্পারেট্রিক্স" এবং ইংরাজী ভাষায় "এমপ্রেশ্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া"।

ইহা ভিন্ন অস্মৎইচ্ছা ও অভিপ্রায় এই যে, কমীশন, সনন্দ, লেটার্শপ্যাটেণ্ট, গ্রাণ্ট, রীট নিয়োগ পত্র ও প্রভৃতি, পূর্ব্ববর্জিত দলিল সমূহে উক্ত অতিরিক্ত উপাধি সংযুক্ত হইবে।

অধিকন্তু অস্মৎইচ্ছা ও অভিপ্রায় এই যে, যে সকল স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রময় মুদ্রা এক্ষণে সংযুক্ত রাজ্যমধ্যে নিয়ম পূর্ব্বক প্রচলিত রহিয়াছে ও যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রময় মুদ্রা অদ্য কি ইহার পর অস্মৎ আদেশানুসারে ঐরূপ অঙ্কিত হইবে, তাহা অস্মৎ অতিরিক্ত অভিধান ও উপাধি সত্ত্বেও সংযুক্ত রাজ্য মধ্যে আইনানুগত প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইবে। অপর উক্ত সংযুক্ত রাজ্যের অধীনস্থ কোন প্রদেশে অস্মৎ-অভিধান ও উপাধির অঙ্ক বা তাহার অংশযুক্ত যে সকল মুদ্রা অঙ্কিত ও প্রচলিত হইয়া অস্মৎ ঘোষণানুসারে ঐ প্রদেশে নিয়ম পূর্ব্বক প্রচলিত হইবে এবং উক্ত ঘোষণানুসারে যে সকল মুদ্রা উক্ত অতিরিক্ত উপাধি সত্ত্বেও ভিন্ন আদেশান্তর পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশের মধ্যে নিয়ম পূর্ব্বক প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া গণিত হইবে।

উইণ্ডসারস্থ অস্মৎসভায় ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে, অস্মৎ রাজত্বের উনচত্বারিংশ অব্দে ২৮ সে এপ্রেল তারিখে প্রচারিত হইল।

পরমেশ্বর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে রক্ষা করুন,

ভারতবর্ষের বাইস্রয় ও গবর্ণর জেনেরেলের সভার আদেশানুসারে।

Government Central Press.

বিজ্ঞাপন।

পলিটিকেল।

সিমলা তাং ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৬।

নং ১৮৯১ পী।

ঘোষণা পত্র।

আমি, ভারতবর্ষের বাইস্রয় ও গবর্ণর জেনরল, এ প্রযুক্ত এই রাজ্যের গবর্ণর, কার্য্য সম্পাদক, রাজা, সরদার, আমীর ও প্রজাগণের গোচরার্থ নিম্ন-লিখিত আইন, যাহা ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ২৭শে এপ্রেল তারিখে গ্রেট্ ব্রিটন ও আয়র্ল্যাণ্ডের ইম্পীরিএল পার্লিমেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়া ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ২৮সে এপ্রেল তারিখের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজত্বের ঊনচত্বারিংশৎ বৎসরে উইণ্ডসোর রাজসভার রাজকীয় ঘোষণার সহিত একত্রে মহামান্য সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট কর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের তদীয় ৭০ নং মোড়ক মধ্যে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা এই বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি।

অধিকন্তু আমি আপন হস্তাক্ষর ও মোহর দ্বারা অপর সাধারণ সকলকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি যে ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লী নগরে একটী রাজকীয় সভা করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের উপর তাঁহার আন্তরিক সদয় ভাব প্রচার করিব, যৎপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী, বিশেষতঃ তাঁহার নিজ রাজ্যের এই বৃহৎ অংশের প্রতি আপনার অনুরাগ ও ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রজাগণের রাজভক্তি ও অনুরাগের উপর স্বকীয় বিশ্বাস প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আপনার অন্যান্য রাজকীয় অভিধান ও উপাধির অতিরিক্ত এক উপাধি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমার ইচ্ছা এই যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতরাজ্যের সকল অংশ হইতে গবর্ণর, লেপ্টনন্ট গবর্ণর, প্রধান প্রধান কার্য্যসম্পাদক এবং রাজা, সরদার ও আমীরগণ, যাঁহাদের অবস্থানে পুরাতন বর্দ্ধনশীলতা ও অধুনাতন শ্রীসম্পন্নতা সংযুক্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের শোভা ও প্রতিষ্ঠায় এমন ক্ষমতাবান উপকরণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই।

অতএব আমি এই মহৎকীর্ত্তিগর্ভস্মরণীয় ব্যাপারের গুরুতানুযায়ী এবম্ভূত আদেশ অবিলম্বে কৌন্সিলের আসন হইতে প্রচার করিব, যাহা মহারাণীর প্রকৃতিমণ্ডল, মহীয়সী রাজ্ঞীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশার্থ স্বকীয় রাজভক্তিসূচক যে সাধারণ উৎসব করিবার বাসনা করিয়া থাকে তৎপোষক হইবে।

(স্বাক্ষরিত, লীটন)

সিমলা তাং ১৮ই আগষ্ট ১৮৭৬।

উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন দ্বারা কুইন ভিক্টোরিয়ার নূতন উপাধি যথোপযুক্ত সমারোহের সহিত ভারতে বিঘোষিত হইবার সময় ও স্থান নিরূপিত হইয়া সাম্রাজ্যের যাবতীয় রাজন্য, আমীর ওম্‌রা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রাচীন দিল্লী নগরের বিরাট দরবারে আহ্বান করা হইল। বড়লাট লিটন বাহাদুরের আহ্বানে যথাসময়ে সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া ঘোষণা ব্যাপার সুসম্পন্ন করিলেন। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হস্তিনাপুর-ক্ষেত্রে যথায় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা দেশ বিদেশ হইতে সমাগত নানাশ্রেণীর মিত্র করদ নৃপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক আর্য্যসাম্রাজ্যের একচ্ছত্রী অধিপতিরূপে বরিত হইয়াছিলেন সেই স্থলে বৃটনেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি তাঁহাকে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীরূপে বরণ করত: ইংরাজ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করিলেন;—সুদূর ইংলণ্ডে থাকিয়া কুইন ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হয়:—

IMPERIAL ASSEMBLAGE

DELHI CAMP

The 1st January 1877.

On the first day of November, in the year 1858, a Proclamation was issued by the Queen of England, conveying to the Princes and People of India those assurances of Her Majesty's good will which, from that day to this, they have cherished as their most precious political possession.

The promises then made by a Sovereign, whose word has never been broken, need no confirmation from my lips. Eighteen years of progressive prosperity confirm them; and

this great assemblage is the conspicuous evidence of their fulfilment. Uudisturbed in the enjoyment of their hereditary honours, protected in the prosecution of their lawful interests, both the Princes and the People of this Empire have found a full security for the future in the generosity and justice of the past.

We are now assembled to proclaim the assumption by the Queen of the Title of Empress of India; and it is my duty, as Her Representative in this Country, to explain the gracious intentions of Her Majesty, in adding that title to the style and dignity of Her ancestral Crown.

Of all Her Majesty's possessions throughout the world, possessions comprising a seventh part of the earth's surface, and three hundred millions of its inhabitants,—there is not one that She regards with deeper interest than this great and ancient Empire.

At all times, and in all places, the British Crown has had able and zealous servants, but none more illustrious than those whose wisdom and heroism have won and kept for it the dominion of India. This achievement, in which all Her Majesty's subjects, European and Native, have worthily co-operated, has also been aided by the loyalty of Her Majesty's great allies and feudatories, whose soldiers have shared with Her Armies the toils and victories of war, whose sagacious fidelity has assisted Her Government in preserving and diffusing the blessings of peace; and whose presence here today at the solemn inauguration of Her Imperial Title, attests their confidence in the beneficence of Her power, and their interest in the unity of Her Empire.

This Empire, acquired by Her Ancestors, and consolidated by Herself, The Queen regards as a glorious inheritance to be maintained and transmitted intact to Her descendants, and She recognises in the possession of it the most solemn obligation to use Her great power for the welfare of all its people, with scrupulous regard for the rights of Her feudatory Princes. For this reason, it is Her Majesty's Royal pleasure to add to the titles of Her Crown one which

shall be henceforth to all the Princes and Peoples of India the permanent symbol of its union with their interests, and its claim upon their loyal allegiance.

The successive dynasties whose rule in India the power of the British Crown has been called by Providence to replace and improve, were not unproductive of good and great Sovereigns, but the polity of their successors failed to secure the internal place of their dominions. Strife became chronic and anarchy constantly recurrent. The weak were the prey of the strong and the strong the victims of their own passions. Thus, sapped by incessant bloodshed and shaken by intestine broils, the great House of Tamerlane crumbled to decay, and it fell at last because it had ceased to be conducive to the progress of the East.

Now, under laws which impartially protect all races and all creeds, every subject of Her Majesty may peacefully enjoy his own. The toleration of the Government permits each member of the community to follow without molestation the rules and rites of his religion. The strong hand of Imperial Power is put forth, not to crush but to protect and guide, and the results of British Rule are everywhere around us in the rapid advance of the whole country and the increasing prosperity of all its promises.

British Administrators and Faithful Officers of the Crown— It is to your continued labours that these beneficent results are chiefly due: and it is to you in the first instance, that I have now, in the name of Her Majesty, to express the gratitude and confidence of your Sovereign. Not less steadfastly than all your honoured predecessors, you have toiled for the good of this Great Empire with a persevering energy, public virtue and self-devotion, unsurpassed in history.

The doors of fame are not open to all, but the opportunity of doing good is denied to none who seek it. Rapid promotion it is not in the power of any Government to provide for its servants. But I feel assured that, in the service of the British Crown, public duty and personal devotion will ever have higher incentives than the expectation of public

honours or personal emoluments. Much of the most important and valuable work of Indian Administration, has always been, and always must be done, not by persons in prominent positions, but by those district officers on whose patient intelligence and courage and efficient operation of its whole system is essentially dependent.

I cannot give expression too emphatic to Her Majesty's grateful recognition of the admirable manner in which Her servants, both Civil and Military have performed and are performing throughout India tasks as delicate and difficult as any to which the Crown can confide to its most trusted subjects. Members of the Civil and Military services,—placed at an early age in positions of immense responsibility, submitting with cheerful devotion to a severely exacting discipline, personally exercising the most important administrative functions among populations whose language, creed and customs differ from your own,—may you ever be sustained in the firm yet gentle discharge of your arduous duties by the consciousness that, whilst you thus uphold the high character of your race, and carry out the benign precepts of your religion, you are also conferring on all other creeds and races in this country the inestimable benefits of good government.

But it is not only to the official servants of the Crown that India is indebted for the wise application of the principles of Western civilization to the steady development of her vast resources and I should ill represent the feelings of my August Mistress if, on this occasion, I failed to assure Her non-official European subjects in India the cordial satisfaction with which Her Majesty recognises and appreciates, not only their loyalty to Her Throne and Person but also the benefits which Her Indian Empire derives from their industry, their enterprise, their social energy, and civic virtue.

Wishing to increase Her opportunities of distinguishing the public services, or private worth of her subjects throughout this most important portion of Her dominions, Her

Majesty has been pleased not only to sanction a certain enlargement of the Most Exalted Order of the Star of India, and of the Order of British India, but also to institute for this purpose an entirely new order which will be called the Order of the Indian Empire.

Officers and Soldiers of the Army of India, British and Native,—The Queen recalls with pride your heroic achievements on every occasion, when, fighting side by side, you have upheld the honour of Her arms. Confident that all future occasions will find you no less efficiently united in the faithful performance of that high duty, it is to you that Her Majesty entrusted the great charge of maintaining the peace, and protecting the prosperity of Her Indian Dominions.

Volunteer Soldiers,—Your loyal and successful endeavours to render yourselves capable of acting, if necessary, with the Regular Forces, claim cordial recognition on this occasion.

Princes and Chiefs of the Empire,—which finds in your loyalty a pledge of strength, in your prosperity a source of splendour, Her Majesty thanks you for your readiness, on which She reckons, if its interests be attacked or menaced, to assist Her Government in the defence of them. In the Queen's name I cordially welcome you to Delhi, recognizing in your presence, on this great occasion, conspicuous evidence of those sentiments of attachment to the Crown of England which received from you such emphatic expression during the recent visit of the Prince of Wales to this country. Her Majesty regards Her interests as identified with yours, and it is with the wish to confirm the confidence and perpetuate the intimacy of the relations now so happily uniting the British Crown and its feudatories and allies, that Her Majesty has been graciously pleased to assume the Imperial Title we proclaim to day.

Native subjects of the Empress of India, the present conditions and the permanent interests of the Empire demand the supreme supervision and direction of their administration by English Officers trained in the principles of that polity

whose assertion is necessary to preserve the continuity of Imperial rule. It is to the wise initiative of these Statesmen that India chiefly owes that steady progress in civilization which is a condition of her political importance, and the secret of her growing strength, and it is they who must long continue to form the most important practical channel, through which arts, sciences, the culture of the West (which has given to Europe its present pre-eminence in peace and war) may freely flow towards the East for the common benefits of all its children.

But you the natives of India, whatever your race, and whatever your creed, have a recognized claim to share largely with your English fellow-subjects according to your capacity for the task, in the administration of the country you inhabit. The claim is founded in the highest justice. It has been repeatedly affirmed by the greatest British and Indian Statesmen, and by the legislation of the Imperial Parliament. It is recognized by the Government of India, as binding on its honor, and consonant with all the aims of its policy. The Government of India, therefore, notices with satisfaction the marked improvement during the recent years in the character of the Native Public Service, especially in its higher grades.

The administration of this great Empire demands, from many of those to whom a share in it is entrusted, attributes not exclusively intellectual, qualifications to which moral and social superiority are essential, more especially, therefore, does it rest with those who, by birth, rank, and hereditary influence, are your natural leaders, to fit themselves and their children for the honourable duty which is open to them, by accepting the only education that can enable them to comprehend and practise the principles steadily maintained by the Government of the Queen their Empress.

You must all adopt as your own that highest standard of public virtue which comprises loyalty, incorruptibility, impartiality, truth, and courage. The Government of Her Majesty will then cordially welcome your co-operation in

the work of administration. For in every quarter of the globe in which its dominion is established, that Government trusts less to the strength of armies than to the willing allegiance of a contented and united people, who rally round the throne, because they recognise therein the stable condition of their permanent welfare.

It is on the gradual and enlightened participation of Her Indian subjects in the undisturbed exercise of this mild and just authority, and not upon the conquest of weaker states, or the annexation of neighbouring Territories, that her Majesty relies on the development of Her Indian Empire Her interests and duties, however are not confined to Her own dominions. She sincerely desires to maintain the most frank and friendly relations with the Rulers of those Territories which, adjoining the frontiers of this Empire, have so long owed their independence to the sheltering shadow of its Power. But, should the repose of that Power be at any time threatened from without, the Empress of India will know how to defend Her great inheritance. No foreign enemy can now attack the British Empire in India without thereby assailing the whole civilization of the East, and the unlimited resources of Her dominions, the courageous fidelity of Her allies and feudatories, and the loyal affection of Her subjects have provided Her Majesty with ample power to repel and punish every assailant.

The presence on this occasion of the Representatives of Sovereigns who from the remotest parts of the East, have addressed to the Queen their congratulations on the event we celebrate today, significantly attests the pacific policy of the Government of India. To His Highness the Khan of Khelat, and to those Ambassadors who have travelled so far to represent on British Territory the Asiatic Allies of the Empress of India, as also to our honoured guest His Excellency the Governor General of Goa, and to the Foreign Consular Body, I desire to offer, on behalf of Her Majesty's Indian Government, welcome to this Imperial Assemblage.

Princes and People of India,—It is now my pleasing duty to communicate to you the gracions message which the Queen, your Empress, has today addressed to you in Her own Royal and Imperial name. These are the words of the telegraphic message which I have this morning received from Her Majesty.

"We Victoria by the Grace of God of the United King dom, Queen, Empress of India, send through our Viceroy to all our Officers, Civil and Military, and to all Princes, Chiefs and Peoples now at Delhi assembled, our Royal and Imperial Greeting, and assure them of the deep interest and earnest affection with which we regard the people of our Indian Empire. We have witnessed with heartfelt satisfaction the reception which they have accorded to our beloved Son, and have been touched by the evidence of their loyalty and attachment to our House and Throne. We trust that the present occasion may tend to unite in bonds of yet closer affection ourselves and our subjects; that from the highest to the humblest all may feel that under our rule the great principles of liberty, equity, and justice are secured to them and that to promote their happiness, to add to their prosperity, and advance their welfare, are the ever present aims and objects of our Empire."

You will, I am confident, appreciate those gracious words.

God save Victoria, Queen of the United kingdom and Empress of India *

Private Secretary's Office Press — Camp Delhi, 1877.

ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন। (১)

---

* সিপাহী যুদ্ধের অবসানে যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় সেখানির সুর আগাগোড়া নরম ছিল; এখানি নরম-গরম আঠার বৎসরের অভিজ্ঞতাতে রাজপুরুষগণের যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইহা তাহারই ফল। কোম্পানীর আমলে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত বৃটীশরাজের এক প্রকার সম্বন্ধ ছিল, রাজা খাস হইলে তাহা আর একরূপ দাঁড়ায়, পরে অষ্টাদশবর্ষকাল দেখিয়া শুনিয়া ভিন্নরূপ সম্পর্কস্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হয়; অবশেষে বিগত অভিষেক ব্যাপারে সমুদ্রপারে অ.বর্দ্ধণ করত প্রবৃত্ত ছবি দেখান হইয়াছে। প্রজাদিগকেও কোম্পানি যে চক্ষে দেখিতেন,

কালিন্দী-কূলে।

হে কালিন্দী বসে আছি আমি তব তীরে ;
চেয়ে আছি অনিমিষে ওই নীল নীরে ;
স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুবিমল, স্বাদু, সুমধুর,
আকাশে সন্ধ্যার তারা ভাবিয়া মুকুর
হেরিছে আনন ! লভি সুমন্দ বাতাস,
ফুটিছে অফুট মৃদু কল্লোল উচ্ছ্বাস
তোমার করুণ কণ্ঠে ! ওকি সুধাগীতি ?
অতীতের বুকভরা বিরহের স্মৃতি
প্রত্যেক হিল্লোলে তব ? সে নূপুর-ধ্বনি
আজো বেজে উঠে কানে অলক্ষ্যে তেমনি
শিহরি প্রাণের কুঞ্জ ! আত্মহারা কবি
ও হৃদে বিম্বিত হেরি রাধা রূপচ্ছবি ;
জড়িত বিশ্বের তৃষা ; তাই তব জলে
জীবন জুড়ান শান্তি লভে জীব দলে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সোম।

বিদ্রোহে তাহার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটে, অতঃপর বিদ্রোহশান্তি হইতে আঠার বৎসরের পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহাদের ভিতরকার আসল ভাব রাজপুরুষগণ বেশ বুঝিয়া লইয়াছেন। (লেখক)

(১) লেখক এই বক্তৃতার কোন কোন অংশের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এই কারণে এবং বক্তৃতার বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই দীর্ঘ ইংরাজী বক্তৃতা সন্নিবেশিত করা গেল। যে অংশের উপর লেখকের মন্তব্য থাকিবে তাহার ভাবার্থ বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হইবে। নঃ প্রঃ সঃ

মায়া।

(গল্প)

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুবিচ্ছেদ।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

"ক্রোধ হইতে সম্মোহ (হিতাহিত বিবেকাভাব) হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (আত্মবিস্মৃতি), স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃততুল্য হইতে হয়।" গীতা ২।৬

প্রবোধ বাবু আসিলে নরেশ বাবু অভ্যাস বশতঃ বলিলেন—"আসুন, বসুন," কিন্তু গম্ভীর হইয়া থাকিলেন। প্রবোধ বাবু বলিলেন "নরেশ! আমি তোমার শত্রু, এই কি তুমি বিশ্বাস কর?"

নরেশ। না! আপনি আমার পরম বন্ধু! পরম শুভাকাঙ্ক্ষী! আমার আর একটী বন্ধু শ্যামচাঁদ।

প্রবোধ। আমি আর শ্যামচাঁদ?

নরেশ। আপনি আমার খুব ভাল চেষ্টা করিতেছেন! প্রজাদিগের উত্তেজনা করিতেছেন—হারামজাদা মহেশের পক্ষে মোকদ্দমার খরচ দিতেছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আমার নামে ঠকাম করিতেছেন। এইত আপনার মত বন্ধুর কাজ! আপনি একটী পাকা লোক।

প্রবোধ। (আশ্চর্য্য হইয়া) নরেশ তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?

নরেশ। হাঁ, আমি ক্ষিপ্ত। বলুন আমি আহম্মক, আমি গাধা। তবে, আমি গাধাই হই, ক্ষিপ্তই হই, মহেশ বা অন্য কোন প্রজার স্ত্রীর জন্য ক্ষিপ্ত হই না—গোপনে পাপ করিয়া ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া সাধু সাজিয়া বেড়াই না। আপনি শ্যামচাঁদের নিকট যান—তার পক্ষে মামলার তদ্বির করুন গে—আমার কাছে কেন?

প্রবোধ। আমি দেখিতেছি বিপদে তোমার মাথা যথার্থই খারাপ হইয়া গিয়াছে।

নরেশ। আমার বাটীতে বসিয়া আমাকে যদি ফের "মাথা খারাপ বা পাগল" বলেন তাহা হইলে—আমি বল্‌ছি—আপনি আরও অপমান হইবেন—আপনি চলিয়া যান—চলিয়া যান। আপনি আর কখন আমাকে পরামর্শ দিতে আসিবেন না।

প্রবোধ। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে আমি দেখিতেছি। আমি চলিলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিচারালয়ে।

আজ মহেশের বিচার। আদালত লোকে গস্‌গস্‌ করিতেছে। বাহিরে অসংখ্য প্রজা, ভিতরে ভদ্রলোকের ঠেসাঠেসি। যে সকল উকীল মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন নাই, তাঁহারাও অনেকে সামলা মাথায় দিয়া চেয়ারে বসিয়া সওয়াল জবাব শুনিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন নব্য উকীল দ্রুতবেগে পেন্সিলে নোট লিখিতেছেন, যেন তাঁহারা এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত আছেন। মহেশের হাতে কড়ি,—মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গাম্ভীর্য্য। তাহার পশ্চাতে যদু ও সম্মুখে—ঠিক মহেশের উকীলের পশ্চাতে—কালীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছে।

মহেশের নামে অভিযোগ—খুন ৩০২ ধারা, অপরাধযুক্ত নরহত্যা যাহা খুন নহে ৩০৪ ধারা, এবং গুরুতর আঘাত ৩২৫ ধারা। মোকদ্দমাটী এই ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, নসিরদ্দি নামক জমিদারের লাঠিয়াল মহেশের স্ত্রীকে আক্রমণ করিয়াছিল। মহেশ ও তাহার পিতা অনেক দিন হইতে তাহাকে খুন করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। কিন্তু নসিরদ্দি বিশেষ সতর্ক থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। একদিন নসিরদ্দি রাত্রিতে একাকী বাটী যাইতেছিল। মহেশ ও হারাধন পথের ধারে বন হইতে বাহির হইয়া তাহাকে লাঠি মারিয়া খুন করে।

নরেশ বাবু সরকারী উকীলের সহিত একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন এই ব্যারিষ্টারের সহিত জজ সাহেবের বিশেষ সৌহৃদ্য আছে এবং যাহাতে জজ সাহেব মহেশকে গুরুতর দণ্ড

দেন তজ্জন্য রাত্রিতে খানা খাইবার সময় ব্যারিষ্টার সাহেব জজ সাহেবকে অনুরোধ করিবেন এবং জজ সাহেব সেই অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। সাহেবটী আইনজ্ঞ ও দক্ষ কৌন্সিলি। মহেশের পক্ষে প্রবোধ বাবু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভাদুড়ি নামক একজন স্থানীয় উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র উদীয়মান প্রতিভাশালী হৃদয়বান্ উকীল। তাঁহার সঙ্গে একজন নবীন জুনিয়র ছিলেন। সাতদিন হইতে এই বিচার চলিতেছে। হেমচন্দ্র, ব্যারিষ্টার সাহেব এবং গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের সহিত একাকী যুঝিতেছিলেন—অক্লান্ত, অদম্য, তর্কে অজেয়, বাদিপক্ষ সমর্থনে নির্ভীক। সরকার বাহাদুরের পক্ষে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করা হইয়াছিল, হেমবাবুর জেরায় তাহাদিগের সাক্ষ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু মহেশ নিজেই প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করিয়াছিল;—মহেশ জীবন রক্ষার জন্যও মিথ্যা কথা কহিতে স্বীকৃত নহে। মহেশ বলিয়াছিল যে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে জমিদারের লাঠিয়ালের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সে বল প্রকাশ করিয়াছিল। উকীল হেমবাবু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, মহেশের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে, জেরাতে তাহার কোনটী টিকে নাই, তাহারা আত্মবিরোধী, পরস্পর বিসম্বাদী, অবিশ্বাস্য। তবে মহেশের নিজের একরার এই এক কথা। তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যদি মহেশের স্বীকার মাত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে তাহার সমুদয় স্বীকারটুকু বিশ্বাস করা সঙ্গত। তাহার একরারের কতকাংশ পরিত্যাগ করিয়া কতকাংশ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। আসামী আঘাত করিয়াছিল তাহা সে নিজেই স্বীকার করে। কিন্তু সে পিতাকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিয়াছিল। সুতরাং সে আইন-সঙ্গত ভাবে আত্মপক্ষ রক্ষা করিয়াছিল। তজ্জন্য দণ্ডবিধির ১০০ ধারা অনুসারে তাহার কখনই দণ্ড হইতে পারে না।

হেম বাবু বক্তৃতা করিতে করিতে বঙ্গদেশের জমীদার ও প্রজার সম্পর্ক, মামুদ পরগণায় প্রজার উপর অত্যাচার, প্রজার অসহায় অবস্থা, বিশদ ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। তাহার পর আসামীর প্রতি যে অত্যাচার হইয়া আসিতেছিল—একটা সমৃদ্ধ ও সম্মানিত কৃষক পরিবার জমীদারের আমলার অত্যাচারে কিরূপে ছারখার হইল, অবশেষে বৃদ্ধ গৃহস্বামী হারাধন কিরূপে নিরপরাধে ধৃত হইল, কিরূপে জমীদারের লাঠিয়ালগণ তাহাকে ধরিয়া রাস্তায় হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, হারাধনের শির

কিরূপে মায়া কিরূপে লাঞ্ছিত পিতার পশ্চাতে পশ্চাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িল, কিরূপে পাষাণ হৃদয় লাঠিয়ালগণ এই কোমল বালিকাকে নিষ্ঠুর ভাবে রাস্তায় নিক্ষিপ্ত করিল এবং তাহার পিতাকে ধরিয়া লইয়া যাইল, রুধিরাক্তা বালিকা পথে কিরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিল এবং অবশেষে এই কৃষক বীর কিরূপে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে রক্ষা করিল হেমবাবু হৃদয়দ্রাবী ভাষাতে বর্ণনা করিলেন। অত্যাচার বর্ননা কালে এই সহৃদয় উকীলের স্বর মধ্যে মধ্যে দুঃখে প্রকম্পিত হইল এবং কখন কখন স্বরভঙ্গ ও তাঁহার চক্ষু আদ্র হইয়া আসিল। শ্রোতারা অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন, এমন কি জজ সাহেব নিজেও একটু বিচলিত হইলেন। আবার অত্যাচারের প্রতি ধর্ম্ম্য ক্রোধ প্রকাশ করিবার সময় হেম বাবুর ভাষা প্রদীপ্ত বহ্নিবং জ্বলিতে লাগিল। সেই অপূর্ব্ব বক্তৃতা এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে বর্ণনা করিবার স্থান নাই। উপসংহারে উকীল বাবু তাঁহার সমুদয় হৃদয়ের শক্তি তাঁহার ভাষাতে ঘনীভূত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমার মক্কেল, এই আসামী, যে কোন অপরাধ করিয়াছে তাহার লেশ মাত্র প্রমাণ নাই। সে নিজে যাহা স্বীকার করিয়াছে তাহাতে তাহা মহত্ত্ব ও নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাইতেছে, কোন অপরাধ প্রকাশ পাইতেছে না। বস্তুতঃ সে হেয় দস্যু বা তস্করের ন্যায় শোচনীয় বন্দীভাবে আনীত হইবার যোগ্য নহে, সে শ্রদ্ধার যোগ্য—পূজার্হ। বিধাতার দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায়ে পূজ্য ব্যক্তিও কখন কখন এই জগতে লাঞ্ছিত হন। নতুবা এই ব্যক্তি অদ্য কেন এই স্থানে বন্দীভাবে দণ্ডায়মান তাহা আমি যথার্থই বুঝি না। এই পিতৃভক্ত স্বচ্চরিত্র ধর্ম্মাত্মা যুবা তাঁহার পিতৃভক্তির জন্য ফাঁসি কাষ্ঠে দোদুল্যমান হইবে, অথবা চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইবে, অথবা দস্যু তস্করের ভোগ্য কারাবাসের যন্ত্রণাভোগ করিবে কি না তাহা বিচারকের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে। আপনারা অবগত আছেন পুরাকালে একদা এতনা নামক আগ্নেয়গিরি হইতে প্রধূমিত প্রজ্বলিত ধাতুনিঃস্রব, প্রচণ্ড বেগে নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সকল দগ্ধ ও ভূগর্ভস্থ করিতে লাগিল। তখন কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই ভয়াকুল চিত্তে স্ব স্ব মহামূল্য দ্রব্য লইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল আনাপিয়স ও আম্ফিনোমস নামক দুইটী যুবক নিজের সম্পত্তির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে স্কন্ধে করিয়া নিরাপদ স্থানের সন্ধানে ধাবমান হইলেন। স্বয়ং ধর্ম্ম এই সাধু পুত্রদ্বয় ও জনক জননীকে রক্ষা করিলেন। যে দিক দিয়া তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন সে দিক দিয়া শৈল নিঃস্রব গেল না। সুতরাং তাঁহারা রক্ষা পাইলেন এবং

ঐ পুত্রদ্বয়ের অনুসৃত পথ অন্যান্য স্থানের ন্যায় দগ্ধ হইল না। সেই পথ পুত্রদ্বয়ের ধর্ম্মে পূত হইয়াছিল। সেই জন্য ঐ স্থান "ধর্ম্মক্ষেত্র" নামে প্রখ্যাত হইল। আমিও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনাদিগের সম্মুখীন এই যুবা পিতৃভক্ত পুত্র, নিজের প্রাণনাশের ভয় না করিয়া, লাঞ্ছিত জনককে জমিদারের বেতনভোগী দস্যুদিগের হস্ত হইতে অসাধারণ বীর্য্যবলে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে স্কন্ধে লইয়া যে পথে ভগ্নীর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, সেই ভূভাগ পুণ্যভূমি, "ধর্ম্মক্ষেত্র"—চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। আমি অসংকোচে বলিতেছি যে, বৃদ্ধ নিরপরাধী পিতাকে অপমান, পীড়ন, যন্ত্রণা ও শোচনীয় মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য করায় যদি কাহারও কোন বিচারালয়ে দণ্ড হয় তাহা হইলে সেই বিচারালয় ধর্ম্মাধিকরণ নহে, তাহা ভীষণ নরক। যদি সংসারে পিতৃভক্তির আদর থাকে, যদি ধর্ম্মের গৌরব থাকে, তাহা হইলে কেবল ইহাকে বেকসুর খালাস করা উচিত তাহা নহে, ইহার পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণার্থ ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপন করা উচিত।" ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত অনর্গল বক্তৃতা করিয়া হেম বাবু বসিলেন। শ্রোতারা বলিল "ধন্য হেম বাবু" "ধন্য মহেশ।" চাপরাসীরা "চোপ চোপ" হাঁকিয়া দিল। কিন্তু বারান্দায় আবার "ধন্য মহেশ," "ধন্য হেম বাবু" শব্দ হইল। বাহিরে অগণ্য প্রজা "জয় মহেশজীকি জয়—জয় উকীল বাবুকি জয়—জয় মহেশজীকি জয়—" এই বলিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। তখন মহেশের বোধ হইল যেন আবার রাত্রিতে শ্মশান কালীর মাঠে কৃষক সভাতে সে নিজে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছে আর প্রজারা "জয় মহেশজীকি জয়" বলিতেছে।

আসামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে। ব্যারিষ্টার আবার বক্তৃতা করিলেন; কিন্তু হেম বাবুর যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তৎপরে জজ সাহেব উকীল বাবুকে বলিলেন "বাবু, আপনি উত্তেজিত হইয়া আপনার বক্তৃতার উপসংহারে ওকালতীর ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। আপনাকে এইবার সাবধান করিয়া দিয়া ক্ষমা করিলাম। নতুবা 'আদালতের অবজ্ঞা করিয়াছেন' এই অপরাধে আপনাকে দণ্ড দিতাম।" হেম বাবু উত্তর করিলেন, "হুজুর আমার দণ্ড হইয়া যদি এই নির্দ্দোষী আসামীর মুক্তি হয় তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না।" জজ সাহেব বলিলেন অদ্য রাত্রি ৮টা হইয়াছে। আর কাজ চলিতে পারে না। সেদিন আদালত বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:#:—

সেবানন্দ স্বামী অনেক সন্ধান করিয়া মায়াকে পাইয়া প্রবোধ বাবুর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। মায়া ও কুমুদিনীকে প্রবোধ বাবুর স্ত্রী আশ্রয় দিলেন প্রবোধ বাবু সপরিবারে কলিকাতার উপকণ্ঠে তাহার একটা উদ্যান ভবনে বাস করিতেছেন। সুতরাং এক্ষণে কুমুদিনী ও মায়াও সেই বাটীতে। কুমুদিনী ও মায়ার সুন্দর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া লীলা তাহাদিগকে নিজের ভগ্নীর মত ভাল বাসিয়াছিলেন। লীলা জমিদারের পত্নী, জমিদারের কন্যা, কিন্তু ধনে তাঁহার অহঙ্কার হয় নাই! তিনি গরিব লোককে ঘৃণা করিতেন না; তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ব্রত উপাসনাদি করিতেন এবং প্রতিদিন অন্ততঃ একটী গরিব লোকের সেবা না করিয়া অন্নগ্রহণ করিতেন না। মায়া ও কুমুদিনীর কষ্ট কিছু উপশম করিবার জন্য লীলা কত চেষ্টা করিতেন; কখন হিন্দু শাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম কাহিনী শুনাইতেন; দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সীতা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের পবিত্রতা, সাহস ও ধৈর্য্য বর্ণনা করিতেন; কখন বা তাহাদিগকে গান শুনাইবার জন্য প্রবোধ বাবুকে অনুরোধ করিতেন। প্রবোধ বাবুর অবসর কম হইলেও এই সন্তপ্তা অবলা-দ্বয়ের সান্ত্বনার জন্য ভজন গাইতেন। কুমুদিনী ও মায়া পাশের গৃহ হইতে তাহা শ্রবণ করিত। সেই মধুর পবিত্র গান শুনিয়া মায়ার চক্ষু দিয়া জল পড়িত। লীলার আন্তরিক স্নেহে, ধর্ম্মোপদেশে, প্রবোধ বাবুর ধর্ম্ম সংসঙ্গীতে এই দুই কৃষক বালা যেন গভীর অন্ধকারের ভিতরে একটু আলোক দেখিতে পাইল। তাহাদের বোধ হইল জগতে একজন বিপদ-ভঞ্জন আছেন, তিনি অসহায়ের সহায়, দুঃখীর সান্ত্বনা, অন্ধের যষ্টি, দরিদ্রের ধন, অশান্তির শান্তি, অনাথিনীর নাথ, নিরুপায়ের উপায়, বিপন্নের সম্বল, ভব সাগরের তরী। তাহারা দুইজনে বরাবর পূর্ব্বে প্রবোধ বাবু ভাল লোক শুনিয়াছিল মাত্র। তথাপি জমিদার বা ধনীলোক কোমল হৃদয় হইতে পারে, তাহাদের যে দুখিনীর প্রতি এত দয়া, গরিবের প্রতি এত স্নেহ হইতে পারে তাহা তাহারা পূর্ব্বে জানিত না। জমিদার বলিলেই তাহার আগে মনে হইত, বড় বড় লাঠি হাতে কালান্তক লাঠিয়াল পরিবেষ্টিত বাবু—স্থূলোদর—সতত ক্রুদ্ধ, নিয়ত কর্কশভাষী—জনৈকনির্দ্দয় বাবু বসিয়া আছেন —আর ক্রমাগত "টাকা টাকা" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে

বলিতেছেন "লাগে মার।" কিন্তু প্রবোধ বাবুকে দেখিয়া এক্ষণে মায়া ও কুমুদিনীর বোধ হইল "জমিদার দেবতা, দুর্ব্বল লোকরক্ষা করিবার জন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে ভূমি হইতে শস্য বাহির করিবার সুবিধা দিবার জন্য মূর্খকে জ্ঞান দিবার জন্য, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, জমিদারের জন্ম।" কুমুদিনী ও মায়ার চিত্ত বিনোদন জন্য লীলা কখন তাঁহার গাড়ি করিয়া চিড়িয়াখানায়, কখনও যাদুঘরে ইত্যাদি মনোহর স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেন স্নেহপ্রাণা ভগ্নীর, পতিপ্রাণা কুমুদিনীর তাহা ভাল লাগিত না। তাহারা লীলার সঙ্গে নির্জ্জনে বাস করিতে ভাল বাসিত। লীলার একটী দুই বৎসরের পুত্র ছিল, মায়ার মন যখন একটু ভাল থাকিত তখন সে সেই পুত্রটী কোলে করিয়া সোহাগ করিত, চুম্বন করিত, সে বুঝুক আর নাই বুঝুক তাহাকে কত মনের কথা বলিত।

গ্রীষ্মকাল অন্ধকার রজনী, আকাশে নির্ম্মল, তারকিত। মায়া একাকিনী আলুলায়িত-কেশা প্রবোধ বাবুর বাটীতে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চে নভোমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া আছে। দূরস্থিত নক্ষত্রমালার সহিত মায়া সখী পাতাইয়াছিল তাই তাহাদিগকে কি বলিতেছিল—"সখীগণ! এতদিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ, তোমাদের এত ভালবাসি, তোমরা তবু কেন একদিন আমার নিকট আসিলে না। ওখান থেকে, অতদূর থেকে আমার জন্য কি তোমরা কাদ্‌ছ? শুনেছি ভাল লোক মরিয়া তোমাদের কাছে যায়। আমার বাবাও তোমাদের কাছে গিয়াছেন কি, তোমরা একবার স্পষ্ট করে বল না। আমার বাবা কি তোমাদের কাছে আছেন? আমাকে তবে তোমরা তুলে নেওনা কেন। তোমরা ঘাড় নাড়িছ, আমাকে তুলিয়া নিতে পারিবে না? আচ্ছা না পার, তোমরা বলিতে পার, আমার দাদা এক্ষণে কোথায়? কি করিতেছেন? তোমরা বলিতে পার আমার দাদার সঙ্গে কি আর আমার দেখা হবে?

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "হবে বৈকি।" মায়া চমকিয়া উঠিল—দেখিল পশ্চাতে লীলাদেবী। লীলা বলিলেন, "মায়া! খাবার প্রস্তুত, তোমাকে আমি খুঁজিতেছিলাম।"

মায়া। বৌ কোথায়?

লীলা। বৌ তাহার শুইবার ঘরে। সে খাইবে না। শরীর একটু সামান্য অসুখ করিয়াছ।"

মায়া। আমি আগে বৌকে দেখে আসি।

লীলা।—শীঘ্র এস।

যে ঘরে প্রবোধ বাবু বসিয়া লিখিতেছিলেন। লীলা সেই ঘরে আসিলেন।

লীলা। কি লিখছ’?

প্রবোধ। মোক্তার মহাশয় লিখিয়াছেন মহেশের বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ সাহেব অদ্যাপি রায় দেন নাই।

লীলা। সে কি রকম?

প্রবোধ। তাই লিখিতেছি, জজ সাহেব রায় দিলেই যেন তাহা টেলিগ্রাফ করেন।

লীলা। মহেশ খালাস হবে কি?

প্রবোধ। হাকিমদিগের মন কখন কোন দিকে যায় তা বলা যায় না। খালাস হওয়াইত উচিত।

লীলা। সে দিন নরেশ বাবুর ওখানে যাওয়ায় কোন ফল হইল না। নরেশ কেবল তোমাকে অপমান করিল।

প্রবোধ। প্রিয়ে, অপমান কি? অন্যের উপকারের জন্য যা কিছু করা যায় তাহাতে অপমান নাই, তা'ত তুমি জান।

লীলা। তা জানি। তবু তোমাকে তিনি যে কঠিন অন্যায় কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বুকে লাগিয়াছে।

প্রবোধ। প্রিয়তমে, নরেশের এক্ষণে বুদ্ধিনাশ হইয়াছে; তাহার কোন কথা এক্ষণে ধরিতে নাই। নরেশ বিপদ সাগরে পড়িয়াছে, আমি ব্যতীত তাহার একজনও নিঃস্বার্থ বন্ধু নাই। আমার কথা শুনিলে সে বোধ হয় রক্ষা পাইত কিন্তু সেদিন আমাকে যে সকল অপমানের কথা বলিতে সাহসী হইয়াছে তাহাতে সে যে আমার কথা আর এক্ষণ শুনিবে তাহা আশা হয় না।

লীলা। তাহার কি বিপদ?

প্রবোধ। তাহার সমুদয় জমিদারি বাহির হইয়া জাইতে পারে। মস্ত একটা চক্রান্তে পড়িয়াছে। তাহার নামে শ্যামচাঁদ একটা মিছা মোকদ্দমা করিয়াছে।

লীলা। কি মোকদ্দমা?

প্রবোধ। মোকদ্দমার পাপ কথা স্ত্রীলোকের না শুনাই ভাল।

লীলা। যে নিজে আপনাকে নষ্ট করিবে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? ঐ যে একতারা বাজাইয়া গান করিতেছে, বুঝি সেবানন্দ স্বামীজী—

একি হোল ভগবান! তোমার বিধানে!
সাধুজন নিপীড়ন—বাজিছে পরাণে॥
দীন কৃষক কারণ, বুঝিত যে প্রাণপণ,
ধরম কোথায় তার, চির নির্ব্বাসনে॥
এস এস ভাই এস, তুমি প্রাণের মহেশ—
কোথা যাবে, ফেলে সবে, সংসার শ্মশানে॥
কোথা পিতা কোথা জায়া, কোথা তোমার প্রাণের মায়া
ছাড়িয়া সবে যেতেছ কি মহাপ্রস্থানে॥

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেবানন্দ স্বামী আসিয়া প্রবোধ বাবুকে বলিলেন মহেশের দ্বীপান্তরে হুকুম হইয়াছে। প্রবোধ বাবু প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া হাইকোর্টে আপীল করিলেন। মহেশ খালাস হইল, প্রবোধ বাবুর লোক মহেশকে প্রবোধ বাবুর বাসায় আনিল। দুঃখিনী কুমুদিনী ও স্নেহময়ী মায়ার সহিত মহেশের দেখা হইল। দুঃখিনীদ্বয়ের আনন্দাশ্রু অবিরল ধারায় বহিতে লাগিল। পরে, প্রবোধ বাবু মহেশকে বলিলেন, "মহেশ! তোমাকে আমার জমিদারিতে জমি দিব, ঘর করিয়া দিব। মামুদপুর পরগণায় তোমার আর বাস করিবার প্রয়োজন নাই।"

মহেশ। "আমার কতকগুলি কর্ত্তব্য কাজ আছে তাহা সম্পাদন করিয়া মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করিব। আমার ফিরিয়া আসিতে যদি বিলম্ব হয় অনুগ্রহ করিয়া আমার দুঃখিনী স্ত্রী ও শোক-সন্তপ্তা মায়াকে আপনার ও আপনার সহধর্ম্মিণীর আশ্রয়ে রাখিবেন। প্রবোধ বাবু মহেশকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু মহেশ তাহা বুঝিল না।" করযোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল। প্রবোধ বাবু বলিলেন, "মহেশ, যদি তুমি এক্ষণে মামুদ পরগণায় যাও, চতুর্দ্দিকে তোমার বিপদ। সেখানে যাইও না। তোমাকে দেখিলে প্রজাগণ আবার ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট ফৌজ পাঠাইয়াছেন। প্রজারা যদি আবার বিদ্রোহী হয়, তাহারা সিপাহির বন্দুকের গুলিতে দলে দলে মারিবে। সম্প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাতে তোমাকে বলিতেছি, তুমি মামুদ পরগণায় এক্ষণ আর যাইও না।

মহেশ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) আমাকে আপনি আর কিছু বলিবেন না। যাইবার অনুমতি দিবেন, যদি পুণ্যবল থাকে, আপনার চরণ আবার দেখিতে পাইব। অনাথিনীদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।" প্রবোধ বাবু আর অনুরোধ করিলেন না।

কুমুদিনী ও মায়া অনেক কান্না কাটি করিল। মহেশ অনমনীয়। তবে প্রবোধ বাবু, লীলা, কুমুদিনী ও মায়ার অনুরোধে মহেশ প্রবোধ বাবুর বাটীতে এক সপ্তাহ মাত্র বাস করিল। কিন্তু মহেশের মনে সুখ নাই, শান্তি নাই—কি যেন সতত ভাবিতেছে। কখন কখন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িত। এই সাত দিনের মধ্যে যদু, ভীম ও ষড়ানন ও মোকারিম সেখ কলিকাতায় আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মোকারিম বলিল, "ভয় করি না—এবার আমরা বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া লড়িব।" যদু বলিল, "প্রজারা যে আর যোগ দিবে তাহা বোধ হয় না, আর গুলির মুখে আমরা যে লাঠি ধরিয়া লড়াই ফতে করিতে পারিব তাহাও বোধ হয় না।"

মহেশ বলিল "নায়েব নটবর কোথায়?—"

যদু। বলিতে পারি না।

মোকারিম। তাহার গলায় দড়ি দিয়া, রাস্তায় রাস্তায় লইয়া যাওয়ার পর, সে যেখানেই যাইত, মেয়ে ছেলেরা পর্য্যন্ত বলিত ঐ "গলায় দড়ি যায়" তাহার পর সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে জানি না।"

মহেশ। তাহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করার আবশ্যক।

ভীম। আর ঘা কতক দিতে হয়, আমার উপর ভার দিলেই শূয়রকে ঘা কতক দিয়ে দিতে পারি।

মহেশ। ভীম আর ষড়ানন! তোমাদের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। তোমরা কলিকাতায় আসিয়া ভাল কর নি। পুলিশ খোঁজ পাইলেই ধরিবে।

ষড়ানন। তার ঔষধ আছে। কিছু টাকা সঙ্গে আছে। যদি একান্তই ধরে দুই এক টাকা না হয় ৫।১০৲ দিয়া চম্পট দিব। সহজে না হয়, অন্য উপায় আছে।

মহেশ। যদু, ভীম, ষড়ানন! আগামী অমাবস্যার রাত্রি দুইটার সময় শ্মশানকালীর মন্দিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। মা কালীর আদেশ নিয়ে যা স্থির হয় সেখানে বলিব। মোকারিম! ঐ রাত্রি চারিটার সময় তোমার গ্রামের

মসজিদের পিছনে যে বন আছে সেখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

এই কথাবার্ত্তার পর, মোকারিম, যদু, ভীম, ষড়ানন, সকলেই চলিয়া গেল। যেখানে কথা হইতেছিল তাহার পাশের ঘর হইতে একটী কৃশাঙ্গী তরুণী সমুদয় শুনিতেছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রজনী গভীর। মায়া নিদ্রিতা। কুমুদিনী জাগিয়া আছে। সে একটী কিসের শব্দ শুনিতে পাইয়া উঠিল। দেখিল, আস্তে আস্তে মহেশ সে ঘরে প্রবেশ করিল।

মহেশ। তুমি ঘুমাও নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমরা দুইজনে ঘুমাইয়াছ। তোমরা ঘুমাইয়া থাকিতে থাকিতে, তোমাদের দুই জনের মুখ আর একবার দেখিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম। মায়া কই?

কুমুদিনী। ঐ শুইয়া আছে।

মহেশ নতজানু হইয়া ভগ্নীকে দেখিল। তার পর উর্দ্ধে তাকাইয়া হাতজোড় করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "মা কালি যেন এই বালিকার আর কোন বিপদ না হয়।" মহেশের চক্ষের দুই ফোঁটা জল মায়ার মুখের উপর পড়িল। মায়া নিদ্রিতা, জানিল না।

মহেশ কুমুদিনীকে বলিল, "তুমি পাশের ঘরে এস। এখানে কথায় কথায় শব্দে মায়া জাগিয়া উঠিতে পারে।"

মহেশ ও কুমুদিনী পাশের ঘরে যাইল।

কুমুদিনী কাঁদিয়া মহেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "হৃদয়েশ্বর, আবার কোথায় যাইবে—আমার আর মায়ার যে আর কেহ নাই—"

মহেশ কুমুদিনীকে বুকে টানিয়া তাহার অশ্রুপূর্ণ রাজীবলোচন চুম্বন করিল। দুইজনে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ।

কুমুদিনী আবার বলিল। একবার এ দাসীর কথা না শুনিয়া কত বিপদে পড়েছিলে। আমি তোমার পায় পড়ি—আর প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে যেওনা, আমাদের দুজনকে অনাথিনী ক'রে ভাসিয়ে দিওনা।

মহেশ। যা করেন মা কালী; আমি হয়ত দু মাসের মধ্যে আবার ফিরে আসব।

কুমুদিনী। না না। আমরা দুজনে তোমাকে ছেড়ে দেবনা—আমাতে আর মায়াতে তোমাকে ধ'রে রাখ্‌ব—মায়া—মায়া—

মায়া অপর গৃহ হইতে নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিল—"কি বৌ?"

মহেশ কুমুদিনীকে আর একবার চুম্বন করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। মায়া ঐ ঘরে দৌড়িয়া আসিল।

মায়া। বৌ কি হয়েছে।

কুমুদিনী। আর কি হবে? তোর দাদা বুঝি এবার চিরকালের জন্য চলে গেল।

কুমুদিনী আর মায়া দুইজনে নীরবে বসিয়া পরস্পরকে ধরিয়া কাঁদিয়া রজনী অতিবাহিত করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মহেশ কলিকাতা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। নিজের গ্রামে গিয়া ভদ্রাসন বাটী খুঁজিল। তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। জমিদারের লোক মহেশের ভিটা চষিয়া এক্ষণে ধান বুনিয়াছে। মহেশ—নটবর কোথায় সন্ধান করিতে লাগিল। খোঁজ পাইল। একদিনের পথ দূরে রাজাপুর নামক পল্লীগ্রামে সে বাস করিতেছে। সে এক্ষণে ফোঁটা কাটে, নামাবলী গায় দেয় এবং শিষ্যদিগকে মন্ত্রও দেয়। কিন্তু স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল ভোল্ ফিরাইয়াছে মাত্র। একদিন অপরাহ্নে নটবর মাঠ দিয়া গ্রামে আসিতেছে, এমন সময়ে দেখে তাহার সম্মুখে একজন বীরপুরুষ। বীরপুরুষ বলিল, "চিনিতে পার নায়েব?" মহেশের চেহারা কয়েদ থাকার সময় হইতে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে নটবর প্রথমে যথার্থই তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

নটবর চমকাইয়া বলিল, "কেগা তুমি—হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।"

মহেশ। আমি তোমার যম।

নটবর! খুন করিবি নাকি?

মহেশ। যা করিব দেখ। এই এক গাছা লাঠি ধর্—পাষণ্ড! তুই জানিস্ না—সে যখন মহেশের পরিবারের হাত ধরেছিলি, তখনই তুই যমের বাড়ী গিছিস্।—নে, লাঠি ধর্—পারিস্ ত জীবন রক্ষা কর।

নটবর। তুই আমার বাবা, আমি নিরীহ বৈষ্ণব, চৌদ্দপুরুষে আমি কখন মায়েবী করিনি। আমি নটবর নহি—আমি কৃষ্ণদাস বাবাজী—

মহেশ। কৃষ্ণদাস! তুই মহেশের বাপ হারাধনকে খুন করিছিলি—কাছারিতে—হুকুম দিয়ে। মনে নাই? মহেশ জীবিত থাকিতে মহেশের সতী সাধ্বী স্ত্রীকে ছুঁইছিস্—তাহার পিতাকে খুন করেছিস্—আর তোর এক্ষণও জীবনের আশা আছে?

নটবর। তুমি আমার বাবা, আমাকে খুন করো না। আমি বৈষ্ণব, আমি নটবর নহি।

মহেশ। মিছে ক'রে আর পাপ বাড়াচ্ছিস্ কেন? মরদের মত লাঠি ধর্, না হয় ত এইরূপ লাথির ঘাতে তোকে কীচক বধ ক'র্ব্বো। (মহেশ তাহাকে তাহার নাগরা জুতার এক লাথি মারিল)।

নটবর। বাবা মহেশ! তোর—পায়—ধরি, আর মারিস না। আমি নটবর—আমাকে ক্ষমা কর—চিরকাল তোর গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব।

মহেশ। লাঠি নে, তা নৈলে আবার এক লাথি খাবি।

নটবর অগত্যা লাঠি নিল। মহেশকে মারিতে লাগিল। মহেশ প্রথমে কেবল ঠেকাইতে লাগিল। নটবরের কান্নাতে তার কেমন যেন একটা দয়া হইতেছিল, তাই মনে করিতেছিল যে, একটা জীবহত্যা করিব কি? হিন্দুর প্রাণ—যদি স্মরণাগতের হাজার অপরাধ থাকে, তবু তার ক্রন্দন শুনিলে মনটা কেমন নরম হইয়া যায়। কিন্তু হারাধনের যন্ত্রণা আর কুমুদিনীর কেশাকর্ষণ যখন মনে হইল, তখন মহেশ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "না, না, এ পাপের ক্ষমা নাই—পাষণ্ড পরিস্ ত প্রাণ রক্ষা কর—" মহেশ প্রচণ্ডবেগে দুইবার যষ্টি প্রহার করিল। নটবর ধরাশায়ী, মহেশের চক্ষু কপালে—"ওরে নরাধম—যা যমালয়ে" বলিয়া—যেমন যষ্টি উত্তোলন করিয়াছে, অমনি একজন ছুটিয়া আসিয়া, তাহার লাঠি ধরিল।

মহেশ দেখিল, সেবানন্দ স্বামী। বলিল—"ঠাকুর তুমি কেন লাঠি ধরিলে। ছাড়—"

সেবানন্দ স্বামী। না ছাড়িব না, ক্রোধবশতঃ নরহত্যা করা মহাপাপ। তোমাকে সেই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি আসিয়াছি।

মহেশ। স্বামীজী কি ক'র্লে?

ইতিমধ্যে আর দুই জন সন্ন্যাসী আসিয়া মহেশকে স্কন্ধে করিয়া কোথায়

লইয়া চলিল। সেবানন্দ স্বামী নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনয়ন করিয়া নটবরের মুখে দিলেন, রক্ত ধৌত করিয়া দিলেন এবং আর একজন সন্ন্যাসীর সাহায্যে নিকটবর্ত্তী একটী কুটীরে তাহাকে লইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নরেশ বাবু উইলের মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার ভাগিনেয়—শ্যামচাঁদ জমিদারিতে দখল পাইয়াছে। তাঁহাকে উইলে যে ২০০৲ টাকা দিবার সর্ত্ত ছিল, সে টাকা তিনি ঘৃণায় লন নাই। মোকদ্দমার খরচায় নরেশের হাতে এখন কিছু টাকা নাই। নরেশ কলিকাতায় একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাসায় বসিয়া ভাবিতেছেন। "কি আশ্চর্য্য। বিপদে স্ত্রীও কেহ নয়। আমি তাহাকে যাহা দিয়াছিলাম—টাকা গহনা লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল—এখন আর খবরও লয় না—আমার খাওয়া হইতেছে না, তাহা লিখিয়া কিছু টাকা পাঠাইতে পত্র লিখিলাম, উত্তর দিল না। কি সয়তানী—এতদিন বুঝি নাই। বাসা ভাড়া কয় মাসের বাকী। বাজার খরচ জন্য চাকর চাকরাণীর কাছে আর কত ধার পাওয়া যায়। সব বন্ধুদের দেখ্‌লাম। যতদিন টাকা ছিল, ততদিন তারা খোসামোদ ক'রেছিল। বাবা বলেছিলেন—"নরেশ! প্রবোধের কথা শুনিস্।" পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম। ঐ সর্ব্বনাশিনী স্ত্রীর কথায় প্রবোধ বাবুর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌লেম। অকারণ তাকে অপমান কর্‌লেম। তিনি সাহসী পুরুষ হইয়া প্রতিশোধ লইলেন না। কেবল বলিলেন, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে"—অনেক দুঃখই ত—যে পিশাচী স্ত্রীর জন্য এমন বন্ধুর কথা পায় ঠেলিয়াছিলাম সে পিশাচী এখন কোথা?—প্রবোধ বাবুর কাছে কিছু টাকা ধার চাব? না, ম'রে গেলেও তা পার্ব্বো না। আমি এক পয়সার মুড়ি খেয়ে থাক্‌ব। কিন্তু চাকর চাকরাণী খাবে কি? ভিক্ষা করিতে যাব? না, না; তা পার্ব্বো না। জমিদার ভূপেশের পুত্র ভিক্ষা ক'র্ব্বে? না—আত্মহত্যা—বরং সেও ভাল। সন্ন্যাসীটা আসে যায়—সন্ন্যাসী হই না কেন? সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আমার সংবাদ লয়। ও শ্যামচাঁদের চর নহে ত? এমন সময় একতারার সঙ্গে গুণ গুণ স্বরে গান করিতে করিতে কে আসিতেছে—

গান।

কেন উচাটন মন, লওরে শরণ

সেই কমল চরণে।

গুরুপদেশ ধর, বৃথা চিন্তা আশা ছাড়,

পাবে সুখশান্তি মনে॥

নিষ্কাম করম কর, ভজরে পরমেশ্বর,

ভক্তিময় আরাধনে।

সবে ডাকিছেন মাতা, এস সব সুত সুতা,

লইবেন কোলে তুলে,

অপরাধী সন্তানে।

——:*:——

স্বামী স্ত্রীর বিবাদে সোলে নিষ্পত্তি।

শ্রীযুক্ত নবপ্রভা সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়;

"কার দোষ" বিচার করিবার জন্য নবপ্রভার পাঠকগণের সম্মুখে মকর্দ্দমার নথি পেষ করিয়াছেন। মকর্দ্দমাটী বাস্তবিকই বড় সঙ্গীন। এ প্রকার গৃহ বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি তদভিপ্রায়ে একটা বর্ণনা পত্র দাখিল করিলাম, আমি সাহিত্য আদালতের জুনিয়ার উকীল। আমাদের বর্ণনা পত্র আপনার মত প্রবীণ উকীলের অনুমোদিত হইলেই চরিতার্থ হইব।

নিবেদনমিতি।

শ্রীঅতুল চন্দ্র সিংহ।

মিনতি।—

ক্ষমা কর, সতি লক্ষ্মি, হয়েছে কসুর।

যা হবার গেছে হয়ে, সব দোষ পাশরিয়ে

সর্ব্বনেশে বাবুয়ানা করে দাও দূর।

ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

২

হয়েছে উচিত শিক্ষা, পায়ে ধরি কর রক্ষা,
সোণার সংসার নয়, হয়ে যায় চুর।
ফুটেছে এখন চোখ, মিটেছে সখের ঝোঁক,
আক্কেল সেলামী সব পেয়েছি প্রচুর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

৩

ছাড় ছাই বেশ ভূষা, দিনরাত মাজা ঘষা,
দিনে দু'শ' বার দেখা মোহন মুকুর।
গাউন বডিস ছাড়ি, পর দিব্য পেড়ে সাড়ী,
আল্‌পেয়ে চুড়ীগুলা ভেঙ্গে কর চুর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

৪

লাল হাতে লাল শাঁখা, কিবা শোভা হবে বাঁকা,
ঘোমটা টানিয়া দাও মুখে সুমধুর।
সিঁথিতে সিন্দুর পর, সরম ধরম ধর,
সতী লক্ষ্মী হয়ে আলো কর অন্তঃপুর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

৫

হাঁই তুলে, পাশ ফিরে, বিছানায় থেকে পড়ে,
বৃথা ক্ষয় করোনাক প্রভাত মধুর।
ছড়া ঝারা, দীপদান, কর ফিরে অনুষ্ঠান,
হউক আবার লাভ লক্ষ্মী সুপ্রচুর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

৬

কাজ নাই শিল্পকর্ম্মে, ছাড়ি সব নারীধর্ম্মে,
করোনাক জন্মটাকে বেয়াড়া বেসুর।
গৃহস্থের ধর্ম্ম রাখ, দয়া মায়া, সেবা শেখ,
পুণ্যাশ্রম হোক পুনঃ লক্ষ্মীহীন পুর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

৭

লজ্জা ভয় ভক্তি সেবা, স্ত্রীলোকের নিত্য শোভা,
মন দিয়ে শেখ সব হইবে মধুর।
বার, ব্রত, উপবাস, যত্নে পাল বার মাস,
আচার বিচার গুলা করোনাক দূর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

৮

কল্যাণি, কল্যাণে তব হোক পুনঃ আবির্ভাব,
ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা, আনন্দ প্রচুর।
দেখিয়া জুড়াক চোখ, দূরে যাক দুঃখ শোক
পাত দেখি ফিরে সেই সংসার মধুর।
ক্ষমা কর সতি লক্ষ্মি হয়েছে কসুর।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সিংহ।

মেঘদূত।

খ। কাব্যে ভৌগোলিক বিবরণ।

(৫) কুরুক্ষেত্র বা পাণিপতের সমভূমি।

(i) "ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদম্" "কৌরবং ক্ষেত্রং" (৫২ শ্লোক)।

কবি এখন মেঘকে দশপুর হইতে একেবারে শত শত মাইল উত্তর পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্তে যাইতে বলিতেছেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র উভয়ই পাঠকের সুপরিচিত। দৃশদ্বতী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত (মনু, ২।১৭); পুনশ্চ ব্রহ্মাবর্ত্তে, কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল ও শূরসেন দেশ অন্তর্গত (মনু, ২।১৯)। মহাভারত বনপর্ব্ব ও শল্যপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমানা অনেকটা ব্রহ্মাবর্ত্তের সঙ্গে মিলে। কুরুক্ষেত্র আধুনিক বাণেশ্বরের চতুস্পার্শ বেষ্টিয়া প্রায় ৪০ ক্রোশ ব্যাপ্ত। অন্যান্য তীর্থের মধ্যে ব্রহ্মাসর বা রামহ্রদ দ্রষ্টব্য; ইহা ৩৫৪৬ ফুট লম্বা ও ১৯০০ ফুট চৌড়া। [Arch. Surv. India Vol. II pp. 217-8]

(ii) সারস্বতীনাং" (৩৫ শ্লোক)।

সরস্বতী নদী সর্ব্বপ্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। আধুনিক সরস্বতী নদী সারমুর করদরাজ্যে উদ্ভব হইয়া (অক্ষাংশ ৩০। ২৩, দ্রাঘিমাংশ ৭৭। ১৯) অম্বালার নিকট দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম গতিতে স্থানেশ্বরের পদ ধৌত করতঃ কুরুক্ষেত্রের শত২ তীর্থ স্থানের মধ্য দিয়া যায়। তৎপরে কর্ণাল জেলার ও পাতিয়ালা করদরাজ্য পার হইয়া স্থানে স্থানে বালুকায় অন্তর্ধান হওত শির্ষা জেলায় ঘাগর নদীতে পড়িয়াছে। সরস্বতীর তটে যত পবিত্র তীর্থ, এত তীর্থ গঙ্গা ব্যতীত আর কোন নদীতে নাই। মহাভারত বনপর্ব্ব সেই সব তীর্থের নামে পূর্ণ। কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্যে প্রায় ২০০ তীর্থের নাম আছে; সাধারণ প্রবাদ যে সরস্বতীর তীরে তিনশত ষাট (৩৬০) তীর্থ আছে।

৬। মধ্য হিমালয় গিরিপুঞ্জ।

(i) "অনু-কনখলং" "জহ্নোঃ কন্যাং" (৫৪ শ্লোক)।

কুরুক্ষেত্র হইতে কখল উত্তর পূর্ব্ব, একশ মাইলের কিঞ্চিদূর্দ্ধ দূরে। কখল, তদুত্তরে মায়াপুর, তদুত্তরে হরিদ্বার, এই ভাবে ক্রমশঃ গঙ্গার ধারে বিস্তৃত। সাধারণতঃ হরিদ্বারের নামই বিখ্যাত। কিন্তু কখলও খুব প্রাচীন; মহাভারতে ও হরিবংশে ইহার উল্লেখ আছে। কনখল ও মায়াপুর গঙ্গার ডানদিকে; হরিদ্বার গঙ্গার বামদিকে।

হরিদ্বারের অপর নাম গঙ্গাদ্বার। এখানে "মাতর্গঙ্গে" ত্রিধারা হইয়া শিবালিক পর্ব্বত ঘাটি হইতে সমভূমিতে নাবিতেছেন। হরিকা পয়ঁরী ঘাটও তন্নিম্নে "গঙ্গাদ্বার" মন্দির এই পবিত্র স্থানকে চিহ্ন করিয়াছে। উপরিউক্ত ঘাট প্রসিদ্ধ হইলেও আকারে ছোট; মাথায় ৩৪ ফুট চৌড়া, জলে ৮৯ ফুট চৌড়া ও সর্ব্বশুদ্ধ জল পর্য্যন্ত মোট ৩৯টি ধাপ [Arch. Surv. India, Vol. II. p. 235]

(ii) "তস্যা এব প্রভবমচলং" (৫৬ শ্লোকঃ)।

তার পরে মেঘ ক্রমশঃ উত্তর (অল্প পশ্চিম) হইয়া ক্রমশঃ উঠিতে উঠিতে গঙ্গোত্রীতে আসিবে। গঙ্গোত্রী গঙ্গার দৃষ্ট উৎপত্তি স্থান; এইখানে উচ্চ পর্ব্বত মালা মধ্যে প্রকাণ্ড তুহিন রাশির ভিতর হইতে মূল নদী বাহির হইয়াছে। ইহা গাড়ওয়াল প্রদেশে, হরিদ্বার হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে, ৩০।৫৯ অক্ষাংশ, ৭৮০।৫৯ দ্রাঘিমাংশ। গঙ্গোত্রীর উচ্চতা প্রায় ১০,৩১৯ ফুট। তথায় গঙ্গামূর্ত্তি যুক্ত ২০ ফুট উচ্চ একটি মন্দির আছে।

এখানে প্রকৃতি দেবী তাঁহার বিরাট মূর্ত্তিতে বিদ্যমান—দুইধারে "তুষারৈঃ গৌরং" গিরি রাশি; মধ্যে দীর্ঘ জমাট বরফ নদী; দূরে ঘন তুষরাবৃত শুভ্র শিখরের পর শিখর; নীচে কলকল নাদে গঙ্গাদেবী উপলখণ্ডের উপর প্রবাহিতা। দৃশ্য কি মহান্!

(iii) "চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দু মৌলেঃ" (৫৯ শ্লোক)।

ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়া পর্ব্বতের গায় শিবচরণ ন্যাস দেখিবে, তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত পরিক্রমণ করিতে কবি বলিতেছেন। এই স্থান এখনও চিহ্নিত হয় নাই। ইহা কি বদরিনাথের শিখর?

(iv) "প্রালেয়াদ্রেঃ" "হংসদ্বারম" "ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্" (৬১ শ্লোক)।

হিমাদ্রির উপতট ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া মানস-সরোবরে হংসগণের যাইবার দ্বার ক্রৌঞ্চরন্ধ্রকে প্রাপ্ত হইবে। এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র শাস্ত্রী মহাশয় ঞিতি পাসের সহিত চিহ্নিত করিয়াছেন। (পৃঃ ৪৫)। এই চিহ্নিত ঠিক বোধ হয়, কেন না হিমালয়ের এই ভাগে যতটা ঘাটি আছে তাহার মধ্যে ঞিতি ঘাটিটাই নিম্নতম, (১৬৬৭৬ ফুট উচ্চ), ও সহজগম্য। তিব্বত ও পূর্ব্ব তুর্কিস্থান হইতে বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ অনেকটা এই ঘাটি দিয়া ভারতে যাতায়াত করে।

হিমালয় পর্ব্বত গিরিমালায় পরিপূর্ণ। ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদেরা হিমালয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেন;—

১। উত্তর (উঃ পশ্চিম) গিরিপুঞ্জ (Northern range)।

২। মধ্য গিরিপুঞ্জ (Central range)।

৩। পূর্ব্ব গিরিপুঞ্জ (Eastern range)।

যে পথ দিয়া কবি মেঘকে যাইতে বলিতেছেন, সে পথ মধ্যে গিরিপুঞ্জ ও তৎপাদদেশীয় সিবালিক পুঞ্জের (Siwalic Range) ভিতর দিয়া গিয়াছে। অন্য দুই পুঞ্জর অপেক্ষা এই গিরিমালা তুলনায় কিছু কম উচ্চ হইলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বতায় কোন অংশে ন্যূন নহে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর নন্দাদেবী ২৫৭৪৯ ফুট উচ্চ।

৭। কৈলাস গিরিপুঞ্জ।

(i) "কৈলাসস্য" (৬২ শ্লোক)।

"কৈলাসাৎ" (১১ শ্লোক)।

হিমালয় পার হইয়া উত্তরে ও উর্দ্ধে দেখা যায় যে আর এক গিরি শ্রেণী

আছে। সেই শ্রেণী মানস-সরোবর হ্রদ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য গিরিপুঞ্জের সহিত অনেকটা সমান্তরাল ভাবে (parallel) গিয়াছে। উভয়ের মধ্যে শতদ্রু (Sutledge) নদী অধিত্যকার পয়ঃ নিসারণ করত প্রায় ২৮০ মাইল উত্তর পশ্চিম গিয়া পুনশ্চ দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। এই অধিত্যকা ও গিরিপুঞ্জ কৈলাস নামে প্রসিদ্ধ। কনিংহাম সাহেবের মতে কৈলাস ৫৫০ মাইল লম্বা ও অত্যুচ্চ শিখরাবলীতে পূর্ণ। ইহার শৃঙ্গগুলি সাধারণতঃ ১৬০০০ হইতে ২০০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। ইহার উত্তর পশ্চিমাংশ উত্তর হিমালয় গিরি-পুঞ্জের সহিত মিশিয়াছে ও সেইখানে সিন্ধুনদী এক গভীর ও ভয়ঙ্কর ঘাটিতে এই পুঞ্জকে পার হইয়াছে।

(ii) "মানসঙ্গ" (৬৬ শ্লোক)।

"মানসোৎকা" (১১ শ্লোক)।

"মানসং" (৮২ শ্লোক)।

মানস সরোবর কৈলাসের সর্ব্ব দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে অবস্থিত ও শতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থান। ইহার উত্তরে কৈলাস পুঞ্জ আরম্ভ। কৈলাসের শিখরে কুবের রাজধানী অলকা বিদ্যমান এই রূপ পৌরাণিক উক্তি।

এতদ্ব্যতীত ৫৫ শ্লোকে "যমুনাসঙ্গম" অর্থাৎ প্রয়াগের উল্লেখ আছে। প্রয়াগ পাঠকের সুপরিচিত থাকায় কোন বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যকতা হয় না।

শ্রীমন্মোহন চক্রবর্ত্তী

স্নিগ্ধা।

পূর্ণ যৌবনের কান্তি সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া,
উছলিয়া পড়িতেছে ঝলকে ঝলিয়া !
অক্ষয় মাধুর্য্য রেখা পেলব সুষমা,
স্নিগ্ধায় করেছে বিশ্বে যেন নিরুপমা !
চরণে অরক্ত রাগ মুখে মৃদুহাসি,
চিক্কণ অধরে ক্ষরে অমৃতের রাশি,

কটাক্ষে দামিনী বাঁধা, আঁখির মরমে
প্রেমের তরঙ্গ দোলে নির্ম্মল মরমে।
নৃত্যের সংযত কলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
অর্দ্ধ নৃত্য লইয়াছে চরণ গঠিয়া,
ভুরুর বলনী আর কুন্তলের লীলা,
প্রসাধিত হস্তে বিধি যতনে নির্ম্মিলা;
রূপোপরি সরলতা কমলে নীহার
যৌবনে উচ্ছ্বাস নব, বীণায় ঝঙ্কার।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

কাটোয়ার পথে।

(সত্য গল্প)

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পরাণের কথা শেষ হইলে বাবু বলিলেন "আমরা কর্জ্জণা মাঠের প্রায় তের আনা অংশ অতিক্রম করিয়াছি। বেলা আর অধিক নাই, বলদ দুইটা ক্লান্ত হইয়াছে দেখিতেছি, আমাদেরও সমস্ত দিবস আহারাদি হয় নাই, অতএব শীঘ্রই বিশ্রাম লাভের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।" সেই মাঠের পথের ধারে কতকগুলা অশ্বথ বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের তলে একটা ক্ষুদ্র দোকান দেখা গেল। সে দেশে এরূপ ক্ষুদ্র দোকানকে "চটি" বলে। চটিতে মুড়ি, মুড়কী, চিড়ে, গুড়, খই, নবাত, পাটালী, বাতাসা, মোয়া, চাউল, ডাউল প্রভৃতি পাওয়া যায়। রাস্তার বাম পার্শ্বে চটি এবং রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে দোকানদারের একখানি খালি ঘর ছিল, আমরা ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ঐ খালি ঘর খানি অধিকার করিলাম। বহুসংখ্যক পথিক একত্র না হইলে এই চটিতে প্রায় কেহই থাকিত না, কিন্তু আমরা সাহসে নির্ভর করিয়া চারি জনে ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

আমরা রাঢ় দেশের প্রথা মত যাহা পাক করিলাম, তাহা এই; রাঙ্গা রাঙ্গা মোটা মোটা চাউলের ভাত, কাঁচা আমের সঙ্গে খাঁড়ি মশুরীর লাল ডাল, বার্ত্তাকু দগ্ধ, আলু সিদ্ধ এবং পটোল ভাজা। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিতেছিল, সুতরাং এই "টকো" ডালের সঙ্গে রাঢ়দেশের চাউলের ভাত খুব তৃপ্তির সহিত পেট ভরিয়া আহার করিলাম। সেরূপ তৃপ্তি

অনেক সময়ে অনেক রাজার হয় কি না সন্দেহ। রাত্রে আমাদের কোনও বিপদ হয় নাই। আমরা খুব ভোরের সময় উঠিয়া চটির ধারে খড়্গেশ্বরী নাম্নী ক্ষুদ্রা নদীতে মুখ হাত ধুইয়া বলদ শকটে আরোহণ পূর্ব্বক আবার গমন করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা অনেকদূর চলিয়া গেলে পর, বাবু কহিলেন "কর্জ্জণা মাঠ এবারে শেষ হইল।" 'কর্জ্জণার মাঠ' শেষ হইল বটে, কিন্তু মাঠের শেষ হইল না। চারিদিক চাহিয়া দেখি—কেবল মাঠ, আর মাঠ!! চারি দিকই কেবল ধূ ধূ করিতেছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, আমি বাবুকে কহিলাম "মহাশয়! গরুর গাড়ীর ক্রমাগত হেলনে ও দুলনে আমার শরীরে ব্যথা বোধ হইতেছে, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিয়দ্দূর পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা করি।" বাবু তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন "যদি পায়ে হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট বোধ না কর, তাহা হইলে কিছু দূর চলিয়া যাও, কিন্তু রৌদ্র খুব ভয়ানক, ছাতা সঙ্গে লইয়া যাও।" আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম এবং পরাণ বাগ্দীকে আমার যায়গায় বসাইয়া দিলাম। গাড়ী হইতে নামিবার সময় ছাতা ও "গুপ্তি" সঙ্গে লইয়াছিলাম। অনেক পাঠক ও পাঠিকা হয়ত গুপ্তি কিরূপ তাহা জানেন না। বাঁশের বা কাষ্ঠের লাঠির ভিতরে খুব শাণিত পাতলা তরবারি লুক্কায়িত থাকে, এই তরবারিকে কিরিচ্ কহে। বাহির হইতে দেখিলে গুপ্তিকে লাঠি বলিয়াই ভ্রম হয়, বস্তুতঃ ইহা দ্বারা লাঠি এবং তরবারী এতদুভয়ের কার্য্যই সম্পন্ন হয়। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আমি ঐ কিরিচ্কে খুব পরিষ্কার করিয়া এবং তাহাতে নারিকেল তৈল দিয়া মালিষ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এক হাতে গুপ্তি এবং আর এক হাতে ছাতা লইয়া আমি পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, চলিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। মানুষের চলনের সঙ্গে গরুর গাড়ী কখনই চলিতে পারে না; দেখিতে দেখিতে আমি বহুদূরে গিয়া উপস্থিত হইলাম; গাড়ীখানা একেবারে দৃষ্টির বাহির হইয়া পড়িল। চলিতে চলিতে সম্মুখে একটা খুব বড় দীঘি দৃষ্টিপথে পতিত হইল, সেই দীঘির পাহাড় খুব উচ্চ, ঐ পাহাড়ের চারিধার ঘন তালগাছের শ্রেণীতে পরিপূর্ণ। এই দীঘির গর্ভ ভয়ঙ্কর স্থান, ইহাও দস্যুদিগের একটা প্রধান আড্ডা, এখানে সচরাচর পথিকেরা নিহত বা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া থাকে। আমি দীঘির পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলাম, দীঘির এ পার হইতে ওপার সহজে নজর হয় না। পাহাড়ের নীচে নামিয়া ধারে ধারে যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহাই অবলম্বন

করিয়া যাইতে হয়, নীচে নামিলে এমন নির্জ্জন ও ভয়ঙ্কর বোধ হয় যে, তথা হইতে ২৫ জন লোক একত্রে চীৎকার করিলেও বাহিরের লোক তাহা সহজে শুনিতে পায় না। দীঘি যেমন বড় তেমনি গভীর; গ্রীষ্মকাল বশতঃ, বিশেষতঃ বহুদিবস বৃষ্টি না হওয়ায়, দীঘির প্রায় দশ আনা জল শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি দীঘি পার হইয়া অপর পারে উঠিলাম; ভগবানের কৃপায় দীঘির ভিতরে কোনও বিপদ উপস্থিত হয় নাই। অপর পারে উঠিয়া একধারে একটা সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিয়া তাহারই সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিলাম। একটা গামোছায় মুড়ি, মুড়কী, সন্দেশ ও পক্ক কদলী বাঁধা ছিল, তাহাই খুলিয়া ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সে গুলি খাওয়া হইলে দীঘির ঘাটে নামিয়া দুইটি অঞ্জলির সাহায্যে দীঘির উত্তপ্ত সলিল পান করিলাম এবং তাহার পরে পুনরায় সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বোধ হইল যেন, বৃক্ষের কোনও শাখায় শকুনি প্রভৃতি বৃহদাকার পক্ষীরা বসিয়া শাখাকে সজোরে হেলাইতেছে ও দোলাইতেছে। এবং তজ্জন্য পাতায় পাতায় ঘর্ষণ হইয়া পুনঃ পুনঃ শব্দ হইতেছে। ঊর্দ্ধ শাখার দিকে খুব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, বৃক্ষে একটিও পক্ষী নাই, কিন্তু একটা ভয়ানক কৃষ্ণাকৃতি এবং বিপুলবপু বলবান ব্যক্তি সেই গাছের উপর হইতে নীচের দিকে নামিতেছে। তাহার মাথায় খুব ঘন কালো চুল, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ মালা, গোঁপ খুব প্রকাণ্ড এবং দাড়ী খুব দীর্ঘ। তাহার হাতে বাঁশের মোটা লাঠি। লোকটাকে দেখিলেই ভয় উপস্থিত হয়। যাহা হউক তাহাকে নামিতে দেখিয়া, আমি অতি শীঘ্র সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটু দূরে আর একটা বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইলাম, ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলাম, সে বৃক্ষের উপরে কোনও দস্যু ছিল না। দীঘির পাহাড় হইতে পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, এরূপ বলবান দস্যুর সম্মুখ হইতে আমি কতক্ষণ পর্য্যন্ত দৌড়িয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি? এক লম্ফেই এ ব্যক্তি আমাকে হস্তগত করিবে। আমি সাহসে নির্ভর করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দস্যু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "ওরে! তোর নাম কি? তুই যাবি কোথায়? আমি বলিলাম "আমি পথিক; কাটোয়ার দিকে যাইতেছি।" দস্যু কহিল "তোকে আর কাটোয়া যেতে হবে না, এই দীঘির জলে তোকে কাটোয়া দেখাইয়া দিব। তোর মাথা ফাটাইয়া এই দীঘির ভিতরে তোকে পুঁতিয়া রাখিব। তোর সঙ্গে কি আছে বল্?" আমি কহিলাম "আমার সঙ্গে

মুড়ি, মুড়কি আছে, আর পাকা কলা আছে, তুই খাবি-কি?" দস্যু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল "তোর সঙ্গে কি আছে বল, নতুবা আমার হাতে তোর মৃত্যু নিশ্চয়।" "আমার সঙ্গে কিছু নাই" শুনিয়া ডাকাইত কহিল "ওরে! তোর মৃত্যু নিকট দেখিতেছি, আমি এক লাঠিতেই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। শীঘ্র শীঘ্র টাকা বাহির করিয়া দে; নতুবা আমার হাতে তোর মৃত্যু নিশ্চয়।" এই রূপে লোকটা মুখের দ্বারা অনেক ভয় দেখাইতে লাগিল, অনেক কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, কিন্তু একটি পদও অগ্রসর হইয়া আমার নিকটে আসিল না বা আসিতে পারিল না। আমি মনে মনে ভাবিলাম, হাতীর তুলনায় পিপীলিকা যেরূপ, এই দস্যুর তুলনায় আমি সেইরূপ, এ ব্যক্তি মনে করিলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু তাহা না করিয়া এ ব্যক্তি কেবল মুখে ভয় দেখাইতেছে কেন? যাহা হউক, এই লোকটার সাহস সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় জন্মিল। আমি তখন একটু নির্ভর হইয়া ঝটিতি লাঠির ভিতর হইতে কিরিচ্ খানা বাহির করিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক রৌদ্রের দিকে তাহা উচ্চ করিয়া ধরিলাম; সেই শাণিত তরবারী—সুরকি দ্বারা পরিমার্জ্জিত এবং নারিকেল তৈলাভিষিক্ত—সেই শাণিত কিরিচ্, রৌদ্রের সম্মুখে গিয়া শত সহস্র হীরকের জ্যোতি ধারণপূর্ব্বক দস্যুকে চমকিত করিল। দস্যু অবাক্ হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। আমি বলিলাম "দেখ্‌ছিস্! এই শাণিত তরবারী তোর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তোর লাঠির আঘাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই কিরিচের আঘাতে তোর মৃত্যু নিশ্চয়।" এই কথা কহিয়া তরবারী ঘুরাইতে লাগিলাম এবং ঘুরাইতে ঘুরাইতে দীঘির পাহাড়ের আর এক দিক দিয়া নীচে অবতরণ করিতে লাগি-লাম। ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, লাঠির উপরে ভর দিয়া, দস্যু পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে অতি কষ্টে দীঘির পাহাড় হইতে নীচে নামিতেছে। আমি আরও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, লোকটা খোঁড়া। *

ক্রমশঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

* এই ঘটনার পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছিল যে, এই দস্যু ডাকাইতি করিতে গিয়া একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান কর্ত্তৃক এরূপ প্রহারিত হইয়াছিল যে, তাহাতে এই ব্যক্তি খঞ্জ হইয়া গিয়াছিল। এখন আর ডাকাইতি করিতে না পারায়, পথে, ঘাটে, মাঠের ধারে, গাছের ডালে, লুকাইয়া থাকিয়া, পথিককে একাকী দেখিলে, ভয় দেখাইয়া টাকা কাড়িয়া লয়।—লেখক।

বঙ্গের শেষবীর।

(প্রতিবাদের উত্তর।)

"নবপ্রভা" কার্ত্তিক সংখ্যায়, আমার লিখিত, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় প্রণীত "বঙ্গের শেষবীর" নামক উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে বা ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া যে আমি ঐ সমালোচনা লিখিয়াছি, ইহা ধারণা করিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়। যাঁহারা স্থিরচিত্তে, পক্ষপাত শূন্য হইয়া শাস্ত্রীর ইতিহাস ও রক্ষিতের উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা আমার লিখিত সমালোচনার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিয়াছেন। রায় সাহেবের প্রতি জবরদস্তী করা আমার উদ্দেশ্য নহে; সাহিত্য-জগতে সত্যকথা বলাই আমার অভিপ্রায়।

বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর, তদীয় শূন্য সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য, রায় সাহেবের ঐকান্তিক বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক আছে, ইহাই আমার ধারণা। যতদূর বুঝিয়াছি, তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে, তাঁহার প্রত্যেক স্বর-লহরীতে এবং তাঁহার পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত প্রায় প্রতি গ্রন্থের আকার, প্রকার, আরম্ভ ও ভঙ্গিতে, এ ভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। যিনি এত বড় উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাহিত্যের রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাকে অন্যের অনুকরণে প্রয়াসী দেখিলে, হৃদয়ে আঘাত লাগে। তাই, "বঙ্গের শেষবীরের" প্রতিকূল সমালোচনার অবতারণা। আমি উক্ত সমালোচনায় যাহা বলিয়াছি, গ্রন্থকারের পক্ষে অপ্রিয় হইলেও, তাহা সার সত্য।

কিন্তু সত্য হইলে কি হয়;—ইহাতে "বঙ্গবাসী"র সাহিত্যসমাচার-লেখক মহাশয় হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি 'নবপ্রভার' সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের ও আমার প্রতি বিষম রুষ্ট হইয়া, বিগত ২৮শে কার্ত্তিকের "বঙ্গবাসী"র সাহিত্য-সমাচারে বলিয়াছেন যে "'বঙ্গের শেষবীর' প্রবন্ধে একদর্শিতার একশেষ। (?) হারাণ বাবুকে পরস্বাপহারী বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াসে যুক্তিহীন জবরদস্তি মাত্র।" হা! অভাগিনী বঙ্গভাষা!!

কোন একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা আবশ্যক হইলে, সেই প্রবন্ধটির

আলোচ্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা উচিত। আদ্যন্ত পাঠ না করিয়া, বাক্যবর্ষণ করিলে, শূন্যে শিলাখণ্ড নিক্ষেপের ন্যায় তাহা সর্ব্বথা বৃথাই হয়। আমি যাহা বলিয়াছি, 'বঙ্গবাসীর' লেখক তাহার কোন কথার যথাযথ প্রতিবাদ না করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক, তাঁহাদের সমক্ষে সমালোচককে দোষী প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, মূল ঘটনা চাপা দিয়া, কতকগুলি অসংযত ও অসংলগ্ন কথার অবতারণা করিয়াছেন মাত্র। প্রকাশ্যে না হউক, স্বগতঃ কি একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন যে, প্রতাপাদিত্যের "পিতৃদ্রোহিতা" সীতারামের 'স্ত্রীর' "প্রিয়প্রাণহন্ত্রিতা" হইতে গৃহীত নহে? প্রতিবাদে, প্রমাণস্বরূপ রাম রাম বসুর গ্রন্থ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে "পিতৃদ্রোহিতা" না বুঝাইয়া "পিতৃব্য-দ্রোহিতা"ই বুঝায় ইহাকে সাধারণ ভাবে কোষ্ঠীর ফল বলা যাইতে পারিত। বাস্তবিকও তাহাই। তাহা না বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কৌশলটিকে অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করায়, কল্পনার কি লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না।

সে যাহা হউক, না হয় মানিলাম, রাম রাম বসুর গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার প্রতাপের "পিতৃদ্রোহিতার" অবতারণা করিয়াছেন। এখানে মনে রাখা উচিত যে, রাম রাম বসু কোষ্ঠীর ফলটি মাত্র বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু উপন্যাসে স্পষ্ট কৌশলটি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব; এই কৌশল উদ্ভাবনে তিনি কলঙ্কিত হন নাই বরং যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। এইরূপে, একখানি দেশমান্য গ্রন্থে যে কৌশলটি প্রতিভার পূর্ণালোকে পূর্ব্বেই প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা কি হারাণ বাবুর ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত নহে? যে ঘটনা প্রত্যেক বাঙ্গালা উপন্যাস-পাঠকের সুবিদিত, তাঁহার কি, তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, অন্য কৌশলের উদ্ভাবনে নিযুক্ত হওয়া উচিত ছিল না?—ইহাকে কি বলিব?—অসাবধানতা অথবা অনুকরণ! গ্রন্থকারের মন জানে। আমি মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি প্রতাপ কর্ত্তৃক পিতৃব্যহত্যার কারণ,—তাঁহার চাক্‌সিরি লাভে অকৃত কার্য্যতা;—আর কিছু নহে।

বঙ্গবাসীর লেখক বলিতেছেন—"বঙ্কিম বাবু ইংরেজ রাজ সম্বন্ধীয় কথা না লিখিলেও বুদ্ধিমান্ ইংরেজ রাজ বিচলিত হইতেন না। হারাণ বাবু সম্বন্ধেও এই কথা। তবে এরূপ লিখিতে হইলে বা এরূপ লেখার আবশ্যকতা থাকিলে এরূপ ভাবে লেখা ভিন্ন কোন গ্রন্থকারের গত্যন্তর নাই।"

পরিষ্কার যুক্তি!! এরূপ উদার মীমাংসা যদি সাহিত্য-জগতে সর্ব্ববাদি-

সম্মত হয়, তাহা হইলে, এখন হইতে সকলেই গ্রন্থকার হইতে পারেন। আর কাহাকেও সমালোচকের তীব্র কসাঘাত ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে না। আর কাহাকেও "যুক্তিহীন জবরদস্তীর" লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে না।

মূল প্রবন্ধে, ব্রাহ্মণের রাজ্ঞী প্রার্থনার কথা অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কোথায়ও করা হয় নাই। প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পাঠকরা উচিত ছিল। এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে উভয় গ্রন্থের ভাষার সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়াছে, আমি তাহাই বলিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা প্রলোভনীয় না হইলেও, "বঙ্গের শেষবীরে"র অনেক স্থানেই যে তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমি মূল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আমি যে সকল স্থান দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, প্রতিবাদে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। হারাণ বাবুর মৌলিক ভাষার সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলি নাই; তাঁহার সংগৃহীত ভাষারই আলোচনা করিয়াছি মাত্র। অতএব, "এ পর্য্যন্ত হারাণ বাবুর ভাষার নিন্দা প্রায়ই শুনা যায় নাই" বলিয়া আক্ষেপের কোন হেতু নাই।

বঙ্গবাসীর লেখক বলেন "সূর্য্যকান্ত বা শঙ্কর সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় সুমীমাংসা করেন নাই। সে কাজ ঐতিহাসিকের! কবি ক্ষীরোদ প্রসাদ অবশ্য কল্পনায় একটা মীমাংসা করিয়াছেন। হারাণ বাবুর সেরূপ একটা করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি পতিত হন নাই; তবে করিতে পারিলে কৃতিত্বের যশোভাগী হইতেন।"

যুক্তির চমৎকারিত্ব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এ কথার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। তবে, ঐতিহাসিক ও উপন্যাস-লেখকের কার্য্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। ঐতিহাসিক যতক্ষণ না একটি ঘটনা সন্তোষ-জনকরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবেন, ততক্ষণ তিনি গ্রন্থমধ্যে ঐ ঘটনা সন্নিবিষ্ট করিতে পারেন না। কিন্তু এস্থানে উপন্যাস-লেখক নিরঙ্কুশ,—ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকও কতকাংশে নিরঙ্কুশ। মূল ঐতিহাসিক তথ্য অব্যাহত রাখিয়া তিনি অমীমাংসিত স্থলের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন। উপন্যাসে "কোথা হইতে আসিয়া জুটিল" বলাটা কি প্রতিভার পরিচায়ক?

সমালোচনার অর্থ যদি স্তুতিবাদ হয়, তাহা হইলে, "বঙ্গের শেষবীরের" সমালোচনা প্রকাশ করার জন্য নবপ্রভার সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় অপরাধী

হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ অধম সমালোচনার সেরূপ অর্থ কোন দিন শিক্ষা করে নাই, তাই তাহার এই দুঃসাহস। অদ্য এই পর্য্যন্ত। বিষয়ান্তরে এসম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅভয়াকিশোর ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য দরবার।

বঙ্গদর্শন—কার্ত্তিক।

"সাহিত্য-সামগ্রী"। লেখক বলেন "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ললিত-কলা।" প্রথমতঃ ললিত-কলার এক অংশ (কাব্য) সাহিত্যের এক অংশ মাত্র। লেখক বোধ হয়, কাব্য অর্থে সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃহদায়তন "সাহিত্য" শব্দের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ করার প্রয়োজন দেখি না। লেখকের মতে জ্ঞান বা সত্য "ব্যক্তি বিশেষের নিজত্ব বর্জ্জিত", সাহিত্য (কাব্য) নিজত্ব বিশিষ্ট; জড় জগতের জ্ঞানকে যথা মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞানকে"নিজত্ববর্জ্জিত"বলা যায়।কিন্তু মনোবিজ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিকজ্ঞান নিজত্ববর্জ্জিত নহে। যাহা অন্তর্মুখ জ্ঞান তাহা নিজত্ব বিশিষ্ট, যাহা বহির্ম্মুখ জ্ঞান তাহা নিজত্ব বর্জ্জিত। লেখকের মতে "সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশী" একথাও স্বীকার করিতে পারি না। ষড় দর্শন (সারবান্ সাহিত্য) কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা কি কম স্থায়ী? "সারবান্ সাহিত্য" ইত্যাদি বাক্যে লেখক সাহিত্য শব্দ কাব্যেতর বিষয়ও বুঝায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। "সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।" এখানে"সাহিত্যের"না লিখিয়া "অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যের" লিখিলে অনেকটা ঠিক হইত। 'অনেকটা' বলিলাম তাহার কারণ, যদিও কাব্য ভাবপ্রধান, রসাত্মক দ্রব্য, তথাপি ইহার মূল জ্ঞান। ফরাসি পণ্ডিত টেন Taine দেখাইয়াছেন কোন সময়ের ললিত কলা তৎকালিক সভ্যতাদির উৎকর্ষ বা পুষ্পোদগম। সভ্যতা জ্ঞানমূলক। সুতরাং ললিত কলাও জ্ঞানমূলক। পদ্ম যেন কাব্য, নাল ও মৃণাল যেন জ্ঞান। যে পরিমাণ জ্ঞান ও চিন্তা বিকশিত হইবে সেই পরিমাণে ভাব ও কাব্য স্ফূর্ত্তি পাইবে। এই সচ্চিদানন্দের জগতে "চিৎ" ও "আনন্দ" যেন দুই দেবকন্যা—নিত্য হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে পূর্ণ আনন্দে পঁহুছিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তি (বা ভাব) উভয়ই চাহি।

বস্তুতঃ, ন ভক্ত জ্ঞানিনোদৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণ ভিন্নতা। শাস্ত্র জ্ঞানী এবং ভক্তের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না। লেখক বলেন ;—

যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সকল শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে কিন্তু হৃদয় ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না''।

ভিক্তর হুগো (Hugo) ঐ রূপ একটা কথা বলিয়াছেন বটে। কিন্তু পুরাতন জ্ঞান নূতন জ্ঞানে যেমন আচ্ছন্ন হয়, ললিত কলা নূতন আবিষ্কারে তেমনি আচ্ছন্ন হয় না এ কথা সত্য বোধ হয় না। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, যে অসভ্য উৎসবানন্দে মাতিয়া প্রথমে করতালি দিয়া লম্ফ পূর্ব্বক তালে তালে চীৎকার করিয়াছিল, তাহাকে গান বাদ্য ও নৃত্যের প্রবর্ত্তক মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু কলা বিদ্যার উন্নতি ক্রমে, নূতন আবিষ্কারে, সেই করতালি-লম্ফ-চীৎকার-ভাব আচ্ছন্ন হইয়াছে। কত ক্ষুদ্র কবির রচনা হোমারে বা রামায়ণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। কত ক্ষুদ্র ইতালীয় উপন্যাসের ভাব সেক্ষপিয়ারে "আচ্ছন্ন" হইয়াছে। তবে, ললিত কলা সম্বন্ধে লেখকের মতের প্রতিবাদ করিয়াও আমরা তাঁহাকে দোষ দেই নাই। কেননা ললিত কলা সম্বন্ধে মহাত্মাদিগের মধ্যে অদ্ভুত মতভেদ দেখিতে পাই। সাহিত্য-ভীষ্ম প্লেটো কৃষি, জুত্রা-নির্ম্মাণ শিল্প পর্য্যন্তকে ললিত কলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। অপর দিকে শিলার (Schiller) ললিত কলাকে ক্রীড়াত্মক মনে করিয়া, ললিত কলা বা ক্রীড়াই মানব-জীবন-সার বিবেচনা করিয়াছেন। "Only when he plays is man really and truly man." "Man ought only to play with the beautiful only"—আমাদের বক্তব্য বঙ্গদর্শনের লেখক সাহিত্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া সারবান্ সাহিত্য হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করাতে বঙ্গদেশের এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতি করিতেছেন। উচ্চ উদার সাহিত্য জাতীয় জীবনকে বিহিতকার্য্যশীল করিবে, জাতীয় চরিত্রকে উন্নত করিবে। আবার উচ্চ জাতীয় জীবন, মহৎ চরিত্র, মহৎ কর্ম্ম, উচ্চ জাতীয় সাহিত্য উৎপাদন করিবে। "প্রয়োজনের'' মন্থনে সাহিত্য-সুধা উত্থিত হইবে। তাই, যদি সাহিত্যের উন্নতি চাহেন, দেশের প্রয়োজন কি তাহাই অনুভব করুন, অন্তরের সহিত আলোচনা করুন, অমঙ্গলের প্রতিকারের চেষ্টা করুন। আর যদি মঙ্গল সংবাদ কিছু পাইয়া থাকেন, আর তাহাতে আপনার হৃদয় আনন্দে মাতিয়া থাকে তাহা ঘোষণা করুন—সেই ঘোষণা ধ্বনি প্রকৃত সাহিত্য—

আপনি বেহুঁশ হইয়া যে অপ্রয়োজনীয় "নাটক নভেল কাব্যে" দেশ ছাইয়া ফেলিতেছেন তাহা সাহিত্য নহে, তাহাতে "স্থায়িত্ব সম্ভাবনা" নাই।

বান্ধব। আশ্বিন কার্ত্তিক।

বর্ত্তমান মাসিক পত্রের মধ্যে অধিকাংশ পত্রেরই সম্পাদক নাই; প্রকাশক সম্পাদক নামে অভিহিত। যাঁহারা সব বিষয়ে মূর্খ, তাঁহারাও আপনাদিগকে মাসিক পত্রের সম্পাদক হইবার যোগ্য মনে করেন, এবং যেন "উপজ্ঞা" বলে পণ্ডিতগণের প্রবন্ধ, যাহা তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যার অতীত তাহা সমালোচনা করিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহা আহ্লাদের বিষয়, বান্ধবের সম্পাদক আছেন। তিনি, গভীর পাণ্ডিত্য, ভাষার উপর অসাধারণ অধিকার, গুণগ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি বিবিধগুণে বিভূষিত। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, তাঁহার ভাষার অলঙ্কারের ভারে তাঁহার চিন্তা প্রায়ই মন্থরগামিনী কচিৎ বা সমাচ্ছাদিত ও অদৃশ্য।

আমরা আশা করিয়াছিলাম বয়োবৃদ্ধির সহিত রায় বাহাদুরের ভাষা ঋজুতা ও সরলতা লাভ করিবে। যে কেশব বাবুর বক্তৃতার ভাষায়, জীবনের আদ্যভাগে, অলঙ্কার ও আড়ম্বর প্রভৃতি ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর সেরিডান প্রমুখ বাগ্মীদিগের বাগৈশ্বর্য্য পরিলক্ষিত হইত, সেই কেশবের বক্তৃতা, জীবনের অন্ত্যভাগে ব্রাইট সাহেবের শক্তিশালিনী সরলতা লাভ করিয়াছিল। রায় বাহাদুরের ভাষায় সে রূপ ক্রমোন্নতি দেখা যায় না। যাহা হউক তিনি যাহা লেখেন তাহা পাঠ্য ও আলোচ্য। কিশোর গৌরাঙ্গ, পঞ্চম অধ্যায়ের মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

যে সময় নবদ্বীপে নবদ্বীপ-চন্দ্র গৌরাঙ্গ উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময় আর তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বৈদান্তিক বাসুদেব, নৈয়ায়িক রঘুনাথ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন—নবদ্বীপের নভোমণ্ডল আলোকিত করিয়াছিল। বাসুদেব মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। তিনি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে বিদ্যানগর গ্রামের টোলে অধ্যাপনা করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃহীন রঘুনাথ বাসুদেবের আশ্রয় লন, বাসুদেব তাঁহাকে ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথিলায় পাঠাইয়া দেন। ন্যায় দর্শনের সূত্রকর্ত্তা গৌতম। কিন্তু মিথিলায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রণীত চিন্তামণি গ্রন্থই তখন পঠিত হইত।

রঘুনাথ চিন্তামণি গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চিন্তামণি দীধীতি নামক এক অপূর্ব্বগ্রন্থ রচনা করিলেন। সমগ্র ভারত তাহাই ন্যায় শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইল। রঘুনাথ যেমন পুরাতন ন্যায় শাস্ত্র ভাঙ্গিয়া "দীধীতি" গ্রন্থ রচনা করেন, রঘুনন্দনও সেইরূপ স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের সারার্থ সংগ্রহ করিয়া অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই বেদান্ত-ন্যায়-স্মৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তির উৎস নিঃসৃত হইল। গৌরাঙ্গ সেই ভক্তির উৎস।

বঙ্গদেশে এই সময় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এ দেশে আর কখন ঘটে নাই। ভগবদ্গীতা যেমন সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের চুম্বক, গৌরাঙ্গের সময়ের নবদ্বীপ তেমনি সমুদয় ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত সার।

সাময়িক সংবাদ।

বঙ্গের পুনর্গঠন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মাননীয় মিঃ রিজলী বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্থানের পুনর্গঠন প্রস্তাব করিয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারীকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। এই দীর্ঘ পত্র ১২ই ডিসেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে জানা যায় যে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার অধীনস্থ চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ আসামের, এবং মানভূম ও সিংভূম ব্যতীত সমুদায় ছোট নাগপুরটি মধ্যভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আবার অন্য দিকে মধ্যভারত, হইতে, ফুলঝাড় ও চন্দ্রপুর ব্যতীত সমুদয় সম্বলপুর জেলাটি ও পাঁচটি করদ রাজ্য, এবং মান্দ্রাজ হইতে গঞ্জাম, গঞ্জাম ও ভিজিগাপটম্ পার্ব্বত্য প্রদেশ বঙ্গের শাসনাধীনে আনীত হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তনের তিনটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে।—(১) বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনের গুরুভার কতক পরিমাণ লাঘব হইবে এবং বহিঃস্থিত জেলা সমূহ সুন্দর ও সুচারু রূপে শাসিত হইতে পারিবে। (২) আসামের উন্নতির নিমিত্ত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আসমুদ্র প্রসারিত করণার্থ আসামের শাসন সীমা বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং এরূপ করিলে তাহার একক স্বাধীন শাসনের সুবিধা হইবে। (৩) যে সকল জাতির মধ্যে উড়িয়া ভাষা প্রচলিত তাহাদিগকে একই শাসন কর্ত্তার অধীনে আনিতে হইবে এবং তাহাতে মান্দ্রাজ ও মধ্যভারতের শাসনকর্ত্তাদিগের বিভিন্ন ভাষার প্রচলনের অসুবিধা কিয়দংশে হ্রাস হইবে।

মাননীয় রিজলী সাহেবের দীর্ঘ পত্রে এই তিনটি উদ্দেশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে।

হাজারীবাগে ছাত্রাবাস। হাজারীবাগ একটী বেশ স্বাস্থ্যকর প্রদেশ। এখানে ডবলিন ইউনিভার্সিটি মিশনের একটী কালেজ আছে কিন্তু ছাত্রাবাস নাই। যে সকল পীড়িত ছাত্র উপযুক্ত স্থানাভাবে বিদেশে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে না, তাহাদিগের জন্য হাজারীবাগে একটী ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে, দশজন ছাত্র পাইলেই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইবে। আহার ও বাসস্থান প্রত্যেক ছাত্রের সাত টাকা লাগিবে, ডাক্তারের খরচ লাগিবে না। ধর্ম্ম ও জাতি বিচার বিশেষরূপে রক্ষিত হইবে। আমাদিগের বিশ্বাস যখন হাজারীবাগের সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার গুপ্ত এবং ডব্লিন ইউনিভার্সিটি মিশন কালেজের অধ্যক্ষ রেঃ জে, এ, মরে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতির অন্যতম সভ্য তখন তাহার বন্দোবস্ত সুন্দর ও পরিপাটী হইবে। গিরীন্দ্র বাবুর নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানা যাইবে।

শোক সংবাদ। যাঁহার সুন্দর ও বিশুদ্ধ নাট্যগীতে বঙ্গবাসী মুগ্ধ, যাঁহার মর্ম্মস্পর্শী অথচ নির্দ্দোষ হাসির গানের নিমিত্ত সকলে উদগ্রীব ও ব্যগ্র, যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী নিসৃত নাটক কবিতা গান ও প্রবন্ধ নবপ্রভাকে দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেই প্রিয়দর্শন স্নেহ ভাজন দ্বিজেন্দ্রের পত্নী বিয়োগে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। গত ১৩ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রে নানাগুণে বিভূষিতা স্নেহশীলা লক্ষ্মী পতি পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অন্তর্হিতা হইয়াছেন। কবির বন্ধু "রঙ্গালয়" ও "বসুমতী" সম্পাদক শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "রঙ্গালয়" যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল।

"একটা বড় মন্দ সমাচার দিতে হইল! আমাদের প্রীতিভাজন, প্রিয়দর্শন সুহৃদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। যিনি সদাসুখী ছিলেন, হাস্যের ও ব্যঙ্গের জ্যোৎস্নাজাল বিস্তার করিয়া যিনি আমাদিগকে সদাই সুখের কৌমুদীস্নাত করিয়া রাখিতেন, এতদিনে বুঝিবা তাঁহার সংসারসুখের চন্দ্রিকাদীপ্তি ম্লান হইল। যে কখনও শোক পায় নাই—তাহার শোক! নিজের দুর্বিসহ শোক; সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যা সকলের শুষ্ক ও উদাস মুখ দেখিয়া সে শোক-বহ্নি রাবণের চিতার ন্যায় অহরহ হৃদয়ে জ্বলিতে থাকিবে। এ শোকের সান্ত্বনা নাই, যে বুঝিয়াছে সেই মরমে মরিয়া আছে। জগদম্বা রায় মহাশয়ের মঙ্গল করুন।"

যাঁহার হাস্যলীলায় নবপ্রভা হাস্যমুখ ছিল, এক্ষণে তাঁহার শোকে নবপ্রভা আজ মলিনা। ভগবান শোক-সন্তপ্ত হৃদয় শান্তি বারিতে শীতল করুন।

নবপ্রভা।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনা।

৩য় খণ্ড] কলিকাতা, মাঘ, ১৩১০ [১২শ সংখ্যা।

কংগ্রেস।

[কাশীধামে আর্য্যধর্ম্মরক্ষিণী সভাতে শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামীর বক্তৃতা।]

"হে শিষ্যগণ—

এতদিন আমার নিকট উপদেশ পাইলে, তথাপি তোমরা বুঝিলে না যে কেবল বক্তৃতা করিয়া, হাততালি দিয়া, কোন বিদেশীয় জাতির স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ করিয়া, কোন জাতি কদাপি উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। আমি কতবার বলিয়াছি, যে যত দিন কংগ্রেস কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল মাত্র বৃথা বক্তৃতা করিবে, তত দিন আমার যে শিষ্য তাহাতে যোগ দিবে, তাহাকে আমি আমার সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। যাহারা মুখে যাহা বলে কার্য্যে তাহা করে না, তাহাদিগের সরলতা আন্তরিকতা তোমরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পার তাহা আমি বুঝি না।

সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বিবেকী যে সে বুঝিতে পারিবে, যে তিনি গূঢ় ভাবে কংগ্রেসকে তিরস্কার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ক্রটী সম্বন্ধে তিনি যাহা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, কংগ্রেস-ওয়ালাদিগের ক্রটী সম্বন্ধে—নিজেদিগের ঘৃণ্য লজ্জাকর স্বার্থপরতাবিলাস-ময় কার্য্যবিমুখতার প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, কংগ্রেসওয়ালাদিগকে, যদিও প্রচ্ছন্ন তথাপি মর্ম্মভেদী ভাষায়, তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—I take it, that there can be no more important national question than the question of education. তাহার কিছু পরে বলিয়াছেন—We have a sacred duty towards the poorer classes of our people. Those who have received the bene-

fits of High Education are bound to do, whatever may be in our power to extend the blessings of education, so far as may be, to the masses of our people. অর্থাৎ "দেশের দীন দরিদ্র লোকের প্রতি আমাদিগের এক পবিত্র অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যকার্য্য আছে, আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে তাঁহারা সাধ্যানুসারে এই মঙ্গলময় শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।"—কংগ্রেসওয়ালারা কি সাধ্যানুসারে দীন দরিদ্রদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতেছেন? সাধ্যানুসারে দূরে যাউক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করিতেছেন? দুই চারি জন সাধু অকপট ব্যক্তি করিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসওয়ালার অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় যখন প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের কপটতা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কি তিনি গূঢ় ভাবে কংগ্রেসওয়ালাদিগকেও বলিতেছেন না—যে "তোমরা দেশহিতৈষিতার ভাণ করিয়া বেড়াও কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তোমাদিগকে দেখিতে পাই না? তোমরা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত——যাহাদিগের লইয়া দেশ (The nation dwells in the cottage) তাহাদিগের শিক্ষার প্রতি, উন্নতির প্রতি কখন কটাক্ষপাতও কর না। সুতরাং তোমরা কি ভণ্ড নহ, কপট নহ?" সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভেও প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছেন যে কংগ্রেস যে কপট নহে তাহা কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করা আবশ্যক—If we are really sincere in our professions of democratic faith, let us prove our sincerity not merely by mellifluent phrases, but by deeds more eloquent than words. ঘোষ মহাশয় যাহা উত্থাপন মাত্র করিয়া, তিরস্কারের তিক্ত অংশ টুকু তাঁহার বক্তৃতাতে গূঢ় ভাবে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসস্থাপক স্পষ্ট-বক্তা বৃদ্ধ হিউম সাহেব বড় দুঃখেই জ্বালাময়ী ভাষায় কংগ্রেসওয়ালাদিগকে বলিয়াছেন—"তোমরা বেশবক্তৃতা কর কিন্তু কার্য্যে কিছুই নহ—When the congress closes, every man of you broadly speaking goes off straightway on his private business, and not one per cent of you seem to give thereafter any earnest thought or many days real work to poor India's public business. ভক্তিভাজন হিউম সাহেবের এই কথার মর্ম্ম এই যে, "দুই চারি জন ব্যতীত, তোমরা একটা মস্ত ভণ্ডের দল। হায়! বাকসর্ব্বস্ব ভণ্ডামি দ্বারা দেশের কখন কোন মঙ্গল সাধিত হইবে না।" তবুও কংগ্রেসওয়ালারা বুঝিবে না, তবুও তাহাদের লজ্জা

হইবে না, তবুত কার্য্যহীন জীবন লইয়া, কংগ্রেস মণ্ডপে রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিয়া, স্বার্থপরতামসীকলঙ্কিত বদন দেখাইতে ক্ষান্ত হইবে না। যেখানে উল্লাস আনন্দের বিষয় কিছুই নাই, যেখানে আত্মগ্লানির গভীর বিষাদ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইবার কথা, যেখানে অনুতাপে, লজ্জায়, ঘৃণায় অবিরাম অশ্রু বিগলিত হইয়া (মণ্ডপে) অশ্রুহ্রদ হইয়া যাইবার কথা—সেইখানে যখন দেখি স্বদেশীয়গণ চিন্তাশূন্য, হৃদয়শূন্য ভাবে, লঘুচেতা হইয়া আনন্দে নৃত্য করতালি-ধ্বনি করিতেছেন——তখন দুঃখে লজ্জায় কোথায় মুখ ঢাকিব! তখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে, একসময়ে তাঁহার ভ্রান্ত, নির্ব্বোধ, পাপমতি, গর্ব্বিত, সুপরামর্শবধির পুত্রগণের বিজয়ের আশা করেন নাই; তেমনি ভারতক্ষেত্রে মহাসমারোহপূর্ণ এই রাজনৈতিক ঘোর-বাগ্‌বিতণ্ডায় আমিও কখন দেশের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়াছি। বঙ্গদেশে কংগ্রেসওয়ালা জমীদারদিগের কার্য্যাবলী যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আর মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করি নাই। তাঁহারা নিজের প্রজাদিগের উন্নতির জন্য কি করিতেছেন?—আমি নিজে কোনও কোনও জমিদারকে সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য একটা কার্য্যে যোগ দিতে বলিয়াছিলাম। তাহাতে একজন জমীদার বলিলেন, "প্রজা শিক্ষিত হওয়া জমিদারের স্বার্থ নহে। শিক্ষিত হইলে তাহারা নিজের স্বত্ব-অধিকার-ক্ষমতা বুঝিয়া লইবে, এবং এক্ষণে তাহারা যেমন অনুগত বাধ্য আছে, এক্ষণে তাহাদিগকে কাছারী হইতে তলব করিলে তাহারা যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে আইসে, এক্ষণে তাহারা জরিমাণা করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ভয়ে ভয়ে জমিদারকে দিয়া ফেলে, শিক্ষিত হইলে তাহারা তাহা আর তেমন করিবে না, তেমন দিবেনা। বঙ্গদেশের "দেশহিতৈষী" সম্পাদকগণের ভিতর প্রায়ই দেখিতে পাই যদি একজন সাহেব কোন ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে অমনি তাঁহারা একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেন। কিন্তু প্রজার প্রতি জমিদার যদি অত্যাচার করেন তাহা কি সংবাদপত্রে তেমন প্রকাশিত হয়। আজি কালি একটা আশা হয়। একখানি নির্ভীক, নিরপেক্ষ ১ম শ্রেণীর বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ("বসুমতীতে") সে দিন দেখিলাম—"আমরা বিচার ও শাসন বিভাগ প্রভেদ করিতে চাহি, কিন্তু আমাদের কত গ্রামে কত পল্লীতে জমীদারের কঠোর অত্যাচারে সহস্র সহস্র প্রজার জীর্ণ মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, চক্ষু দিয়া অশ্রুর পরিবর্ত্তে রক্তস্রোত বহিতেছে; তাহার প্রতিকার কে

করিবে? সে দিকে কি আমাদের লক্ষ্য করিবার অবসর আছে?" আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই সংবাদপত্র দীর্ঘজীবী হউক। আমি ভরসা করি অন্য সংবাদপত্রও জাতি নির্ব্বিশেষে দরিদ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিতে বদ্ধ পরিকর হইবেন।

বস্তুত দরিদ্র কুটীরবাসী আমাদিগের আশাস্থল। কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে সাধারণ লোক যদি অজ্ঞতাতে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে দেশের মঙ্গলজনক বিষয়ে তাহারা উদাসীন থাকিবে। এ কথার মধ্যে সংক্ষেপে অনেক কথা রহিয়াছে। সেই কথা কংগ্রেস এতদিন লক্ষ্য করিতেছে না বলিয়া তাহার সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হইতেছে।

হে শিষ্যগণ—তোমরা বড় নামে ভুলিও না। হিন্দুস্থান রিভিউ (Hindustan Review) নামক পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নারোজি, শ্রীযুক্ত ওয়েডার্বর্ণ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়গণ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। তাঁহারা ইংরাজ সমাজ দেখিয়া দেখিয়া, ভারত যে ইংলণ্ড নহে, আয়র্ল্যাণ্ড নহে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।—যে সকল আন্দোলন প্রণালী ইংলণ্ডে বা আয়র্লণ্ডে সুফলদায়ক হয়, তাহাতে ভারতে কেবলমাত্র ইংরাজের জুতার ঠোকরের জোর আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। তিন ব্যক্তি সাধু উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করিয়া ভারতের যে প্রভূত এই অনিষ্ট করিতেছেন, হায়! তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। মাননীয় হিউম তাঁহার Call to Arms নামক লিপিতে আয়র্লণ্ডের সহিত সর্ব্বতঃ-পরাধীন কেবল-মাত্র-দয়াজীবী ভারতের কোনই সাদৃশ্য নাই তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।—আমি এত কাল যাহা বলিয়া আসিতেছি তাহা—অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কংগ্রেসের গন্তব্য পথ কি তাহা—সুপরিচালিত চিন্তাশীল পাণ্ডিত্যভূষিত New India নামক ইংরাজি পত্র—কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া—বিশদভাবে লিখিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" ও এবিষয়ে সারবান্ কথা লিখিয়া আসিতেছেন।

যদি কংগ্রেস কার্য্য করিতে চাহে প্রথমত সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করুক। কেবল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবেক না। কংগ্রেস আমার কথা শুনিবে কি না তাহা জানি না। সংসারে যাহারা প্রভূত যশ বা খ্যাতি লাভ করে তাহারা আমার মত দীন দরিদ্র সন্ন্যাসীর কথায় কর্ণপাত করিবে তাহা সম্ভব নহে।

কিন্তু, হে শিষ্যগণ, যদি তোমরা যথার্থই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাক, যদি তোমাদের হিন্দুত্ব ভণ্ডামি না হয়, তোমরা গীতার যে নিষ্কাম ধর্ম্মাত্মক শ্লোকগুলি মধ্যে মধ্যে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া থাক, যদি তাহাতে তোমাদিগের যথার্থই আস্থা হইয়া থাকে—তাহা হইলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি অদ্য যাহা সংক্ষেপ বলিলাম, দেশে কার্য্যে প্রচার কর—সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য ব্রতী হও। গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন কর। তোমরা তাহাতে শিক্ষা দেও, আর তোমাদের সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা অন্যান্য নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক শিক্ষক আকর্ষণ কর। অবৈতনিক শিক্ষকদিগের শ্রেণীবদ্ধ কর। যাহারা বৎসরে ১ ঘণ্টা মাত্র অবৈতনিক শিক্ষা দিবেন তাহারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মী। যাঁহারা মাসের মধ্যে ১ ঘণ্টা ঐরূপ শিক্ষা দিবেন তাঁহারা ৩য় শ্রেণীর, যাঁহার সপ্তাহের মধ্যে ১ ঘণ্টা ঐরূপ শিক্ষা দিবেন তাঁহারা ২য় শ্রেণীর, আর যাঁহারা প্রতি দিন ১ ঘণ্টা করিয়া ঐরূপ অবৈতনিক শিক্ষা দিবেন তাঁহারা ১ম শ্রেণীর কর্ম্মী হইবেন। আর যাঁহারা সমুদয় সময় বিনা বেতনে ঐ কার্য্য করিবেন তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কর্ম্মী হইবেন। আর আর উপদেশ পরে দিব। কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে, কংগ্রেস লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া, বৃথা ঢক্কনিনাদ ও ধ্বজা ত্যাগ করতঃ, তোমাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। তোমাদিগের নিয়ম এই হইবে;—১ম, বক্তৃতা করিবে না। কর্ম্মহীন বক্তৃতাতে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। ২য়, যাহা করিবে তাহা সংবাদ পত্রে বা কোন মুদ্রিত বিবরণীতে প্রকাশ করিবে না। ৩য়, যাহা করিবে তাহা ঈশ্বরের কর্ম্ম বলিয়া নিষ্কাম ভাবে করিবে।

ওঁ হরিঃ।

অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা *

গোধূলি।

১

দিনমনি অস্ত যায় যায়!

কাঞ্চন কিরণ ঘটা, অপূর্ব্ব সিন্দূর ছটা,

সন্ধ্যা ভালে কি মধুর ভায়!

---

* এই কাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তরার্দ্ধ ধারাবাহিক ক্রমে "নবপ্রভায়" প্রকাশিত হইবে। —লেখক।

এল ধীরে, গোধূলিরে অগ্রদূতী করি,
দিবার দুহিতা সন্ধ্যা, মোহিনী অপ্সরী!

২

শ্যামাঙ্গিনী আইল শর্ব্বরী!
হাব ভাব হাস্যে ভরা, কি লাবণ্য মনোহরা,
রসময়ী নবীনা নাগরী!
রঙ্গিণী খুলিয়া দিল হাসির ফোয়ারা!
শ্বেতাঙ্গী রজনীগন্ধা, হেসে হ'ল সারা!

৩

সুধাকর হাসিল হরষে! —
ধ্রুবতারা, শুক্রতারা (সোহাগিনী বধূ তারা!)
ভাসিল সে হাসির সরসে!
চন্দ্রকান্তা কুমুদিনী, সরসীর কোলে
সোহাগে পড়িল ঢলি সে হাসিহিল্লোলে!

৪

আহা সখি সবাই সুখিনী!
হেরি চন্দ্র চন্দ্রমুখ, সবারি ভরিল বুক,
হায় সুধু অভাগী দুঃখিনী!
মনে পড়ে সে নিকুঞ্জ, সে চাঁদনি রাতি,
সুধাংশু ঝালরে শত তারকার বাতি!

৫

মনে পড়ে সে নিকুঞ্জবন;
মধুর বাঁশীর সুর, ফুটিতেছে ভুর্ ভুর্,
বনতুলসীর গন্ধ প্রাণ-উন্মাদন!
বহিতেছে ঝুর্ ঝুর্ দখিণা অনিল,
থেকে থেকে ডেকে উঠে বনান্ত কোকিল!

৬

কেমনে বর্ণিব সে উল্লাস?
চারিধারে জ্যোৎস্নারাশি, মধুর বাজিছে বাঁশী,
চারিধারে সেফালীর বাস!

মদন বধূর যেন সুরভি নিশ্বাস
পড়িতেছে! অহো সখি সে সুখ বিলাস!

৭

কে যেন গো দিতেছে আশ্বাস,
"এখনি পাইবে তারে সদা প্রাণ চাহে যারে,"
এমনি সে সুমধুর ভাষ!
মধুর বিশ্বাসে মম চিত্ত গেল ভরি;
আনন্দে শিহরি উঠি, অঙ্গ থর থরি!

৮

আইলা গো পীতাম্বর হরি!
মাতাইয়া, কাঁপাইয়া, কাঁপাইয়া, মাতাইয়া,
কোকিল ডাকিল সখি, কুহরি, কুহরি!
আদরে সোহাগে হরি বক্ষে নিলা টানি,
তার পর কি হইল, কিছুই না জানি!

৯

কে যেন গো হরিল চেতনা!
পড়িনু অগাধ জলে, বিস্মৃতির রসাতলে,
সুখহ্রদে এমনি মগনা!
আনন্দ সাগর জলে জ্ঞানের তপন
অস্ত গেল, কমলিনী মুদিল নয়ন!

১০

আনন্দের প্রশান্ত তিমিরে
চেতনা মুদিল আঁখি, যথা কলকণ্ঠ পাখী,
গীতক্লান্তা কান্তা সহ সুনিবিড় নীড়ে!
নহে ইহা বিহ্বলতা, নহে ইহা ঘুম;
যোগীর পরাণ সম পুলকে নিঝুম!

১১

চেতনা জাগিল ধীরে ধীরে!
নাথের চরণ তলে বসিলাম কুতূহলে,
আরতির দীপ যেন দেবের মন্দিরে!

হেরিলাম (তখনও ছিল আধা ঘুম)
প্রেমের নিরালাকুঞ্জে সকলি নিঝুম !

১২

চারিধারে নীরব, নীরব !
শব্দ নাই, বস্তু নাই, দুই জনে আমরাই
পান করি নেত্রপাত্রে আনন্দ আসব !
ধীরে ধীরে হইলাম এমনি তন্ময়
রাধা নাই, বিশ্ব নাই—বিশ্ব শ্যামময় !

১৩

আজিও গো তেমনি যামিনী !
চারিধারে জ্যোৎস্না রাশি, মধুর বাজিছে বাঁশী,
সুমধুর শেফালী কামিনী !
মদনবধূর যেন সুরভি নিশ্বাস
পড়িতেছে ! কোথা হরি ? কোথা শ্রীনিবাস ?

১৪

বক্ষে আজি জাগিছে লালসা !
দুঃখে দুঃখে গেছে শান্তি, মলিন নলিন কান্তি,
রাধা আজি বিক্লবা, বিবশা !
এ অশান্তি, এ লালসা ভাল নাহি লাগে !
এস হে ত্রিভঙ্গশ্যাম, দীপ্ত অনুরাগে !

১৫

হে সুন্দর শ্যাম, অভিরাম,
ঘন নিবিড় আনন্দ, যোগীজন ব্রহ্মানন্দ,
পূর্ণশান্তি ! হে চির বিরাম !
এস পরম পুরুষ ! করিয়া শয়ান
তব বক্ষে রাধা আজি লভিবে নির্ব্বাণ !

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন।

মহাভারত ও রামায়ণ।

শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র মজুমদার সুশিক্ষিত, সাহিত্যসেবী। তিনি যে উকীল হইয়াও সাহিত্যসেবা করেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহার "মহাভারত" ও "রামায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে* কৃতী উকীলের নিঃসন্দিগ্ধ আত্মবিশ্বাসের পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহাতে তিনি কতদূর ব্যুৎপন্ন জানি না। তিনি প্রচলিত রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি, রচনাকাল ও পরিণতি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা কতটা অন্যের সিদ্ধান্ত বা নিজের বিচার-তর্ক-গবেষণার ফল তাহা বুঝিবার বড় সুযোগ দেন নাই। আদিম রামায়ণ মহাভারত কি, প্রচলিত রামায়ণ মহাভারতই বা কি, তাহাও প্রবন্ধদ্বয়ে সুস্পষ্ট নহে। এই পুরাতত্ত্বের সমালোচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের মধ্যে কেবল মাক্‌ডানলড্‌ ও ক্রিষ্টোর নাম দেখিতে পাইলাম। প্রতিপাদ্য বিষয় ও সমস্যা যেমন গুরুতর, বিজয় বাবুর যুক্তি ও তর্ক সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত, নজির বিহীন, জটিল ও অনুবৃত্তি নিরপেক্ষ (wanting in logical sequence) লেখকের প্রতিজ্ঞা সমষ্টিতে নিবিড় সত্য নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারে নিগূঢ় ভাবে সংস্থিত; আমাদের মতন অজ্ঞ পাঠকের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (১) প্রবন্ধ দুইটী নিতান্ত অভিনিবিষ্ট চিত্তে পড়িলেও, কোন একটা বিশ্বাসমূলক ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না; (২) এবং ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে এই প্রকার যেন মনে হয় যে, লেখক স্বয়ং মূল রামায়ণ মহাভারত, পাণিনি, পাণিনি পতঞ্জলি মহাভাষ্য, বেদের ব্রাহ্মণাদি সমগ্র বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী প্রভৃতি বহুবার তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন; এবং আলোচ্য পুরাতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের নিকট বিশেষ ঋণী নহেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনায় মোক্ষমূলর, কোলব্রুক, উইলসন, লেসেন, গোলড্‌ষ্টুকর, বেবর, ডাক্তার হোগ, ডাক্তার বুলার, হরনলি, থিব (Dr. Thibaut) জ্যাকবি (Dr. Jacobi) অধ্যাপক ব্লুমফিলড্‌ এবং ডাক্তার হুইটলি, ব্রেণ্টী, মুইর প্রভৃতি এবং প্রাচ্যদিগের মধ্যে টেলাঙ্গ, তিলক, রঙ্গাচার্য্য, ভাণ্ডেকার কেতকার, ডিক্‌সিট, আয়ার,

---

* প্রবাসী—ভাদ্র ও কার্ত্তিক ১৩১০।

এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কপিল বস্তু ও পাটলি পুত্রের আবিষ্কর্ত্তা পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ; (৩) আমাদের দেশের প্রত্নতত্বজ্ঞেরা প্রায়ই উল্লিখিত প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতীয় পুরাতত্ব সমালোচনায় তাঁহাদের সহিত মতভেদ হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্তস্থাপন ও খণ্ডন করিয়াছেন ; (৪) কোন একটী বিশেষ অভিনব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষজ্ঞের (Expert authority) মতের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন ; এবিষয় মোক্ষমূলর তাঁহার Last Essay নামক পুস্তকে বলিয়াছেন "Unless Student can appeal for help to recognized authorities * * * he is apt to make brilliant discoveries which explode at the slightest touch of the specialist." (৫) প্রতীচ্য বা প্রাচ্যপণ্ডিতেরা যে সকলেই সমান অভিজ্ঞ, নির্ব্বাচনক্ষম নহেন, ইহা লেখা বাহুল্য মাত্র ; (৬) ভারতদ্বেষী জর্ম্মান পণ্ডিত বেবরের মতের উপর ঝোঁক দিয়া বিচার করিলে, অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যাকরণ ইতিহাসাদি নিতান্ত প্রাচীন না হইয়া, অধিকতর আধুনিক হইয়া যায়—বেবরের মতে পাণিনিও নিতান্ত আধুনিক—পাণিনি সূত্রে "মহাভারত" অর্থে ভরতবংশ, এবং যুধিষ্ঠিরাদি নাম উল্লেখ থাকিলেও তাহা আধুনিক ; কারণ বেবরের মতে, পাণিনি "কালকের ছেলে" এবং বাল্মীকির রামায়ণ বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং বৌদ্ধ ও হিন্দুযুদ্ধের রূপক মাত্র ; এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ জর্ম্মান পণ্ডিতের মত প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলে, শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত অর্জ্জুনাদি সব রূপক মাত্র অর্থাৎ পঞ্চ পাণ্ডব একটী পরিহাস ব্যাপারে দাঁড়াইয়া যায়। (৭) আমাদের দেশের লেখকগণের যে প্রকার পরিশ্রম-ক্ষমতা, পুরাতত্ত্বে যে প্রকার অনুরাগ, জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, তাহাতে অব্যবসায়ীর 'প্রতিজ্ঞা' পরম্পরার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা, প্রচার আলোচনা অধিকতর প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ ; পুরাতত্ত্ব বিষয়ক কাল নির্ণয় অতিশয় জটিল, বিশিষ্ট পরিশ্রম ও গভীরজ্ঞান সাপেক্ষ ; এ বিষয় তিলক তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থে (Arctic Home in the Vedas) যাহা ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব বিশেষজ্ঞের মতের সমালোচনা হউক, তাহার পর চিন্তা করিয়া নিজের গবেষণার ফলে, সেই মতের খণ্ডন হউক, ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না ; এই প্রকার বিধিব্যবস্থায় মৌলিকতা হীন বা বিশুষ্ক হইয়া যায় না, বরং সরলতা বিনয় সততায় উজ্জ্বল হয়। হিন্দুপণ্ডিতের বিশেষত্ব

নিজের মৌলিকতার খ্যাপন নহে। নিজের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া পরের গৌরব বৃদ্ধি করা। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে বিপুল চেষ্টা, যে নিজের মালমসলা বা ঢাল তলোয়ার না থাকিলেও মৌলিক হইতে হইবে, যে ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তাহাকে বাজার গরম করিবার জন্য একটী বিশিষ্ট মহাজন সাজিতে হইবে। এইকথাগুলি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইল না, আমাদের পরাধীন জাতির দুর্ব্বলতাপরিচায়ক বিশিষ্ট গুণ বা দোষ বিজ্ঞাপিত হইল মাত্র। যিনি নিজে প্রকৃত গুণশক্তিশালী তিনি অন্যের গুণে বা নামোল্লেখে অভিভব বোধ করেন না। ম্যাথিউ আর্নল্ড, হার্বার্ট স্পেন্সার অধ্যাপক ডাউডন, ঋষি এমার্সন ও কারলাইল, ফরাসী সেরার (M. Scherer), সেণ্ট ভিভ্ (M. Saint Beauve) ও নিসার্ড (M. Nisard) স্বরচিত প্রবন্ধাবলিতে নিজের প্রতিপাদ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য মহাজনের মত ও অভিব্যক্তি উল্লেখ ও সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের মৌলিকতা নষ্ট না হইয়া, নিজের মত সমধিক প্রচলিত হইয়াছে, সাধারণের জ্ঞান পিপাসা উদ্বুদ্ধ এবং শিক্ষার পথও সুবিস্তৃত ও সহজ হইয়াছে।

লেখক "রামায়ণ" ও "মহাভারত" প্রবন্ধদ্বয়ে, কখন বা পূর্ব্ব পরিচিত নিতান্ত পুরাতন, কখন বা পরস্পর-বিরোধী যুক্তিশূন্য, কখন বা বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক সমূলোৎপাটিত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা প্রথমে রামায়ণ প্রবন্ধেরই সমালোচনা করিব। লেখক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাম কথা প্রথমে, হিন্দুদিগের মধ্যে তেমন প্রচলিত ছিল না, রাম কথা প্রথমে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর বৌদ্ধ দশরথ জাতক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; জাতক গ্রন্থে রাম ও সীতা ভাই ভগিনী; পরে তাঁহারা উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েন; বহু শতাব্দী পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতাব্দীতে প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ রচিত। এই সিদ্ধান্তটী অবশ্য লেখকের নিজস্ব নহে, ইহা ভারতবিদ্বেষী জর্ম্মান পণ্ডিত শ্রীমান্ বেবরের এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জার্ম্মান পণ্ডিত লেসেন কর্ত্তৃক খণ্ডিত। "বৌদ্ধদের দশরথ জাতকের অন্তর্গত রামোপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণোক্ত রাম রাবণের যুদ্ধ বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর বিরোধ-বিজ্ঞাপক, রাম ও কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তক বলরাম একই ব্যক্তির নাম, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ও রাম রাবণের যুদ্ধ-ব্যাপার গ্রীসদেশীয় হোমর কৃত ইলিয়ড্ কাব্যের অন্তর্গত হেলেন হরণ ও ট্রয় সংগ্রামের অনুকরণ, বর্ত্তমান প্রচলিত রামায়ণ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর উত্তর

কালীন গ্রন্থ, শ্রীমান্ লেসেন স্পষ্টাক্ষরে শ্রীমান্ বেবরের এই সমস্ত অভিপ্রায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন।—

Prof. Lessen on Weber's dissertation on the Ramayan translated from the German by J. Muir in the Indian Antiquary for 1874 p.p. 102 & 103 (অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্ট, ২৩৭ পৃঃ)—"The question whether the Ramayana was copied from Homer is entirely meaningless. The fact seems to be that both Homer and Valmiki have utilized a common mythological stock and any resemblances between their works only go to prove the theory of their common origin. It has been pointed out by Prof Weber that in the Buddhistic Dasaratha Jataka, Sita is represented as the wife of Rama, and the learned Professor tells us that this must be an ancient version of the story, for a marriage with one's sister must be considered as primeval as Adam himself. *The late Mr. Telang was of opinion that the Buddhists must have deliberately misrepresented the story of the Bramhanical Epic and such a perversion is not improbable*" (Vide Mr. Tilak's Arctic Home in the Vedas p. 349)—

বলা বাহুল্য যে বিজয় বাবু তাঁহার রামায়ণ প্রবন্ধে বেবর, লেসেন বা টেলাঙ্গের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই।—যে যুক্তিবলে, হিন্দুপূজিত বাল্মীকি রামায়ণকে, নিতান্ত আধুনিক প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়, তাহার মূলে এই কয়টী কথা আছে;—"রাম ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের নাম বৈদিকাদি সাহিত্যে নাই, সূত্রাদি গ্রন্থে নাই, পাণিনি ব্যাকরণে নাই, অথবা ১৫০ খৃঃপূ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে নাই।" ইহার উত্তর (১) রামায়ণ ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ইহা পদ্যে রচিত হইলেও ইংরেজের epic নহে; রামায়ণের মৌলিক ঘটনা ঐতিহাসিক; রামায়ণে স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক কথা আছে স্বীকার করি, কিন্তু যে অংশ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, তাহা কেন পরিত্যক্ত হইবে? রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্তা ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। রামায়ণই বা অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত

হইবে কেন ?—ইংরেজেরা বা জার্ম্মানেরা রামায়ণ মহাভারতকে Epic বা মহাকাব্য বলিয়াছেন, সুতরাং চিরকাল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয় কেবলমাত্র কবি কল্পনা প্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। ভারতের সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ পদ্যে রচিত ; সুতরাং ইতিহাসও যে পদ্যে রচিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে ; রামায়ণ কাব্যাংশে ইংরেজের Epic এর মতন হইলেও, ঐতিহাসিক মনুষ্যচরিত্র বর্ণনের সফলতায় কাব্যাংশে অতীব সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; মেকলে, কার্লাইল, লামার্টীন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, তাহা অনেক সময় ইংরেজী হিসাবে, কাব্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রামায়ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বজন মান্য সূক্ষ্মদর্শী তিলকের মত এস্থানে উদ্ধৃত হইল ;—"The main story in the Ramayan is narrated in such detail that on the face of it bears the stamp of a historic origin" (Mr. Tilak's Arctic Home in the Vedas p. 347.)

(২) সমসাময়িক গ্রন্থে বা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে রামাদির নাম উল্লেখ না থাকিলেই যে তাঁহাদের অস্তিত্ব চলিয়া যায়, এমনও নহে ; নানা কারণে, পূর্ণাবয়ব প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য দৃষ্ট হয় না এবং সমস্ত প্রস্তর লিপিরও উদ্ধার হয় নাই, সমস্ত প্রখ্যাত ঘটনাবলী এবং মহাপুরুষগণ যে প্রস্তরাদি-লিপিতে উল্লিখিত হইবে এমনও কিছু সম্ভাবনা নহে ; ভারতের প্রাচীন আর্য্যেরা একস্থানে আবদ্ধ ছিলেন না ; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থানে বাস করিয়া বিভিন্ন দেবতা বা মহাপুরুষগণের উপাসক ছিলেন ; যে গ্রন্থকার, বৈয়াকরণ বা শাস্ত্রকার, কৃষ্ণোপসাক, তিনি প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক ভাবে, নিজ গ্রন্থে কৃষ্ণাদির নাম, এবং যাঁহারা রামোপাসক তাঁহারা রামাদির নাম নিজ গ্রন্থে বেশী উল্লেখ করিবেন, ইহাও সম্ভাবনা ; তাহার উপর ভারতীয় গ্রন্থকারদিগের যে প্রকার রীতি, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতের নিতান্ত বিপ্লবকারী ঐতিহাসিক ঘটনাও, ভারতীয় সাহিত্যে স্থান পায় নাই ; কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে আলেকজন্দর বা গজনবী মহম্মদের, নাম গন্ধ নাই, সুতরাং কি বলিতে হইবে ইহারা কবিকল্পনা প্রসূত ; বঙ্গীয় সাহিত্যে বখতীয়ার খিলিজির উল্লেখ নাই, সুতরাং কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ইনি মিনহাজদ্দিনের কল্পনা প্রসূত মাত্র, তাহা যদি না হয়, তবে মিনহাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাস যোগ্য

হইল কিসে? আর রামায়ণের কথা অবিশ্বাস যোগ্য হইল কিসে? - এই প্রসঙ্গে পাঠকগণকে বঙ্কিম বাবুর অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহুতথ্য সমন্বিত, বিশিষ্ট অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতে অনুরোধ করি। সুতরাং দেখা গেল, রামোপাখ্যানের মূল বা উৎপত্তি বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে নিহিত নহে। যে কারণে নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী বৌদ্ধরা বৌদ্ধশাস্ত্র ললিতবিস্তর বা সূত্র-পিটকে, কৃষ্ণকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কারণেই হিন্দুর পূজ্য শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত করিয়াছে। লেখক বলিতে-ছেন "রামায়ণে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের নামে অনেক কলঙ্কের কথা ছিল বলিয়া, নূতন কবি এই সময়ে আদর্শ রাম চরিত্রে হিন্দুজাতিকে শ্রেষ্ঠতর নূতন আদর্শ দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বড় করিবার জন্যই ইঁহার কথা ত্রেতাযুগে স্থাপন করিয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত কলঙ্কের কথা ভাগবতে আরব্ধ হইয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পরাকাষ্ঠা লাভ করে। বিশেষজ্ঞের মতে ভাগবত পুরাণ ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ষোড়শ বা সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; (এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র দ্রষ্টব্য)। উইলসন সাহেব বলেন, পুরাণদিগের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ—ইহার রচনা প্রণালী আজি কালি ভট্টাচার্য্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। সুতরাং বিজয় বাবু যখন শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ তুলসীদাসী কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমীপবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়। কারণ কৃত্তিবাস পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন এবং আকবরের সমসাময়িক তুলসী-দাসের জীবনকাল ১৫৩২ খ্রীঃ অঃ—১৬২৩ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত যুক্তিবলে, কোন ক্রমেই প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইতে পারে না। সমধিক প্রাচীন বাল্মীকি-রামায়ণে নূতন নূতন বচন প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা রামায়ণের সংস্কৃত টীকাকার কতকাদি স্বীকার করিয়াছেন। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ৮৫ পৃষ্ঠা)। এই প্রক্ষিপ্ত হেতু ইহা প্রমাণ হইল না যে আদিম রামায়ণের মূলোপাখ্যান লুপ্ত বা বাল্মীকি-রামায়ণ হইতে খুঁজিয়া বাছিয়া লওয়া যায় না।

বিজয় বাবু আরও বলেন, প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণ প্রচলিত মহাভারতের পরে রচিত।—কিন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে মহাভারতের ভিতর রামোপাখ্যানে বাল্মীকির নাম সন্নিবেশিত আছে। (বনপর্ব্ব ২৭৩ ২৯১ অধ্যায়;

দ্রোণপর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক, শান্তিপর্ব্ব ৫৭ অধ্যায় ৪০ শ্লোক)—তারপর সহমরণ ধর্ম্মটী হিন্দুজাতির আদি ধর্ম্ম নহে। রামায়ণে উহার প্রচলনের কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় পাণ্ডু রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় প্রিয় পত্নী মাদ্রী তাঁহার চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন কিন্তু রামায়ণে দশরথের নিতান্ত অনুগতা পত্নী কৌশল্যা তাঁহার স্বামীর অনুসরণ করেন নাই। (উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগ ৯৪—৯৬ পৃঃ)—ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে যে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী।

এখন মহাভারতের কথা; এই মহাভারত প্রবন্ধে, লেখক এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—(১) কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ কি না, মীমাংসা করা কঠিন; (২) নূতন মহাভারতে পুরাতন মহাভারত কতদূর রক্ষিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না (৩) "তখন নৈমিষারণ্যে বসিয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে (A. D.) কোন হিন্দুপণ্ডিত মহাভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন" * * পাণ্ডবদিগের উপাখ্যান বনবাস তপস্যাদির কথা, বিজয় বাবুর নব সংস্কৃত মহাভারতে কালোপযোগী বলিয়া সংসৃষ্ট। (৪) যাহা প্রস্তর বা তাম্রাদিতে উৎকীর্ণ হয় নাই তাহা ছিল না বা থাকিবার কোন সম্ভাবনাও নাই; দান করিলেই তাহা মহাভারত নাম বা মহাভারতের শ্লোক সংযুক্ত হইবে এবং তাহা প্রস্তরাদিতে খোদিত হইবে; মহারাজ হস্তীর ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের দান লিপির পূর্ব্বে অন্য কোন লিপিতে মহাভারতের উল্লেখ নাই, সুতরাং প্রচলিত মহাভারত ৪র্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে; লেখক, মহাভারত রচনাকাল নিরূপণে, তাঁহার এই শেষোক্ত অদ্ভুত প্রতিপত্তির উপর বিষম ঝোঁক দিয়াছেন। (১) ও (২) তর্কবিতর্কের মীমাংসা বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণ-চরিত্রে দ্রষ্টব্য। বাঙ্গালী বলিয়া হয়তো বঙ্কিম বাবুর নাম কোন কোন পাঠকের নিকট অগ্রাহ্য হইবে। তবে বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে পারি, যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর সকলেরই সেবা করেন, দেশী প্রবন্ধ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বঙ্কিম বাবুর নাম উল্লিখিত হইল না। আমরা বঙ্কিম বাবু মহাভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ (specialist) বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। শুনিতে পাই তিনি চরিত্র লিখিবার পূর্ব্বে, ৭ বার মূল মহাভারত খানি পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণ

ও পঞ্চপাণ্ডব সংযুক্ত মহাভারতের কাল নির্ণয়ে দেশী বিদেশী অধিকাংশ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত গুলি বিশিষ্ট ভাবে সমালোচনা করিয়া পরে বিবিধ যুক্তি দিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা সম্ভব হইলেও গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না, "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ";—সেই অখণ্ডনীয় জ্যোতিষিক প্রমাণ বলে "অয়নচলন" (Precession of the Equinoxes) হিসাবে, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর বা খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর নিরূপণ করিয়াছেন; (Vide also Mr. Telak's Orion P. 39 and Arctic Home in the Vedas pp 75 & 76) ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কালনির্ণয়ে,—এই জ্যোতিষিক প্রমাণ সংগ্রহ পক্ষে,—যদ্দূর সম্ভব, বঙ্কিম বাবুই অগ্রণী, আজকাল ভারতীয় জ্যোতিষী ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ কেৎকার ও তিলক, দীক্ষিৎ প্রভৃতি এই পথের পথিক।—গোলডষ্টুকর, মোক্ষমূলর, ডাক্তার মার্টিনহোগের সিদ্ধান্ত-পরম্পরা মিলাইয়া বঙ্কিম বাবু পাণিনির সময় খৃঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দীর স্থির করিয়াছেন। আবার পাণিনিতে যুধিষ্ঠির, কুন্তী, বাসুদেব ও অর্জ্জুনের নাম পাওয়া যায়; সুতরাং খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চপাণ্ডব সংসৃষ্ট মহাভারত প্রচলিত ছিল। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিজয়বাবু অসীম-সাহসে এবং অজ্ঞেয় প্রমাণ বলে, হিন্দুর সীতা রামকে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে বৌদ্ধ "জাতকারণ্যে" নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, অধুনা আবার কি যুক্তিবলে বা কোন্ সাহসে তিনি আদিম মহাভারতের অস্থিমজ্জা কৃষ্ণাশ্রিত পঞ্চপাণ্ডবকে আদিম মহাভারত হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার নবাবিষ্কৃত মহাভারতে স্থান দিলেন তাহাও একবারে বুঝিতে পারিলাম না। "রামকৃষ্ণ-গোপাল ভাণ্ডারকার প্রদর্শন করিয়াছেন খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণোপাখ্যান হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল," যখন কৃষ্ণ পূজিত তখন তদাশ্রিত অর্জ্জুনাদি সেই সঙ্গে ছিলেন, ইহাও সম্ভাবিত। "এই সমুদয় (পতঞ্জলি মহাভাষ্য) পর্য্যালোচন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে পতঞ্জলির সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে কৃষ্ণোপাখ্যান সচরাচর প্রচলিত ছিল; এমন কি ঐ সময়ের পূর্ব্বে কৃষ্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থও প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। * * শ্রীমান্ লেসেন পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মহাভারতোক্ত (চরিত্রাদি) কৃষ্ণপাণ্ডবের সম্বন্ধ বিজ্ঞাপক বলিয়া অনুমান করেন; সুতরাং মিগাস্থিনিসের সময় অর্থাৎ

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল এইরূপ বিবেচনা করেন।" উপাসক সম্প্রদায় ২২৭-২৩০ পৃঃ (Vide also Tiluk's Arctic Home in the Vedas p, 69) এই প্রবন্ধ নিবদ্ধ মীমাংসা ও যুক্তি নিতান্ত জড়াপট্‌কি রকম।—লেখক একস্থানে বলিতেছেন আদিম মহাভারত 'লুপ্ত' আবার বলিতেছেন "বৈশম্পায়ন রচিত মহাভারত-কথা লইয়া মহাভারত-সংহিতা রচিত"; আবার বলিতেছেন "প্রাচীন বৈশম্পায়নের মহাভারত কি প্রকার ছিল জানি না"—অর্থাৎ আদিম মহাভারত আছে কিন্তু আগা পাছগুলা সবই বদলাইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে পরগাছা কৃষ্ণার্জ্জুন আসিয়া শিকড় গাড়িয়াছেন। এই সম্পর্কে একটী হুঁকো চুরীর মামলার কথা মনে পড়িল। মামলাটী হুঁকোচুরীর;—হাকিম পদে ও গৌরবে ডেপুটী; ভদ্রলোকের নামে হুঁকোচুরির নালিশ;—হাকিম লোকটি ভাল; ভদ্রলোকের নামে হুঁকোচুরীর নালিশ, বিশ্বাস সহজে করিতে না পারিয়া সাক্ষীকে ধমকাইয়া বলিলেন 'দ্যাখ—বেশ ভাল করিয়া দ্যাখ—যে হুঁকাটি চুরী গিয়াছে, সে এই হুঁকাটি কি না?" সে অনেকক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে দেখিয়া বলিল "হাঁ হুজুর সেই হুঁকাই বটে, তবে বোধ হচ্ছে যেন নল্‌চেটা বদ্‌লে ফেলিয়াছে;" তখন সাক্ষীটা আবার ধমক খাইয়া বলিল "হুজুর, এখন দেখিতেছি চোর ব্যাটা হুঁকোর খোল্‌টাও বদলাইয়া ফেলিয়াছে;" তখন হাকিম অতি রোষভরে ফের ধমক দিয়া বলিলেন "তবে এই হুঁকোটা চোরা মাল হইল কি প্রকারে?" তখন সাক্ষীটি অতি বিনীত ভাবে হাতযোড় করিয়া বলিল "হুজুর যে চুরী করে সে কি ধরা পড়্‌বে বলিয়া চুরী করে—তার পর এই চোরটা শেয়ানা পাকা চোর—হুঁকোর নল্‌চে ও খোল্‌টা একেবারে বেমালুম বদলাইয়া ফেলিয়াছে"। বলা বাহুল্য আসামী,—সন্দেহের গুরুত্ব, বিচারে খালাস পাইল।—এখন বিজয় বাবু ধৃত, সেই কশ্চিৎ হিন্দু পণ্ডিত, যিনি, নৈমিষারণ্যে বসিয়া, সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক মহাভারতখানি চুপে চুপে, এক রাত্রির ভিতর, নূতন লক্ষাধিক শ্লোক বেমালুম বদলাইয়া ফেলিলেন, তিনি পাঠকের বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন কি না, জানি না।—বিজয়বাবু আমাদের পরমাত্মীয়, অন্তরঙ্গ বন্ধু; তিনি হয়ত বিষয় কার্য্যের গুরুভারে, নিতান্ত তাড়াতাড়িতে, প্রবন্ধ দুইটী লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু সমালোচ্য বিষয় নিতান্ত গুরু বলিয়া, সমালোচনাটী—কর্ত্তব্যের খাতিরে—কিঞ্চিৎ তীব্র হইয়া পড়িল।—আশা করি, লেখক নিজগুণে, এই দীন সমালোচককে ক্ষমা

করিবেন।—পুরাতত্ত্বে, বর্ত্তমান সমালোচকের জ্ঞান নিতান্ত হীন ; বিজয় বাবুর প্রবন্ধ দুইটী বুঝিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি না ঠিক বুঝিয়াছি কি না। এক্ষেত্রে আমাদের মতন লোকের অবতরণ বাঞ্ছনীয় নহে, তবে যখন দেখিলাম "সাহিত্য" এবং "সঞ্জীবনী" প্রবন্ধদ্বয়কে কেবল উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিদায় দিলেন, অথচ প্রবন্ধদ্বয় আমাদের হিন্দু ও ব্রাহ্মের প্রচলিত প্রিয় বিশ্বাস ও ধারণাকে আঘাত করিল ; হিন্দুর দেবদেবী শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিল ; হিন্দুর গৌরবময় পবিত্র স্মৃতিকে ক্ষুন্ন ও কলুষিত করিতে প্রয়াসী হইল, তখন, নিজের অসামর্থ্য জানিয়াও, সমালোচ্য বিষয়ে লেখনী ধারণে অগ্রসর হইতে হইল। আশা করি কোন যোগ্যতর ব্যক্তি সমালোচ্য বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইবেন। তবে বিজয়বাবু ও আমরা উভয়েই, মোক্ষমুলরের কথা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে পারি—" We have stepped out (rather too boldly) of our own domain, even at the risk of being called an interloper, an ignoramus, for whatever accidents we may meet with ourselves, the subject is sure to be benefited"

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়

কাটোয়ার পথে।

সত্য গল্প।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

—(০:০)—

আমি দীঘি পার হইয়া অপর পারে যাইলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পরাণ বাগ্দীকে দ্রুতগতিতে আসিতে দেখিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি একাকী অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। এজন্য বোধ হয় বাবু আমার অনুসন্ধান জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পরাণকে পাঠাইয়া দিয়াছেন ; বাস্তবিক সেই জন্যই পরাণ দ্রুত আসিতেছিল। পরাণ আসিয়া পৌঁছিলে আমি তাহাকে দস্যুর কথা বলিলাম ; পরাণ বাগ্দী একটা

মহাবিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া দস্যুকে ধরিতে গেল, কিন্তু অল্পসময় মধ্যেই সেই কৃষ্ণাকৃতি বদ্‌মায়েস্ একটা খর্জ্জুর বনে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। আমি পরাণকে কহিলাম, বনের ভিতরে গিয়া উহার পশ্চাদ্ধাবন করা ভাল নহে, কারণ বনের ভিতরে উহাদের দল থাকিতে পারে। পরাণ আমার অনুরোধে দস্যুর আর পশ্চাদ্ধাবন করিল না। অনেকক্ষণ পরে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে, বাবুকে সকল কথা শুনাইলাম; আমি একাকী আসিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। আমরা আবার গাড়ী যোগে সাবধানে যাইতে লাগিলাম। যেখানে সূর্য্যাস্তের সময় উপস্থিত হইল, সেখানে একখানি ক্ষুদ্র চটি ছিল। সেই চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম। ভোজনের জন্য মোটা চাউলের ভাত, বিরি কলাইয়ের ডা'ল (তাহা এত পাতলা যে গঙ্গা যমুনার একত্র সঙ্গম বলিলেই হয়)! বার্ত্তাকু দগ্ধ, পোস্ত ও লঙ্কা বাঁটা সহ বড়ি ভাজা এবং আলু, বেগুন ও বড়ির সহিত পুরাতন তেঁতুলের "টক"। ক্ষুধা থাকিলে ঘাসও অমৃত বলিয়া বোধহয়, সুতরাং তৃপ্তি কম হয় নাই।

সেই চটিতে সেই দিবস দুই জন পথিক আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ইহারা গুজরাট দেশের লোক; মুক্তা, অলঙ্কার ও সুপারি বিক্রয় করিবার জন্য নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে আসিতেছিল। ইহাদের এক জনের সঙ্গে তাহার সহধর্ম্মিণীও ছিল। ইহারা দুই চারিটা আসল্ মুক্তা সঙ্গে রাখিয়াছিল, বাকি মুক্তা গুলি ভেল্ (নকল); অলঙ্কার গুলি গিল্টির তৈয়ারী, দেখিলে খুব ভাল সোণার গহনা বলিয়া বোধ হয়। পল্লীগ্রামের নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ লোকদিগের নিকটে গিয়া ইহারা অল্প মূল্যে ইহা বিক্রয় করে এবং তাহারা খুব আগ্রহ সহকারে এই সকল জিনিষ খরিদ করিয়া লয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এদেশে এখনকার দিনে এক পয়সায় ২৫টী সুপারি পাওয়া যায়; এত দূরদেশ হইতে তোমরা সুপারি বিক্রয় করিতে আসিয়াছ কেন?" তাহারা বলিল "আমাদের সঙ্গে ১৪ প্রকার সুপারি আছে, এই দেখ আপনাদিগকে দেখাই।" এই বলিয়া তাহাদের এক ব্যক্তি গাঁটরী খুলিয়া ১৪ প্রকার সুপারি দেখাইল। পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সুপারির তালিকা দিলাম। ১ম কাঁচা সুপারি (মায় ছোবড়া), ২য় কাঁচা সুপারি (ছোবড়া খোলা), ৩য় শুষ্ক সুপারি (গোটা), ৪র্থ খুব পচা ও খুব পুরাতন সুপারি (ঔষধের জন্য) ৫ম সুপারি কুচো, ৬ষ্ঠ খুব সূক্ষ্ম করিয়া কাটা সুপারি, ৭ম অতীব সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় কাটা

সুপারি, ৮ম অতি সূক্ষ্ম সুপারি চূর্ণ, ৯ম সুপারির আরক (জীর্ণকারক), ১০ম সুপারির মোরব্বা, ১১শ খদির ভিজান জলে, খণ্ড সুপারি অগ্নিতাপে পাককরা (মাদ্রাজী লোকেরা ইহা ব্যবহার করে), ১২শ গোলাপজলে গুজরাটের খুব ছোট সুপারি সিদ্ধে, বিশেষ সুগন্ধিযুক্ত। ১৩শ কচ্ছদেশের লম্বালম্বা সুপারির "আচার" (কাসন্দি), ১৪শ কাঁচা সুপারির কষায় (অম্লশূল রোগের মহৌষধ)।

আমরা কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম, দস্যুরা পথিমধ্যে এই তিনজন লোককে নিহত করিয়াছিল। এই ভয়ানক রাহাজানীতে কোথাকার একটা পুলিশ দারোগা এবং একজন কনেষ্টবল সম্মিলিত ছিল। গিল্টির গহনাকে সোণার গহনা এবং নকল মুক্তাকে আসল মুক্তা ভাবিয়া দস্যুরা ইহাদিগকে বধ করিয়াছিল। বর্দ্ধমান মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে এই মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সম্বাদপত্র পাঠ করিয়া জানিয়াছিলাম দারোগার সাত বৎসর এবং কনেষ্টবলের তিনবৎসর কারাদণ্ডের হুকুম, জজ সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সমাচারপত্র ছিল না; বাঙ্গালায় "সোমপ্রকাশ" ভিন্ন প্রকৃত সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র এবং "বিজ্ঞান মিহিরোদয়" ভিন্ন মাসিকপত্র ছিল না। হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ, বিজ্ঞান মিহিরোদয় এই তিন খানি পত্রে এই সম্বাদ পাঠ করিয়াছিলাম।

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার কাটোয়া অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। বাবু কহিলেন "যদি বিঘ্ন বা বিপদ উপস্থিত না হয় তাহা হইলে অদ্য অপরাহ্ণে কিম্বা সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে কাটোয়া পৌঁছিতে পারিব।" কিন্তু মধ্যাহ্নকালে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের গাড়ীর একটা চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা অনেক কষ্টে নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামে গেলাম, সেই ক্ষুদ্র গ্রামে একজন তান্ত্রিক সাধু ছিলেন, তাঁহারই আশ্রমে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তিনি আর একখানি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে একজন মিস্ত্রি আনাইয়া আমাদের গাড়ীর চাকা মেরামত করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহার আশ্রমে রাত্রি যাপন করিলাম।

রজনী সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময়, আমরা নানা কারণে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলাম, ঐ তান্ত্রিক সাধু বাস্তবিক "সাধু" নহে, সে ব্যক্তি ডাকাইতদিগের অন্যতম সর্দ্দার। ডাকাইত, দস্যু ও রাহাজানেরা, চোরাই মাল ও ডাকাইতি

মাল ইহারই হাত দিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। যাহাহউক, পর দিবস মধ্যাহ্নে আমরা ভাগিরথীতীরবর্ত্তী কাটোয়া নগরীতে উপনীত হইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাবুকে কহিলাম "রাস্তায় কেবল মাঠ আর ডাকাত!! এমন দস্যুভরা দেশ আর ভূমণ্ডলে নাই!!"

কাটোয়া নগরী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ মহকুমা। বাণিজ্য ও ব্যবসার জন্য ইহা সমৃদ্ধিসম্পন্না, তদ্ভিন্ন বৈষ্ণবদিগের ইহা একটি তীর্থভূমি। এখানকার স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের বাঙ্গালা ভাষা এবং উচ্চারণ প্রথা, কলিকাতার বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র। কথা খুব কর্কশ। কবিবর দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "সুরধুনী" কাব্যে লিখিয়াছেন—

"কাটোয়ার কাষ্ঠ ভাষা কণ্টকের ধার।"
"মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে আকার ॥"

আমরা কয়েক সপ্তাহ কাল কাটোয়ায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এখনকার দিনে কাটোয়া যাইবার অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ষ্টীমারে কাটোয়া যাওয়া যায় এবং বর্দ্ধমান হইতে উটের গাড়ীতে কাটোয়া যাইবার উত্তম উপায় আছে। সে সময়ে এ সকল কিছুই ছিল না। রেলওয়ে হইবার কথাও শুনা যাইতেছে। ভারতবিজয়ী দয়াময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শত দোষ আছে স্বীকার করি। কিন্তু সহস্র—লক্ষ—কোটি গুণও আছে। বৃটিশ শাসনে দস্যুর সংখ্যা কম হইয়া আসিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র নির্ভয়ে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে, ইহা ইংরাজ শাসনের অন্যতম প্রধান গুণ।

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মেঘদূত।

পরিশিষ্ট।

মল্লিনাথের সময় সঠিক এখনও জানা যায় নাই। কয়েকটা কারণে অনুমান করা যায় যে তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে টীকাগুলি লিখিয়াছিলেন। সময় নির্দ্ধারণের জন্য যে যে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে অগ্রার্দ্ধী সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। পাঠকের জ্ঞাতার্থে মেঘদূতের টীকায় সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের

নাম ও যে শ্লোকের টীকায় উল্লেখ তাহার বর্ণানুযায়ী তালিকা নিম্নে দিলাম। রঘুবংশের টীকায় ঐ রকম তালিকা শঙ্কর পাণ্ডুরাং পণ্ডিত তাঁহার রঘুবংশের সংস্করণের শেষে দিয়াছেন (vol III., Index pp. 8-12)। শ্লোকীয় টীকায় যদি কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকার একবারের ঊর্দ্ধ উল্লেখ হইয়া থাকে তবে সেই সংখ্যা ক্ষুদ্র বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইয়াছে।

বাগ্‌ভট	১৩, ২০।
বামন	৯, ৪৯, ৫৩, ৮৮।
বিশ্ব বা বিশ্বপ্রকাশ	৩ (২), ৬, ৯, ১২, ১৪ (২), ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৩, ৩৯, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৫৮, (২), ৫৯, (২), ৬০, ৬৯, ৭৩, ৭৪, (৩) ৮৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৫, ১১৮।
শব্দরহস্য	৪৭ (২), ৫৯, ৬৪, ৭৭।
শাশ্বত	২, ৩১, ৩৫।
শ্রীহর্ষ	১০৭।
সংগীত রত্নাকর	৯২।
বৈজয়ন্তী	৩০, ৫৯, ৭২।
শব্দার্ণব	১ (২), ২, ৯, ১০, ১১ (২), ১৫, ১৯ (২), ২১ (২) ২৩, ২৪, (২), ২৬, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৬ (২), ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, (২), ৮৪, ৮৭, ৯৪, ১০৪ (২), ১১১, ১১২, ১২০।
সামুদ্রিক	৮৮।
সারস্বতালঙ্কার	১২১।
স্কান্দ	৩৭।
হলায়ুধ	২, ৪, ২৭, ৩৭, ১০৮।

উপরি উক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণকে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রানুযায়ী বাছাই করিয়া নিম্নে দিলাম। যে নাম গুলি রঘুবংশের টীকায় নাই, তাহাতে (নু) চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে, ও যত বার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার নোট দেখান গিয়াছে।

ক। অভিধান বা কোষ	বার
(১) অক্ষয্য কোষ (নু)	১।
(২) অমরকোষ	১৩৭।
(৩) উৎপলমালা (নু)	৩৬।
(৪) ক্ষীরস্বামিন্	৩।
(৫) মালতীমালা (নু)	২।
(৬) যাদব	২৪।
(৭) রুদ্র (নু)	২।
(৮) বিশ্ব বা বিশ্বপ্রকাশ	৩৬।
(৯) বৈজয়ন্তী	৩।
(১০) শব্দার্ণব	৫০।
(১১) শাশ্বত	৩।
(১২) হলায়ুধ	৫।
(১৩) "অভিধানাৎ"	১।

খ। অলঙ্কার।	
(১) অলঙ্কার সর্ব্বস্ব (নু)	১।
(২) একাবলী (নু)	২।
(৩) দণ্ডিণ	৪।
(৪) দশরূপক	২।
(৫) পতাকা (নু)	১।
(৬) ভোজরাজ	২।
(৭) সারস্বতালঙ্কার (নু)	১।

গ। কবি বা কাব্য।	
(১) কর্ণোদয় (নু)	১।
(২) নিচুল (নু)	১।
(৩) ভবভূতি (নু)	১।
(৪) ভারবি (নু)	১।
(৫) মালবিকাগ্নিমিত্র (নু)	১।
(৬) শ্রীহর্ষ	১।

ঘ। কামশাস্ত্র।	
(১) কামসূত্র	১।
(২) নৃত্যসর্ব্বস্ব	১।
(৩) রতিরহস্য (নু)	৩।
(৪) রতিসর্ব্বস্ব (নু)	১
(৫) রসরত্নাকর (নু)	৪।
(৬) রসাকর (নু)	৩।

(৭) সঙ্গীতরত্নাকর (নূ) ১।

ঙ। টীকা বা টীকাকার।

(১) নাথ ৪।

(২) রঘুবংশসঞ্জীবিনী ১।

চ। দর্শন।

(১) দিগনাগাচার্য্য (নূ) ১।

(২) ন্যায় (নূ) ১।

ছ। নিমিত্তকশাস্ত্র।

(১) নিমিত্তনিদান (নূ) ৪।

(২) সামুদ্রিক (নূ) ১।

জ। পৌরাণিক।

(১) শম্ভুরহস্য (নূ) ৫।

(২) স্কান্দ ১।

ঝ। ব্যাকরণ।

(১) অধিকার সূত্র (নূ) ১।

(২) উজ্জ্বল (নূ) ১।

(৩) কাশিকা ১।

(৪) চন্দ্রব্যাকরণ (নূ) ১।

(৫) নিরুক্তকার (নূ) ২।

(৬) পাণিনীয় (নূ) ১।

(৭) ভাষ্যকার ২।

(৮) বামন ৪।

ঞ। বৈদ্যকশাস্ত্র।

(১) অশোককল্প (?) (নূ) ১।

(২) মদিরার্ণব (নূ) ১।

ট। স্মৃতি।

(১) মনু ১।

প্রবাদ আছে যে মল্লিনাথের "মাঘে মেঘে গতং বয়ঃ" মাঘের টীকা সর্ব্বঙ্কষা, ও মেঘদূতের টীকা সঞ্জীবিনী করিতে তাঁহার বয়স কাটিয়া যায়। উপরি উক্ত তালিকা হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রকাশ যে মেঘদূতীয় টীকার পূর্ব্বে রঘুবংশ-সঞ্জীবিনী রচিত হইয়াছিল ও মেঘদূতীয় টীকায় তিনি অনেক নূতন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মোহন চক্রবর্ত্তী।

মায়া।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভজরে, মানস মম, অনাদি কারণ।
ভক্তিভরে জীব তরে থাট অনুক্ষণ॥
আনন্দ অপার তার স্বার্থ নাহিক যার
পরার্থে হৃদয় যার হয়েছে মগন॥
জীব ব্রহ্ম, পূজা প্রেম,——প্রেম নিষ্কাম করম;
নিষ্কাম করমে ভজরে, মন, ব্রহ্ম সনাতন॥

সেবানন্দ স্বামী নরেশের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরেশ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। সেবানন্দ স্বামী বসিলেন এবং বলিলেন বৎস! তোমার জন্য প্রবোধ বাবু এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নরেশ। আমি রাজা ভূপেশের পুত্র আমি ভিক্ষা লইব!

সেবানন্দ। ভিক্ষা নহে, হাওলাত। যখন সুবিধা হইবে তখন এই ঋণ শোধ করিও। আর, যখন যাহা আবশ্যক, প্রবোধ জানিতে পারিলে তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন।

নরেশ। আমি কি পাষণ্ড! এই প্রবোধ বাবুকে আমি আমার গৃহে অপমান করিয়াছি। তাঁহার টাকা আমি কোন্ মুখে লইব? আপনি টাকা ফেরত লইয়া যান।

সেবানন্দ স্বামী। বৎস! অভিমান ত্যাগ কর। মহামায়ার মোহে, কোন্ জীব, কোন না কোন সময়ে, না অভিভূত হয়? প্রবোধ তোমাকে পূর্ব্বেও যেমন ভালবাসিত এখনও তোমাকে তেমনি ভালবাসে। আর আমার গুরুজীর তোমার উপর কৃপা আছে। তিনি বলিয়াছেন পরিণামে তোমার মঙ্গল হইবে।

নরেশ। আপনার গুরুজী কে? কোথায় থাকেন?

সেবানন্দ স্বামী। তিনি সন্ন্যাসী, হরিদ্বারে থাকেন।

নরেশ। আমাকে কিরূপে জানিলেন?

সেবানন্দ। জানি না। কিন্তু তোমার বিষয় তিনি অনেক সংবাদ রাখেন।

নরেশ। কেন?

সেবানন্দ। গুরুজী তাহা বলেন নাই।

নরেশ। আপনার গুরুজী যিনিই হউন, তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবেন।

সন্ন্যাসী নরেশের হস্তে এক হাজার টাকার নোট দিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এমন সময় প্রবোধ বাবু আসিলেন। নরেশ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রবোধ বাবু নরেশকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

প্রবোধ। এই বাটীতে তোমার কষ্ট হইতেছে। আমার বাটীতে আইস। আমি তোমার বড় ভাই মনে রাখিও।

নরেশের চক্ষু আর্দ্র হইল। বলিলেন "আমি নরাধম, তুমি নিজ গুণে

আমাকে ক্ষমা করিয়াছ"। প্রবোধ বাবু অনেক বলিয়া কহিয়া নরেশকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। সেই বাটীতে এক্ষণে কুমুদিনী এবং মায়াও আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ছুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যছুঃখভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

মহেশ মন্দিরে।

মহেশ অমাবস্যা রাত্রিতে তটিনী তটে, সেই শ্মশান-কালীর মাঠে আসিল। রাত্রি চম্ চম্ করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র বাতাস সোঁ সোঁ করিতেছে—আর, দূরে শিবারব শ্রুত হইতেছে। যে রাত্রিতে মহেশ সেই বিশাল প্রান্তরে বিরাট কৃষক-সভায় বক্তৃতা করিয়া এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল, সেই রাত্রির কথা তাহার মনে পড়িল। সেই লোকারণ্য, সেই হাজার হাজার মশাল, কৃষকদিগের ফূর্ত্তি—আর গগন-ভেদী "জয় মহেশজী কি জয়" ইত্যাদি হুঙ্কার; আর বক্তৃতার সময় নিজের পবিত্র আবিষ্ট ভাব—সব যেন কল্পনা চক্ষে দেখিতে পাইল। এই সময়ে নিকটে কে যেন "বম্ ভোলানাথ" বলিল। তাহাতে মহেশের চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু দেখিল, আজ সেই মাঠে জন প্রাণী নাই, সব নিস্তব্ধ—মহেশ চারিদিক আবার দেখিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার পর জঙ্গলের সেই মন্দিরে গেল। একটী ক্ষীণালোকে দেখিল যে, সেই সন্ন্যাসী ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। মহেশ সম্মুখে গিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিল। সন্ন্যাসী চক্ষু খুলিয়া বলিলেন "বৎস কি চাহ?"

মহেশ। এক্ষণে আমি কি করিব? আবার প্রজাবিদ্রোহের চেষ্টা করিব কি?

সন্ন্যাসী। মা কালীর আরাধনা কর।

মহেশ সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া মা কালীর সম্মুখে আসিল। সেখানেও একটি দীপ জ্বলিতেছে। করালবদনা ভীমা চণ্ডী রণবেশে দাঁড়াইয়া যেন হাসিতেছেন। মহেশ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল——

"মা! আমি আবার তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি এক্ষণে কি করিব? আবার কি গাঁয় গাঁয় গরিব প্রজাদিগের ঘরে ঘরে ফিরিব? আবার কি বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিব? যদি আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে, তাহাতে অত্যাচার পুড়িবে, না প্রজারা পুড়িবে? আগে যে অত্যাচার ছিল তার চেয়ে যে অত্যাচার বেড়েছে! যদি বিদ্রোহে প্রজাদিগের কোন উপকার হবে না, তবে কেন আমাকে এ মতি দিয়াছিলে? এই বিদ্রোহের জন্য আমার নিরপরাধী পিতার প্রাণ গেল, আমাদের পরিবারের ইজ্জত গেল, আর আমার স্ত্রী, আমার ভগ্নী এক্ষণে পথের কাঙ্গাল। মা! তুমি নরবলি চাহিয়াছিলে, তাই কি আমার পিতার বলি হইল? আমাকে বলি দিলে না কেন? আমাকে বলি দিয়ে প্রজাদের কেন বাঁচাইলে না, তাহাদের দুঃখ কেন ঘুচাইলে না। আমি যে দুঃখী-প্রজাদের কিছুই করিতে পারিলাম না; কেবল তাহাদের মজাইলাম, তাহাদের দুঃখ বাড়াইলাম। মা, তুমি ত জান, তোমার সন্তান বিপদে ভীত নহে। মা আমাকে ব'লে দেও এক্ষণে কি করিব। বিদ্রোহ না শান্তি?"

মা ত কিছুই বলিলেন না। মহেশ চক্ষু নিমীলিত করিয়া মা কালীকে ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান করিতে করিতে দেখিতে পাইল—গাঢ় অন্ধকার হইতে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,—তাহা ক্রমে বাড়িতে লাগিল, তাহার ভিতরে অসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।

"ভীষণবদনা কৃষ্ণবর্ণা দেবী অসি এবং পাশ ধারণ করিয়া বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন। তিনি বিচিত্র লৌহময় যষ্টিধারিণী এবং নরশিরমালায় বিভূষিতা, তাঁহার পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি ক্ষীণাঙ্গী হওয়ায় অতি ভীষণাকৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই দেবীর বদনমণ্ডল অতি বিস্তৃত, এবং লোলজিহ্বা"।

মহেশ দেখিল এই মূর্ত্তি আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর দেখিল, হাজার হাজার ভীম দৈত্যদল কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিবৎ দেবী আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু বায়ু যেমন মেঘবারিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, রণরঙ্গিণী দেবী তেমনি অসুরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন—অসুরগণ রক্ত বমন

করিতে করিতে ছুটিতেছে, পড়িতেছে, মরিতেছে। ভৈরব-নাদিনী আলুলায়িত কেশে অট্টহাস্য করতঃ ছিন্নমুণ্ডরাশির উপর নৃত্য করিতেছেন। মহেশ দেখিল চণ্ডীর জয় হইল। অখিলজগৎ প্রসন্ন ও বিপ্লব-রহিত হইল, আকাশ নির্ম্মল হইল, সরিৎ সকল স্বস্ব মার্গে চলিতে লাগিল। দেবগণ হর্ষভরে পরিপূর্ণ হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ মধুর সঙ্গীতে জগৎ প্লাবিত করিলেন। মহেশ তাহার পর দেখিল, চণ্ডী ভুবনেশ্বরী হইয়া হাসিতেছেন। মহেশ উচ্চৈঃস্বরে মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিল। তখন ভুবনেশ্বরী মহেশকে বলিলেন—।

"বৎস! অত্যাচার স্বরূপ দৈত্যকে মঙ্গলরূপিণী শক্তি মর্দ্দন ও নাশ করিতেছে—। অত্যাচার যাহাদের প্রাণ তাহারা মরিতেছে বা মরিবে—আপাততঃ শোণিতপাত, পরে সাধুগণ স্বরূপ দেবতাগণের আনন্দ। এই জগতে নিত্য সুরাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। কেহ বা দেব, কেহ বা দৈত্য। পরের সুখের জন্য যাহাদের জীবন, তাহারা দেবতা; অন্যের দুঃখের জন্য যাহাদের জীবন, তাহারা দানব। জগতের কোন ভাল কাজই নিষ্ফল হয় না। তোমার কর্ম্ম-বীজের ফল কয়েক বৎসর পরে দেখিতে পাইবে। প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য শাসনকর্ত্তারা একটা বিধি * প্রচার করিবেন, তুমি এজন্মে বঙ্গের প্রজাদিগের জন্য আর কিছু করিতে পারিবে না। জন্মান্তরে তুমি বঙ্গে একজন প্রধান জমিদার হইবে। জমিদার সমিতি গঠন করিবে এবং তোমার জীবনের আদর্শ দ্বারা এবং তোমার উপদেশ দ্বারা বঙ্গের জমিদারদিগের এবং প্রজাদিগের মধ্যে পিতা পুত্রের ধর্ম্ম্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবে। তুমি এক্ষণে এই মন্দিরে যে সন্ন্যাসী রহিয়াছেন তাহার নিকট মন্ত্র লইয়া সাধনা দ্বারা পুণ্যবল সঞ্চয় কর—।"

এই কথা বলিয়া মাতা অন্তর্হিতা হইলেন। যে স্বর্গীয় আলোক ফুটিয়াছিল তাহা অন্ধকারে লুপ্ত হইল। মহেশ তার পর দেখিতে পাইল, আকাশে ঘন কৃষ্ণমেঘ-স্তূপের পিছনে মেঘস্তূপ ছুটিতেছে। সেই মেঘস্তূপ আরোহণ করিয়া দৈত্যগণ রণে ধাবিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে মার মার শব্দ মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে—মেঘ কড় কড় করিয়া ডাকিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া মহেশ চমকিয়া উঠিল। মহেশের আবেশ ভাঙ্গিল দেখিল মন্দির অন্ধকার। ঝড় হইতেছে—বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, মুহুর্মুহু মেঘ ডাকিতেছে।

* The Tenancy Act of Bengal (VIII of 1885.)

মহেশ ভাবিল, এই দুর্য্যোগে যদু ভীম ও ষড়ানন আসিবে? এমন সময় মন্দিরে আর কয়েক জনের কথা শুনা গেল।

মহেশ বলিল, "তোমরা কারা"? উত্তর হইল, "আমি যদু,—আর ভীম, আর ষড়ানন ঝড় বৃষ্টিতে বড়কষ্ট পাইয়াছি। আলো জ্বালিবার উপায় নাই"?

মহেশ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর,—আশ্রিত জনকে আশ্রয় দিন"।

সন্ন্যাসী।—বৎস! তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ তাহার নিকটে তোমার দক্ষিণ দিকে একটু কোলঙ্গাতে চকমকি পাথর আছে তাহা লও, দীপ জ্বাল। বৎস! আগে দরজা বন্ধকর। মহেশ দীপ জ্বালিল। সন্ন্যাসী তাহার ঝুলি হইতে তিন খণ্ড কাপড় দিলেন। যদু ভীম ও ষড়ানন আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিল। তাহার পর, যদু ভীম ও ষড়ানন ও মহেশ এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

Ophelia. (*singing*)

And will he not come again?
And will he not come again?
No, no, he is dead,
Go to thy death-bed,
He never will come again.

Shakspeare.

উন্মাদিনী।

কত দিন গেল। মহেশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবু কুমুদিনী ও মায়া প্রতিদিনই পথ চাহিয়া থাকে। দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাস যায়,—বৎসর ঘুরিয়া গেল, তথাপি মহেশের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।—রজনীতে কুমুদিনী ও মায়া দুইজনে কখন বা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, কখন বা নীরবে বসিয়া থাকে —কখন বা দুই জনে শয়ন করিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ

করিতে করিতে নিদ্রিত হয়। মায়া কখন কখন নিদ্রিত হইয়া দাদাকে স্বপ্নে দেখিয়া "দাদা-দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠে। কুমুদিনী তাহা শুনিয়া কখন কখন "কে রে, মায়া"? বলিয়া উঠে। কখন বা বলে "আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন—আমাদের এমন কপাল কি হবে?" মায়া বলিত "বৌ আমার মন বলে, 'দাদা আমার আসিবেন—তাঁকে আবার পাব'। তখন কুমুদিনী সেই বালিকাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার অশ্রুসিক্ত বদন অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে চুম্বন করিত, কখন কখন বলিত, "মায়া আমাদের বাড়ীতে সকলে বলিত, 'তুই মানবী নহিস, তুই কোন দেবকন্যা, কাঙ্গালের দুঃখে দুঃখী হইয়া, কৃপা করিয়া কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়াছিস'। আমারও বোধ হয় তুই দেবী, তোর কথা অবশ্য সত্য হইবে"। তখন মায়া বলিত "আমি দেবকন্যাও নহি, দেবীও নহি, আমি তোমাদের মায়া"। কুমুদিনী এই কথা যতবার শুনিত ততবারই কাঁদিয়া ফেলিত, আর তাহাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহভরে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিত। আমরাও বলি "মায়ারে! তোর মত মেয়ে কি আমরা কখন পাব? আমাদের এই দরিদ্রের ঘর তুই কি কখন আলো করিবি? আমাদের এই নিষ্ঠুর জগতে তোর আবির্ভাব কবে হইবে?"

কুমুদিনী বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মহেশের সংবাদ খুঁজিত। একদিন একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে পাঠ করিল, "জমিদারের লাঠিয়ালগণের সহিত প্রজাগণের মস্ত একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনেক লোক আহত হইয়াছে। জমিদারের পক্ষে দুইজন লোক খুন হইয়াছে, আর প্রজাদিগের মধ্যে মহেশ নামক একজন ব্যক্তি হত হইয়াছে।" সম্পাদক টীকা করিয়াছেন "যতদূর জানা যায় এই সেই বিদ্রোহী প্রসিদ্ধ প্রজাদলপতি মহেশ"। কুমুদিনী এই টুকু যেমন পড়িল, অমনি তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, খবরের কাগজ খানি হাত হইতে পড়িয়া গেল। কুমুদিনী মায়াকে ডাকিল। প্রবোধ বাবুর একটী বৃদ্ধা চাকরাণীর জ্বর ও ক্ষয়কাশী হইয়াছিল। ক্ষয়কাশ বলিয়া অন্য চাকর ও চাকরাণী তাহার নিকট বড় যাইত না। প্রবোধ বাবুর স্ত্রী তাহার সেবা করিতেন, আর মায়া। যখন কুমুদিনী ডাকিল মায়া তখন সেই বৃদ্ধার শুশ্রূষা করিতেছিল। ডাক শুনিয়া মায়া দৌড়িয়া আসিল, বলিল, "বৌ, দাদার কোন খবর পেয়েছ না কি?"

কুমুদিনী। খবর পেয়েছি। কপাল ভেঙ্গেছে।

মায়া। দাদা কি নাই?

কুমুদিনী উত্তর করিল না, কাঁদিতে লাগিল।

মায়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "দাদা কি স্বর্গে গিয়াছেন?" মায়া তাহার মৃত্যুতে জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, দাদার মৃত্যুর সংবাদে আবার কি করে, সেই ভয়ে কুমুদিনী নিজের শোক দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া অতি কষ্টে বলিলেন—

"নিশ্চিত খবর পাওয়া যায় নাই, আমার ভয় হইতেছে—"

মায়া। "ভয় কি বৌ! দাদা স্বর্গে গেলেও সেখানে আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হবে। তবে যা' দুঃখ বিলম্বের জন্য। কিন্তু বৌ! দাদাকে আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করছে"। মায়া চক্ষু বুজিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল "দাদা! তুমি যদি জীবিত থাক, আমাদিগের শীঘ্র দেখা দেও—আমরা যে তোমাকে না দেখে কত কষ্ট পাচ্ছি তাতে কি তোমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না?"

কুমুদিনী (হাস্য করিয়া) "হো হো—দাদা আসছে তোকে দেখাব, দেখাব, কি দিবি?" বলিয়া গান করিতে লাগিল,—

(গান)।

সে রতন করিয়া যতন, এনেছি তোরই তরে।
সে নিধি অঞ্চলে বেঁধে, এনেছি তোরই তরে॥
তোরই তরে তোরই তরে—

গান করিতে করিতে কুমুদিনী মায়ার মুখের গোড়ায় হাত নাড়িতে লাগিল, আবার হাত নাড়িয়া গাহিতে লাগিল।

"কি দিবি, কি দিবি, ওরে যাদুমণি, পাইয়া তারে।
সে রতন, করিয়া যতন, এনেছি ওরে তোরই তরে॥"

কুমুদিনী হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে গান করিতে লাগিল। মায়ার মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া গিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া বলিল "তুই কে? তুই কে!—তুই মায়া—মায়া—না, সে যে জলে ডুবে মরেছে,—

গান।

জলেতে ডুবেছিলাম, কেন তুলিলে মোরে, স্বজনি।
তারে নাহি হেরে, সখিরে, সইরে, এক্ষণ যে প্রমাদ গণি"॥

মায়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল "ও কি বৌ, ও বৌ, কি হলো—বৌ কি পাগল হল—লীলা দিদি ও দিদি—"

লীলা দ্রুতবেগে সেই ঘরে আসিলেন। কুমুদিনী মাথা দোলাইয়া বলিল "ঠিক, ঠিক—হয়েছে"—

লীলা বলিলেন "বৌ শান্ত হও থাম"। কুমুদিনী লীলাকে দেখিয়া কাঁদিয়া করতালি দিয়া আবার গান গাহিতে লাগিল—

(গান)।

সে কেন এলো না, সে কেন এলো না।
প্রাণ কেন গেল না, প্রাণ কেন গেল না॥
আঁখি ভরে তাঁরে হেরে, কেন রে এলাম ঘরে,
দগ্ধে মরিবার তরে—কেমনে সহি এ দারুণ যন্ত্রণা॥
সইরে সে কেন এল না, সে কেন এল না॥

লীলা। সে আসিবে, শান্ত হও।

কুমুদিনী। তুমি কে গা?—লীলামণি না হীরামণি?—জমীদারের বৌ? রাক্ষসী দূর হ দূর হ, আবার হাততালি দিয়া গান—

"প্রাণ কেন গেল না" ইত্যাদি।

মায়া কুমুদিনীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুমুদিনী। দূর হ দূর হ। উনি কাঁদিতে পারেন, আমি কি কাঁদিতে পারি না

কাঁদিতে কাঁদিতে গান।

"সে কেন এলো না কেন এলো না? ইত্যাদি।

লীলা ও মায়া এই পতি-প্রেমে-পাগলিনীকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী অনেক সময় চুপ করিয়া থাকে, কখন কখন মাথা নাড়ে, কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন গান করে।

মায়া কখন বৌকে বাতাস করে, কখন স্নান করায়, কখন বা খাওয়ায়, কখন বা মস্তকে শীতল তৈল মর্দ্দন করে। প্রবোধ বাবু ভাল চিকিৎসক আনাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে ইহা শোক-জনিত রোগ, শোকের বেগ থাকিতে আরোগ্য লাভের আশা কম।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী ও মায়ার অবস্থা যখন এইরূপ তখন নরেশকে বুঝাইয়া প্রবোধ বাবু তাহার ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে নরেশ বাবু ও প্রবোধ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন।

প্রবোধ। সুন্দরবনে আমার যে লাট আছে, তাহার পাশের লাট গবর্ণমেণ্ট

বিলি করিবেন। সুন্দরবন কমিশনর সাহেবের সহিত আমার আলাপ আছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, লাটটীতে খুব ভাল খাল অতি অল্প আছে। জমি উচ্চ সামান্য ভেড়ী বাঁধ দিলে লোনা জল উঠিবে না। জমিও খুব উর্ব্বরা। ৮০০০ বিঘা আন্দাজ হইবে। তুমি তাহা বন্দবস্ত করিয়া লও। বন্দবস্ত করিয়া লইতে অতি সামান্য টাকা লাগিবে।—আমি এই পুস্তকখানি তোমার জন্য আনিয়াছি তাহাতে সমুদয় জানিতে পারিবে।—*

নরেশ। জঙ্গল লইব, হাসিল করিব কেমন করিয়া? হাসিল করিতে ত টাকা চাহি।—

প্রবোধ। টাকা চাহি অল্প। বিঘা প্রতি দুই টাকা লাগিবে।

নরেশ। অর্থাৎ ১৬০০০ টাকা। আমার এক পয়সা নাই।

প্রবোধ। আমার নিকট হাওলাত লও।

নরেশ। দান? শোধ দিব কি করিয়া?

প্রবোধ। শীঘ্র বিলি হইবে। এক টাকা নিরিখে। প্রথম ১০ বৎসর গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইবে না। প্রজারাও তোমাকে ৩ বৎসর কর দিবে না, তাহার পর আর তিন বৎসর "রসদ" তার পর পুর দস্তর প্রতি বিঘা ১ টাকা খাজনা পাইবে। ৪র্থ বর্ষে চারি আনা নিরিখে ২০০০৲—৫ম বর্ষে আট আনা নিরিখে ৪০০০৲—৬ষ্ঠ বর্ষে বার আনা হিসাবে ৬০০০৲—৭ম বর্ষে পুরা দস্তর এক টাকা নিরিখে ৮০০০৲ পাইবে ধর। এই চারি বৎসরে মোট ২০,০০০৲ টাকা হয়। তাহা হইতে ১ হাজার টাকা অনাদায় ছাড়িয়া দেও। এবং সাত বৎসর তোমার নিজ খরচ ৭০০০৲ টাকা ধরিয়া লও। এই ৮ আট হাজার গেল; আর ১০০০৲ সরঞ্জম খরচ ধর। মোট ৯০০০৲ হইল। বাকী টাকা হইতে আমার ৮০০০৲ হাওলাত শোধ দিবে। ৩০০০৲ মজুত তহবিল থাকিবে। তাহাতে লাটের কাজ চালাইবে। আমার টাকার তাড়াতাড়ি নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে দশ বা বিশ বৎসরে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।"—

এমন সময়ে ক্ষিপ্তা কুমুদিনী অন্দরমহল হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। নরেশ বাবুকে বলিল, "তুমি নরেশ, তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছ—তুমি আমার শ্বশুরকে খুন করেছ—ধিক্ নরেশ,—ধিক্ নরেশ, নরেশ—আচ্ছা মেরে ফেল্লি কেন?—আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস নরকে

* Manual of Sunderban Waste Lands.

যাবার জন্য তোদের কেন এত ইচ্ছা হয়—তুই সয়তান, না সয়তানের বাচ্চা—না সয়তানের পোষ্যপুত্র (কাঁদিয়া গীত)—

"সই, প্রাণ কেন গেল না।
আঁখি ভোরে তারে হেরে—কেন এলাম ফিরে ঘরে,
কেন তারে দিলাম ছেড়ে—যন্ত্রণা আর সহে না"

(ক্রন্দন) "সইরে—সইরে—সইরে—ছি! ছি! ছি! যমদূত একে নিয়ে যাও। নিয়ে যা নরেশকে। ঐ নরককুণ্ড। ঐ জল্‌ছে—দাউদাউ করে। ঐ কড়াতে তেল টগবগ্ করে ফুট্‌ছে। ঐ তেলে তোকে ভাজিবে।—ঐ দেখ্ তোর মতন পাপীরা ঐখানে কান্‌ছে। ওকে কড়াতে ফেলেদে—ফ্যাল্ ফ্যাল্, ফেলেদে ফেলেদে, ফেলেদে, ফেলেদে—হি! হি! আমার শ্বশুরকে খুন করা, আমার স্বামীকে খুন করার সাজা কেন পাবি না—হো হো (গীত) "প্রাণ কেন গেল না" ইত্যাদি।—প্রবোধ বাবু "ঝি ঝি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ঝি আসিল, মায়া আসিল। ঝি কুমুদিনীকে ভুলাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু মায়া নরেশ বাবুকে বলিল, "হায়! জমিদার, দেখ দেখ কি করিয়াছ—। তুমিও জমিদার, প্রবোধ বাবুও জমিদার। প্রবোধ বাবু ত কাহাকেও খুন করেন না। তাঁর অত্যাচারে কারও বৌ ঝি পাগল হয়নি?—ওগো, তোমার কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল? ওমা তোমার চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে—তুমিও কি আমাদের মত দুঃখী, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়িছি?—ক্ষমা কর", এই বলিয়া মায়া নিজের চক্ষুর জল মুছিয়া—অন্দর মহলে গেল।

নরেশ। আমি কি নরাধম! এই সতী পতির জন্য পাগল, ইহাকে কুলটা ঘোষণা করিছি, এই দেবকন্যার মত কচি মেয়েকে পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন অভিভাবকহীন করেছি। আর আপনি শিবতুল্য লোক তথাপি আপনাকে কি অকথ্য কথা বলেছি—প্রবোধ বাবু আমি বিদায় লইলাম। বনে গিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, তার পর যদি বেঁচে থাকি আপনার কাছে মুখ দেখাবো"—এই বলিয়া নরেশ দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আগামী বারে সমাপ্য।

শান্তি ।

ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণ সর্ব্বদা সমুদায় কার্য্যে শান্তির অন্বেষণ করিয়া থাকেন। কি সুখকর কার্য্য, কি অতি দুঃখদায়ক ভয়সঙ্কুল কর্ম্ম, সর্ব্বত্র শান্তিকামনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর্য্যগণ যখন কুটীরবাসী তখন তাঁহাদিগের মনে, কাজে ও বাহ্য দৃশ্যে যে শান্তি ছিল এখন তাহা সংপূর্ণরূপে দেখা যায় না। তাই আমরা এত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ। আর্য্যঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন দেখিলে জানা যায়, তাঁহারা সংসারদুঃখ দূর করার অভিপ্রায়েই সকল কাজে শান্তি বিধান করিয়াছেন, অধুনা আমাদিগের মনে উদ্দেশ্য মাত্র আছে, বিধেয় যে কি তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। সে বিস্মৃতির হেতু কেবল নিরন্তর সুখাভিলাষ। আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণের কি সুখেচ্ছা ছিল না? ছিল, অত্যধিক ও অসঙ্গত ছিল না। সেই হেতুবশতঃ তাঁহারা অনায়াসে সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইতেন। সর্ব্বাগ্রে শারীরিক শান্তি, মনের শান্তি ও সর্ব্বশেষে সংসারে শান্তি অন্বেষণ করিতেন। আমরা এখন শান্তি যে কি বস্তু এবং কিরূপ ফলপ্রদ তাহা বুঝিবার ও চেষ্টা করি না। কেবল মৌখিক শান্তির আলোচনা করি। আর্য্য জাতির সাংসারিক কার্য্যে দশবিধ সংস্কার আছে। প্রত্যেক সংস্কারের স্বস্তি বাচন ও শেষে শান্তি কার্য্যের বিধান আছে। এই উভয় আবার পুণ্যাহ বাচন ঋদ্ধি সহ শুভ হেতু অনুষ্ঠিত হয়। দশসংস্কার করিবার তাৎপর্য্য কি? উহা করিলে মনে, কাজে ও ব্যবহারে অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা অতি অল্পই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং শান্তি স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়। দশসংস্কার কি? ১ম গর্ব্ভাধান, ২য় পুংসবন, ৩য় জাতকরণ, ৪র্থ নিষ্ক্রমণ, ৫ম নামকরণ, ৬ষ্ঠ অন্নপ্রাশন, ৭ম চূড়াকরণ, ৮ম উপনয়ন (অর্থাৎ গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন), ৯ম সমাবর্ত্তন (পাঠসমাপনান্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্তি), ১০ম বিবাহ।

গর্ব্ভাধানের তাৎপর্য্য, শুক্রশোণিতাদিক্লেদজনিত আত্মা অর্থাৎ জীবের পবিত্রতা বিধান। এই কার্য্যে পঞ্চামৃত ও পঞ্চ গব্যের ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অল্পমাত্রায় গোমূত্র সেবনে শারীরিক দুর্ব্বলতা নষ্ট হয়। গোময়ের আঘ্রাণে নিশ্বাস প্রশ্বাসের দোষ বিদূরিত হইয়া থাকে। এখনকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন ইংরাজী ফেনাইলের যে গুণ গোময়ের গুণ

তদপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র ন্যূন নহে। "দুগ্ধ" যে কিরূপ অমৃতময় পদার্থ তাহা কি বলিব, আজন্মমৃত্যুপর্য্যন্ত সুখকর, হৃদ্য, আয়ুষ্কর ও পবিত্রতা-বর্দ্ধক। "দধি"র গুণ বৈদ্যকে যাহা লেখে তদ্দ্বারা বোধ হয় শারীরিক পুষ্টি সাধন সহ মানসিক বৃত্তির উত্তেজনা করাই ইহার প্রধান গুণ। "ঘৃতের" ভোজনে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়া শরীর সবল করে। "মধু" সকল কাজের ও সকল ঔষধের সহায় ও সাধক ও সর্ব্বজীবের প্রিয় বস্তু। "শর্করা" সমুদায় ভোজ্য দ্রব্য মধ্যে সুমিষ্ট ও সুখকর। গর্ভাধানের সর্ব্বপ্রকার বস্তু মধ্যে যদি এইগুলি প্রধান অঙ্গ বলিয়া থাকে তবে অবশ্য তাহার ব্যবহার অনিবার্য্য সুতরাং ইহা দ্বারা গর্ভাশয়ের দোষ পরীহার হয়; এবং জননেন্দ্রিয়ের সবলতা ও শারীরিক স্বাস্থ্য অনায়াসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে যে এখানে স্বস্তি ও শান্তি বিধানেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়।

কেহ কেহ কহিবেন ঐ প্রথাটী অতি কুৎসিত বীভৎস ও ঘৃণাকর। আমরা তাঁহাদিগের জন্য ইহা লিখিতেছি না। তাঁহারা এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইতে পারেন।

জাতকরণেও স্বস্তি ও শান্তির প্রয়োজন। জাতশিশুর শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে, জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন হইবে সুতরাং এ কার্য্যে আনন্দ, স্বস্তি ও শান্তি কামনা করা সকলেরই অভিপ্রেত। তাই সূতিকা ষষ্ঠীপূজা। আত্মীয় স্বজনের আগমন প্রার্থনা, অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদগ্রহণ নিতান্ত কর্ত্তব্য। স্বশক্ত্যনুযায়ী মিষ্টান্ন বিতরণ, তৌর্য্যত্রিকের অনুষ্ঠান সহকৃত হুলাহুলীপূর্ব্বক পুরবাসীজনের কৌতুক লক্ষণ।

নিষ্ক্রমণ—নবজাত শিশু মাসত্রয় অতিক্রম করিলে চন্দ্র দর্শনের আনন্দ অনুভব করিবার অধিকারী হয়। ইহাতেও গৃহস্থের স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন—মানব সন্তান ছয় মাস অতিক্রম না করিতে পারিলে কঠিন পদার্থ ভোজন করিতে পারে না। তখন তাহার দন্তোদ্গম হয়। তখন যে হামাগুড়ি দেয় যাহা সম্মুখে দেখে তাহাই মুখে দিবার চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় তাহার সুখ ও শান্তি বিধানমানসে নান্দীমুখ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যে অষ্টবসুর পূজা ও বসুধারার প্রয়োজন। ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়াদির পূজা পূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকার পূজা। শিশুর কল্যাণ কামনায় দেবতার অধিবাস

পুরঃসর তাহার অধিবাস এবং পিতৃগণের নান্দীমুখশ্রাদ্ধ। অর্থাৎ আনন্দোৎসব পূর্ব্বক পিণ্ডদান। যেখানে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বর্ত্তমান থাকেন তথায় তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধনই নান্দীমুখ শ্রদ্ধ। ইহার আনুসঙ্গিক ভূতযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ হইয়া থাকে। ইহাকে সুতরাং স্বস্তি ও শান্তি অবশ্যই কহিব। নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহরূপ. অবশিষ্ট সংস্কারেও নান্দীমুখাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। স্বস্তি ও শান্তি এই সকল কার্য্যের প্রধান অঙ্গ।

নামকরণে—একব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে পৃথক করা যায়। চূড়াকরণে, কর্ণবেধ ও কেশমুণ্ডন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শিশুর বেশভূষার পারিপাট্য বিধান করান মুখ্য উদ্দেশ্য। পঞ্চবর্ষ অতিক্রম করিলে শিশুর সকল বিষয়েই স্পৃহা জন্মে। এই কালে তাহাকে পরিশোভিত করিতে পারিলে সকলেরই মনে স্বস্তি ও শান্তি অনুভূত হয়।

প্রাত্যাহিক সংস্কারে যত প্রকার শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ও কল্যাণ কামনা আছে এত আর কিছুতেই নাই। এ কার্য্যে যাহার কিছু লাভ নাই তাহারও দর্শন সুখ ও মনে স্বস্তি ও শান্তির উদয় হইয়া থাকে। তবে নিতান্ত অসূয়াপরবশ হিংস্র ব্যক্তির কথা পৃথক ও সুদূরপরাহত।

আর্য্যঋষিগণ যখন সকল কার্য্যেই স্বস্তি ও শান্তির বিধান করিয়াছেন তখন আমরা এত অশান্তি ভোগ করি কেন? তাহার কারণ একমাত্র দুরাকাঙ্ক্ষা। আমাদিগের আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা নাই। প্রবৃত্তিমার্গে মনঃসংযোগ আছে। নিবৃত্তিমার্গে দৃষ্টির লেশমাত্র দেখা যায় না। আমরা অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রার্থনা করি কিন্তু উপায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইবে তাহার কোন চেষ্টাই করি না। তাঁহার অনুগ্রহ ও কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত কেহই কোন বস্তু পান না। এবং পাইলেও অধিকার করিতে পারেন না। আমরা প্রত্যক্ষভূত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য দেখিতেছি কিন্তু উহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে সমর্থ নহি। কেন? তাহার উপাসনা করি না ও সকল বিষয়েই অতৃপ্ত ও অপরিণামদর্শী। অসাধ্য সাধন করিতে হইলে নিজের ক্ষমতাকে ঈশ্বরের অনুকম্পার উপরে ন্যস্ত করিতে হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারে ও সর্ব্বজীবের মঙ্গল কামনা করে তাহারই নিকট ঈশ্বর হস্তামলকবৎ প্রতীয়মান হয়েন।

আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। আমাদিগের যদি এই জ্ঞান দৃঢ় হয় তাহা হইলে তিনি আমাদিগের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ করেন।

মানবের আশা চতুর্বর্গ প্রাপ্তি; সেও নিজের হাতে। ধর্মবল, অর্থবল, কামবল ও মোক্ষবল প্রত্যেকটী নিজ কর্ম্মের ফলমাত্র। কর্ম্ম কর ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হও, আপনি চতুর্বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

দেখ, প্রহ্লাদ শৈশবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির সংপূর্ণ অধিকারী হয়েন। ধ্রুবও ইঁহার তুল্য পরাক্রমশালী। এই দুয়ের মনের উচ্চতা কতদূর তাহা কি কেহ অনুভব করিতে পারিয়াছ। "নিস্পৃহতা ও মনের ঔদার্য্যই স্বস্তি ও শান্তির লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার হইলেও তাঁহার মনে কুটিলতা ছিল বলিয়াই তিনি মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে যদুবংশ ধ্বংস করিতে হইয়াছিল এবং শেষে আত্মনির্ব্বৃত্তি জন্য ব্যাধ হস্তে শরাঘাতে প্রাণত্যাগ বাঞ্ছা করিতে হইয়াছিল। ইহার শেষ সীমা স্বস্তি ও শান্তি বিধান।

শ্রীকৃষ্ণ এই কার্য্যদ্বারা দেখাইলেন যে অত্যন্ত অশান্তির পরেও যদ্দ্বারা সংসারের শান্তি হয় তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই হেতু বশতঃ আর্য্যেরা সমুদায় কার্য্যের অগ্রে স্বস্তি বাচন ও শেষে শান্তি মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার দুই একটী দেওয়া গেল যথা।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো হরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

শান্তিমন্ত্র।

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণপ্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥
ও কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুসংবৃতাঃ।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরিক্ষঃ শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ। যতএবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করা হইয়াছে। তিনি আমাদিগের শুভ সাধন করুন। দ্বিতীয়—

ধর্ম্মপত্নী সকলকে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাঁহারা সুসংযত হইয়া শুভ সাধন করুন।

সেই দেবমাতৃগণ কে ? অর্থাৎ ধর্ম্মের পত্নী। এখন দেখা গেল যদি আমরা সুখী হইতে ইচ্ছা করি ও শান্তিলাভের বাসনা করি তাহা হইলে আমাদিগেরই অন্তঃকরণে বিরাজিত সেই ধর্ম্মপত্নীগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরিচালক মাতৃগণ কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে। মাতা যেমন হিতকরী ও পিতা যেমন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মাণ্ডে তেমন আর কেহই নাই ইহা দেখান হইয়াছে। দেবতাবর্গ পিতৃস্থানীয়। কীর্ত্তি=যশঃ; লক্ষ্মী=ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অণিমাদি গুণ; ধৃতি=ধৈর্য্য; মেধা=স্মরণশক্তি; ক্ষমা=পরের দোষ মার্জ্জনা; মতি=অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি; বুদ্ধি=জ্ঞান; লজ্জা=নিজকৃত দোষ দর্শনে কুণ্ঠিত হওয়া; বপুঃ=নিজ দেহের গৌরবে অবজ্ঞা প্রদর্শন; কান্তি=নিজ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হওয়া; শান্তি=সত্ত্বগুণাশ্রিত মানসিক ঔদার্য্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণী ও সত্ত্বে দয়া; তুষ্টি=নিস্পৃহতা অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্ম্ম ও কর্ম্মানুষ্ঠান। এখন দেখা গেল, আমরা এইরূপ সদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলেই আমরা স্বস্তি শান্তির আশ্রয় লইতে পারি।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

সাহিত্য দরবার।

প্রবাসী আশ্বিন, ১৩১০।

প্রবাসী সচিত্র মাসিক পত্রিকা; প্রিন্সিপ্যাল শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ ইহার সম্পাদক। প্রবাসীকে আমরা ভালবাসি এবং রামানন্দ বাবুর চরিত্র ও দেশানুরাগের উপর আমাদিগের শ্রদ্ধা আছে। তিনি, প্রবাসে থাকিয়া বঙ্গভূমি বঙ্গভাষাকে বিস্মৃত হন নাই। ইহার জন্য রামানন্দ বাবুকে আমরা অন্তরের সহিত অভিবাদন করি। সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালী যাহাতে আদর্শ জীবন সুরক্ষিত করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট; এবং তাহারই ফলে, পশ্চিমাঞ্চলে আদর্শ বঙ্গীয় জীবনের বৃত্তান্ত প্রবাসীতে সময়ে সময়ে প্রকটিত হইয়া থাকে।

"গুজরাতী সাহিত্য" প্রবন্ধের লেখক ডাক্তার মেজর বামন দাস বসু, উল্লিখিত প্রবন্ধে, গুজরাতী ভাষায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। এ প্রবন্ধটী দাক্ষিণাত্যের "প্রজাবন্ধু" (ইংরেজী) পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত। ইহাতে অনেক সারগর্ভ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তবে প্রবন্ধের রচনা বা ভাষায়, লেখক তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। "সাহিত্য নির্ম্মিত" "প্রদত্ত করা গেল" প্রভৃতি প্রয়োগ নিতান্তই দুষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। লেখক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"উত্তর ভারতের প্রচলিত ভাষার ভিতর গুজরাতী ভাষা যত ভিন্নজাতি ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়, ভারতের আর কোন ভাষা তত হয় না"; ইহাতে যেন হঠাৎ মনে হয়, যে ভারত বর্ষে গুজরাতী ভাষার প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; বস্তুতঃ তাহা নহে:—(১) খাস হিন্দী ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ+পঞ্জাবী ১ কোটি ৭২ লক্ষ+দক্ষিণী মুসলমানী ৩৬ লক্ষ+সিন্ধি ২৬লক্ষ+পশ্চিম পাহাড়ী ১৫লক্ষ+মধ্য পাহাড়ী ১২ লক্ষ+মাড়বারি ১১লক্ষ—মোট হিন্দুস্থানী ১১ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের ভাষা—

(২) খাস বাঙ্গালা ৪ ক্রোটি ১৩ লক্ষ+আসামী ১৪ লক্ষ+উড়িয়া ৯০ লক্ষ মোট বাঙ্গলা, উড়িয়া ৫ কোটী ৬৭ লক্ষ লোকের ভাষা—

(৩) মহারাষ্ট্রীয় ১ কোটি ৯০ লক্ষ+ গুজরাটী ১ কোটি+কানারী ৯৭ লক্ষ+ কচ্ছী ৪ লক্ষ মোট মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী, কানারী ৩ কোটি ৯১ লক্ষ লোকের ভাষা—

(৪) তেলেগু ১ কোটি ৯৮ লক্ষ লোকের ভাষা—

(৫) তামিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ+মালায়ালম ৫৪ লক্ষ। মোট তামিল মালায়ালম ২ কোটি ৬লক্ষ লোকের ভাষা—(ভূদেব বাবুর সামাজিক প্রবন্ধ ২২১ পৃষ্ঠা।)

কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লেখকগণই গুজরাতী ভাষার স্রষ্টা নহেন। পার্শী-দিগেরও মাতৃভাষা গুজরাতী। তবে হিন্দুলেখকগণ বেশী সংস্কৃত, ও পার্শী লেখকেরা বেশী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পার্শী দাদাভাই নাওরোজী, গুজরাতী ভাষায় সুলেখক বলিয়া গণ্য এবং তিনিই 'রাস্তগোফ্‌তার' পত্রিকার সংস্থাপক এবং প্রথম সম্পাদক। বঙ্গের রাজনৈতিক অগ্রণী এবং কংগ্রেসবীরগণ অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা করিতে ও প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম; কিন্তু মাতৃভাষায় একখানি পত্র লিখিতে হইলে, গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিলক,

নওরোজী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। প্রাচীন গুজরাতী কাব্যাদির ভাষা, ব্রজবুলী; সুতরাং বঙ্গভাষার অনেকটা সমীপবর্ত্তী। যাঁহারা বিদ্যাপতির পদাবলি ব্রজভাষায় রচিত বলিয়া, বিদ্যাপতি ঠাকুরকে মৈথিল কবি প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতিকে বিদ্যাপতি প্রভাবে বর্দ্ধিত মনে করেন, তাঁহারা হয়তো গুজরাতী কবি নরসিংহ, প্রেমানন্দ, দয়ারাম, মীরাবাই প্রভৃতিকে, "রিসফী" অথবা মিথিলা প্রদেশস্থ সীতামারির কোন মংকুমার অধীনে টানিয়া আনিয়া ফেলিবেন। গুজরাতী ভাষা ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনার ফলে দেখা যায় যে এক সময় সম্ভবতঃ প্রাকৃতের পরে ব্রজভাষাই গুজরাত হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বা কবিত্বের লিখিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। উত্তর পশ্চিম হইতেই আর্য্যেরা বাঙ্গলায় উপনিবেশ করেন; এই উপনিবেশ কবে আরব্ধ হইয়াছিল নির্ণয় করা সহজ নহে; তবে জয়দেবের (দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ) সময় হইতে বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গবিহার প্রভৃতি প্রদেশে অধিকাংশ কৃষ্ণলীলাশ্রিত সঙ্গীত পদাবলি, ব্রজভাষাতেই রচিত হইত, এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। উল্লিখিত প্রতিজ্ঞাতে এরূপ সিদ্ধ হইতেছে না যে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতির সময়ে সাধারণ চলিত ভাষা ব্রজভাষা ছিল। পদকল্পতরুর এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা ব্রজভাষা সংসৃষ্ট নহে এবং আধুনিক বাঙ্গলাভাষার নিতান্ত সন্নিকটবর্ত্তী। (এ সম্পর্কে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য ৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সুতরাং আধুনিক বঙ্গভাষার মূলপত্তন চণ্ডীদাসের সময় (চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দ) হইতে আরব্ধ এবং পঞ্চদশশতাব্দীর কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামদাসী মহাভারতে সুদৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। গুজরাতী সাহিত্যের ক্রম বিকাশ বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির পথ অনুসরণ করিতেছে। আদ্যকালে বাঙ্গলায় যেমন হিন্দী এবং ব্রজভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়, তেমনি প্রাচীন 'গুজরাতী সাহিত্যেও ব্রজভাষার সংস্রব সুস্পষ্ট —। আবার আধুনিক গুজরাতী ভাষা, আধুনিক পরিণত বঙ্গভাষায় ন্যায় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ বাহুল্যে সুমার্জ্জিত।

নবপ্রতিভা। শ্রাবণ ১৩১০।

নবপ্রতিভার প্রতিভা "এদেশী সঙ্গীত" প্রবন্ধে প্রতিফলিত। ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অতি অল্প কথায় সরল ভাষায় বেশ বর্ণিত হইয়াছে।

"সঙ্গীতের আদি কোথা? গ্রীসের যখন অন্নপ্রাশন "হয় নাই তখনো এদেশে সঙ্গীত ছিল, তাহার প্রমাণ সামবেদ।"

শুধু ইহাই নহে। Von Bohlen [vide Das alte Indien, II. p. 195 (1830)], and Benefy, [vide Indien p. 299 (in Ers-ch and Gruber's Encyclopoedie, vol XVII. 1840.)] দুইজন মহাপণ্ডিত। তাঁহাদের মতে ছন্দ* হইতে সপ্তস্বর (Notation) পারস্যে ও পারস্য হইতে আরবে যায়। আরব হইতে Giudo d'arizzo কর্তৃক ইউরোপীয় সঙ্গীতে লওয়া হয়।

"অনেকের বিশ্বাস যে পাশ্চাত্য সঙ্গীত অতি হেয় না হইলেও এ দেশী সংগীত অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক।"

এ বিষয়ে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ১৮৭৪ সালে Calcutta Reviewতে Mr. C. B. Clarke যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার একটু নমুনা দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন আমাদের কথা কতদূর সত্য। "I think most Europeans who take the trouble to compare them (i.e boatman's songs) with the best specimens in Sangit Sara (সঙ্গীত সার) etc. will readily credit my statement in my letter of 17 th. May 1873 (addressed to the director of Public Instruction) viz, that while all Hindu musicians speak with contempt and almost abhorrance of the boatman's songs, I have heard many Europeans declare that *the boatmen's chants are the only music in Bengal that can properly be called music."*

ইহা হইতেই বুঝা যায় ইউরোপীয় সঙ্গীত কিরূপ এবং ইউরোপীয়েরা —কিরূপ সঙ্গীত রসজ্ঞ!

"পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগ রাগিণী নাই বটে, কিন্তু তাহাতে হারমনি,কাউন্টারপইন্ট প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার আছে তাহা আমাদের কোথায়? এ দেশী সঙ্গীতের বিশিষ্ট লক্ষণ রাগ রাগিণী।"

ইহা* ভ্রমাত্মক। "It is true that Hindu music abounds in melody but it is not void of harmony. The following quotation from Narada's work will best explain our meaning:

গানস্য দশবিধগুণবৃত্তিস্তদ্‌যথা,রক্তং
পূর্ণমলঙ্কৃতংপ্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টংশ্লক্ষ্ণং সমং
সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ। তত্র রক্তং নাম
বেণুবীণাদি স্বরানামেকীভাবে রক্তমিত্যুচ্যতে।

---

* The earliest mention of the names of the seven notes of the musical scale occurs in the Vedangas—in the chhandas স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়ঃ। ষড়্‌জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদাঃ স্বরা ইতি — বৈদিক ছন্দোক্ত and Siksha.

But of all of them are not to our present purpose ; রঙ্গং only serves our purpose well, and its defination is as follows : রঙ্গং is that which is produced by a combination of the sounds of all stringed instruments, wind instruments, and those of other kinds.——This is harmony. Vide সঙ্গীতদর্পণ and অদ্ভুত রামায়ণ। (vide Hindu Patriot, 7th Sep. 1874).

নূতন গ্রন্থ।

(১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন চরিত। আমরা এই দুইখানি উৎকৃষ্ট, জ্ঞানগর্ভ এবং সুখপাঠ্য গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামীবারে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

সাময়িক সংবাদ।

নূতন নিয়ম। ১৯ শে তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত হয় যে ছয় তোলার অনধিক ওজনের সংবাদ পত্র (রেজিষ্টার্ড) ৫ এবং বিশ তোলার অনধিক অর্দ্ধ আনার ডাকমাশুল লাগিবে।

সভা সমিতি। পৌষের মধ্যভাগে ভারতে নানা স্থানে সভা সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। বোম্বাই নগরে মহম্মদীয় মহাসমিতি, মান্দ্রাজে কংগ্রেস, বঙ্গে কায়স্থ সমিতি উৎকল সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হইয়াছিল। সভা সমিতি দেশের একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইল। সভাসমিতিতে দেশের কোন বিশেষ উপকার নাই ; কেবল নিরর্থক অর্থব্যয়, অনর্থক শ্রম স্বীকার। এই অর্থ ও শ্রম যদি দীনদরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত হয়, যদি তাহাদিগের জাতীয় ব্যবসায় কল্পে এই অর্থ প্রযুক্ত হয়, যদি স্বদেশী দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রসারে প্রয়াস করা হয় তাহা হইলে দেশের বহু উপকার হইবে।

নদীয়া মিউনিসিপালিটী। গত ভাদ্র মাসে শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরদিগের নিকট হইতে স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হয়। আবার গত পৌষমাসে নদীয়া মিউনিসিপাল কমিশনরগণ শান্তিপুরের সহিত সমদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কুয়াপায়খানা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া তোলা পায়খানা করিতে ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ল্যাট্রিন ট্যাক্স বসাইতে আদেশ করেন। কিন্তু স্থানীয় লোক সকল অতি দীন বলিয়া কমিশনারগণ গভর্ণমেণ্টের আদেশ পালনে অসম্মত হন। তজ্জন্য তাঁহাদের এই শাস্তি।

রুষ জাপানের যুদ্ধ। আজ কয়েকমাস হইতে রুষ ও জাপানে কোরিয়া ও মানচুরিয়া লইয়া গোলযোগ বাধে। রুষ এই দুই স্থানের নিজ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে চাহেন, জাপান তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। এতদিন তারের সংবাদে কখন শান্তিপ্রদসন্ধির প্রস্তাবে আশান্বিত ও সুখী হইতেছিলাম, কখন যুদ্ধ নিশ্চিত মনে করিয়া উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হইতেছিলাম। কিন্তু ২৫ শে মাঘ যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। * এখন জয় পর জয় ভগবানের হাতে।

* যুদ্ধের দৈনিক বিবরণ যথা সময়ে "দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ" প্রকাশিত হইবে।

দৈনিক ঘটনা সংগ্রহ।

পৌষ, ১৩১০।

১লা পৌষ, ১৬ই ডিসেম্বর। গ্রীস মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী রালি পদত্যাগ করেন।—আফ্রিকায় হটেণ্টাসগণ বিদ্রোহী হইয়াছে জানা যায়।

২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর। লর্ড কর্জ্জন পারস্যোপসাগর ভ্রমণান্তে কলিকাতায় পৌঁছান।

৩রা পৌষ, ১৮ই ডিসেম্বর। থিয় কিস নূতন গ্রীস মন্ত্রী সভা গঠন করেন।

৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।—জেনারেল ডিলারী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আশ্বস্ত হইয়া আহম্মদ নগরে বন্দী বুয়ারগণ ইংরাজের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়াছে জানা যায়।

৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর। জেনারেল ডিলারী আফ্রিকা উদ্দেশে যাত্রা করেন।—সিবিতে ভূমিকম্প হয়। অনেক ঘর বাড়ী পতিত হয় ও ৫টি লোকের মৃত্যু হয়।

১১ই পৌষ, ২৬শে ডিসেম্বর। মহীশুরের মহারাজা কর্ত্তৃক কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রদর্শনী উন্মোচিত হয়।

১২ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সিনি ষ্টেশনের নিকটে মাল-গাড়ী ও যাত্রী গাড়ীর সংঘর্ষণ হয়। অনেক যাত্রী হত ও আহত হয়।—ইতালীর রাজনীতি-বিদ জানার্ডেলির মৃত্যু হয়।

১৩ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর। কংগ্রেসের উনবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষ সভাপতি বরিত হন।

১৪ পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর। মান্দ্রাজে ভয়ানক ঝড় ও জল হয়।—উৎকল সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য সমগ্র উড়িষ্যাবাসীদিগকে একত্রিত করণ।—

১৫ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর। মতিহারীতে ৮০০০ কায়স্থ উপস্থিত হইয়া কায়স্থ সমিতিতে যোগদেন।—কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হয়।—রামনদের রাজার ভাস্কর সেতুপতির মৃত্যু সংবাদ শুনা যায়।—আমেরিকার চিকাগো নগরে আইরো কুইস থিয়েটারে "ব্লু বিয়ার্ড" অভিনয় কালীন অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হয়। প্রায় ছয় শত লোকের জীবন নষ্ট হয়।

১৬ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর। ভারতবর্ষীয় জাতীয় সামাজিক সমিতির সপ্তদশ বৈঠক বসে।

১৭ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী (১৯০৪)। মান্দ্রাজে ভীষণ জলপ্লাবনের সংবাদ আসে।—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট স্যর লাটুস কলিকাতায় আগমন করেন।—কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ও সেনাপতি লছমন দাসের মৃত্যু হয়।

২০শে পৌষ, ৪ঠা জানুয়ারী। সংবাদ আসে যে পাগলা মোল্লা ইতালীয় দিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে।—কুচবিহার মহারাজার মাতৃ দেবী পরলোক গমন করেন।—বঙ্গের সীমানা পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ করনার্থ ঢাকায় বৃহতী সভা হয়।

২১শে পৌষ, ৫ই ডিসেম্বর। স্যর লাটুস কলিকাতা পরিত্যাগ করেন।

২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারি। নবদ্বীপ মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের হস্ত হইতে মিউনিসিপাল কার্য্যভার নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস ভুক্ত লগ্রিং হাউস বিভাগের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে এক বৎসরের জন্য ন্যস্ত হইল।

২৪শে পৌষ, ৮ই জানুয়ারী। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়।

২৬শে পৌষ, ১০ই জানুয়ারী। ব্রিটিস্ কলম্বিয়ার নিকটে ক্লালাম অর্ণবপোত জলমগ্ন হইয়া বহুলোকের প্রাণহানি হয়।

২৭শে পৌষ ১১ই জানুয়ারী। স্যার আর্থর হাভলক টাসম্যানিয়ার শাসনকর্তার পদ পরিত্যাগ করেন।—জিডবালির নিকট মোল্লার দরবেশ সৈন্য ইংরাজ দিগের নিকট পরাজিত হয়।

৩০শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী। লাহোরে অতিশয় বৃষ্টি হয়।